FAYSAL

মাসুদ রানা

# ধ্বংস পাহাড়

# ভারতনাট্যম

# স্বর্ণমৃগ

কাজী আনোয়ার হোসেন

তিনটি বই একত্রে




ANIK



pathfinder

# মাসুদ রানা

## ভলিউম ১

## কাজী আনোয়ার হোসেন

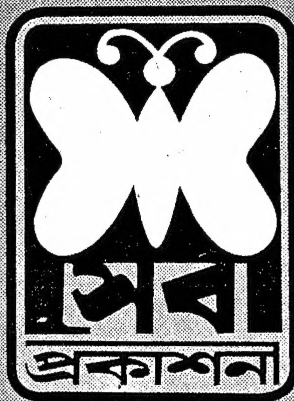
বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর-সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সঙ্গে পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত। ধন্যবাদ।




সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

---

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০




চৌষট্টি টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০



প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
আসাদুজ্জামান
সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩
MASUD RANA VOLUME-1
Three Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

## প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

প্রথমেই বলে রাখি, এই বই বড়দের জন্যে লেখা।

বাংলা সাহিত্যে রহস্যোপন্যাস বলতে বোঝায় কেবল ছোট ছেলে-মেয়েদের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে কেনা এক ধরনের উদ্ভট গল্পের বই, যা হাতে দেখলে বাবা, কাকা, ভাইয়া এবং মাস্টার মশাই প্রবল তর্জন গর্জন করে কেড়ে নিয়ে নিজেরাই পড়তে লেগে যান, গোপনে।

কেন পড়েন?

কারণ এর মধ্যে এমন এক বিশেষ রস আছে যা প্রচলিত অর্থে যাকে আমরা সুসাহিত্য বলি তার মধ্যে সাধারণত পাওয়া যায় না। তাই ছোটদের বই থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে, আংশিক হলেও, আনন্দ লাভ করেন বড়রা।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিশেষ করে ছোটদের জন্যে লেখা বলে এসব বইয়ে ছেলেমানুষীর এতই ছড়াছড়ি থাকে যে আমরা বড়রা এই বই পড়ি, এবং এ থেকে আনন্দ পাই তা স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করি।

তাই ছেলেমীটাকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে গিয়ে বড়দের উপভোগ্য রোমাঞ্চকর রহস্যোপন্যাস রচনা করবার চেষ্টা করলাম।

এ চিন্তা মাথায় ঢুকিয়েছেন বন্ধুবর মাহবুবুল আমীন (আবু)। তাঁরই উৎসাহে এবং সর্বপ্রকার সহযোগিতায়, বলতে গেলে এক রকম বাধ্য হয়েই, লিখতে হলো ধ্বংস-পাহাড়। তাই এর নিন্দার সবটুকু গ্লানি অম্লান বদনে মাথা পেতে নিতে তিনি বাধ্য।

প্রশংসার কথা কিছু বললাম না। যদি কিছু জোটেই, ভাবছি একা নিজেই চুপচাপ হজম করে ফেলব কিনা।

কাজী আনোয়ার হোসেন

মে, ১৯৬৬

# ধ্বংস-পাহাড়

প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৬৬

## এক

কফির কাপটা মুখে তুলতে গিয়ে থমকে গেলেন চীফ এঞ্জিনিয়ার আর.টি. লারসেন। সামনে দাঁড়ানো লোকটার মুখের দিকে চাইলেন ভুরু কুঁচকে। তারপর ভাঙা বাংলায় বললেন, 'বলো কি, আবদুল! এটা সম্ভব?'

ফ্রন্টিয়ারের আবদুর রহমান উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'হামি নিজে তিন দিন দেখছি, স্যার। কেউ হামার কোথা বিশওয়াস কোরে না। আখুন আপনার কাছে আইছি, হাজুর, কসম খোদার···'

'আমাকে দেখাতে পারবে?' ওকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন লারসেন।

'আলবৎ! আর আধা ঘোণ্টা পর আইবো তারা। উও স্পীডবোট হামাদের না, ফিশারীরও না। আজহি দেখাতে পারি, হাজুর!'

'বেশ, তুমি যাও। ঠিক সাতটায় আসছি আমি ড্যামের ওপর।'

খুশিমনে সাহেবের বাংলো থেকে বেরিয়ে এল আবদুর রহমান। একবার ভাবল, আজ যদি ওরা না আসে? বোকা বনতে হবে সাহেবের কাছে। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে মনে মনে বলল—রোজ আসছে, আজ আসবে না কেন, নিশ্চয়ই আসবে।

কাপ্তাই বাঁধের কাজ শেষ, পাওয়ার হাউজ তৈরির শেষ পর্বের কাজ চলছে জোরেশোরে। তুমুল ব্যস্ততা, চারদিকে সাজ-সাজ রব, প্রেসিডেন্ট আসবেন ড্যাম ওপেন করতে। এরই মধ্যে এই ফ্যাঁকড়া।

আজ আট বছর ধরে প্রজেক্টের সারভে ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে আবদুর রহমান।

কাপ্তাইকে সে ভালবেসে ফেলেছে সমস্ত হৃদয় দিয়ে। ওর চোখের সামনেই তিল তিল করে বছরের পর বছর ধরে তৈরি হয়েছে এই বাঁধ। প্রজেক্টের খুঁটিনাটি ওর নখদর্পণে। ড্যামের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের দিকে লক্ষ রাখার গুরু দায়িত্ব ওর ধারণা ওরই উপর ন্যস্ত আছে। সীমান্ত প্রদেশের আবদুর রহমান এখানে এসে সবার প্রিয় আবদুল হয়ে গেছে। সাহেব সুবোরা স্পীড বোটে করে বেড়াবেন, কি পাহাড়ী গ্রাম দেখতে যাবেন, কিংবা ষাট মাইল উত্তরে যাবেন হরিণ শিকারে, সঙ্গে যাবে কে—ওই আবদুল। সবকিছুতেই ওর অক্লান্ত উৎসাহ। এই পার্বত্য চট্টগ্রামের কোথায় সে যায়নি? চল্লিশ মাইল পায়ে হেঁটে দুর্গম লুসাই হিলেও গিয়েছে সে সাহেবদের সঙ্গে।

ক'দিন ধরে একটা ব্যাপার লক্ষ করে বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে আবদুল ভিতর ভিতর। আর দু'দিন পর প্রেসিডেন্ট আসছেন প্রজেক্ট ওপেন করতে। ছোট্ট শহরটায়

তাই অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য। চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছে। প্রচুর আই.বি., সি.আই.ডি. ঘুরঘুর করছে শহরের আনাচেকানাচে। কিন্তু আই.বি. কর্মতৎপরতা বলে এই ঘটনাকে হালকা করে দেখতে পারেনি সে। তাই যদি হয় তবে ভুড়ভুড়ি কিসের?

এক টিপ খইনি নিচের ঠোঁট আর দাঁতের ফাঁকে যত্নের সাথে ছেড়ে দিয়ে সেটাকে ঠিক জায়গামত বসিয়ে নিল আবদুল। তারপর স্পিলওয়ের গার্ডরুমে ঢুকে দোনলা বন্দুকধারী দেশোয়ালী ভাইয়ের সাথে অনর্গল পশতু ভাষায় কিছুক্ষণ বাতচিত করল।

ঠিক সাতটায় দূর থেকে লারসেন সাহেবকে আসতে দেখে এগিয়ে গেল আবদুল। সন্ধ্যার আর দেরি নেই।

কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর রিজারভয়েরের মধ্যে দূরে একটা স্পীড-বোট দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন মি. লারসেন। উঁচু একটা টিলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা। আরও আধ ঘণ্টা পর আবদুলের কথামত সত্যিই পানির উপরে ছোট ছোট বুদ্বুদ দেখা গেল। শক্তিশালী টর্চ জ্বেলে দেখা গেল সেই টিলার দিক থেকে বুদ্বুদের একটা রেখা ক্রমেই এগিয়ে আসছে বাঁধের দিকে। গজ পনেরো থাকতে এগোনোটা থেমে গেল—এবার এক জায়গাতেই উঠতে থাকল বুদ্বুদ।

মি. লারসেন উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'মাই গড্! আশ্চর্য! আবদুল, তুমি ছুটে যাও তো, স্টোর থেকে আমার নাম করে দুটো অ্যাকুয়া-লাঙ (ডুবুরীর পোশাক) নিয়ে এসো এক্ষুণি। আর যাওয়ার পথে লোকমানকে বলে যাও আমাদের স্পীড-বোট রেডি করে ঘর থেকে যেন আমার রাইফেলটা নিয়ে আসে। যাও, কুইক।'

দৌড় দিল আবদুল। ঠিক সেই সময়ে দূর থেকে একটা এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ শোনা গেল। সেই টিলার দিক থেকেই এল শব্দটা। ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল সেই শব্দ—ফিরে চলে গেল স্পীড-বোট।

কাপ্তাইয়ের পাঁচ মাইল উত্তর-পশ্চিমে হাতের বামদিকে একটা মাটির টিলা—এখন রিজারভয়েরের পানি বেড়ে ওঠায় ডুবু-ডুবু। তারই ভিতর দামী আসবাবপত্রে সুসজ্জিত একটা প্রশস্ত ঘর। একটা সোফায় বসে আছেন গৃহস্বামী কবীর চৌধুরী আর অপর একখানায় ভারতীয় গুপ্তচর বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ মাদ্রাজী কর্মকর্তা মি. গোবিন্দ রাজলু। পাশের টিপয়ের উপর চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে গোবিন্দ রাজলু বলল, 'অসামান্য প্রতিভা আপনার, মি. চৌধুরী। এই পাহাড়ের মধ্যে এত বড় একটা গবেষণাকেন্দ্র তৈরি করলেন কি করে? এতসব যন্ত্রপাতি, এত রকম ব্যবস্থা! অথচ বাইরে থেকে কিছুই বুঝবার উপায় নেই।'

এই অকুণ্ঠ প্রশংসায় কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে চৌধুরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাইল রাজলুর চোখের দিকে, তারপর বলল, 'আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি আছি, মি. রাজলু। শুক্রবারেই ঘটবে ঘটনাটা।'

দেয়ালের গায়ে দুটো তাকের উপর থরে থরে সাজানো আছে বই। চৌধুরী উঠে গিয়ে একটা বোতাম টিপতেই দেয়ালের খানিকটা অংশ ঘুরে গেল। বইসুদ্ধ সামনের দিকটা অদৃশ্য হয়ে গেল পিছনে, আর পিছন দিক থেকে সামনে চলে এল

একটা সি-সিটিভি, অর্থাৎ ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন সেট। সেটটা চালু করে দিয়ে নিজের আসনে গিয়ে বসল চৌধুরী। গোবিন্দ রাজলু অবাক হয়ে দেখল পরিষ্কার কাপ্তাই ড্যামের ছবি দেখা যাচ্ছে টেলিভিশনে। এক আধটা গাড়ি সাঁ করে চলে যাচ্ছে বাঁধের ওপরের রাস্তাটা দিয়ে। সামনে থৈ-থৈ করছে জল, অল্প বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে সে জলে।

'রিজারভয়েরের জল এখন কতখানি?' জিজ্ঞেস করল রাজলু।

'সী-লেভেল থেকে ৯৯ ফুট। এটা সারভে অভ পাকিস্তানের হিসাব। ড্যামের হিসাব অবশ্য আলাদা—ওরা সী লেভেলের নয় ফুট নিচ থেকে ধরে। ওরা বলবে এখন ১০৮ ফুট।'

'আচ্ছা, পুরো ড্যামের ফিল্ ম্যাটেরিয়াল কতখানি? মাত্র তিনটেতেই কাজ হয়ে যাবে বলে মনে করেন?'

'ফিল্ ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে পনেরো কোটি ছেষট্টি লক্ষ আশি হাজার সি.এফ.এস.। হ্যাঁ, আমার মতে তিনটেই যথেষ্ট। মেইন ড্যামটা দু'হাজার দু'শো ফুট লম্বা; আর চওড়া হচ্ছে, ওপরটা বাইশ ফুট—নিচটা একশো পঁয়তাল্লিশ ফুট। তিনটে জায়গা ভেঙে দিতে পারলে বাকিটা আপনিই উড়ে যাবে। তাছাড়া দেখুন, স্পিলওয়ের ষোলোটা গেট—প্রতিটা বত্রিশ বাই চল্লিশ ফুট—আমার লোক সব ক'টা লক গেট সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে সরে পড়বে সবাই যখন প্রেসিডেন্টের ওপেনিং নিয়ে ব্যস্ত, সেই সুযোগে। এছাড়াও পাওয়ার হাউসের টানেল ডায়ামিটার হচ্ছে বত্রিশ ফুট হর্‌স্‌শ্যু—সেখান দিয়েও বেরোচ্ছে পানি। সবটা মিলে মোট এফেক্ট হচ্ছে এক কথায় যাকে বলে ডিভাসটেটিং, ভয়ঙ্কর। পুরো রিজারভয়ের অর্থাৎ দু'শো তেপ্পান্ন বর্গমাইলের এতদিনকার জমা পানি একসাথে বেরোবার চেষ্টা করছে—কল্পনা করুন একবার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মি. রাজলু, এই তোড়ের মুখে প্রেসিডেন্টের চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না, পাক্-চীন প্যাক্ট নিয়েও ভারতকে আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে না।'

'আমাকে আপনি আশ্চর্য করে দিচ্ছেন, মি. চৌধুরী। ভয়ানক নিষ্ঠুর লোক আপনি, মশাই। এত সাঙ্ঘাতিক একটা কাজ এমন ঠাণ্ডা মাথায় কি করে করছেন আপনি? এতটুকু বিকার নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে একবারও কি দ্বিধা হচ্ছে না, কিংবা হচ্ছে না একবিন্দু বিবেক-দংশন?'

'দেখুন, সে অনেক কথা। আমাদের কারও হাতেই অত সময় নেই যে এ নিয়ে আলাপ করব। তবু এটুকু আপনাকে বলতে পারি যে এমন হঠাৎ করে যদি প্রয়োজন হয়ে না পড়ত তাহলে হয়তো এত প্রাণ নষ্ট না করে অন্য উপায় অবলম্বন করতাম আমি। কেবল মাত্র আকস্মিক প্রয়োজনের তাগিদেই আপনাদের সাহায্য নিতে হচ্ছে আমাকে—এবং কেবলমাত্র এই জন্যেই প্রজেক্ট ওপেনিং-এর দিন ড্যাম ভাঙার গর্হিত প্রস্তাব আমাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিতে হলো।'

কথার ফাঁকে ফাঁকে বাঁকা পাইপটায় টোবাকো ভরা হচ্ছিল, এবার সেটা ধরিয়ে নিয়ে টেলিভিশন সেটের একটা নব সামান্য ঘুরিয়ে ছবিটা আরও পরিষ্কার করে দিল মি. চৌধুরী। তারপরই কী দেখে চমকে উঠে 'এক্সকিউজ মি,' বলে একপাশে টেবিলের উপর রাখা ওয়ায়্যার-লেস্ ট্রান্সমিটারের সামনে গিয়ে বসল।

হঠাৎ চৌধুরীকে এমন ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখে বিস্মিত গোবিন্দ রাজলু টেলিভিশনের দিকে চেয়ে দেখল তাতে একজন মার্কিন সাহেবকে দেখা যাচ্ছে। হাত নেড়ে কাউকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছে সে—বাঁধের কাছেই জলের মধ্যে কিছু লক্ষ করছে সাহেব টর্চ জ্বেলে।

কানে এয়ার ফোন লাগিয়ে ইলেভেন মেগাসাইকেল্‌সে সিগন্যাল দিল চৌধুরী।

'এক্স ওয়াই জেড কলিং এস বি টু, ক্যান ইউ হিয়ার মি?' দু'বার কথাটা বলল চৌধুরী।

'এস বি টু স্পীকিং। হিয়ার ইউ লাউড অ্যাণ্ড ক্লিয়ার।' সাথে সাথেই উত্তর এল স্পীড-বোট থেকে।

'তেরো নম্বরকে বোটে ফিরিয়ে আনো—সিগন্যাল দাও।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর উত্তর এল, 'আমাদের সিগন্যাল পাচ্ছে না তেরো নম্বর—অনেক দূর চলে গেছে। এগিয়ে যাব সামনে?'

একমুহূর্ত চিন্তা করে চৌধুরী বলল, 'না, ফিরে চলে এসো এক্ষুণি।'

চিন্তিত মুখে আবার কী-বোর্ডে কিছুক্ষণ আঙুল চালিয়ে বলল, 'এক্স ওয়াই জেড কলিং কে পি ফাইভ, এক্স ওয়াই জেড…এক্স ওয়াই জেড…এক্স ওয়াই জেড। ক্যান ইউ হিয়ার মি?' বার কয়েক কথাটা উচ্চারণ করল সে। তারপর উত্তর এল।

'দিস ইজ কে পি ফাইভ। হিয়ার ইউ লাউড অ্যাণ্ড ক্লিয়ার, স্যার।' কাপ্তাই ভি আই পি রেস্ট হাউসের একটা কামরায় ট্রান্সমিটারের সামনে বসে শুনছে কে পি ফাইভ।

'ড্যামের গায়ে আনলাকি থারটিন কাজ করছে, মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ধরা পড়বে ও। তুমি গিয়ে পানিতে নামবে সবার আগে। যন্ত্রপাতি মাটি চাপা দিয়ে দেবে, এবং তেরো নম্বরের মৃতদেহ নিয়ে ওপরে উঠবে। বুঝতে পেরেছ? তেরো যেন জ্যান্ত পানির ওপর না ওঠে।'

'বুঝেছি, স্যার, যাচ্ছি এখুনি।'

সিক্সটি মডেলের একটা কালো শেভ্রোলে চীফ এঞ্জিনিয়ার লারসেনের পাশে এসে থামল জোরে ব্রেক কষে। জানালা দিয়ে মুখটা বের করে আরোহী বলল, 'হ্যালো, লারসেন, কি করছ এখানে?'

'হাল্লো, ইসলাম। তুমি কোত্থেকে? নেমে এসো, একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাচ্ছি তোমাকে।'

'কি ব্যাপার?' বলে গাড়ি থেকে নেমে এল রাফিকুল ইসলাম। অফিসার্‌স্ ক্লাবের হিরো এই ইসলাম। ক্লাবে মোটা স্টেকে ব্রিজ, ফ্ল্যাশ, পোকার খেলে এবং প্রতিবার প্রচুর টাকা হেরে, প্রচুর পরিমাণে ড্রিঙ্ক পরিবেশন করে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছে সে সবার কাছে। বছর তিনেকের নিয়মিত যাতায়াতে সবার সাথেই খাতির জমিয়ে নিয়েছে এই সদালাপী সুদর্শন ধনী যুবক। লারসেন সাহেবও একে খুব স্নেহের চোখে দেখেন।

'ওই দেখো। ওখানে বুদ্বুদ কিসের বলতে পারো?'

টর্চের আলোয় পানির উপর অনেকগুলো বুদ্বুদ দেখল ইসলাম। বলল, 'আশ্চর্য!

এ তো অ্যাকুয়া লাঙ-এর ভুড়ভুড়ি। ওখানে কাউকে নামিয়েছ নাকি নিচে?'

'না। ওই টিলার কাছ থেকে কেউ পানির নিচ দিয়ে এসেছে বাঁধের গায়ে। লোকটা কি করছে জানা দরকার।'

'কাল গিয়েছিলাম কক্সবাজারের সী-তে রেয়ার কিছু শঙ্খ তুলতে। গাড়ির পেছনে অ্যাকুয়া-লাঙটা বোধহয় রয়ে গেছে। নেমে দেখব নাকি?'

'দাঁড়াও, আবদুলকে স্টোরে পাঠিয়েছি—ও আসুক, দু'জন একসাথে নেমো। পানির নিচে একাধিক লোক থাকতে পারে, অস্ত্রশস্ত্রও থাকতে পারে।'

হেসে উড়িয়ে দিল ইসলাম কথাটা। তারপর গাড়ির পিছন থেকে কম্প্রেস্‌ড এয়ারের সিলিণ্ডার ফিট করা কিম্ভূতকিমাকার ডুবুরী-পোশাক বের করে পরে নিল আধমিনিটের মধ্যে। কাঁটাতারের বেড়া টেনে ধরলেন মি. লারসেন, বাঁধের গায়ে সাজিয়ে রাখা বড় বড় কালো পাথরগুলোর উপর পা ফেলে ফেলে তরতর করে নেমে গেল ইসলাম পানিতে।

কিছুদূর নেমেই কাঁচের মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার দেখা গেল প্রায় সত্তর-আশি ফুট নিচে একটা উজ্জ্বল আণ্ডারওয়াটার টর্চ জ্বেলে কি যেন করছে আন্‌লাকি থারটিন। আনলাকিই বটে! হাসল ইসলাম।

প্রায় পনেরো ফুট কাছে যেতেও যখন লোকটা টের পেল না তখন পকেট থেকে সরু একটা টর্চ বের করল ইসলাম। ওর ভয় কেবল লোকটার পাশে মাটিতে রাখা হার্পূন বন্দুকটাকে।

আর তিন হাত এগোতেই হঠাৎ তেরো নম্বর কাজ বন্ধ করল, তারপর চট করে ঘুরে ইসলামের দিকে টর্চের আলো ফেলেই একটানে হার্পূনটা তুলে নিল হাতে। টর্চের তীব্র আলো পড়ায় মস্তবড় একটা কাতলা মাছ সড়াৎ করে সরে গেল সামনে দিয়ে।

সাথে সাথেই হাতের পেন্সিল-টর্চ জ্বেলে সিগন্যাল দিল ইসলাম। হার্পূনের ট্রিগার থেকে আঙুলটা সরে গেল তেরো নম্বরের। প্রত্যুত্তরে সেও সিগন্যাল দিয়ে হার্পূনের সেফটি-ক্যাচটা আবার তুলে দিল উপরে। তারপর সেটা নামিয়ে রেখে একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্যে বসে পড়ল মাটিতে। এতক্ষণ একটানা পরিশ্রমে রাবারের ভিতরে দর দর করে ঘাম ঝরছে ওর দেহ থেকে। ভাবল, বোধহয় তার কাজ তদারক করবার জন্যে এল কেউ। কিন্তু কেন জানি বুকের ভিতরটা একবার কেঁপে উঠল ওর।

বরফে গর্ত করবার একটা ফিন-বোর দিয়ে বাঁধের গায়ে গর্ত খুঁড়ছে তেরো নম্বর। ফিনল্যাণ্ডে এই যন্ত্রের ব্যবহার খুব বেশি। হাতে তুলে নিয়ে দেখল ইসলাম প্রায় সাড়ে তিন ফুট লম্বা আর পানির নিচে সের দু'য়েক ওজনের এই যন্ত্র অনায়াসে বারো ইঞ্চি ব্যাসের গর্ত তৈরি করতে পারে মাটিতে। মিনিয়াপোলিসের রাপালা কোম্পানীর তৈরি এই ফিন-বোর। ইচ্ছে করলে অনেক লম্বা করা যায় একে রড জুড়ে জুড়ে।

বন্দুকটা হাতে তুলে নিল ইসলাম। দেখল ফ্রান্সের নাম করা 'চ্যাম্পিয়ান' হার্পূন গান ওটা। সমুদ্রে হাঙ্গর, ব্যারাকুডা, এমনকি তিমি মাছ পর্যন্ত মারতে এ জিনিস অদ্বিতীয়।

আবার কাজ করবার ইঙ্গিত করতেই আনলাকি থারটিন যন্ত্রটা নিয়ে ঝুঁকে পড়ল

গর্তের উপর। আর ওর অজান্তে ইসলামের ডান হাতে ধরা সিরিঞ্জের সূচটা ঢুকে গেল রাবারের পোশাক ভেদ করে ওর পিঠে, হার্টের কাছটায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢলে পড়ে গেল লোকটা, ঠিক যেন ঘুমিয়ে পড়ল এক মুহূর্তে।

এবার গর্তের মধ্যে সম্পূর্ণ ঢুকিয়ে দিল ইসলাম যন্ত্রটা এবং তার সাথের রডগুলো। তারপর মুখটা মাটি দিয়ে চেপে বন্ধ করে দিল।

উজ্জ্বল আলোটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক মাছ দেখতে পেল সে। যেন একটা মস্তবড় অ্যাকুয়ারিয়ামের মধ্যে চলে এসেছে ও। ছোট ছোট মাছ নির্ভয়ে ওর পাশ দিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। বড় বড় গলদা চিংড়ীর উপর আলো পড়তেই আট হাত-পা কুঁকড়ে ওগুলো কয়েক পা পিছিয়ে যাচ্ছে লেজের উপর ভর করে—টুকটুকে লাল চোখ দিয়ে অবাক হয়ে দেখছে ওকে। অসংখ্য কাঁকড়া গর্ত থেকে অর্ধেকটা শরীর বের করে ওর মতি-গতি লক্ষ করছে—এগোলেই সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়বে গর্তে। টর্চের আলো দেখে কৌতূহলী বড় বড় রুই কাতলা ভদ্র দূরত্ব বজায় রেখে আশপাশে ঘুরঘুর করছে।

তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করবার তাগিদ অনুভব করল ইসলাম। অনায়াসে গোটা আষ্টেক মাছ মারল সে হার্পুন দিয়ে। তারপর একটা সরু শক্ত দড়ি দিয়ে মাছগুলোকে বেঁধে নিয়ে তেরো নম্বরের মাথার ঢাকনিটা খুলে আলগা করে দিল।

একহাতে হার্পুন আর মাছের দড়িটা আর অন্য হাতে তেরো নম্বরের মৃতদেহটা ধরে এবার টেনে নিয়ে চলল সে উপরে। মাঝপথে আসতেই দেখা গেল আবদুল নামছে নিচে। আবদুলের হাতে মৃতদেহটার ভার দিয়ে আগে আগে উপরে উঠে এল ইসলাম।

বাঁধের উপর এখন অনেক লোক জড়ো হয়েছে। কয়েকজন গার্ডও এসে গেছে। একজন গেছে থানা থেকে ও.সি-কে ডাকতে। রীতিমত হুলস্থুল কাণ্ড।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে উপরে উঠে এল ইসলাম। মাথা থেকে ঢাকনিটা খুলতেই লারসেন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকটা কোথায়? মাছ কিসের?'

'আবদুল আনছে লোকটাকে। ব্যাটা হার্পুন দিয়ে আমাকে প্রায় মেরে ফেলার জোগাড় করেছিল। নেমে দেখি ভদ্রলোক বাঁধের গায়ে বসে বসে মাছ মারছেন।'

'আই সী! তাহলে মাছ চুরি হচ্ছে রিজারভয়ের থেকে এই কায়দায়। আমি ভেবেছিলাম, না জানি কী। তুমি জখম হওনি তো?'

'না বেকায়দায় পড়ে পা-টা শুধু মচকে গেছে। ভেঙেও গিয়ে থাকতে পারে। এক্ষুণি হাসপাতালে যাওয়া দরকার।'

এমন সময় আবদুল উঠল লোকটাকে নিয়ে। সবাই ধরাধরি করে কাঁটাতারের এপাশে নিয়ে এল দেহটা। আবদুলের চোখে চোখ পড়তেই অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল রাফিকুল ইসলাম।

এরপর আর্টিফিশিয়াল রেস্পিরেশনের চেষ্টা—কিভাবে ধস্তাধস্তিতে লোকটার মাথার ঢাকনি খুলে গেছে তার মনগড়া বিবরণ—পুলিসের ডায়েরী—হাসপাতাল পাঠানো— পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থা।

কালো শেভ্রোলের বিলীয়মান ব্যাক লাইট দুটোর দিকে চেয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে আবদুল বলল, 'শুয়ার কা বাচ্চা!'

# দুই

টেবিলের উপর পরিপাটি করে সাজানো রয়েছে ব্রেকফাস্ট।

এক গ্লাস অ্যাপল্ জ্যুস কয়েক ঢোকে শেষ করে ঠক করে টেবিলের উপর গ্লাসটা নামিয়ে রাখল পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের উজ্জ্বলতম তারকা শ্রীমান মাসুদ রানা—বয়স ছাব্বিশ, উচ্চতা পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি, গায়ের রঙ শ্যামলা, সে বাংলায় কথা বলে।

সকাল আটটা। দশটার দিকে অফিসে একবার নিয়মিত হাজিরা দিয়ে আজ যাবে ক্লাবের স্যুইমিং পুলে—দু'টি মেয়েকে কথা দিয়েছে সাঁতার শেখাবে। দশটার এখনও অনেক দেরি। তাই ধীরে সুস্থে দুটো কাঁচা পাঁউরুটি আর দুটো মচমচে টোস্টের উপর এক আঙুল পুরু করে চিটাগাং-এর ভিটা মাখন লাগিয়ে নিল রানা। পরিজ আর সেই সাথে দুধের বাটিটা ঠেলে সরিয়ে দিল ডান ধারে, খাবে না। তারপর একটা কাঁচা রুটির উপর কোয়েটা থেকে আনানো হান্টারস বিফ কেটে স্লাইস করে সাজিয়ে এক কামড় দিল। সেই সাথে এক প্লেট ভর্তি স্ক্র্যাম্বল্ড্ এগ থেকে এক এক টেবল-স্পূনফুল অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকল। বিফ শেষ হতেই আরেকটা স্লাইসের উপর সাজানো হলো ক্রাফ্ট্ পনির। মিনিট খানেকের মধ্যে সেটাও যখন শেষ হয়ে এল তখন মচমচে টোস্টের উপর হালকা করে মিচেল্সের গুয়াভা জেলি লাগানো হলো—সেই সঙ্গে চলল গোটা দুই ইয়া বড় মুন্সিগঞ্জের অমৃতসাগর কলা। তারপর ফ্রিজ থেকে সদ্য বের করা বোতলের ঠাণ্ডা পানি ঢেলে নিল রানা একটা গ্লাসে। তিন ঢোকে গ্লাসটা শেষ করতেই ঘরে ঢুকল রাঙার মা।

বুড়িকে এক নজর দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আরাম করে সোফায় হেলান দিয়ে জুতোসুদ্ধ পা তুলে দিল রানা টেবিলের উপর। চোখ বন্ধ করেই সে অনুভব করল, ফরসা টেবিল ক্লথের উপর রাখা জুতো জোড়ার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বুড়ি পট থেকে কফি ঢেলে রানার হাতের কাছে টি-পয়ের উপর রাখল, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পরপর দু'কাপ কড়া কফি খেয়েও গতরাত জাগরণের গ্লানিটা শরীর থেকে গেল না মাসুদ রানার। ক'দিন ধরে কাজ নেই হাতে। আজ টেনিস্; কাল গল্ফ্, পরশু স্যুইমিং, তার পরদিন রোয়িং, ফ্লাইং, ডান্সিং, ব্রিজ ইত্যাদি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রানা। খাঁচায় বন্দী বাঘের মত ছটফট করছে তার বিপদ আর রোমাঞ্চ প্রিয় মনটা। গত রাতে তিনটে পর্যন্ত পোকার খেলেছে ক্লাবে— কিন্তু এসবে কি আর মন ভরে?

একা মানুষ। ৫/১-বি পুরানা পল্টনে ছোট্ট একটা একতলা বাড়ি ভাড়া করে আছে সে। তিনখানা বড় বড় ঘর। লাইট, কল, অ্যাটাচ্ড্ বাথ, কিচেন, সার্ভেন্ট্স কোয়ার্টার, সব ব্যবস্থা ভাল। গাড়ি বারন্দার সামনে ছোটখাট বেশ সুন্দর একটা লন আছে। ভাড়া পাঁচশো টাকা। অফিস থেকেই ভাড়া পায় বাড়িওয়ালা মাসে মাসে। ধনীর দুলাল সেজে থাকতে হয় রানাকে অফিসের হুকুমেই।

ঘর তিনখানার একখানা রানার বেডরুম, একটা ড্রইংরুম; বাকিটা খালি পড়ে থাকে হঠাৎ যদি কোন অতিথি এসে পড়ে, সেই অপেক্ষায়।

মোখলেস বাবুর্চির হাতে ইংলিশ খানা খাচ্ছিল এতদিন, হঠাৎ বছর দু'য়েক আগে একদিন রাঙার মা এসে উপস্থিত হলো। জিজ্ঞেস করল, 'ও আব্বা, রান্নার নোক নাগবি?'

প্রথম দর্শনেই রানার পছন্দ হয়ে গেল বুড়িকে। বয়স পঞ্চান্নর উপর, দাঁত একটাও নেই। এ বয়সেও শরীর একেবারে ঢিলে হয়ে যায়নি—আঁট-সাঁট কর্মঠ চেহারা। আর আসল কথা হলো, কেন জানি রানার নিজের মরা মায়ের কথা মনে পড়ল ওকে দেখে। কোথায় যেন মিল আছে। বলল, 'ভাল রান্না করতে জানো?'

'জানি।' কথাটার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় আছে।

'আগে কোথায় কাজ করেছ?'

'ওমা! নোকের বাসায় কাজ করতি যাব কেন? আমার নিজিরই…' হঠাৎ চেপে গেল বুড়ি। তারপর একটু মলিন হাসি হেসে বলল, 'বিটার বউয়ের সাথি নাগ করে আসছি।'

'বাড়ি কোথায় তোমার?'

'যশোহর।'

'ছেলে-বউ কোথায়?'

'সিখানেই।'

'ও, পালিয়ে এসেছ ঢাকায়? দু'দিন পর আবার মন টানলেই এখান থেকে পালাবে। যাও তুমি, এমন লোক আমার লাগবে না।'

এই উত্তরই যেন আশা করেছিল, ঠিক এমন ভাবে কোন রকম যুক্তি-তর্কের অবতারণা না করেই চলে যাচ্ছিল বুড়ি। হঠাৎ রানা কি ভেবে ডাকল পিছন থেকে। বুড়ি ঘুরতেই দেখল জল গড়াচ্ছে ওর চোখ দিয়ে। বুঝল রানা, এক কাপড়ে রাগের মাথায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে—ঢাকায় কোথাও কিছু চেনে না—এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঠোকর খেয়ে ফিরছে, কিন্তু চাকরি হয়নি। খাওয়াদাওয়া হয়নি ক'দিন কে জানে। এমন অপ্রত্যাশিত দুর্বিপাকে পড়ে রাগে দুঃখে হতাশায় ভেঙে পড়েছে বুড়ি। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে কাছে এসে দাঁড়াতেই রানা বলল, 'তা বেতন চাও কত?'

'আমি তো জানিনে, কাজের নোককে সবাই যা দেয় তাই দেবেন।'

'বেশ। থাকো আমার এখানেই। মোখলেস তো ওর হাঁড়ি-পাতিল ধরতে দেবে না। তুমি এখন খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নাও, বিকেলে ওর সাথে গিয়ে দোকান থেকে সব কিনে আনবে।'

সেই বুড়ি রয়েই গেল। ঝোঁকের মাথায় ওকে থাকতে বলেই খুব আফসোস হয়েছিল রানার—কেন শুধু শুধু জঞ্জাল বাড়াতে গেলাম? বেশ তো চলছিল, কোন হাঙ্গামা ছিল না। ভেবেছিল—কোন ছুতো পেলেই বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু পরদিন ওর হাতের বাঙালী রান্না খেয়ে পরিতৃপ্তির একটা ঢেকুর তুলে রানা ভাবল—ছলে বলে কৌশলে যেমন করে হোক একে রাখতেই হবে, ছাড়া যাবে না।

এখন অবশ্য বাজার করা ছাড়া মোখলেসের অন্য কাজ নেই—অল্পদিনেই বুড়ি বিলিতী রান্নাতেও ওকে ছাড়িয়ে গেছে, আর মোখলেসও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

টেলিফোনটা বেজে উঠল।

'হ্যালো, ফাইভ-এইট-টু-সেভেন,' রানা ধরল।

'কে, মাসুদ সাহেব বলছেন?' প্রশ্ন এল অপর দিক থেকে।

'হ্যাঁ। কি খবর, সারওয়ার?'

'আপনাকে একটু অফিসে আসতে হবে, স্যার। বড় সাহেব জরুরী তলব করেছেন আপনাকে।' মেজর জেনারেল রাহাত খানের পি. এ. গোলাম সারওয়ার বলল নির্বিকার কণ্ঠে।

বিশেষ করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় উপস্থিত হলে চেহারা-চালচলনে একটা নির্লিপ্ত ভাব চেষ্টাকৃত ভাবে এনে এক ধরনের আনন্দ পায় গোলাম সারওয়ার। বোধহয় আত্মসংযমের আনন্দ। রানার খুব ভাল করে জানা আছে এ কণ্ঠস্বর। তাই জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কি বলো তো, সারওয়ার! নতুন গোলমাল বাধল কিছু?'

'কোথায় আছেন, স্যার! হুলুস্থুল কারবার। ভোর পাঁচটা থেকে অফিস করছি আজ। জলদি চলে আসেন।' বলেই ফোন ছেড়ে দিল কাজের চাপে সর্বক্ষণ ব্যস্ত অক্লান্ত পরিশ্রমী গোলাম সারওয়ার অন্য কোন প্রশ্নের সুযোগ না দিয়েই।

মাসুদ রানা চোখ বন্ধ করে স্পষ্ট দেখতে পেল টেলিফোনটা রেখেই চটপট গোটা কতক 'ইমিডিয়েট' লেবেল লাগানো ফাইল নিয়ে গোলাম সারওয়ার ছুটল চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কামরার দিকে।

ঘন কালো ভুরু জোড়া অল্প একটু উঁচু করে ছোট্ট একটা শিস দিল মাসুদ রানা। তাহলে তো খেলা জমে উঠেছে মনে হচ্ছে!

প্যান্ট আর জুতো পরাই ছিল—ভোরবেলা গোসল করেই সে এগুলো পরে ফেলে সব সময়। ড্রয়ার থেকে পিস্তল ভরা হোলস্টারটা বের করে বাঁ কাঁধে ঝুলিয়ে নিল রানা। পিস্তলটা খুব দ্রুত কয়েকবার হোলস্টার থেকে বের করে ঠিক জায়গা মত হাতটা পড়ছে কিনা দেখে নিল। তারপর রোজকার অভ্যাস মত স্লাইডটা আটবার টেনে একে একে আটটা গুলি বের করে পরীক্ষা করল ইজেক্টার ক্লিপটা ঠিকমত কাজ করছে কিনা। ম্যাগাজিন রিলিজটা টিপতেই সড়াৎ করে বেরিয়ে এল খালি ম্যাগাজিন। আবার স্লাইড টেনে চেম্বারে একটা বুলেট ঢুকিয়ে আস্তে হ্যামারটা নামিয়ে দিল রানা। সব সময় ঠিক ফায়ারিং পজিশনে এনে রাখে সে তার বিপদসঙ্কুল রোমাঞ্চকর জীবনের একমাত্র বিশ্বস্ত সাথী এই পয়েন্ট থ্রী-টু ক্যালিবারের ডাবল অ্যাকশন অটোমেটিক ওয়ালথার পি.পি.কে. পিস্তলটি। ম্যাগাজিনে সাতটা বুলেট ভরে যথাস্থানে ঢুকিয়ে দিল রানা। ক্যাচের সাথে আটকে একটা ক্লিক শব্দ হতেই সন্তুষ্ট চিত্তে আবার শোল্ডার হোলস্টারে ভরে রাখল সে তার ছোট্ট যন্ত্রটা। তারপর একটা নীল টি-শার্ট পরে ড্রেসিং টেবিলের লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে ভাল করে দেখে নিল শোল্ডার হোলস্টারটা কোন দিক থেকে দেখা যাচ্ছে কিনা। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে স্টার্ট দিল ওর একান্ত প্রিয় জাগুয়ার এক্স কে ই গাড়িতে।

'ও আব্বা, দরোজার চাবিটা নেছেন?' রাঙার মা এসে দাঁড়াল।

'না তো, কেন? তুমি বাসায় থাকবে না?'

'দোফরে একটু মীরপুরের মাজার যাব।'

'ড্রয়ার থেকে আমার চাবিটা নিয়ে মোখলেসের কাছে দিয়ে যেয়ো।'

'ও-ও তো আমার সঙ্গে যাবি।'

'বেশ, তোমার চাবিটা জলদি আমাকে দাও—তুমি ড্রয়ার থেকে আমারটা নিয়ে নিয়ো। নাও, তাড়াতাড়ি করো।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটু হাসল রানা। যেদিনই বিশেষ টেলিফোন আসবে অফিস থেকে, সেদিনই বুড়ির মীরপুরের মাজারে যাওয়া চাই। এই দুই বছরের মধ্যে রাঙার মা দেখেছে, যতবারই এমন টেলিফোন এসেছে ততবারই আব্বা কয়দিন আর বাড়িতে ফেরেনি। প্রায়ই শরীরে কাটাকুটি নিয়ে বাড়ি ফেরে আব্বা। একবার তো বিশদিন পর খাটিয়ায় করে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে দিয়ে গেল কয়েকজন লোক—সারা অঙ্গে জখমের দাগ। একমাস কত সেবা-শুশ্রূষা করে জ্যান্ত করতে হয়েছে তাকে। আব্বা যে কি কাজ করে তা ঠিক জানে না সে, তবে কাজটা যে খুবই ভয়ঙ্কর আর বিপদজনক তা সে বুঝতে পারে। সদাসর্বদা তাই শঙ্কিত হয়ে থাকে সে। একেক বার মনে হয় আব্বা বোধহয় পুলিসের নোক; আবার সন্দেহ হয়, পুলিসের নোক যদি হয় তবে মেজাজ এত ঠাণ্ডা কেন? গোলাগুলির সাথে কারবার আব্বার—তাই তো আব্বার সাথে সব সময় ছোট-বন্দুক থাকে। এইটাই আব্বার চাকরি, বিপদ আছে বলেই না মাসে মাসে ষোলোশো টাকা করে মাইনে দেয় আব্বাকে। কোন ভাবে বারণ করতে পারে না সে, তাই যতবারই রানা কোন কাজে হাত দেয়, ততবারই রাঙার মা মীরপুরের মাজারে গিয়ে মানত করে আসে। যখন সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থায় সে ফিরে আসে, তখন মোখলেসকে দিয়ে মানত পুরো করে দেয়। বিরক্ত হয়ে মোখলেস একদিন রাঙার মার এসব গোপন কথা বলে দিয়েছে রানাকে।

মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়ার একটা সাততলা বাড়ির পিছন দিকটায় গাড়ি পার্ক করে লিফটের বোতাম টিপল মাসুদ রানা। ওকে দেখে লিফট্ম্যান কোন প্রশ্ন না করেই ফিফ্থ্ ফ্লোর, অর্থাৎ ছ' তলায় উঠে এল। ছয় এবং সাততলার সবটা জুড়ে পি.সি.আই. বা পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অফিস। নিচের তলাগুলো হরেক রকম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান টুকরো টুকরো করে ভাড়া নিয়ে দফতর খুলেছে।

ছ'তলার বেশির ভাগটাই জুড়ে রয়েছে রেকর্ড সেকশনের ব্যস্ত-সমস্ত কেরানীর দল, জনা পনেরো মেয়ে-পুরুষ টাইপিস্ট, স্টেনো ইত্যাদিতে। কেবল ডানধারের সব শেষে করিডরের দু'পাশে মুখোমুখি চারটে কামরায় বসে রানা আর তার তিন সহকর্মী।

সাত তলার এক অংশে মেজর জেনারেল রাহাত খান আর চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কর্নেল শেখের কামরা। আর বাকিটায় অত্যাধুনিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত ওয়ায়্যারলেস সেকশন। সাড়ে তিনশো কিলোওয়াটের অত্যন্ত শক্তিশালী ট্রান্সমিটার রয়েছে ছাতের উপর। বিদঘুটে সব যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে ডায়াল করছে স্পেশাল ট্রেনিংপ্রাপ্ত জনাকয়েক অপারেটর, কানে হেডফোন। মাইক্রো ওয়েভ, সানস্পট আর হেভি সাইড লেয়ারের জগতে আছে এরা। পাশের টেবিলে রাখা শর্টহ্যাণ্ড খাতা, ডিকটাফোন।

সব মিলিয়ে নিখুঁত এ প্রতিষ্ঠানটি। কোন গোলমাল নেই; যেন আপনাআপনি সব

কাজ হয়ে যাচ্ছে, এমন শৃঙ্খলা।

মাসুদ রানা প্রথমে ঢুকল নিজের কামরায়। ঘরটার চারভাগের একভাগ কার্ড-বোর্ডের পার্টিশন দিয়ে আলাদা করা। সেখানে টাইপিস্ট মকবুল বসে রানার গত কেসটার পূর্ণ বিবরণ টাইপ করছে। রানাকে দেখে পিঠটা কুঁজো করে উঠে দাঁড়াতে গেল মকবুল। 'বোসো,' বলে সুইং ডোর ঠেলে নিজের ঘরে ঢুকল রানা।

ইন লেখা বেতের কারুকাজ করা ট্রে-তে গোটা কয়েক ফাইল জমা হয়ে আছে। ওগুলোর দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে চেয়ে একটু হাসল রানা। ভাবল আজ বাছাধনেরা একটু বিশ্রাম নাও, আজ আর তোমাদের কাছে ভিড়ছি না।

টেবিলের উপর হাতের ডানধারে রাখা ইন্টারকমের একটা বোতাম টিপে রানা বলল, 'মাসুদ রানা বলছি, আমাকে ডেকেছিলেন, স্যার?'

গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর এল, 'ওপরে এসো।'

বুকের মধ্যে ছলাৎ করে উঠল খানিকটা রক্ত। কেমন একটা আনন্দশিহরণের মত অনুভব করল রানা এক সেকেণ্ডের জন্যে। মাসখানেক পর আজ আবার গিয়ে দাঁড়াবে সেই তীক্ষ্ণ দুটো চোখের সামনে—যে চোখকে আজ সাত বছর ধরে সে ভক্তি করেছে আর ভালবেসেছে। ওই ক্ষুরধার দৃষ্টির ইঙ্গিতে কতবার কত ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে বিনা দ্বিধায়।

লিফটের দিকে না গিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল রানা। সুন্দরী রিসেপশনিস্ট মিষ্টি করে হাসল একটু। রানাও হেসে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

ডানধারে সবশেষের ঘরটায় বসেন রিটায়ার্ড মেজর জেনারেল রাহাত খান। বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্রিটিশ আর্মি ইন্টেলিজেন্সের এত উপরে উঠতে পেরেছিলেন। ১৯৫২ সালে শিশু রাষ্ট্র পাকিস্তান যখন বহির্বিশ্বের ক্রমবর্ধমান কুচক্রের বিরুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছে, ঠিক সেই সময় অবসর গ্রহণ করলেন আর্মি ইন্টেলিজেন্সের সুযোগ্য কর্ণধার মেজর জেনারেল রাহাত খান। সাথে সাথেই নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হলো, নাম দেওয়া হলো পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স—এবং দ্বিধামাত্র না করে রাহাত খানকে বসিয়ে দেয়া হলো এর মাথায়। অনেক বাক-বিতণ্ডার পর ঢাকায় এর হেড-কোয়ার্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গৃহীত হলো।

নিজহাতে এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন রাহাত খান মনের মত করে। অক্লান্ত পরিশ্রম করে কয়েক বছরের মধ্যে এত বেশি সুনাম অর্জন করেছে এ প্রতিষ্ঠান যে আমেরিকা, ব্রিটেন আর সোভিয়েট ইউনিয়নের গুপ্তচর বিভাগ এখন পি সি.আই.-কে নিজেদের সমকক্ষ বলে স্বীকার করতে গর্ব অনুভব করে।

কিছুটা গোপনীয়তার খাতিরে আর কিছুটা পাকিস্তানের বাইরে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র কার্যরত পি.সি.আই. এজেন্টদের জরুরী খবর আদান-প্রদানের সুবিধার জন্যে বাড়িটা ভাড়া নেয়া হয়েছে একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ছদ্মনামে। মস্ত বড় সাইন বোর্ড টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে, তাতে ইংরেজিতে লেখা:

ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং করপোরেশন
এক্সপোর্টার্স-ইমপোর্টার্স-ইনডেনটার্স

ব্যবসার খাতিরে বা চাকরির খোঁজে কেউ যদি ভুল করে এখানে এসে ওঠে, তবে রিসেপশনিস্টের মিষ্টি হাসি এবং কয়েকটা প্রশ্নের না-বাচক উত্তর নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরতে হয়।

'আসুন, স্যার। বড় সাহেব আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন,' বলল গোলাম সারওয়ার। টেলিফোন করবার ঠিক চার মিনিটের মধ্যে রানাকে সশরীরে উপস্থিত দেখে একটু বিস্মিতই হলো সে। তারপর আবার মগ্ন হয়ে গেল আপন কাজে।

আস্তে দরজাটা খুলে ঘরে প্রবেশ করল রানা। পুরু কার্পেটে আগাগোড়া মোড়া মস্ত ঘরটা। উত্তর দিকের জানালার দামী কার্টেনটা একপাশে সরানো। পুরু বেলজিয়াম কাঁচে ঢাকা মস্তবড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে রিভলভিং চেয়ারে আরাম করে বসে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে কি যেন ভাবছেন রাহাত খান। হাতে কিং সাইজের একটা জ্বলন্ত চেস্টারফিল্ড সিগারেট। আমেরিকান টোস্টেড টোবাকোর গন্ধ সারা ঘরে।

দরজাটা খুট করে বন্ধ হতেই চোখ ফিরিয়ে একবার আপাদমস্তক দেখলেন রানাকে, তারপর টেবিল থেকে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসলেন রাহাত খান। মাথাটা একটু ডান দিকে ঝাঁকিয়ে আবছা ইঙ্গিতে বসতে বললেন রানাকে।

এসব ইঙ্গিত রানার মুখস্থ—বিনা বাক্যব্যয়ে সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। এবার তাঁর আটান্নতম জন্মবার্ষিকীতে রানার উপহার দেয়া রনসন গ্যাস লাইটারের তলায় চাপা দেয়া একটা চারভাঁজ করা কাগজ তুলে নিয়ে রাহাত খান বললেন, 'এটায় একবার চোখ বুলিয়ে পকেটে রেখে দাও। মজার জিনিস।'

ভাঁজ খুলে দেখল রানা, ক্রীম কালারের অনিয়নস্কিন পেপারে ইংরেজিতে টাইপ করা একটা চিঠি ওটা। সাইজ ৮·৫×১১ ইঞ্চি, অর্থাৎ ডিমাইয়ের চারভাগের একভাগ। বেশ কিছুদূর গড়গড় করে পড়ে গেল সে, কিন্তু অর্থ কিছুই বুঝতে পারল না। সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা চিঠিটা। হঠাৎ চিঠিটার উপর দিকে ডান ধারে একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখেই রানা বুঝল এটা ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের চিঠি। এই চিহ্ন আগেও দেখেছে সে কয়েকবার।

মুখ তুলে রাহাত খানের দিকে চাইতে তিনি ইঙ্গিত করলেন ওটা পকেটে রেখে দেবার জন্যে। বেশি কথা বলা পছন্দ করেন না তিনি, তাই যতটা সম্ভব ইঙ্গিতেই কাজ সারেন।

এবার আর একটা কাগজ টেবিলের উপর রানার দিকে একটু ঠেলে দিলেন তিনি। বললেন, 'ওই চিঠির অনুবাদ। মন দিয়ে পড়ো। কোথাও বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করবে।'

রানা একবার জেনারেলের মুখের দিকে চাইল। কিছুই আন্দাজ করা গেল না সে মুখ দেখে। গোঁফ দাড়ি পরিষ্কার করে কামানো। কপালে আর গালে বয়সের ভাঁজ পড়েছে কয়েকটা। কাঁচা-পাকা ভুরু। এছাড়া ঋজু দেহটায় প্রৌঢ়ত্বের আর কোন চিহ্ন নেই। ইজিপ্শিয়ান কটনের ধবধবে সাদা স্টিফ-কলার শার্ট, সার্জের স্যুট আর ব্রিটিশ কায়দায় বাঁধা দামী টাইয়ের নট—সবটা মিলিয়ে খুব সপ্রতিভ চেহারা বুড়োর। তীক্ষ্ণ চোখ দুটো এখন নিরাসক্তভাবে চেয়ে আছে সামনের দেয়ালে

টাঙানো অ্যাংলো-সুইস ঘড়িটার দিকে।

একটু ঝুঁকে চিঠিটা তুলে নিল রানা টেবিলের উপর থেকে। ইংরেজিতে লেখা সে-চিঠির বাংলা করলে দাঁড়ায়:

মঙ্গলবার

'এল্' সেন্টারে তোমার কাজ প্রশংসা অর্জন করেছে। নতুন কাজের ভার দেয়া হচ্ছে। তোমার ফোক্সওয়াগেন নিয়ে আগামীকাল, বুধবার ঠিক এগারোটায় ডি-সি ফেরী পার হও। ১৬৫ মাইল পথ, গড়পরতা ৪০ মাইল বেগে চলবে। বেলা তিনটা পঁয়তাল্লিশে চারজন ই. পি. আর. সেপাই তোমার গাড়ি থামিয়ে চারটে প্যাকেট তুলে দেবে গাড়ির সামনের বুটে। সেই সাথে গাড়িতে উঠবে একজন মহিলা। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে দশ নম্বর রূম বুক করা আছে তোমাদের জন্যে নির্দিষ্ট হোটেলে। সেখানে লাগেজ উঠিয়ে প্যাকেটসুদ্ধ গাড়িটা মেয়েটির হাতে ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী আদেশের জন্যে অপেক্ষা করবে হোটেলেই।

দু'বার আগাগোড়া চিঠিটা পড়ে মুখ তুলল মাসুদ রানা। দেখল দুটো চোখ গভীর মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করছে তাকে।

'কি বুঝলে?' প্রশ্ন করলেন রাহাত খান।

'সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার, স্যার! ভারতীয় কোন গুপ্তচরকে গাড়ি চালিয়ে ঢাকা থেকে চিটাগাং যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আজই, এগারোটার সময়।' চট করে রিস্টওয়াচটা দেখে নিয়ে আবার রানা বলল, 'সুপরিকল্পিত কোন প্ল্যান বলেই মনে হচ্ছে। পৌনে চারটেয় কুমিল্লা ছাড়িয়ে চোদ্দগ্রামের কাছাকাছি বর্ডারের পাশ দিয়ে যখন গাড়ি যাবে, তখন ই.পি.আর-এর ছদ্মবেশে কয়েকজন ভারতীয় সেনা গাড়িতে কিছু মাল তুলে দেবে। চিটাগাং-এ কোন সাঙ্ঘাতিক ঘটনা ঘটতে চলেছে, স্যার। নিরাপত্তার জন্যে কাজটা দু'ভাগে ভাগ করে দেয়া হয়েছে—ছেলেটার কিছুটা, মেয়েটার কিছুটা।'

রানার মধ্যে এই হঠাৎ উত্তেজনার সঞ্চার দেখে একটু হাসলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। বললেন, 'ঠিক ধরেছ। এখন শোনো। এই সাঙ্কেতিক চিঠিটা নিতান্ত ভাগ্যক্রমে পাওয়া গেছে ভারতের এক নামকরা গুপ্তচর সুবীর সেনের পকেটে। গতরাতে আড়াইটার দিকে শাহবাগ হোটেল থেকে মাতাল অবস্থায় ফিরছিল সে গাড়ি চালিয়ে। ঢাকা ক্লাবের সামনে একটা শাল গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে গেছে সে গাড়ি।'

রানার মনে পড়ে গেল, গত রাতে ক্লাব থেকে ফেরার পথে একটা সাদা ফোক্সওয়াগেনকে প্রায় চুরমার অবস্থায় দেখেছে সে ঢাকা ক্লাবের সামনে। বলে ফেলল, 'গাড়িটা আমি দেখেছি, স্যার।'

ভুরু কুঁচকে তিরস্কারের ভঙ্গিতে তার দিকে চেয়ে রাহাত খান বললেন, 'ভোর

সোয়া-পাঁচটায় মিলিটারি ক্রেন এসে উঠিয়ে নিয়ে গেছে সে গাড়ি। রাত আড়াইটা থেকে ভোর সোয়া পাঁচটা—এর মধ্যে তুমি দেখলে কি করে সে গাড়ি? লম্পট সুবীর সেনের মত তুমিও নিশ্চয়ই ফিরছিলে কোনওখান থেকে, রানা?'

চুপ করে থাকল রানা। গতরাতের অনাচারের কথা কঠোর নীতিপরায়ণ সত্যনিষ্ঠ রাহাত খানের কাছে গোপন থাকল না!

'নিজেকে শুধু শুধু অপচয় কোরো না, রানা,' রানার অপরাধী মুখের দিকে চেয়ে বললেন খান। দুই সেকেণ্ড চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'যাক, যা বলছিলাম, চিঠিটা সে পেয়েছে খুব সম্ভব পাক এয়ার-লাইন্সের কোন এয়ার হোস্টেসের কাছ থেকে। কাল সন্ধ্যার ফ্লাইটে এই দু'মুখো সাপ (যে সমস্ত পাকিস্তানী ভারতের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করে তাদেরকে খান সাহেব ঘৃণা ভরে দু'মুখো সাপ বলেন) কলকাতা থেকে এ চিঠি নিয়ে এসেছে এবং রাতে সেনকে পৌঁছে দিয়েছে।'

আরেকটা সিগারেট ধরাবার জন্যে থামলেন রাহাত খান। সেই ফাঁকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'চিঠিটা আমাদের হাতে এল কি করে, স্যার?'

চোখে ধোঁয়া যাওয়ায় চোখ দুটো পেঁচিয়ে উপর দিকে ঘুরিয়ে ঠোঁট থেকে সিগারেটটা আঙুলের ফাঁকে নিয়ে রাহাত খান বললেন, 'হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে ডাক্তার ওর পকেট থেকে এ চিঠি পেয়ে পুলিসকে দিয়েছে। পুলিস কোড ব্রেক করতে না পেরে ভোর সাড়ে চারটায় আমাদের কাছে পাঠিয়েছে। আমাদের কোড এক্সপার্ট আধ ঘণ্টায় কোড ব্রেক করে আমার কাছে জরুরী টেলিফোন করেছে। এগুলো রুটিন ওয়ার্ক। এখন তোমার কাজটা বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। শোনো, সুবীর সেন এখন আমাদের হাতের মুঠোয়; এয়ার হোস্টেস্‌কে চিনে বের করা আমাদের বিশ মিনিটের কাজ; ই.পি.আর-এর ছদ্মবেশে ভারতীয় সৈন্যদের এবং সেই মহিলা গুপ্তচরকে আমরা অনায়াসে মালসহ গ্রেপ্তার করতে পারি। এসব কাজ মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু এগুলো করলে আসল সূত্রটা যাবে হারিয়ে। আমি জানতে চাই ভারতের এই সব তৎপরতার আসল উদ্দেশ্য কি—গোড়াটা কোথায়। প্যাকেটে করে কি জিনিস চালান হচ্ছে; যাচ্ছে কার কাছে, এবং কেন। বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। এবার বেশ পরিষ্কার হয়ে এল আসলে তার কাজটা কি।

'আজই বুধবার। এখন ঘড়িতে ন'টা বাজতে পাঁচ।' এবার একটু চাঞ্চল্যের রেশ পাওয়া গেল রাহাত খানের কণ্ঠে। 'ঠিক এগারোটায় নারায়ণগঞ্জ ফেরিঘাটে পৌঁছতে হবে তোমাকে সুবীর সেনের ভূমিকায়। একটা সাদা ফোক্সওয়াগেনের সামনে-পিছনে সেনের গাড়ির নাম্বার লেখা হয়ে গেছে এতক্ষণে। দু'ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে সেটা নিয়ে তুমি রওনা হবে চিটাগাং-এর পথে।'

কথাটা বলে আধ-মিনিট খানেক সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে পর্যালোচনা করে দেখলেন রাহাত খান অন্যমনস্কভাবে। তারপর আবার বললেন, 'আসল সুবীর সেন যে আমাদের হাতে বন্দী হয়েছে সে খবর সম্পূর্ণ চেপে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেনকে সোয়া পাঁচটার দিকে মেডিকেল কলেজ থেকে সরিয়ে আর্মি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওর গাড়িটা মিলিটারি ক্রেন দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আগেই বলেছি। হোটেল ক্যাসেরিনায় টেলিফোন করে বলে দেয়া হয়েছে 'সেন সাহেব আমাদের বাসায় রাত কাটিয়েছেন; বেশি রাত হয়ে যাওয়ায় কাল রাতে আর

হোটেলে ফিরতে পারেননি। আজ জরুরী কাজে চিটাগাং চলে যাচ্ছেন—দু'একদিন পর ফিরবেন', তাও আরও নিশ্চিত হবার জন্যে অ্যাংলো ম্যানেজার এ. ডি. কোস্টারকে ডেকে পাঠিয়েছি এখানে—একটু টিপে দিলেই সব পরিষ্কার বুঝবে ছোকরা। কাজেই সেনের দুর্ঘটনার খবরটা চাপা পড়ে যাচ্ছে। বর্ডারের সৈন্যরা বা মেয়েটি টের পাচ্ছে না কিছুই, সাবধানও হতে পারছে না।'

'কিন্তু, স্যার, যে কোন একজন ওয়াচার কি যথেষ্ট ছিল না? আমাকে পাঠাচ্ছেন কেন?' রানা আরেকটু পরিষ্কার করে জানতে চায় সব কথা।

'তার কারণ, চিঠিটা পড়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বিরাট কোন পরিকল্পনার প্রায় সমাপ্তির দিকে চলে এসেছে ওরা। সুচিন্তিত, সুষ্ঠু আয়োজন দেখছি সবদিকে। তাই পাঠাচ্ছি তোমাকে। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার জানতে হবে তোমার—কী আছে প্যাকেটে, কাকে দেয়া হচ্ছে সেটা, আর কেন দেয়া হচ্ছে। বুঝেছ?'

'জ্বি, স্যার।' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ওদের সমস্ত কুমতলব বানচাল করে দিতে হবে আমাদের। তাই আমাদের সবচেয়ে, মানে, মোটামুটি একজন বুদ্ধিমান লোককে পাঠাতে হচ্ছে। এখন তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে বলো।'

রানা বলল, 'গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমি, কিন্তু ঠিক কোন্ হোটেলে উঠতে হবে জানা নেই।'

'দাঁড়াও, তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।' ইন্টারকমের একটা বোতাম টিপে রাহাত খান বললেন, 'শেখ, কোন খবর পেলে?'

'জ্বি, স্যার। আমি আসছি এখুনি।' ইন্টারকমের ভিতর দিয়ে চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার কর্নেল শেখের গলাটা কেমন ধাতব খনখনে শোনাল।

লম্বা চেস্টারফিল্ডের প্যাকেট থেকে একটা চিপ্টে যাওয়া সিগারেট বের করলেন রাহাত খান প্যাকেটের উপর টোকা দিয়ে দিয়ে। তারপর রনসন গ্যাস লাইটার দিয়ে ধরিয়ে নিলেন একটা দিক। কয়েক সেকেণ্ড 'ইন' ট্রের কয়েকটা জরুরী কাগজে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন রাহাত খান। তারপর রানার দিকে চেয়ে বললেন, 'চিটাগাং-এর সব হোটেলেই টেলিফোন করা হয়েছে, দেখা যাক তোমার ভাগ্যে কোন হোটেল জুটল।'

কর্নেল শেখ ঘরে ঢুকবার সময় রাহাত খানের কথার শেষটুকু শুনে রানার দিকে চেয়ে একটু হাসল। তারপর বলল, 'হোটেল মিসখা। চেনেন?'

'চিনি। স্টেশন রোডে, রেস্ট হাউসের ঠিক উল্টো দিকে, সিনেমা হলটার পাশে,' বলল রানা।

'হ্যাঁ। মিসখার পাঁচ তলায় দশ নম্বর এয়ার কণ্ডিশনড রুম বুক করা আছে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস মাসুদ রানা, থুরি, সুবীর সেনের নামে।' রানার পাশে একটা চেয়ারে সশব্দে বসল প্রকাণ্ড দেহী কর্নেল শেখ। যেমন উচ্চতা তেমনি প্রস্থ। ভদ্রলোক খাস মুলতানী। নিজ রসিকতায় নিজেই খুশি হয়ে ওঠেন।

'মিসখা এয়ার কণ্ডিশন করেছে নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

'না, স্যার, কোন কোন ঘরে এয়ার কুলার লাগিয়ে দিয়ে দশ টাকা চার্জ বেশি নেয়।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, রানা,' কাজের কথায় এলেন আবার রাহাত খান, 'তোমরা পৌঁছবে সেখানে সন্ধে সোয়া সাতটার দিকে। মেয়েটা যখনই প্যাকেটগুলো পৌঁছাবার জন্যে নিচে নামবে লিফটে করে, তুমি সাথে সাথে নেমে আসবে সিঁড়ি বেয়ে। সামনের রাস্তাটা পার হয়েই দেখবে চালকবিহীন একটা নীল রঙের ওপেল রেকর্ড স্টার্ট দেয়া অবস্থায় রাখা আছে রাস্তার ওপর। ওই গাড়িতে করে পিছু নেবে মেয়েটির। এরপর কিভাবে এগোবে তা স্থির করার ভার তোমার উপরই থাকবে। চিটাগাং-ঢাকা ডিরেক্ট টেলিফোন লাইন থাকায় তোমার সাথে আর ওয়্যারলেস সেট দিচ্ছি না। যখনই প্রয়োজন মনে করো তখনই রিং করবে।'

মাথা নেড়ে উঠতে যাচ্ছিল রানা, চোখের পাতা নামালেন এবং সেই সাথে তর্জনী দিয়ে সিগারেটের উপর লম্বালম্বিভাবে একটা টোকা দিয়ে ছাই ঝাড়লেন রাহাত খান। তার মানে 'উঠো না, একটু বসো।' শেষ একটা টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে সিগারেটের টুকরোটা ফেলে বোতাম টিপলেন রাহাত খান। উপরের পাতটা দু'ভাগ হয়ে ভিতরে চলে গেল টুকরোটা। 'ছ্যাঁৎ' করে একটা শব্দ হলো ভেতর থেকে, আর পাতলা এক ফালি ধোঁয়া বেরিয়ে এল কোনও এক ফাঁক দিয়ে।

'আর একটা কথা,' এতক্ষণ পর আন্তরিকতার একটা ক্ষীণ হাসির আভাস পাওয়া গেল রাহাত খানের মুখে, 'বলা যায় না, আমাদের অজ্ঞাত কোন উপায়ে অপরপক্ষ জেনে ফেলতে পারে যে তুমি সুবীর সেন নও। হয়তো এখনি সবকিছু জেনে গেছে ওরা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিপদের ঝুঁকিটা কতখানি বুঝতে পারছ? কাজেই খুব সাবধান থাকবে। আর সব রকম পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত থাকবে। যাও এখন।'

কথাগুলো শোনাল, ছোটকালে বাইরে কোথাও পাঠালে মা যেমন বারবার করে বলে দিতেন, 'দেখিস, খোকা, গাড়ি ঘোড়া দেখে চলিস। আর রাস্তার ডানধার ঘেঁষে হাঁটবি, বুঝলি?' ঠিক তেমনি।

মৃদু হেসে রানা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। হঠাৎ যদি সে পিছন ফিরত, তাহলে দেখতে পেত তার সুঠাম দীর্ঘ একহারা চেহারার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন মেজর জেনারেল (অব:) রাহাত খান।

## তিন

আই.ডাব্লিউ.টি.এ ফেরিটা দাউদকান্দি পৌঁছল দেড়টার সময়। তারপর একটানা পথ। মেঘবিহীন খর-বৈশাখের দুপুর। অসহ্য গরম বাতাস আগুনের হল্কার মত জ্বালা ধরায় চোখে-মুখে। এমন দিনে এত বেলায় শখ করে কেউ ঢাকা থেকে চিটাগাং যায় না। কেউ নিতান্ত ঠেকায় পড়লে ভোর বেলার ফেরীতে পার হয়ে দেড়টা দুটোর মধ্যে পৌঁছে যায় চিটাগাং। তাই মাসুদ রানার সহযাত্রী অন্য একটা গাড়িও নেই যে তার সাথে পাল্লা দিয়ে দূর পথ চলার একঘেয়েমি কাটাবে। মাঝে মাঝে কেবল এক আধটা বাস বা ট্রাক আসছে সামনে থেকে—একরাশ ধুলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছে দাউদকান্দির দিকে। রাস্তায় লোকজনের চলাচল এত কম যে মাঝে

মাঝে হঠাৎ ধোঁকা লাগে, এ কোথায় চলেছি! গাড়ির ভিতরের ভ্যাপসা গরমে মাথাটা ঘুরে উঠতে চায়।

কুমিল্লায় পৌঁছে ট্যাঙ্ক ভর্তি করে পেট্রল নিয়ে নিল মাসুদ রানা। গাড়ি থামালেই বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে রানার দৃঢ় দুই বাহুর লোমকূপগুলো ঘিরে, জুলফির ভিতর দিয়ে ঘাম গড়িয়ে নিচে নামতে আরম্ভ করে, আর সুড়সুড়ি লাগে। আবার ষাট—পঁয়ষট্টি—সত্তর—আশিতে ওঠে স্পীড মিটারের কাঁটা চল্লিশ মাইলের গড়পড়তা ঠিক রাখতে। তখন নোনতা ঘামেভেজা শরীরটা শুকিয়ে চড়চড় করে।

ঝির ঝির এয়ার কুলড এঞ্জিনের একটানা একঘেয়ে শব্দ, আর গাড়ির নিচ দিয়ে কার্পেটের মত কালো পিচের রাস্তাটার অনবরত পিছনে সরে যাওয়া। মাঝে মাঝে এক আধটা শিরীষ কি অশ্বত্থ গাছ ঝাঁই করে চলে যাচ্ছে পিছনে। রাস্তার পাশে নিচু জায়গায় যেখানে অল্পস্বল্প পানি আছে, সেখানে এক-আধটা বক ধৈর্যের সাথে মাছের অপেক্ষায় বসা।

রানা ভাবছে, যদি আসল ঘটনা প্রতিপক্ষ জেনে গিয়ে থাকে তবে বসন্তপুর বা চোদ্দগ্রামে গিয়ে কি দেখবে সে। হয়তো ই.পি.আর এবং মেয়েটির কোন চিহ্নই পাওয়া যাবে না রাস্তায়। এমনও হতে পারে সেনকে বন্দী করার পাল্টা জবাব হিসেবে ওকে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে সৈন্যরা। যা হবার তাই হবে—মাথা থেকে এসব বাজে চিন্তা তাড়াবার চেষ্টা করল রানা। খুব সম্ভব এত শিগগির ওরা টের পায়নি সুবীর সেনের ব্যাপার। কিন্তু নিজের অজান্তেই আবার ভাবতে লাগল সে, যদি সৈন্যরা কোন রকম সিগন্যাল বা কোডওয়ার্ড আশা করে ওর কাছ থেকে পরিচিতি হিসেবে, তখন কি করবে সে? তখনই তো হাতে-নাতে ধরা পড়ে যাবে ও। সে দেখা যাবেখন। আবার চিন্তাটাকে দূর করে দিল রানা। কোড থাকলে জানাত চিঠিতে।

এবার পথের দিকে মন দিল সে। ভাগ্যিস চিটাগাং-ফেনি-কুমিল্লা-দাউদকান্দি বাস সার্ভিস রয়েছে; তাই মাঝে মাঝে 'পথের সাথী', 'গ্রীন অ্যারো', 'টাইগার এক্সপ্রেস' বা 'দুল দুল' লেখা এক আধটা বাসের দেখা পাওয়া যায়, আর হাঁফ ছেড়ে বাঁচে রানা।

আচ্ছা, মেয়েটা দেখতে কেমন হতে পারে? স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একই ঘরে সীট রিজার্ভ করবার অর্থ কি? মেয়েটিকে চোখে চোখে রাখা?

হঠাৎ একটা লোহার রড বোঝাই ট্রাক সামনে থেকে এসে ঘাড়ের উপর উঠবার উপক্রম করল রানার। বেশ কিছুটা দূর থেকেই স্পীড কমিয়ে তিরিশে নিয়ে এসেছিল রানা, কিন্তু ভাবতেও পারেনি যে ট্রাক ড্রাইভারটা হারামীপনা করে সবটা রাস্তা জুড়ে ফুল স্পীডে আসবে—জায়গা ছাড়বে না একটুও। এক হেঁচকা টানে স্টিয়ারিংটা ঘুরিয়ে ঘাসের উপর নেমে এল রানা। ডান পা-টা এক্সিলারেটর ছেড়ে হাইড্রলিক ব্রেকের উপর তিনটে মৃদু চাপ দিল। গাড়িটা ততক্ষণে কয়েকটা ছোট-বড় গর্তে পড়ে পদ্মার ঢেউয়ের মাথায় ডিঙি নৌকোর মত নাচানাচি আরম্ভ করেছে। কিছুদূর গিয়ে থেমে গেল গাড়ি। ট্রাক ততক্ষণে বহুদূর চলে গেছে। অসম্ভব রাগ হলো রানার। নির্জন রাস্তায় একা গাড়িতে বসে ট্রাক ড্রাইভারের উদ্দেশে অশ্রাব্য, অকথ্য ভাষায় গালাগালি বর্ষণ করল সে কিছুক্ষণ ইংরেজি-বাংলা-উর্দু মিশিয়ে।

তারপর সন্তুষ্টচিত্তে আবার স্টার্ট দিল গাড়িতে। চোদ্দগ্রাম ছাড়িয়ে গেল রানা, তবু কারও দেখা নেই।

ঠিক তিনটে সাতচল্লিশে রানা দেখল একটা ওয়ায়্যারলেস ফিট করা উইলিজ্ জীপ আসছে দূর থেকে। একটু কাছে আসতেই আরোহীদের স্পষ্ট দেখা গেল। কয়েকজন খাকি পোশাক পরা লোক এবং একজন মহিলা বসে আছে গাড়িতে। এক মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে নিল রানা। টীশার্টের উপরের দিকে দুটো বোতাম খোলাই ছিল—আরেকটা খুলে দিল সে, যাতে, প্রয়োজনের সময় পিস্তল বের করতে কোন অসুবিধে না হয়। বাম বাহু দিয়ে পাঁজরের সাথে চেপে স্প্রিং-লোডেড হোলস্টারটার স্পর্শ অনুভব করল সে একবার। গজ পনেরো থাকতেই নাম্বার প্লেট দেখে ব্রেক কষল জীপটা। ড্রাইভার হাত বের করে রানাকে থামবার ইঙ্গিত করল। রানাও ব্রেক করে ঠিক জীপের পাশে থামাল ওর গাড়ি।

রানাকে দেখেই মিষ্টি হেসে মেয়েটি বলল, 'নমস্কার, সুবীর বাবু।'

'নমস্কার।' সদ্য ফোটা শিশির মাখা ফুলের মত প্রাণবন্ত এবং সুন্দরী মেয়েটির দিকে এক মুহূর্ত অবাক চোখে চেয়ে উত্তর দিল রানা।

চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স হবে মেয়েটির। কপালে কুমকুমের লাল টিপ। ঠোঁটে হালকা গোলাপী লিপস্টিক। বড় করে একটা বিড়ে খোঁপা বেঁধেছে মাথায়—তাতে সুন্দর করে প্লাস্টিকের ক'টা রজনীগন্ধা গোঁজা। সরু চেনের সাথে বড় একটা লাল রুবি বসানো লকেট ঝুলছে বুকের উপর। ডান হাতে এক গাছি সোনার চুড়ি, বাঁ হাতে ছোট্ট একটা রোলগোল্ডের সাইমা ঘড়ি। ফরসা গায়ের রঙ তার আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে। একহারা লম্বা গড়ন অটুট স্বাস্থ্যের লাবণ্যে কমনীয়। আরও সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে ঝাঁঝাল লাল আর হলুদে মেশানো কাতান শাড়িটায়। সত্যিই এমন চেহারা সহজে চোখে পড়ে না।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সশব্দে দরজা বন্ধ করল রানা। জীপের ড্রাইভিং সীট থেকে নেমে এসে রানার সাথে হ্যাণ্ডশেক করল আর্মি অফিসার। বলল, 'দিস্ ইজ ক্যাপ্টেন মোহন রাও। হাউ ডু ইয়ু ডু, মি. সেন?'

'হাউ ডু ইয়ু ডু,' স্বাভাবিক গাম্ভীর্যের সাথেই উত্তর দিল রানা।

'কয় প্যাকেট লাগবে আপনার, মি. সেন?' প্রশ্ন করল মোহন রাও।

'চারটে।'

'বেশ, গাড়ির পেছনের সীটে তুলে দিচ্ছি প্যাকেটগুলো।'

'না। সামনের বুটে রাখতে বলুন।'

ব্যস, আর প্রয়োজন হলো না। এটুকুতেই বুঝে নিল ক্যাপ্টেন যা বুঝবার। জোরে রানার হাতটা আবার বার কয়েক ঝাঁকিয়ে দিল।

ততক্ষণে মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। একটু মিষ্টি গন্ধ। মৃদু রিনিঠিনি চুড়ির শব্দ। আঁচল উড়ছে বাতাসে।

'বাব্বা, কী অসম্ভব গরম!'

'আপনি গাড়িতে গিয়ে বসুন না।' যেন কতকালের চেনা, এমনিভাবে বলল রানা। মেয়েটির দ্বারা এই মুহূর্তে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই—লক্ষ রাখতে হবে

সিপাই তিনজন আর ক্যাপ্টেনটার দিকে।

গাড়িতে গিয়ে বসল মেয়েটা। তারপর বাঁ হাতে লিভার টান দিয়ে সামনের বনেটটা খুলে দিল। ফোক্সওয়াগেন গাড়ি সম্বন্ধে মেয়েটির পরিষ্কার ধারণা আছে বোঝা গেল।

হিন্দীতে জীপের লোকগুলোকে কিছু বলল ক্যাপ্টেন। সশব্দে লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে ই.পি.আর.-এর ইউনিফরম পরা তিনজন সেপাই। বাঙালী বলে মনে হলো না। বোধহয় দাড়ি কামানো শিখ হবে। বিনা বাক্যব্যয়ে জুতোর বাক্সের চাইতে সামান্য বড় তিনটে প্যাকেট খুব যত্নের সঙ্গে এনে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখল সেপাইরা বুটের মধ্যে। বাক্সগুলো পাতলা কেরোসিন কাঠের। বাইরে থেকে স্টীলের পাত দিয়ে জড়িয়ে শক্ত করে বাঁধা। দু'একটা খড়কুটো বেরিয়ে আছে প্যাকেটের গায়ের কোন ফাঁক দিয়ে। গায়ে লেবেল বা কোন রকম চিহ্ন নেই। ভিতরে কি আছে ঠিক বুঝতে পারল না রানা, কিন্তু বয়ে আনার ধরন দেখে মনে হলো ছোট হলেও প্যাকেটগুলো অত্যন্ত ভারি। একজন ফিরে গিয়ে আর একটা অপেক্ষাকৃত ছোট প্যাকেট এনে রাখল বুটের ভিতর, তারপর বনেটটা নামিয়ে দিতেই অটোমেটিক লক হয়ে গেল সেটা।

বাকি দু'জন ততক্ষণে মেয়েটির একটা সুটকেস তুলে দিয়েছে গাড়ির পিছনের সীটে। এদের মনে কোন রকম সন্দেহের উদ্রেক হয়নি দেখে আশ্বস্ত হলো রানা। পি.সি. আই.-এর নিপুণ কাজের জন্যে গর্ব অনুভব করল সে।

হঠাৎ পিছন থেকে খটাশ করে জোরে একটা আওয়াজ হতেই চমকে ফিরে দাঁড়াল রানা। দেখল তিনজন একসাথে বুট ঠুকে স্যালিয়্যুট করছে ওকে। রানার ডান হাতটা দ্রুত চলে এসেছিল পিস্তলের কাছে—এক সেকেণ্ডে সামলে নিয়ে ও-ও হাত তুলে ভারতীয় কায়দায় প্রত্যাভিবাদন করল। পর মুহূর্তেই এক লাফে জীপের পিছনে উঠে বসল তিন সেপাই ঠিক তিনটে বানরের মত, এবং সাথে সাথে সাঁ করে চলে গেল জীপটা যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকেই।

বিলীয়মান গাড়িটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল রানা। দিন দুপুরে ভোজবাজির মতই ঘটে গেল যেন ঘটনাগুলো। এই কয়মিনিট আগে গ্রীষ্মের প্রখর রোদের মধ্যে উত্তপ্ত রাস্তার উপর সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে একা গাড়ি চালাচ্ছিল সে। হঠাৎ কোথাকার এক জীপ এসে তার সমস্ত উদ্বেগ উৎকণ্ঠার নিরসন করে অজানা অচেনা এক রাজকন্যেকে তুলে দিয়ে গেল রানার হাতে, যেন যাদুমন্ত্রের বলে। এখন আর সে জীপের কোন চিহ্নও নেই—রয়েছে কেবল সে, আর মেয়েটি।

'হাঁ করে কী দেখছেন, সুবীর বাবু! এদিকে গরমে যে ঘেমে নেয়ে উঠলাম,' জড়তাহীন পরিষ্কার সুরেলা গলা।

গাড়িতে ঢুকেই আবার সুগন্ধ পেল রানা। শ্যানেল নাম্বার ফাইভ সেন্টের মিষ্টি গন্ধে ভরপুর হয়ে আছে গাড়ির ভিতরটা।

'সিগারেট খেলে অসুবিধে হবে আপনার?'

'মোটেই না।'

'যাক, বাঁচা গেল,' বলে রানা স্টার্ট দিল গাড়িতে। গাড়ি ছুটছে পঁচাত্তর মাইল বেগে। আগের কথার খেই ধরে বলল, 'বিয়ের আগে সব মেয়েই এ রকম বলে।

কিন্তু বিয়ে হয়ে গেলেই তাদের মতামত পাল্টে যায়। স্বামীর নেশা ছাড়াবার জন্যে তখন উঠে পড়ে লেগে যায় তারা।'

মেয়েটা মাথা ঝাঁকিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে রানা বলল, 'দেখুন তো কাণ্ড, আপনার নামটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি এখনও।'

'সুলতা রায়।'

'ক'বছর আছেন সার্ভিসে?'

'দেড় বছর। এতদিন ফাইল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। এই প্রথম আমার বাইরে আসা। কপালটা ভাল, প্রথমেই আপনার সাথে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে গেলাম।'

'কপাল ভাল, তার মানে?' মনে মনে হাসল রানা। কপালটা তোমার খারাপ, সুন্দরী!

'ভাল বলব না? সুবীর সেনের সাথে কাজ করবার সুযোগ ক'জনের হয়? সার্ভিসের অন্যান্য মেয়েরা তো হিংসায় মরে যাচ্ছে।'

'আচ্ছা? এতই বিখ্যাত লোক আমি?' মৃদু হাসল রানা। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

'কই, সিগারেট ধরাচ্ছেন না যে?' হঠাৎ বলল সুলতা।

'খাই না।' হাসল রানা। 'ও-কথা বলে গল্প শুরু করলাম আর কি।'

কথায় কথায় মেয়েটি বলল কেমন ভাবে সাধারণ ডিউটি থেকে তাকে সরিয়ে সাতদিন স্পেশাল ট্রেনিং দেয়া হয়েছে, তারপর কলকাতা থেকে বর্ডারে আনা হয়েছে হেলিকপ্টারে করে। সেখান থেকে কত বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে বর্ডার ক্রস করেছে জীপটা ভয়ে ভয়ে। এখন অন্য পথে ফিরে যাবে আবার সেটা ভারতীয় এলাকায়।

ফেনীতে এসে সুলতা বলল তেষ্টা পেয়েছে। দু'জন দুটো ডাবের পানি খেয়ে নিয়ে আবার রওনা হলো। এরই মধ্যে আরও সহজ ও সাবলীল হয়ে এসেছে সুলতা রায়। মাসুদ রানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর অতীতের কথা, বাবা-মার কথা, ছেলেবেলার কথা জিজ্ঞেস করে করে শুনল মন দিয়ে। সুলতাও মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে যার-পর- নাই উৎসাহিত হয়ে ওর নিজস্ব প্রাঞ্জল ভাষায় বলে গেল অনেক কথা। পথের ক্লান্তি ভুলে গেল দু'জন।

বাবা ছিলেন উকিল,ছেলেবেলায় লাক্ষ্ণৌ শহরে মানুষ, ক্যালকাটা লেডি ব্রাবোর্ন থেকে গ্র্যাজুয়েশন, তারপর সিক্রেট সার্ভিসে যোগদান।

মেয়েটার মস্ত বড় গুণ হচ্ছে দু'চার মিনিটে সবার সাথে বন্ধুত্ব করে নিতে পারে। নিজের কোন কথাই চেপে রাখবার চেষ্টা করল না ও। ওর জীবনের অনেক গোপন কথাও সে বলল রানাকে। বলতে বলতে টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল ওর চোখ থেকে। রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে একটু থেমে আবার বলল, 'কেন যে এসব বলছি জানি না—ভাল করে চিনিও না আপনাকে—কিন্তু বড় ভাল লাগছে নিজের সব কথা আপনাকে বলতে। মনে হচ্ছে আমার সব কথা আপনি বুঝবেন, আপনাকে দিয়ে আমার কোন ক্ষতি হতে পারে না।'

মেয়েটার কথাবার্তার ধরন অনেকটা পুরুষের মত। চালচলনেও কিছুটা

পুরুষালী ভাব। মেয়েলীপনা বা ন্যাকামীর লেশমাত্র নেই ওর মধ্যে। ওকে ভাল লাগল রানার।

একটা ব্রিজের কাছে আসতেই দেখা গেল দুটো বাঁশ পুঁতে একখানা সাইনবোর্ড টাঙানো:

**বিদায়। নোয়াখালী জিলার শেষ সীমা।**

বেশ বড় ব্রিজ। নিচ দিয়ে নদী গেছে একটা। ফেনী নদী। গ্রীষ্মের তাপে শুকিয়ে ক্ষীণ হয়ে গেছে সে নদী। পুলটা পার হতে এক টাকা শুল্ক দিতে হলো। অপর পারে আরেকটা সাইনবোর্ডে লেখা:

**স্বাগতম। চিটাগাং জিলার শুরু।**

হাতের বাঁ ধারে অল্প কিছু দূর দিয়ে লম্বালম্বিভাবে মাটির টিলা সেই যে আরম্ভ হয়েছে, আর শেষ হতে চাইছে না কিছুতে। প্রায়ই ছোট ছোট বাজার-গঞ্জ পড়তে লাগল পথে। কাজেই গতি অনেক কমে গেল গাড়ির। সবচাইতে অসুবিধা করল বাঁশ বোঝাই গরু বা মোষের গাড়িগুলো। রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে চলে ওগুলো। দূর থেকে হর্ন বাজালে নড়ে না রাস্তার উপর থেকে। যখন কাছে যাওয়া যায় তখন হঠাৎ করে গাড়ি ঘুরিয়ে বাম ধারের অসমতল কাঁচা রাস্তার উপর নেমে পড়ে। ফলে পিছনের লম্বা বাঁশগুলো রাস্তার উপর আড়াআড়িভাবে চলে এসে সমস্ত পথটা বন্ধ করে দেয়। কাঁচা রাস্তায় গরুর গাড়িগুলো আবার পাকা রাস্তার সাথে সমান্তরাল না হওয়া পর্যন্ত অচল অবস্থায় ড্রাইভিং সীটে বসে মনে মনে মোষের গুষ্টি উদ্ধার করা ছাড়া উপায় নেই।

'কই, আপনি যে কিছুই বলছেন না? আমিই কেবল বক বক করে যাচ্ছি।' নিজের কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে জিজ্ঞেস করল সুলতা।

'আমি অত সুন্দর করে বলতে পারি না,' এড়িয়ে যাবার জন্যে বলল রানা।

জোরে হেসে উঠে কথাটা উড়িয়ে দিল সুলতা। একটা মাইল-পোস্ট পার হয়ে যাচ্ছিল, চট করে দেখে নিয়ে সুলতা বলল, 'চিটাগাং টেন মাইলস।'

তখন গোধূলি লগ্ন। সারাদিন পৃথিবীর উপর অগ্নিবর্ষণ করে সূর্যটা বঙ্গোপসাগরে ডুব দিয়ে গা-টা জুড়োচ্ছে এখন। পশ্চিম দিগন্তে এক আধ ফালি সাদা মেঘ এখন লাল। তারই হালকা আলো এসে পড়েছে সুলতার মুখের উপর। রূপকথার রাজকন্যার মত সুন্দর লাগছে ওকে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল রানা ওর মুখের দিকে। রাস্তায় পড়ে থাকা একটা ইঁটের উপর হোঁচট খেলো গাড়িটা। ফিক করে হেসে সুলতা বলল, 'অ্যাকসিডেন্ট করবেন নাকি?'

'যদি করি, তবে দোষ তোমার,' উত্তর দিল রানা।

রানার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা কথাটা কেমন যেন থমকে দিল সুলতাকে। কথাটা নিয়ে নিজের মনেই নাড়াচাড়া করল সে কয়েক মুহূর্ত। এত ভাল লাগল কেন কথাটা?

'আপনি—'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সুলতা, ওকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'আর "আপনি" নয়, এবার "তুমি"। চিটাগাং আর সাত মাইল। এখন থেকে আমি তোমার স্বামী, তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী, বুঝলে?'

হাসল সুলতা। 'আমি তো নকল স্ত্রী, তোমার আসল স্ত্রী জানতে পারলে মারবে তোমাকে। তাই না?'

'বিয়েই হয়নি, তার আবার আসল স্ত্রী!'

'ওমা, এত বয়স হয়েছে বিয়ে করোনি কেন? কাউকে ভালবাসো বুঝি?'

'নাহ্। ওসব বালাই নেই।'

'বাবা-মা নেই বুঝি তোমার?'

'না।'

'আমারও নেই। থাকলে এভাবে বখে যেতে পারতাম না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সুলতা। খসে পড়া আঁচল তুলে দিল বাঁ কাঁধে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে—হেড লাইট জ্বেলে দিল রানা।

প্রায় দু'বছর পর চিটাগাং-এ এসে বেশ আশ্চর্য লাগল রানার। শহরের ভোলটাই যেন পাল্টে গেছে। উন্নয়নের কাজটা যেন ঢাকার চাইতেও অনেক বেশি দ্রুত হয়েছে এখানে। হরেক রকম অট্টালিকা ঝলমলে দোকান-পাট। রাস্তায় সারি সারি ফ্লোরেসেন্ট বাতি দিন করে রেখেছে রাতকে। পথঘাট বেশ পরিষ্কার মনে ছিল রানার, কাজেই স্টেশন রোডে মিস্খা হোটেল চিনে বের করতে কোনও অসুবিধে হলো না।

হোটেলের সামনে ফুটপাথের ধারে এমন বেকায়দা করে গাড়ি রাখল রানা, যাতে খুব পাকা ড্রাইভারেরও কমপক্ষে দুই মিনিট সময় লাগে ওটাকে বাগে এনে রাস্তায় চালু করতে।

গাড়ি থামতেই হোটেলের পোর্টার দৌড়ে এল। সুলতা গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল ফুটপাথে। ওর সীটটা ভাঁজ করে ইঙ্গিত করতেই পিছনের সীটে রাখা রানা এবং সুলতার সুটকেস দুটো বের করল পোর্টার। গাড়ির কাঁচ তুলে দিয়ে দরজাটা লক করে চাবিটা দিল রানা সুলতার হাতে।

নিচতলার গেট দিয়ে ঢুকেই করিডরের বাঁ ধারে লিফট। বুড়ো লিফটম্যানের থুতনি থেকে ঝুলছে অল্প একটু পাকা ছাগলা-দাড়ি। সালাম করল সে রানাকে দেখে। পোর্টারকে পাঁচতলার দশ নম্বর রুমে মাল নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে লিফটে উঠল রানা আর সুলতা।

দোতলায় ম্যানেজারের কাউন্টার। সামনে মস্ত বড় লাউঞ্জে ফাঁক ফাঁক করে রাখা টেবিলগুলোর ওপর প্লেট, কাঁটা চামচ, ছুরি ইত্যাদি ডিনারের সরঞ্জাম পরিপাটি করে সাজানো। গ্লাসের মধ্যে সদ্য লণ্ড্রির ধোয়া ইস্তিরি করা ন্যাপকিন ফুলের তোড়ার মত কায়দা করে রাখা। কোন কোন টেবিল ঘিরে দু'জন-চারজন লোক বসা। বেশির ভাগই খালি।

অল্পবয়সী ম্যানেজার ওদের দেখেই এগিয়ে এল।

'এখানে আর আপনাদের দাঁড়াতে হবে না, স্যার। এই যে নিন আপনাদের ঘরের চাবি—পাঁচতলার দশ নম্বর রুম। আমি এন্ট্রি-বইটা পাঠিয়ে দেব ওপরে, সই করে দেবেন।'

'ধন্যবাদ। আমাদের ঘরের ওয়েটার কে?'

'হাসান আলী। ওকে দিয়েই বইটা পাঠাচ্ছি, স্যার।'

পাঁচতলায় উঠে এল ওরা। দেখল সুটকেস দুটো নিয়ে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পোর্টার।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই রানা এয়ার কুলারের হাই কুল লেখা সাদা বোতামটা টিপে দিল। মালগুলো ঘরে এনে রাখতেই পাঁচ টাকার একটা নোট বকশিশ দিয়ে দিল রানা পোর্টারকে। আশাতিরিক্ত বকশিশ পেয়ে সালাম ঠুকে বেরিয়ে গেল সে। প্রায় সাথে সাথেই একজন ঝাড়ুদারের সঙ্গে একহাতে একটা বই আর অন্য হাতে কিছু পরিষ্কার বিছানার চাদর আর বালিশের ওয়াড় নিয়ে ঘরে ঢুকল হাসান আলী।

একটা আই সি আই ফ্লিট স্প্রে-গান দিয়ে সারা ঘরে, বিশেষ করে বিছানার তলে, টেবিলের নিচে আর আলমারির পিছনে স্প্রে করল জমাদার, তারপর ভিম-এর কৌটো নিয়ে অ্যাটাচড্ বাথরুমে ঢুকল কমোড, বাথ-টাব আর বেসিনটা পরিষ্কার করবার জন্যে। হাসান আলী নিপুণ হাতে পুরানো বেড শীট আর বালিশের ওয়াড় সরিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিল ঘরটাকে দুই মিনিটের মধ্যে। এসব কাজগুলো এরা সবসময় নতুন 'কাস্টোমারের' সামনে করে—আগে থেকে করে রাখলে অনেক সময় আবার ডবল করে করতে হয়, তাই।

সুলতা বলল, 'একটু জল খাওয়াতে পারো? ঠাণ্ডা?'

'এক্ষুণি নিয়ে আসছি।' হাসান আলী ছুটল পানি আনতে।

বড়-সড় ঘরটায় পাশাপাশি দুটো সিঙ্গেল খাট—ইচ্ছে করলে জোড়া দিয়ে নেয়া যায়। কোণে একটা সাধারণ চম্বল কাঠের আলমারি। একটা মাঝারি গোছের ডাইনিং টেবিলের দু'পাশে দুটো চেয়ার রাখা। একটা ড্রেসিং টেবিল আর একটা ইজি চেয়ার। এই হচ্ছে ঘরের আসবাব।

রানাকে রিস্ট ওয়াচটা খুলে ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখতে দেখে সুটকেস থেকে কিছু কাপড় বের করতে করতে সুলতা বলল, 'আমি কিন্তু আগে যাচ্ছি বাথরুমে। সারাদিনের এই ধকলের পর এক্ষুণি চান করতে না পারলে মরে যাব।'

'মেয়েমানুষ, একবার বাথরুমে ঢুকলে তো আর বেরোতে চাইবে না সহজে।' একটু থেমে আবার বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমিই আগে যাও—আমি পরে যাব। অলওয়েজ লেডিজ ফার্স্ট।'

হাসান আলী দু'হাতে দু'বোতল ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি নিয়ে ঢুকল। দুটো গ্লাস দিয়ে বোতলের মুখ ঢাকা। দশ টাকা বকশিশ পেয়ে সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে গেল হাসান আলীর।

'কিছু খাবে, সুলতা?' রানা প্রশ্ন করে।

'কেক-বিস্কিট গোছের কিছু আনতে বলো। আমি এক্ষুণি গা-টা ধুয়ে আসছি।' এক গ্লাস পানি খেয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল সুলতা।

কয়েকটা কেক পেস্ট্রি আর দু'কাপ কফি আনতে বলল রানা। হাসান আলী চলে যাচ্ছিল, আবার ডাকল রানা। আরও একটা দশ টাকার নোট ওর হাতে গুঁজে দিয়ে নিচু গলায় বলল, 'তোমার একটা কাজ করতে হবে, হাসান আলী, পারবে? টাকাটা রেখে দাও, বকশিশ।'

বিস্মিত হাসান আলী চট করে হাত উঠিয়ে সালাম করল দ্বিতীয়বার।

'খুব পারব, স্যার।' বিগলিত হাসান আলী এখন পা-ও চাটতে পারবে।

ইঙ্গিতে ওকে কাছে সরে আসতে বলে চাপা গলায় বলল রানা, 'গত রাতে হঠাৎ ওর (চোখদুটো তেরছা করে বাথরূমের দিকে ইঙ্গিত করল রানা) বাবা মারা গেছেন, খবর এসেছে। বাবার একমাত্র মেয়ে ও। খুবই আদরের মেয়ে। খবরটা ওকে জানানো হয়নি এখনও, বুঝলে? (মাথা ঝাঁকাল হাসান আলী) এখন খবরটা ওকে হঠাৎ করে জানাতে চাই না, ওর শরীর অত্যন্ত দুর্বল, আচমকা আঘাত পেলে কি হয়ে যায় বলা যায় না। তাই না? (যেন খুব ব্যথা পেয়েছে, এমন মুখ করে সায় দিল হাসান আলী) সেজন্যে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আমার কিংবা ওর কোন চিঠি বা টেলিগ্রাম এলে ম্যানেজারের কাছ থেকে তুমি নিয়ে নেবে সেটা—নিয়ে গোপনে আমার হাতে দেবে, যেন ও ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। জিজ্ঞেস করলে বলবে কোন চিঠি বা টেলিগ্রাম আসেনি। আর কেউ যদি ওর কাছে টেলিফোন করে বা দেখা করতে চায়, ও থাকুক বা না-ই থাকুক সোজা বলে দেবে বাবুর সাথে বাইরে গেছে। কি, পারবে না?'

'ঠিক আছে, স্যার, কোন চিঠিপত্র-টেলিফোন বা লোক এলে আমি সামলে নেব। কিন্তু উনি যদি কাউকে টেলিফোন করেন, তখন?'

'সে দিকটা আমি দেখব, তুমি কেবল এটুকু করলেই হবে। এখন যাও তো, চট করে কিছু খাবার নিয়ে এসো।'

ঠাণ্ডা ঘরটায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করল রানা। সারাদিনের একটানা পরিশ্রমের পর এতক্ষণে চোখ দুটো একটু বিশ্রাম পেল। চোখের পাতায় অল্প অল্প জ্বালা অনুভব করল সে। দশ মিনিট এভাবে চুপচাপ পড়ে থাকল রানা। এতেই অনেকটা বিশ্রাম হয়ে গেল। তারপর চোখ মেলে দেখল উগ্র লাল রঙের একখানা খাটাউ প্রিন্ট শাড়ি সাদাসিধে একহারা করে গায়ে জড়িয়ে বাথরূম থেকে বেরোচ্ছে সুলতা।

# চার

সুলতা লিফটে উঠতেই মাসুদ রানা ঘরে তালা দিয়ে তর তর করে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। রানা ভাবছিল, লিফটের ঠিক পাশেই সিঁড়ি ঘর, একই করিডর দিয়ে বেরোতে হয়, ওখান দিয়ে সুলতার পিছন পিছন বেরোলে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

দোতলায় এসে ম্যানেজারের কাউন্টারে থামল সে। চাবিটা দিয়ে বলল, 'একটু বাইরে যাচ্ছি। আমাদের কোন চিঠি বা টেলিগ্রাম এলে হাসান আলীর হাতে দিয়ে দেবেন।'

'জ্বি, আচ্ছা।'

'ফিরতে আমাদের রাত হতে পারে। গেট ক'টা পর্যন্ত খোলা রাখেন আপনারা?'

'গেটে তালা লাগিয়ে দেয়া হয় এগারোটায়। তবে এপাশ দিয়ে একটা পথ

আছে। দেরি হলে…’

'বেশ, বেশ,' উৎসাহিত হয়ে রানা বলল, 'কাউকে দিয়ে একটু চিনিয়ে দিন না পথটা—রাতে দরকার হতে পারে।'

'নিশ্চই, এই, সামাদ, যাও তো বাবুকে কিচেনের পাশের রাস্তাটা দেখিয়ে দাও।'

সরু একটা গলি দিয়ে মেইন গেটটার গজ পনেরো বামে রাস্তায় এসে দাঁড়াল রানা। দেখল সুলতা ততক্ষণে গাড়িটা ঘুরিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হয়েছে।

হোটেলের সামনে রাস্তার অপর পারে নীল রঙের একটা ওপেল রেকর্ড দাঁড়িয়ে আছে। তিন লাফে রাস্তা পার হয়ে গাড়িতে উঠে বসল রানা। প্রায় একশো গজ দূরে ফোক্সওয়াগেনের টেইল লাইট দুটো দ্রুত সরে যাচ্ছে। রানার রিস্ট ওয়াচে এখন বাজে পৌনে ন'টা। রাস্তার ঝলমলে আলোর পাশে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদটাকে বড় ম্লান দেখাচ্ছে।

এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে মাইল তিনেক চলবার পর এল নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি। হাসপাতালের উল্টোদিকে আবগারী শুল্ক দফতরের পাশ দিয়ে গেছে বায়েজিত বোস্তামী বা ক্যান্টনমেন্ট রোড। প্রায় নির্জন রাস্তাটা দোহাজারী রেল লাইন পার হয়ে, মাজারের পাশ দিয়ে চলে গেছে। ঠেকেছে গিয়ে চিটাগাং ক্যান্টনমেন্টে। বাঁ দিকে একটা রাস্তা গিয়ে মিশেছে রাঙামাটি রোডে।

অতদূর যেতে হলো না, রেল ক্রসিং আর মাজারের মাঝামাঝি জায়গায় এসে হঠাৎ ডানধারের একটা খোয়া-ঢালা কাঁচা রাস্তায় নেমে গেল সামনের ফোক্সওয়াগেন। বড় রাস্তার পাশে একটা একতলা বাড়ির উঁচু পাঁচিল—ঠিক তারপরই ডান দিক দিয়ে চলে গেছে কাঁচা রাস্তাটা।

ওপেলের নাকটা পাঁচিলের আড়াল থেকে একটু বেরোতেই ব্রেক করল রানা। প্রায় দেড়শো গজ দূরে হাতের বাম ধারে একটা দোতলা বাড়ির লোহার গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল ফোক্সওয়াগেন। তারপর আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল গেট। গাড়িটা ব্যাক করে পাঁচিলের আড়ালে ঘুরিয়ে রেখে নেমে এল মাসুদ রানা।

দূর থেকে দেখা গেল উঁচু প্রাচীর দিয়ে বাড়িটা ঘেরা। একতলার কয়েকটা ঘরে বাতি জ্বলছে, কিন্তু দোতলাটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। চাঁদের আলোয় স্নাবছা কতগুলো উঁচু টিলা দেখা গেল খানিকটা দূরে। একটা নিচু জমি আছে বাড়িটাতে পৌঁছবার আগে হাতের বাঁ ধারে। বোধহয় সেখানে বাড়ি তোলা হবে। মাটি ফেলে অর্ধেকটা ভরাট করা হয়েছে। কয়েক হাজার এক নম্বর ইঁট জায়গায় জায়গায় থাক দিয়ে সাজিয়ে রাখা।

বাড়িটার গেটের সামনেটা ডুম বাতির উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। তাই বাঁ দিকে মাঠের মধ্যে নেমে গেল রানা। ইঁটের পাঁজার আড়ালে আড়ালে উঁচু প্রাচীরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। দেখল পাঁচিলের উপর আবার তিন ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া। রানা বুঝল, অত্যন্ত সুরক্ষিত বাড়ি। একবার ভিতরে ঢুকে কোন ভাবে ধরা পড়লে ওখান থেকে আর বেরোতে হবে না। এমন জায়গায় একটা বাড়িকে এত সুরক্ষিত করার কি উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা গেল না।

প্রাচীর বরাবর কিছুদূর বাঁ দিকে চলে গেল রানা। ন'টা-সোয়া ন'টাতেই এই

এলাকা একেবারে নির্জন হয়ে গেছে। একটানা ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। সেই সাথে থেকে থেকে নিচু জলা জায়গা থেকে বেসুরো ব্যাঙের ডাক। এক আধটা জোনাকী মিটমিট করছে ম্লান ভাবে।

গোটা কতক দশ ইঞ্চি ইঁট একটার উপর আরেকটা রেখে তার উপর উঠে দাঁড়াল রানা। আর হাত খানেক উপরে পাঁচিলের মাথা। লাফিয়ে উঠে পাঁচিল ধরল সে। কাঁটাতারের বেড়াটা প্রায় দেয়ালের গায়ে লাগানো। ওটাকে ঠেলে উঁচু করবার জন্যে যেই ধরেছে, অমনি ছিটকে দশ ফুট দেয়াল থেকে মাটিতে পড়ল রানা। অসম্ভব জোর এক ধাক্কায় মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে। হাজার ভোল্টের ইলেকট্রিসিটি চলছে তারের মধ্যে দিয়ে। সেই বিদ্যুৎবাহী তারটা রানার ডান হাতের তালুতে আড়াআড়িভাবে বসে যাওয়ায় মাংস পোড়া গন্ধ ছুটল। ফোস্কা পড়ল না। দগদগে ঘায়ের মত কাঁচা মাংস দেখা যাচ্ছে। সাদা রস গড়িয়ে পড়ছে তার থেকে। অজ্ঞান হয়ে নিজের শরীরের ভারে মাটিতে পড়ে না গেলে কয়েক সেকেণ্ডেই মৃত্যু হত রানার।

দু'তিন মিনিট পর ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল রানার। কানের কাছে তানপুরার মত একটানা ঝিঁঝি পোকার সুর আর কোলাব্যাঙের ক্লাসিকাল তান শুনে অবাক হলো সে। হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে চোখে মুখে। ভাবল, এয়ারকুলারটা বন্ধ করে দিই। ধীরে চোখ মেলল সে। পরিষ্কার চাঁদের আলোয় দেখল একটা দেয়ালের গায়ে কয়েকটা মরচে ধরা সিক দেখা যাচ্ছে। মাটিতে ঘাসের উপর শুয়ে আছে ও। ভাবল, এ কোথায় আছি! হঠাৎ ডান হাতের তালুতে অসম্ভব জ্বালা করে উঠতেই সব কথা মনে পড়ে গেল ওর। উঠে বসে ক্ষত জায়গাটা একবার দেখল রানা। তারপর দেয়ালের উপর তারগুলোর দিকে চাইল একবার। ভাবল, আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল আমার। যাক, গতস্য শোচনা নাস্তি। পকেট থেকে রুমাল বের করে ডান হাতটা পেঁচিয়ে নিয়ে সিকগুলোর দিকে ফিরল সে।

বাড়ির ভিতর থেকে একটা বড় নর্দমা এসে শেষ হয়েছে দেয়ালের বাইরে। ভিতর থেকে পানি এসে এই নিচু জমিতে পড়ে। মোটা সিক দিয়ে বেড়া দেয়া আছে নর্দমাটা। বহুদিনের পুরানো লোহা মরচে ধরে ক্ষয়ে গেছে। সেই নর্দমা দিয়ে হু-হু করে দখিনা বাতাস এসে রানার চোখে মুখে লাগছিল এতক্ষণ।

সিকগুলো সহজেই বাঁকিয়ে বাড়িতে ঢোকা সম্ভব মনে করে হাত দিতে গিয়েও থমকে গেল রানা। যদি এতেও কারেন্ট থাকে! বোঝা যাবে কি করে? এবার আর ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা নেই—নিশ্চিত মৃত্যু!

'ম্যাও!'

চমকে উঠে দেখল রানা, বাড়ির ভিতর থেকে একটা বিড়াল এসে সিকের অপর পারে উঁকি দিচ্ছে। বাইরে চলাচল করবার এই সোজা পথ বের করে নিয়েছে সে। সিকের সাথে আলস্যভরে দু'বার গা ঘষে বাইরে বেরিয়ে এল বিড়ালটা। রানার দিকে নিরুৎসুক দৃষ্টিতে চাইল একবার। তারপর পিঠের উপরটা দু'বার চেটে নিয়ে একটা বুক ডন দিয়ে লাফিয়ে চলে গেল ডান ধারে।

নিঃসন্দেহ হয়ে এবার রানা বাঁ হাতে একটা সিক ধরে টান দিল। সিকগুলোর নিচের দিকটা একেবারে চিকন হয়ে গেছে মরচে ধরে গিয়ে, তাই বাঁ হাতেই

অনায়াসে বাঁকিয়ে উপর দিকে উঠিয়ে দিল সে। হাতের মুঠো থেকে একরাশ মরচে ধরা লোহার গুঁড়ো ঝরে পড়ল। খুশি মনে একটা একটা করে সবক'টা সিক বাঁকিয়ে তুলে দিল রানা উপর দিকে, তারপর ডানহাতে ওয়ালথারটা বাগিয়ে ধরে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

বাড়িটার পিছন দিকে মস্ত বড় কম্পাউণ্ড। টিনের ছাউনি দেয়া লম্বা একখানা গুদাম ঘর দেখা গেল। তার সামনে পাঁচ টনের দুটো লরি দাঁড়িয়ে আছে। একটা ফোর্ড, আরেকটা মার্সিডিজ। লোকজনের সাড়া শব্দ নেই। শেডবিহীন একখানা একশো পাওয়ারের বাল্‌ব-জ্বলছে গুদাম ঘরের এক কোণে বাইরের দিকে। নগ্ন দেখাচ্ছে ওটাকে। বনবন করে কয়েকটা পোকা ঘুরছে ওটার চারধারে।

গেটের দিকে কিছুদূর সরে এল রানা দেয়াল ঘেঁষে। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সামনের বনেটটা হাঁ করা অবস্থায় ফোক্সওয়াগেনটা দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি বারান্দায়। রানার সামনে বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁকা। চাঁদের আলো বিছিয়ে পড়েছে মাঠের ওপর। এই মুহূর্তে দ্বাদশীর চাঁদটাকে বড় বেশি উজ্জ্বল মনে হলো তার।

দ্রুত পদক্ষেপে একটা ছোট গাছের তলায় চলে এল রানা। সেখান থেকে বাড়ির পিছনটা আর মাত্র গজ দশেক দূরে। পিছন দিকে ব্যারাকের মত কয়েকটা চাকরের ঘর। কোন লোকজনের চিহ্ন দেখা গেল না ওদিকে। বাতি জ্বলছে না একটাও। কেবল একটা ইলেকট্রিক জেনারেটরের মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি আসছে সেদিক থেকে। নাহ্‌, কেউ লক্ষ করেনি ওকে।

মাথার উপর দিয়ে একটা বাদুড় ডানা ঝটপট করে উড়ে গেল রানাকে সচকিত করে দিয়ে। আপন মনে ঝুলছিল গাছে, হঠাৎ কি মনে করে সশব্দে ডানা ঝাপটে চাঁদের আলোয় উড়তে লাগল ঘুরে ঘুরে।

বাড়ির পিছন দিকে দোতলার ব্যালকনিতে মাটি থেকে একটা মাধবী লতার ঝাড় উঠেছে। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে ঝাড়টা। মিষ্টি মধুর গন্ধ আসছে মৃদু বাতাসে।

গাড়ি বারান্দার সামনে সদর দরজা ছাড়া একতলায় ঢোকার আর কোন উপায় দেখতে পেল না রানা। জানালা দিয়েও কিছু দেখার উপায় নেই। কাঁচের সার্সীর ওপারে ভারি পর্দা ঝোলানো।

আবার কয়েক লাফে এগিয়ে এসে বাড়িটার গায়ে সেঁটে দাঁড়াল রানা। সতর্কভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পায়ের জুতো জোড়া খুলে ফেলল সে। তারপর পিস্তলটা হোলস্টারের মধ্যে পুরে তরতর করে দোতলার ব্যালকনিতে উঠে এল একটা পাইপ বেয়ে। রুমালের ভিতর ডান হাতের পোড়া তালুটা জ্বালা করে উঠল চাপ লেগে।

খোলা দরজা দিয়ে ঢুকতেই প্রথমে পড়ল সাজানো গোছানো সৌখিন একটা শোবার ঘর। বিছানার উপর পরিপাটি করে দামী বেড কাভার পাতা। পেন্সিল টর্চ জ্বেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খালি ঘরটা দেখল রানা। বোধহয় বেশ কিছুদিন হলো কেউ ব্যবহার করেনি এ ঘর। পাতলা এক পর্দা ধুলো জমেছে সব আসবাব-পত্রের উপর।

পরপর কয়েকটা ঘর পেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল রানা। ভূতুড়ে বাড়ির মত

শূন্য দোতলায় একটা লোকও নেই। সিঁড়ি ঘরের কাছে আসতেই দেয়ালের গায়ে একফালি আলো দেখা গেল। একতলার ভেন্টিলেটার থেকে আসছে আলোটা।

পায়ের পাতার উপর ভর করে নিঃশব্দে কয়েক ধাপ নেমে এল রানা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে। ভেন্টিলেটারের ফাঁকে চোখ রেখে দেখতে পেল ড্রইংরুমে একটা সোফায় বসে রানার দিকে মুখ করে কথা বলছে সুলতা, আর রানার দিকে পিছন ফিরে বসা দু'জন লোক অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শুনছে। সুলতা আর লোকগুলোর মাঝখানে একটা টেবিলের উপর সব ক'টা প্যাকেট রাখা। বড়গুলো থেকে একটা আর ছোট একটা প্যাকেট খুলে ভিতরের জিনিস সাজানো আছে টেবিলের উপর।

চৌকোণ ধাতব বস্তুটার উপর চোখ পড়তেই রানার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। ডিনামাইট! টি.এন.টি.! তাহলে তিনটে বাক্সের মধ্যে করে তিনটে ডিনামাইট এল ভারত থেকে গোপন পথে। সাথের ছোট বাক্সটায় এল একটা রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার। খুব সম্ভব ডিনামাইটগুলো ফাটানো হবে রেডিয়োর সাহায্যে।

সমস্ত ইচ্ছাশক্তি একত্রীভূত করে কান পেতে রানা শুনতে চেষ্টা করল সুলতার কথাগুলো। কিন্তু নিচু গলায় কথা হচ্ছে বলে কিছুই শোনা গেল না।

সামনে একজন কিছু জিজ্ঞেস করল। সুলতা ট্র্যান্সমিটারের কয়েকটা ডায়াল ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিল। রানা বুঝতে পারল বিশেষভাবে তৈরি এই রেডিয়ো-অপারেটেড ডিনামাইটের ব্যবহার পদ্ধতি বুঝিয়ে দিচ্ছে সুলতা। এ সম্বন্ধে কয়েকদিন বিশেষ ট্রেনিং দেয়ার পর ওকে পাঠানো হয়েছে কলকাতা থেকে। কিন্তু এই শক্তিশালী ডিনামাইট দিয়ে কী ধ্বংস করতে চায় এরা? রাহাত খানের কথা মনে পড়ল, 'বিরাট কোন পরিকল্পনার প্রায় সমাপ্তির দিকে চলে এসেছে এরা। জানতে হবে তোমার, কি আছে প্যাকেটে, কাকে দেয়া হচ্ছে সেটা, আর কেন দেয়া হচ্ছে। ওদের সমস্ত কুমতলব বানচাল করে দিতে হবে।' কঠিন সঙ্কল্পের মৃদুহাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে।

পিছনের একটা ব্ল্যাক বোর্ডের সামনে উঠে গিয়ে দাঁড়াল সুলতা। সাদা চক দিয়ে তার উপর একটা ডায়াগ্রাম আঁকল। তারপর লাল চক দিয়ে তিনটে জায়গায় গোল চিহ্ন দিল। রানা বুঝল, এবার বোঝানো হচ্ছে কোন জায়গায় ডিনামাইটগুলো বসাতে হবে।

নক্সাটা দেখে কিছুই বোঝা গেল না। চেষ্টা করেও রানা কোন কিছুর সাথে এর মিল খুঁজে পেল না। ছবিটা যত্ন করে মনের মধ্যে গেঁথে নিল সে ভবিষ্যতের জন্যে।

আবার সোফায় এসে বসল সুলতা। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর একজন একটা নোট বই এগিয়ে দিল, তাতে কি সব লিখে দিল সুলতা।

হঠাৎ সুলতার সামনের লোক দু'জন উঠে দাঁড়াল। রানা চেয়ে দেখল পিছনের একটা দরজা দিয়ে ভারি পর্দা উঠিয়ে ঘরে ঢুকল সাড়ে ছ'ফুট লম্বা এবং সেই পরিমাণে চওড়া একজন লোক। কাঁধের উপর প্রকাণ্ড একটা মাথা, মাথা ভর্তি কোঁকড়া ব্যাকব্রাশ করা চুল। অত্যন্ত সুপুরুষ চেহারা। পরনে কড়া ইস্তিরির রুচিসম্পন্ন টেট্রন স্যুট। লোকটা ঘরে ঢুকল ডান পা-টা একটু টেনে টেনে।

সুলতা উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, লোকটা ওকে বসতে বলে অপর দু'জনকেও বসবার ইঙ্গিত করল। তারপর নিজে সুলতার পাশে বসে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস

করল। সামনের একজনকে কিছু একটা আদেশ করতেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এবার বিদায় গ্রহণের পালা। সাড়ে দশটা বাজে। সুলতা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। মিষ্টি হেসে বিদায় দিতে এগিয়ে গেল নতুন আগন্তুক।

সুলতা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই পা টিপে আবার দোতলায় উঠে এল রানা। গাড়ি বারান্দার ঠিক মাথার উপরের ব্যালকনিতে একটা মোটা থামের আড়াল থেকে শুনল গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে উঁচু গলায় সুলতা বলছে, 'গেটটা কাউকে একটু খুলে দিতে বলুন, মি. চৌধুরী।'

'আপনি রওনা হন। এখান থেকে বোতাম টিপলে আপনি খুলে যাবে গেট,' ভারি গলায় উত্তর এল।

রানা ভাবল সুইচটা কোথায় আছে দেখতে পেলে হত। কিন্তু তখন আর নিচে নামার সময় নেই।

সামনেটা আলোকিত করে গেটের কাছে চলে গেল ফোক্সওয়াগেন। গেটটা খুলে ভিতর দিকে ভাঁজ হয়ে গেল। হেডলাইটের আলোয় রানা পড়ল গেটের উপর প্লাস্টিকের নেম প্লেটে লেখা:

কবির চৌধুরী
২৫৭ বায়েজিদ বোস্তামী রোড
চিটাগাং

গাড়িটা বেরিয়ে যেতেই লোহার গেট বন্ধ হয়ে গেল। ক্লিক করে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ করে তালা লেগে গেল গেটে। রানা ভাবল, আপাতত কাজ শেষ। কালকে শুরু হবে আসল কাজ। এখন আবার পাইপ বেয়ে নামা, ড্রেন গলে বেরিয়ে হোটেলে ফেরা। ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল সে।

'হ্যাণ্ডস্ আপ্!'

চমকে উঠল রানা। উদ্যত রিভলভারের নলটার দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে। তিন গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে মি. চৌধুরীর আদেশে যে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সেই লোকটা। রানা এক পা এগোতেই উজ্জ্বল বাতি জ্বলে উঠল ব্যালকনিতে। গর্জন করে উঠল লোকটা, 'খবরদার! আর এক পা এগিয়েছ কি গুলি করব। কোন চালাকি চাই না—মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াও।'

ধীরে দু'হাত মাথার উপর তুলে ধরল রানা। ঠিক সেই সময় আরও দু'জন লোক উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। একজনের উদ্দেশে লোকটা বলল, 'হাবীব, দেখো তো এর সাথে কোন অস্ত্রশস্ত্র আছে কিনা।'

হাবীব ও তার সাথের লোকটা এগিয়ে এল রানার দিকে। রানা বুঝল, এই সুযোগ। রিভলভার থেকে যেই হাবীব ওর দেহটা আড়াল করেছে অমনি এক ঝটকায় পিস্তল বের করে ফেলল সে। কিন্তু ভীষণ বলশালী একটা হাত চেপে ধরল ওর কব্জি। হাবীবের পাশের লোকটা। কব্জিটা ধরে বিশেষ কায়দায় একটা মোচড় দিতেই ঠিক শিশুর হাতের খেলনার মত রানার অটোমেটিক ওয়ালথারটা খসে পড়ে গেল মাটিতে। হাবীব ওটা তুলতে গেছে, হাঁটু দিয়ে ওর চিবুকে কায়দা মত একটা লাথি মারতে গিয়ে থেমে গেল রানা। ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর পিঠের উপর একটা তীক্ষ্ণ

ছুরির ফলা অল্প একটু বিঁধল। ততক্ষণে রিভলভারের সামনের আড়াল সরে গেছে। হাবীবের সাথের পাতলা-সাতলা লম্বা অথচ অসুরের মত বলশালী লোকটা রানার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল, 'দুষ্টুমি করে না, খোকা। মারব।'

এই বিপদের মধ্যেও লোকটার রসিকতায় মৃদু হাসল রানা। ওর হাত দুটোকে পিছমোড়া করে সাঁড়াশীর মত চেপে ধরল লম্বা লোকটা। চেষ্টা করেও এক বিন্দু আলগা করতে পারল না রানা সে মুঠো। ঠেলতে ঠেলতে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিচতলার একটা দেয়ালের সামনে নিয়ে আসা হলো রানাকে। বোতাম টিপতেই দেয়ালটা দু'ভাগ হয়ে গিয়ে একটা দরজা বেরিয়ে পড়ল। মাঝারি আকারের একটা ঘরের ভিতর চলে এল রানা। হাবীব রয়ে গেল বাইরে। লম্বা লোকটার পিছন পিছন ঘরে ঢুকল রিভলভারধারী। পিছনের দেয়ালটা আবার জোড়া লেগে গেল।

'লাইব্রেরিতে নিয়ে এসো।' ভারি গলার আওয়াজ পাওয়া গেল ঘরের মধ্যে, কিন্তু কোন লোকের দেখা নেই। এদিক ওদিক চেয়ে রানা দেখল দেয়ালের গায়ে স্পীকার বসানো আছে একটা।

ততক্ষণে তাকে আরেকটা দেয়ালের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একই উপায়ে দরজা তৈরি হলো সে দেয়ালে। রানার মাথায় তখন অতি দ্রুত কয়েকটা চিন্তা ঘুরছে। এখান থেকে বেরোবার কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা করছে সে।

দামী সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপরটা পুরু সবুজ ভেলভেটে ঢাকা—তারই ওপাশে রিভলভিং চেয়ারে বসে শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কবীর চৌধুরী। সামনের টেবিলের উপর একটা মোটা ইংরেজি বই পড়তে পড়তে উল্টে রাখা। চট করে নামটা দেখে নিল রানা। এইচ. এ. লরেঞ্জ-এর লেখা 'প্যাটার্ন অভ ইলেকট্রন্স'।

'আসুন, আসুন! বসুন।' নরম স্বাভাবিক গলায় আপ্যায়ন করল কবীর চৌধুরী। যেন কিছুই ঘটেনি, এমনি ভাব।

পুরু কার্পেটের উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসানো হলো রানাকে ডেস্কের দিকে মুখ করে। হাতটা ছেড়ে দিল লম্বা লোকটা। রানাও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। হাতের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এতক্ষণ। হাত দুটো ঝুলিয়ে রাখল রানা চেয়ারের হাতলের দুই পাশে। চিনচিনে মৃদু ব্যথার সঙ্গে আবার রক্ত চলতে শুরু করল।

কোন কথা না বলে কবীর চৌধুরী আপাদমস্তক লক্ষ করছিল রানাকে। দৃষ্টিটা স্থির এবং একাগ্র। মনে হলো যেন অন্তস্তল ভেদ করে বেরিয়ে গেল সে দৃষ্টি। যেন কিছুই এর নজর থেকে গোপন রাখার উপায় নেই। ঝিরঝির করে এয়ার কণ্ডিশনারের মৃদু গুঞ্জন আসছে ঘরের এক কোণ থেকে। এই প্রথম রানা অনুভব করল অত্যাশ্চর্য এক ব্যক্তিত্ব। চোখে মুখে চেহারায় সবদিক থেকে যেন প্রতিভা এবং শক্তির বিচ্ছুরণ হচ্ছে। অদ্ভুত প্রাণবন্ত একটা মানুষ। মস্তবড় মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল তেলের অভাবে কিছুটা রুক্ষ। বয়স পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হবে।

রানা লক্ষ করল কবীর চৌধুরীর গায়ের রঙটা তিনদিনের পানিতে ডোবা প্রায় পচে ওঠা মড়ার মত। যেন বহুদিন ছিল মাটির তলায়, বাইরের আলো-বাতাসের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত।

ট্রেনের কোটটা খুলে একটা হ্যাঙ্গারে ঝোলানো। সাদা স্টিফ কলার শার্টের

নিচে গেঞ্জির অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে কয়েকটা বাঁকা রেখায়। অনামিকায় মস্ত বড় একটা হীরের আংটি উজ্জ্বল আলোয় ঝিকমিক করছে। জুলফির কাছে কয়েকটা পাকা চুল আভিজাত্য এনেছে চেহারায়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ মনোযোগ দিয়ে রানাকে লক্ষ করল মি. চৌধুরী। রানাও পাল্টা লক্ষ করল তাকে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, তারপর ঘরের চারধারে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। সৌখিন কোটিপতির লাইব্রেরির মত সাজানো গোছানো ঠাণ্ডা ও নীরব এই ঘরটা। বোধহয় সাউণ্ড-প্রুফ করা। থরে থরে সরু-মোটা অনেক বই সাজানো বারো চোদ্দটা বড় বড় আলমারিতে। কবির চৌধুরীর ঠিক মাথার উপর পিছনের দেয়ালে টাঙানো স্বামী বিবেকানন্দের মস্ত এক অয়েল পেন্টিং।

রানা ভাবছিল, এই লোকটাই কি সেই বিখ্যাত চৌধুরী জুয়েলার্সের মালিক? তবে এর বাড়িতে অত বড় গুদাম ঘর কিসের? বাড়িটা এমনভাবে সুরক্ষিত করবার কি দরকার? ভারতীয় গুপ্তচর বিভাগের সাথে এর কি সম্পর্ক? তার উপর স্বামী বিবেকানন্দের ছবি, অ্যাডভান্সড ফিজিক্সের বই। ঠিক সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কথা বলল কবীর চৌধুরী, 'কোন বদ উদ্দেশ্য থাকলে সাবধান হতে অনুরোধ করছি। প্রতিটি মুহূর্ত আমি প্রস্তুত আছি আপনার জন্যে। ফলটা শুভ হবে না।'

বৃথা হুমকি দেবার লোক কবীর চৌধুরী নয়। বাড়িটায় ঢুকে এতক্ষণে যা দেখেছে, তাতে অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে গেছে রানার কাছে—এ লোকের প্রতিটা খুঁটিনাটি ব্যবস্থায় অসামান্য বুদ্ধির পরিচয় আছে, এবং সেই সাথে আছে প্রচণ্ড ক্ষমতার ইঙ্গিত।

কবির চৌধুরীর চোখের দিকে চাইল রানা।

'আপনার নাম?' রানার চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী। যেন এক বিন্দু মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে।

'সুবীর সেন।'

পলকের জন্যে ভুরু জোড়া একটু কোঁচকাল কবীর চৌধুরী। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের সুবীর সেন?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'সুলতা রায়কে আপনিই গাড়িতে তুলে নিয়ে এসেছেন বসন্তপুর থেকে?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'তা, কি কারণে এই গরীবালয়ে পদার্পণ?'

'হেড অফিসের হুকুম।'

'বিশ্বাস করলাম না আপনার কথা।'

'বিশ্বাস করাবার মত যুক্তি আমার পকেটে আছে, মি. চৌধুরী।'

পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করল রানা। টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল সেটা। কবীর চৌধুরী একবার চোখ বুলাল সাঙ্কেতিক চিঠিটার উপর। এবার আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তার চোখ দুটো।

'এ চিঠির যদি কোন অর্থ থাকে, তবে তা বের করতে আমার পনেরো মিনিট সময় লাগবে। যাক, আপাতত ধরে নিলাম আপনি সুবীর সেন। কিন্তু আমার

বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করেছেন কেন?' চিঠিটা ভাঁজ করে টেবিলের উপর পেপার-ওয়েট দিয়ে চাপা দিয়ে রাখল কবির চৌধুরী।

'সুলতা রায়কে অনুসরণ করবার আদেশ আছে আমার উপর। ডিনামাইটগুলো ঠিক হাতে পৌঁছল কিনা এবং ঠিকমত ব্যবহার করা হলো কিনা তার দিকে নজর রাখার ভার দেয়া হয়েছে আমাকে। তাই গাড়ির মধ্যে লুকিয়ে সুলতার সাথেই ঢুকেছি এ বাড়িতে।'

'সুলতার গাড়িতে আপনি আসেননি—এসেছেন ওপেল রেকর্ডে করে।' কবীর চৌধুরীর হাসি-হাসি মুখটা গম্ভীর থমথমে হয়ে গেল। মনে হলো রানার মুখের উপর কেউ যেন দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। তীব্র দৃষ্টিতে রানার চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'মিছে কথা আমি বরদাস্ত করি না, সুবীর বাবু। আপনি ভুল করছেন। মিথ্যে বলে আজ পর্যন্ত আমার হাত থেকে কেউ নিস্তার পায়নি। আপনিও পাবেন না।'

টেবিলের উপর থেকে একটা পাইপ তুলে নিয়ে তার মধ্যে টোবাকো ভরে নিল কবীর চৌধুরী চামড়ার পাউচ থেকে। একটা লাইটার দিয়ে সেটা ধরিয়ে আঙুল দিয়ে টিপে আগুনটাকে সবটা জায়গায় সমানভাবে ছড়িয়ে দিল। তারপর একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটা তো বটেই, আপনার ডান হাতটাও প্রমাণ করছে যে আপনি সুলতার সঙ্গে আসেননি, দেয়াল টপকাতে গিয়ে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়েছেন ইলেকট্রিসিটির। আমি তখন এখানে ছিলাম না। হঠাৎ বাতির আলো কমে যাওয়ায় এ বাড়ির কারও কাছেই আপনার আগমন গোপন ছিল না। তবে এরা ভাবতেও পারেনি যে ভাগ্যক্রমে নর্দমাটা পেয়ে যাবেন আপনি। এতক্ষণে সে পথটা বন্ধ করা হয়ে গেছে। এ বাড়িতে আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ আমরা লক্ষ করেছি। কাজেই মিথ্যে কথা না বাড়িয়ে বলে ফেলুন আপনি কে, এবং কেন এ বাড়িতে প্রবেশ করেছেন।'

'আপনিও মিথ্যে বকর বকর না করে চিঠিটা পড়ে দেখুন, মি. চৌধুরী। তারপর আমাকে যেতে দিন।'

'চিঠিটা পড়ে দেখলেও আপনাকে যেতে দেয়া হবে না। এ বাড়িতে ঢোকা যদিও একেবারে অসম্ভব নয়—কারণ দেখতেই পাচ্ছি আপনি ঢুকেছেন—কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া সত্যিই অসম্ভব।'

'তার মানে?'

'মানে হচ্ছে, আজ আর হোটেলে ফেরা আপনার কপালে নেই, সুবীর বাবু। কেবল একটা চিঠিতে কিছুই প্রমাণ হয় না। তাছাড়া আপনার কথায় অনেক গোলমাল আছে। শুনুন। আপনি বলছেন, হেড অফিসের হুকুমে আপনি এ বাড়িতে প্রবেশ করেছেন। অথচ আপনার হেড অফিস আমার বাড়ির দেয়ালের ওপর ইলেকট্রিক তারের অস্তিত্ব সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল থাকা সত্ত্বেও আপনাকে সাবধান করে দেয়নি—এ কেমন কথা? তার ওপর আপনার জুতো জোড়া।' ঘরের এক কোণের দিকে চাইল চৌধুরী। রানাও দেখল একটা টী-পয়ের উপর সাজানো রয়েছে ওর জুতো জোড়া। 'ওগুলো ঢাকার বিউটি ফুট ওয়্যারের তৈরি। ওগুলোর গোড়ালিতে যে চোরা কুঠুরি আছে তার মধ্যের ছুরি বিশেষ কায়দায় তৈরি হয়েছে

শিয়ালকোট থেকে। ভারতীয় গুপ্তচরের এসব গুপ্ত জিনিস কি আজকাল পাকিস্তান সাপ্লাই দিচ্ছে?'

'দেখুন, আপনি মিথ্যে আমাকে সন্দেহ করছেন। আমি...'

বাধা দিয়ে গর্জে উঠল কবীর চৌধুরী, 'মিথ্যে আমি কাউকে সন্দেহ করি না, সুবীর বাবু। রাস্তার উপর যে ওপেল রেকর্ড রেখে এসেছেন সেটা পি.সি.আই-এর চিটাগাং-এজেন্ট আবদুল হাইয়ের। আপনি বলতে চান পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিসকে পূর্ব পাকিস্তানের এক মহা ধ্বংস-লীলায় সাহায্য করছে? সেটা সম্ভবপর হলে আমি এদের কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতাম, ভারত সরকারের কাছে হাত পাততে হোত না। বুঝতে পারছেন আমার কথাটা? এখন বলুন, আপনার পরিচয়?'

চুপ করে থাকল রানা। এর চোখে ধুলো দেয়া সহজ কথা নয়।

'চুপ করে থেকে কোন লাভ নেই, সুবীর বাবু। কথা আপনাকে বলতেই হবে—এবং সত্যি কথা। এর উপর নির্ভর করছে আপনার থাকা বা না থাকা। দেখুন, আমি বৈজ্ঞানিক মানুষ, এখন এক ভয়ঙ্কর খেলায় নেমেছি। যে-কোন রকম বাধা অতিক্রম করবার ক্ষমতা আমার আছে। আপনি যদি সত্যি কথা বলেন তবে আপনার অবশ্যম্ভাবি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার একবিন্দু ভরসা থাকতেও পারে। মিছেমিছি প্রাণী হত্যা আমি পছন্দ করি না। আমার পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে আপনি কতটুকু ক্ষতিকর ভূমিকা নিতে পারেন জানতে পারলে আপনার সম্বন্ধে সেই পরিমাণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমার পক্ষে সুবিধে হত। হয়তো এমনও হতে পারে, মাত্র কয়েকটা হাড়গোড় ভেঙে আপনাকে বর্মা মুল্লুকে সরকারী পুলিসের হাতে ছেড়ে দিয়ে আসা হবে। সেখান থেকে নাকানি চুবানি খেয়ে দেশে ফিরতে ফিরতে কয়েক মাস লেগে যাবে—কয়েক বছরও লাগতে পারে—কিন্তু বেঁচে তো গেলেন! কিন্তু কথা না বললে সবচাইতে সহজ পথটাই বেছে নিতে হবে আমাদের।'

পাইপটা নিভে গিয়েছিল। আবার ধরিয়ে নিল কবীর চৌধুরী। কিছুক্ষণ মগ্ন-চিত্তে পাইপ টানার পর আবার বলল, 'আর আপনার ভাগ্যক্রমে যদি কাল সকালে সুলতা দেবী এসে আপনাকে সুবীর সেন বলে সনাক্ত করেন তবে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে আপনাকে আমরা সসম্মানে মুক্তি দেব।'

'এখুনি মিসখায় টেলিফোন করে সুলতাকে ডেকে পাঠান না।' এতক্ষণে একটু আশার আলো দেখতে পেল রানা।

'এত রাতে বিরক্ত করা কি ঠিক হবে? আচ্ছা, বেশ। আপনি যখন এত উতলা হয়ে পড়েছেন হোটেলে ফিরবার জন্যে, তখন দেখছি ফোন করে।'

রিসিভার তুলে ডায়াল করল কবীর চৌধুরী। রানা পিছনে চেয়ে দেখল ওর ওয়ালথার পি. পি. কে. আলগাভাবে হাতের মুঠোয় ধরে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে অস্থিসর্বস্ব লম্বা লোকটা। রিভলভারধারী কখন কবীর চৌধুরীর গোপন ইঙ্গিতে নিঃশব্দে সরে গেছে পিছন থেকে।

'হোটেল মিসখা?...সুলতা দেবীকে ডেকে দিন তো দশ নম্বর রুম থেকে।...না তো, একটু আগে আমি রিঙ করিনি।...নেই? (কপালটা একটু কোঁচকাল কবীর চৌধুরী)...বাবুর সাথে বেরিয়ে গেছে? কখন?...আচ্ছা ঠিক আছে।'

রানা ভাবছে, এতক্ষণে তো হোটেলে পৌঁছে যাবার কথা। এ নিশ্চয়ই হাসান আলীর কাজ।...হোটেলে তাহলে একটু আগে কেউ ফোন করেছিল? নিশ্চয়ই ঢাকা থেকে টেলিফোন! তবে কি তার পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেছে? সুলতাকে যখন চেয়েছিল ফোনে তখন নিশ্চয়ই তাকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে ঢাকা থেকে কেউ করেছিল এই ফোন।...এখানেও তো ওরা ফোন করে জানাবে তাহলে! কোন ভাবে খবরটা আটকানো যায় না? ফোনের তারটা ছিঁড়ে ফেললে কেমন হয়? ফোনটা হাতে পাওয়ার জন্যে বলল রানা, 'সুলতা হোটেলেই আছে। আমিই ওকে নিষেধ করেছি বাইরের কারও ফোন ধরতে। আমাকে দিন, আমি ওকে ডেকে দিচ্ছি।'

টেলিফোনটা কবীর চৌধুরী এগিয়ে দিতে যাবে এমন সময় রানাকে চমকে দিয়ে বেজে উঠল টেলিফোন। ক্রিং ক্রিং...ক্রিং ক্রিং।

'কবীর চৌধুরী বলছি।...আচ্ছা, বলুন!...কে সুলতা? এই কিছুক্ষণ আগে হোটেলে ফিরে গেল।...কি বললেন? সুবীর সেন ঢাকার আর্মি হাসপাতালে? তবে সুলতাকে বসন্তপুর থেকে আনল কে?...মাসুদ রানা? (চট্ করে একবার রানার ফ্যাকাসে মুখের দিকে চেয়ে নিল কবীর চৌধুরী, তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ মন দিয়ে শুনল ফোনের কথাগুলো।)...বুঝলাম, কিন্তু পি.সি.আই. কেবল চিঠিটা দেখে আর কি বুঝবে? এখানে কি হচ্ছে বা হতে চলেছে তার কিছুটা জানতে পেরেছে কেবল মাসুদ রানা। আপনাদের অত চিন্তার কারণ নেই। মাসুদ রানা এখন আমার হাতে বন্দী। কাল ভোরে এ পৃথিবীর জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে ওকে চিরতরে মুক্তি দেব...হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার এলাকায় আমি যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম।... নিশ্চিন্ত থাকুন, সুলতা নিরাপদে কলকাতা পৌঁছবে, আজ রাতেই সরিয়ে ফেলব ওকে মিসখা থেকে...ঠিক আছে, সমস্ত দায়িত্ব আমি নিলাম।'

ফোনটা নামিয়ে রেখে রানার দিকে চেয়ে একটু হাসল মি. চৌধুরী।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বড় খুশি হলাম, মি. মাসুদ রানা। দেয়ালের ওপর অমন ভয়ঙ্কর শক্ খেলেন, তবু আমাদের লোক আপনাকে খুঁজে পাওয়ার আগেই ঢুকে পড়লেন বাড়ির ভেতর। ভাবছিলাম কার এত দুঃসাহস? এখন পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, (একটুও দুঃখিত মনে হলো না তাকে) মৃত্যুর চাইতে হালকা আর কোন দণ্ড আপনাকে দিতে পারছি না, মি. মাসুদ রানা। তবে আমি চেষ্টা করব আপনার জন্যে যতদূর সম্ভব বেদনাহীন মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে।'

'আমার মৃত্যু হলেই মনে করেছ তুমি পার পেয়ে যাবে?'

রানার কথার কোন জবাব না দিয়ে লম্বা লোকটাকে কবীর চৌধুরী বলল, 'একে ঠাণ্ডা ঘরের পাশের কুঠুরিতে আটকে রাখো, ইয়াকুব। ভোর চারটেয় আমি ল্যাবরেটরিতে ফিরে যাব, তখন ওকে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় গাড়ির পেছনে দিয়ে দেবে। এখন যাও। সাবধান থাকবে। যদি বেশি অসুবিধার সৃষ্টি করে তবে শেষ করে দেবে।'

একটা অশ্লীল গালি বেরিয়ে এল রানার মুখ দিয়ে।

বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী। সপাং করে একটা চাবুকের বাড়ি পড়ল রানার কাঁধের উপর। চমকে উঠল রানা। ততক্ষণে আবার নেমে আসছে চাবুক। ডান হাতে ধরে ফেলল রানা চাবুকটা, কিন্তু এক হেঁচকা টানে কবীর চৌধুরী

ছিনিয়ে নিল সেটা। স্টিংরে বা স্থানীয় ভাষায় শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক। হাতের তালুর পোড়া জায়গাটার উপর দিয়ে জোরে ঘষতে ঘষতে বেরিয়ে গেল সেটা মুঠো থেকে। অবর্ণনীয় ব্যথায় নীল হয়ে গেল রানার মুখ। একটা চাপা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে পড়ল মুখ দিয়ে। হাতের রুমালটা লাল হয়ে গেল রক্তে।

'বেয়াদবীর শাস্তি!' বলে কবীর চৌধুরী মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল ইয়াকুবকে।

দাঁড়িয়ে পড়েছিল রানা। ইস্পাত কঠিন দুটো হাত এসে ওর ডান হাতটা ধরে মুচড়ে পিঠের দিকে নিয়ে গিয়ে উপরে ঠেলতে লাগল। রানার মনে হলো হাতটা ভেঙে যাবে। ব্যথায় গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত গোঙানী মত শব্দ বেরোল ওর। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল কপালে।

'এগোও,' একটা ঠেলা দিল ইয়াকুব পিছন থেকে।

রানার পা এলোপাতাড়ি পড়তে লাগল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে ওরা একটা লম্বা বারান্দায় পড়ল। দু'পাশে দেয়াল।

'হাতটা ভেঙে যাবে! উহ্! আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি!' কাতর স্বরে বলল রানা। হাতটা একটু আলগা হোক, তাই চাচ্ছে ও।

'চোপ, শালা!' ধমকে উঠল ইয়াকুব, কিন্তু কব্জিটা ইঞ্চি তিনেক নামিয়ে দিল পিঠের উপর। রানা ভাবছে, তলপেট, কণ্ঠনালী বা অণ্ডকোষ—এই তিন জায়গা হচ্ছে দুর্বলের লক্ষ্যস্থল।

ইচ্ছে করেই একবার হোঁচট খেলো রানা। ইয়াকুবের গায়ের সাথে ধাক্কা লাগল ওর। আন্দাজ পাওয়া গেল দু'জনের মধ্যের দূরত্বটা ঠিক কতখানি।

এবার হঠাৎ রানা ডানধারে একটু সরে গেল এবং বাঁ হাতটা সটান সোজা রেখে খুব জোরে পিছন দিকে চালাল। ধাঁই করে হাতটা লক্ষ্যবস্তুর উপর পড়তেই তীক্ষ্ণ একটা শব্দ বেরোল ইয়াকুবের মুখ থেকে। ডান হাতটা ঢিল পেয়ে পিঠের উপর থেকে নামিয়ে আনল রানা। ইয়াকুব ততক্ষণে যন্ত্রণায় বাঁকা হয়ে গেছে। দুই হাত দিয়ে সে দুই উরুর মাঝখানটা চেপে ধরেছে। দু'পা পিছিয়ে এসে প্রচণ্ড জোরে এক লাথি মারল রানা ওর পাঁজরের উপর। ছিটকে গিয়ে পাশের দেয়ালে পড়ল লোকটা—ভয়ানক জোরে মাথাটা ঠুকে গেল দেয়ালের সাথে। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল ইয়াকুব, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত মাসুদ রানার প্রচণ্ড লেফ্‌ট্ কাট্ এসে পড়ল ওর নাকের উপর।

ইয়াকুবের লম্বা দেহটা দড়াম করে মাটিতে পড়তেই রানা চোখ-মুখের ঘাম মুছে নিল হাতের পিছন দিক দিয়ে, তারপর ইয়াকুবের পকেট থেকে ওয়ালথারটা বের করে নিল। যেদিকে ওকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেদিকেই এগোল রানা। কয়েক পা যেতেই পিছন থেকে দোতলার উপর যে লোকটা রানাকে প্রথম ধরেছিল, তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সেই আগের মতই বলে উঠল লোকটা, 'হ্যাণ্ডস আপ!'

পিস্তল ধরাই ছিল হাতে, এক নিমেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি করল রানা। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল লোকটা, মুখটা খোলাই থাকল, আওয়াজ বেরোল না। দু'হাতে নিজের বুকটা চেপে ধরল সে। তারপর ঢলে পড়ে গেল মাটিতে। হাতের রিভলভার থেকে একটা গুলি ছুটে বেরিয়ে ছাতে লাগল—কিছুটা চুন-সুরকি খসে পড়ল ওর মৃতদেহের উপর পুষ্পবৃষ্টির মত।

এবার সামনের দিকে ছুটল রানা। যেভাবে হোক বেরোতে হবে এখান থেকে। পিস্তল আর রিভলভারের আওয়াজ এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়ির অন্য সবাই টের পেয়ে গেছে।

বারান্দাটা কিছুদূর সোজা গিয়ে আবার বাম দিকে মোড় ঘুরেছে। আরও খানিকটা গিয়ে দেখা গেল সামনে দেয়াল, আর পথ নেই। কায়দা জানাই ছিল, যে ক'টা বোতাম পেল হাতের কাছে সব এক এক করে টিপতে আরম্ভ করল। হঠাৎ দেয়ালটা ফাঁক হয়ে গেল 'ওপেন সিসেম'-এর মত। একটা বড় হলঘর। ঘরে ঢুকেই রানা বুঝতে পারল এই ঘরেই সুলতা বসে ছিল কিছুক্ষণ আগে। টেবিলের উপর থেকে ডিনামাইটগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। হঠাৎ ঘরের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল, 'মাসুদ রানা, যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ো। এক পা নড়াচড়া করলে মারা পড়বে।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝল, ওটা লাউড স্পীকারের ধোঁকাবাজি। এক সেকেণ্ডে বাড়িটার নক্সা চিন্তা করে নিল রানা। ডান দিকে যেতে হবে ওর এখন। ঘরের ডানধারে দেয়ালের গায়ে একটা পর্দা সরিয়ে দেখা গেল ওটা বাথরুম। আরেকটা দরজা দিয়ে পাশের ঘরে চলে এল রানা। যেন গোলক-ধাঁধা। এর থেকে বেরোবার পথ কোন্ দিকে? আবার খুঁজতে খুঁজতে মস্ত আলমারির পিছনে একটা বোতাম পাওয়া গেল। সামনের দেয়ালটা ফাঁক হতেই অবাক হয়ে দেখল রানা ফাঁকা মাঠ দেখা যাচ্ছে সামনে। একটা সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নামলেই বাড়িটার পিছন দিকের প্রাঙ্গণ।

লাফিয়ে নেমে গেল রানা মাঠের মধ্যে। তারপর এক ছুটে চাকরদের ব্যারাকের বারান্দায় গিয়ে উঠল।

ঠিক সেই সময়ে রানার সমস্ত আশা ভরসা এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিয়ে দপ করে জ্বলে উঠল গোটা চারেক ফ্লাড লাইট। সারা মাঠ এখন দিনের মত পরিষ্কার। দ্রুত তিনটে গুলি করে রানা তিনটে ফ্লাড-লাইট নিভিয়ে দিল, কিন্তু পঞ্চাশ গজ দূরে গুদাম ঘরের মাথায় যেটা জ্বলছে সেটাতে গুলি লাগল না।

এমন সময় ভয়ঙ্কর আওয়াজ তুলে এক সাথে গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল। রানার আশপাশে গুলিগুলো এসে বিঁধল, কোনটা দরজায়, কোনটা দেয়ালে। এক লাফে সরে গিয়ে দেয়ালের আড়াল থেকে দেখল রানা ছয়-সাত জন লোক রাইফেল নিয়ে এগোচ্ছে ওর দিকে। একজনের হাতে আবার একটা থমসন মেশিনগান। এই প্রথম রানার আফসোস হলো এক্সট্রা ম্যাগাজিন সাথে না রাখার জন্যে। তার পিস্তলে আর মাত্র তিনটে গুলি অবশিষ্ট আছে। এতগুলো লোককে সে ঠেকাবে কি করে? শিরশির করে মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ভয়ের শিহরণ উপরে উঠে এসে ওর মাথার পিছনের চুলগুলোকে খাড়া করে দিল।

কাছেই একটা লাউড স্পীকারে কে যেন বলল, 'হাত তুলে দাঁড়াও, মাসুদ রানা, নইলে কুকুরের মত গুলি খেয়ে মরবে।'

এবার পাগলের মত ছুটল রানা গুদাম ঘরের দিকে। আরও এক ঝাঁক গুলি বেরিয়ে গেল কানের পাশ দিয়ে। একটা পীচের ড্রামের আড়ালে বসে দুটো গুলি করল রানা। একজন রাইফেলধারী চিৎকার করে চিৎ হয়ে পড়ল। বাকি সবাই শুয়ে

পড়ল মাটিতে। আবার দৌড়াল রানা। মাত্র একটা গুলি অবশিষ্ট আছে চেম্বারে। শোল্ডার হোলস্টারের মধ্যে রেখে দিল রানা পিস্তলটা। তারপর এক লাফে উঠে বসল মার্সিডিজ লরির ড্রাইভিং সীটে।

লরিটায় স্টার্ট দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামনের উইণ্ড-শীল্ডে কয়েকটা ফুটো হয়ে গেল। ভাঙা কাঁচের টুকরো ছিটকে এসে বিঁধল রানার চোখে মুখে।

মাথা নিচু করে লোকগুলোর দিকে জোরে লরি চালিয়ে দিল রানা। গোলা-গুলি বন্ধ করে যে যেদিকে পারল ছিটকে পড়ে জান বাঁচাল ওরা। এবার সোজা গেটের দিকে চলল লরি। আবার আরম্ভ হলো পিছন থেকে গুলিবর্ষণ। গেটের কাছাকাছি আসতেই পিছন দিকে একটা গ্রেনেড ফাটল বলে মনে হলো রানার। কিন্তু এখন আর ফিরে চাইবার অবসর নেই। সাত টনী মস্ত লরি হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল গেটের উপর। স্টীলের গেট দেয়াল থেকে খসে শুয়ে পড়ল মাটিতে। মৃদু হেসে রানা বড় রাস্তায় চলে এল লরি নিয়ে।

লরিটা সেখানেই রেখে রাস্তায় নেমে বাড়িটার দিকে চাইল একবার রানা। দোতলার বারান্দায় উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল কবীর চৌধুরীর প্রকাণ্ড দেহটা।

স্থির অচঞ্চল দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে রানার দিকে।

হাত নেড়ে টাটা করল রানা।

# পাঁচ

খুব দ্রুত হোটেলে ফিরবার প্রয়োজন অনুভব করল রানা। নির্জন রাস্তায় স্পীড-মিটারের কাঁটা মাঝে মাঝে '৮০'-কে স্পর্শ করল। সেই সাথে রানার অতি দ্রুত চিন্তা স্পর্শ করল কয়েকটা বাস্তব সত্যকে।

এত কাণ্ডের পরও কবীর চৌধুরী ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থাকল। তার বিরুদ্ধে একটা প্রমাণও সংগ্রহ করা যায়নি। পুলিস ওর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। ডিনামাইটগুলো নিয়ে কি করা হবে জানতে পারেনি রানা। যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে ওদের কার্যকলাপ, অথচ রানা নিজেকে দিনের আলোর মত পরিষ্কার করে দিয়ে এসেছে শত্রুপক্ষের কাছে। এখন যে-কোন দিক থেকে যে-কোন্ মুহূর্তে আক্রমণ চালাবে কবীর চৌধুরী। লক্ষ্যবস্তু তার জানাই আছে। মৃত্যু পরোয়ানা ঝুলছে এখন রানার মাথার উপর। ওকে শেষ করে দিতে পারলেই কবীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে সব তথ্য চাপা পড়ে যাবে। চেষ্টার কোন ত্রুটি করবে না এই অসামান্য প্রতিভাবান দুর্ধর্ষ বৈজ্ঞানিক।

এখন একমাত্র ভরসা সুলতা রায়। ওকে যদি এতক্ষণে সরিয়ে ফেলা হয়ে থাকে তবেই সর্বনাশ। কোন কিছুকে ভিত্তি করে এগিয়ে যাবার পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। আজ রাতেই সুলতাকে সরিয়ে ফেলবে বলছিল কবীর চৌধুরী। যেমন করেই হোক ঠেকাতে হবে তাকে।

সুবীর বাবু বাইরে গেছে শুনে একটু অবাক হলো সুলতা রায়। ভাবল কাছেই

কোথাও গেছে বুঝি। ঘরে ঢুকে দেখল টেবিলের উপর দু'জনের খাবার সাজানো আছে। পাশে একটা চিঠি। ভাঁজটা খুলে দেখল তাতে লেখা:

লতা

আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। সাড়ে
দশটার মধ্যে না ফিরলে খেয়ে
নিয়ে শুয়ে পোড়ো।

সুবীর

খিদেও লেগেছে, আর সাড়ে-দশটাও গিয়েছে বেজে। খেয়ে নিল সুলতা। বাথরুমে গিয়ে ঠোঁট-মুখের প্রলেপ আর কপালের টিপ উঠিয়ে ফেলল সে। বিড়ে খোঁপা খুলে চুলগুলো আলতো করে পেঁচিয়ে নিল হাত-খোঁপায়।

শাড়ি পরে ঘুমাতে পারে না সুলতা, কিন্তু ওটা খুলে রাখতে লজ্জা লাগল ওর। কখন যে তার স্বামীদেবতা এসে উপস্থিত হবে ঠিক নেই। বিছানায় উঠে বেড সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল ঘরের। চোখটা বন্ধ করতেই সুবীর সেনের (রানার) মুখটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল মনের পর্দায়। চেষ্টা করেও সে ছবি মুছে ফেলতে পারল না সুলতা। মৃদু হেসে মনে মনে কয়েকবার বলল, 'তোমায় ভালবাসি, সুবীর। তোমায় আমি ভালবেসে ফেলেছি।' তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল সে।

অন্ধকার ঘরে গায়ে হাত পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল সুলতার। তন্দ্রাচ্ছন্ন আড়ষ্ট কণ্ঠে 'কখন এলে' বলে পাশ ফিরে শুলো সে। মনে হলো সুন্দর একটা ফুলের বাগানে কচি কচি ঘাসের উপর বসে আছে ও আর সুবীর সেন। আলতো করে সুবীর ধরে আছে ওর হাত। রঙ ধরেছে পশ্চিমের মেঘে।

হঠাৎ মনে হলো, দরজা খুলল কি করে সুবীর? সে তো নিজ হাতে দরজায় খিল দিয়ে তারপর ঘুমিয়েছিল! ঘরের মধ্যে একটু দূরে 'খুক' করে কে যেন একটা কাশি দিল। এবার চোখ থেকে তন্দ্রার রেশটুকু কেটে গেল সুলতার। বেড সুইচের দিকে হাত বাড়াতেই একটা টর্চের তীব্র আলো এসে পড়ল ওর মুখের উপর। কানের কাছে মোটা কর্কশ গলায় কেউ বলল, 'টুঁ শব্দ করেছ কি খুন হয়ে যাবে। চুপ করে থাকো।'

কণ্ঠতালু শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল সুলতার, ঢোক গিলবার চেষ্টা করল সে। এবার তৃতীয় ব্যক্তি ঘরের বাতিটা জ্বেলে দিল। প্রথম জন একটা রুমাল ভরে দেবার চেষ্টা করল সুলতার মুখের মধ্যে। ভয়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতেই বিছানার উপর লাফিয়ে উঠে বসে বাধা দেবার চেষ্টা করল সুলতা। কিন্তু একা মেয়েমানুষ তিনজন গুণ্ডার সাথে পারবে কেন? মুখটা চেপে ধরল একজন। প্রাণপণে আঁচড়ে-কামড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল সুলতা। কিন্তু দ্বিতীয়জন ওর হাতদুটো বেঁধে ফেলল পিছমোড়া করে। এবার সহজেই নোংরা ঘামে ভেজা রুমালটা ওর মুখের মধ্যে ভরে দিল প্রথম জন। তার উপর আরেকটা রুমাল দিয়ে মুখটা পেঁচিয়ে গিঁঠ দিয়ে দিল পিছন দিকে। তারপর গা থেকে খসে পড়া আঁচল দিয়ে পা দুটো শক্ত করে বেঁধে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল ওকে।

তৃতীয় ব্যক্তিকে আদেশ করা হলো, 'আলোটা নিভিয়ে দে। রিভলভার হাতে

আমার দু'পাশে চলবি দু'জন।'

'ঠিক হ্যায়, ওস্তাদ!'

হোটেলের সামনে ফোক্সওয়াগেন ছাড়াও আরেকটা হুড খোলা টয়োটা জিপকে দাঁড়ানো দেখে একটু অবাক হলো রানা। সামনের কলাপ্সিব্ল্ গেটটায় তালা দেয়া। গলি দিয়ে ঢুকতে গিয়েই দেয়ালের আড়ালে সরে দাঁড়াল সে। ব্যাপার কি? আধো-অন্ধকারে দেখা গেল কয়েকজন লোক বেরিয়ে আসছে গলি দিয়ে। তাদের মধ্যে একজন কিছু একটা ভারি জিনিস বয়ে আনছে।

লোকগুলো গলির মুখ থেকে বেরোতেই সুলতার সাথে চোখাচোখি হলো রানার। দপ করে আশার আলো জ্বলে উঠল ওর বড় বড় চোখ দুটোয়। হুড খোলা গাড়িটার দিকে এগোল লোকগুলো।

এক সেকেণ্ডে মনস্থির করে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা বাম দিকের লোকটার উপর। বাঁ কানের উপর রানার প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে 'বাপরে' বলে ছিটকে পড়ল লোকটা তার পাশের জনের ওপর। টপ টপ করে কান থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে ফুটপাথের উপর পড়ল।

'শালা, হারামী!' বলে এবার অতর্কিতে এক প্রচণ্ড লাথি মারল রানা ডান দিকের লোকটার তলপেটে। ছিট্কে পড়ে গেল রিভলভারটা দূরে। 'কোঁক' করে একটা চাপা শব্দ করে সে-ও বসে পড়ল মাটিতে।

ঘটনাটা এত হঠাৎ ঘটে গেল যে সামনের লোকটা ভাল করে বুঝতেই পারল না পিছনে কি ঘটছে। 'ক্যয়া হুয়া রে?' বলে ভারি বোঝাটা নিয়ে যেই ঘুরছে সে, অমনি ধাঁই করে নাকের উপর পড়ল একটা বিরাশি সিক্কা।

সুলতাকে ধপাস করে ফুটপাথের উপর ফেলে দিয়ে নিজের নাক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকটা। দুই-তিন টানে সুলতার হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিল রানা। এমন সময় পিছন থেকে একজন এসে চুলের মুঠি চেপে ধরল রানার। ঠিক স্টীম এঞ্জিনের পিস্টনের মত রানার কনুই গিয়ে পড়ল পিছনের লোকটার ভুঁড়ির উপর সোলারপ্লেক্সাস-এ। চিৎ হয়ে পড়ল লোকটা।

মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একটানে সুলতাকে নিয়ে গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল রানা। বলল, 'এক দৌড়ে ওপরে চলে যাও। ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে দিয়ো। আমি ছাড়া আর কেউ ডাকলে বা দরজা খোলার চেষ্টা করলে চিৎকার করে লোক জড়ো করবে। যাও, দৌড় দাও। আমি আসছি।'

প্রথম যাকে আক্রমণ করা হয়েছিল সেই লোকটা সামলে নিয়ে এবার একটান দিয়ে রিভলভারটা বের করল ওয়েস্ট ব্যাণ্ড থেকে। সাথে সাথেই গর্জে উঠল রানার ওয়ালথার। ডান হাতের কব্জিটা ভেঙে গুঁড়ো করে দিল পয়েন্ট থ্রী-টু বুলেট। 'বাবা-গো' বলে কাতরাতে লাগল লোকটা মাটিতে বসে পড়ে।

মাটি থেকে রিভলভারটা তুলে নিয়ে রানা হুকুম করল, 'সোজা গাড়িতে গিয়ে ওঠো সবাই। কেউ কোন চালাকির চেষ্টা করলেই মারা পড়বে।'

দলপতি একবার রানার ইস্পাত-কঠিন চেহারার দিকে চাইল। বুঝল, খুন করতে এই লোক দ্বিধা করবে না। অপর দু'জনকে বলল, 'চ্যল্ বে, ভাগ্ ইয়াহাঁসে!'

তলপেটে লাথি খাওয়া লোকটা তার রিভলভার তুলে নেবার জন্যে এক পা এগোতেই রানা আবার বলল, 'ওটা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। যাও, সোজা গাড়িতে ওঠো।'

আহত লোকটাকে দু'জন ছেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলল। তারপর ছেড়ে দিল গাড়ি। গলির সামনে দিয়ে যখন গাড়িটা বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে কি মনে করে হঠাৎ রানা একপাশের দেয়ালের গায়ে সেঁটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক নাকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল দুটো বুলেট।

পাঁচ-দশ গজ গিয়ে আবার থামল গাড়িটা। বোধকরি গুলি দুটো ঠিক জায়গা মত লাগল কিনা দেখার জন্যে। আবার রানার হাতের রিভলভারটা গর্জে উঠল। একটা আর্ত চিৎকার শোনা গেল—এবং সাথে সাথেই একজস্ট পাইপের মুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া বের করে দ্রুত চলে গেল গাড়িটা 'বিপণী-বিতানে'র দিকে।

ফুটপাথের উপর পড়ে থাকা রিভলভারটা তুলে নিল রানা। দেখল দুটোই ওয়েবলি অ্যাণ্ড স্কটের অনুকরণে ফ্রন্টিয়ারের দাররা-তে তৈরি থারটি-টু ক্যালিবারের রিভলভার। অনুকরণ এতই চমৎকার এবং নিখুঁত যে ধরাই যায় না যে এটা দেশী মাল। কিন্তু মহাপণ্ডিত পাঠান ছোট্ট একটা ভুল করে বসে আছে, তাই ধরা গেল। নামটা লিখতে 'দু'একটা অক্ষর কখন যে এদিক ওদিক হয়ে গেছে, টের পায়নি। মৃদু হেসে প্যান্টের দুই পকেটে দুটোকে ভরে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে উঠে এল রানা দোতলায়।

ম্যানেজারের কাউন্টারে কেউ নেই। লাউঞ্জের দুটো টেবিল লম্বালম্বি ভাবে জুড়ে নিয়ে হাসান আলী শুয়ে আছে মাথার উপর একটা ফ্যান ফুল-স্পীডে চালিয়ে দিয়ে। একটু নাড়া দিতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল হাসান আলী।

'আমার কোনও টেলিগ্রাম এসেছে?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'দুটো এসেছে, স্যার।'

বালিশের তলা থেকে দুটো খাম বের করে দিল সে। রানা দেখল দুটোই আর্জেন্ট টেলিগ্রাম। একটা ওর নামে, আরেকটা সুলতার। খাম ছিঁড়ে দেখল রানা প্রথমটায় লেখা:

সামথিং হ্যাপেণ্ড ইন কাপতাই স্টপ মিট আই ই কো চীফ স্টপ ইনভেস্টিগেট অ্যাণ্ড রিপোর্ট।

আইটিসি

রানা ভাবল, কাপ্তাইয়ে আবার কি ঘটল? আগামী শুক্রবার অর্থাৎ পরশু তো প্রেসিডেন্ট ওপেন করছেন প্রজেক্ট। সাথে থাকবেন গভর্নর, ওয়াপদা চীফ, ইউ.এস. এ-র রাষ্ট্রদূত, আরও কত হোমরা-চোমরা অফিসার। সেখানে আবার এমন কি ঘটে গেল যে তাকে এমন আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করা দরকার হয়ে পড়ল?

দ্বিতীয় টেলিগ্রামে লেখা:

সেন হসপিটালাইযড্ অ্যাট ঢাকা স্টপ নেগোসিয়েশন ব্রোক ডাউন স্টপ ক্লোজ ডিল উইথ নিউ কোম্পানী স্টপ ফর সলভেনসি রেফার চৌধুরী।

জেটিটি

দুটো টেলিগ্রামই পকেটে ফেলে রানা বলল, 'ঢাকায় একটা ফোন করা দরকার

হাসান আলী। ফোনের চাবিটা কি তোমার কাছে?'

'খুলে দিচ্ছি, স্যার,' বলে হাসান আলী তালা খুলে দিল ম্যানেজারের কাউন্টারের উপর রাখা টেলিফোনটার। প্রথমে ৯১ ডায়াল করে ৮০০৮৩ ঘুরাল রানা। একবার রিং হবার সাথে সাথেই নারী কণ্ঠে শোনা গেল, 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং করপোরেশন। মিস নেলী বলছি।'

'আমি চিটাগাং থেকে সুবীর সেন বলছি, ডারলিং। এক্ষুণি শ্রী রামকৃষ্ণের লাইন দাও, জলদি।'

'শাট আপ!' নেলীর কৃত্রিম রাগত স্বর শোনা গেল। ঠিক দুই সেকেণ্ড পরেই রাহাত খানের ঠাণ্ডা গম্ভীর গলা পাওয়া গেল।

'বলো। খবর আছে কিছু?'

'আমার স্ত্রীর কাছে একটা টেলিগ্রাম এসেছে। তাতে দেখলাম ঢাকায় নাকি আমার এক বন্ধুর অসুখ…'

'ওসব জানি। তোমার কি খবর?' বাধা দিলেন রাহাত খান।

'শরীরটা বেশি ভাল যাচ্ছে না, স্যার।'

'খুব বেশি খারাপ?' (রানা অনুভব করল রাহাত খানের কাঁচা-পাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে গেছে।)

'না, স্যার, তেমন কিছু নয়, এই সামান্য। এখানে হাসপাতালের খবরও বেশি ভাল না—জনা তিনেক মারা গেছে। আমাকেও ডাক্তাররা ছাড়তে চাইছিল না।'

'আচ্ছা!'

'আরও একটা খবর, এই একটু আগে আমার স্ত্রীকে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিল ওর তিনজন মাসতুত ভাই। এত রাতে আর দিলাম না যেতে। ওদের দু'জনের শরীরও বেশি ভাল দেখলাম না।'

'কাণ্ডই বাধিয়ে বসেছ দেখছি।'

'উৎসবে অনেক বাজি পটকা ফুটেছে। আমার শ্বশুর-বাড়িতে যদি একটা খবর দিয়ে দিতেন, স্যার, তাহলে আমি অনেক হয়রানি থেকে বাঁচতে পারতাম।'

'আচ্ছা, বুঝলাম। আমি ফোন করে বলে দেব। তা তোমার জন্মদিনে কি উপহার পেলে অত বাক্স ভর্তি, বললে না?'

'একটা রেডিয়ো ট্র্যানজিস্টার আর তিনটে বড় বড় ডিনার সেট।'.

'বলো কি? ডিনার সেট দিয়ে কি করবে?'

'দেখি কি করা যায়, এখনও ঠিক করতে পারিনি, স্যার।'

'তোমার বন্ধুদেরকে কবে নিমন্ত্রণ করছ শ্বশুর-বাড়িতে?'

'আলাপ হয়েছে, তবে এখনও নিমন্ত্রণের পর্যায়ে যায়নি। আমার পরিচয় পেয়ে অনেক খাতির যত্ন করল, ছাড়তেই চাচ্ছিল না।'

'বেশ, যা ভাল বোঝ করো। শরীরের দিকে লক্ষ রাখবে—বিশেষ করে আজ রাতে। আর কিছু বলার আছে?'

'না, স্যার।'

'রাখলাম।'

পাঁচতলায় উঠে এল রানা। ঘরের দরজায় ভিতর থেকে ছিটকিনি দেয়া। টোকা

দিতেই কাছে এসে রানার গলা শুনে নিশ্চিত হয়ে দরজা খুলল সুলতা। হাতে পয়েন্ট টু-ফাইভ ক্যালিবারের ছোট্ট একটা অ্যাস্ট্রা পিস্তল ধরা। বাঁটটা মাদার অফ পার্লের। উজ্জ্বল বাতির আলোয় একবার ঝিক করে উঠল।

'ওরেব্বাবা! তোমার কামানের মুখটা একটু সরাও। গুলি বেরিয়ে পড়লে একেবারে ছাতু হয়ে যাব!' বলল রানা।

এসব রসিকতায় কান না দিয়ে উৎকণ্ঠিত সুলতা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার লাগেনি তো?'

'সামান্য লেগেছে। তোমার?'

'আমার লাগবে কেন, আমি কি মারামারি করতে গেছি?' একটু থেমে আবার বলল, 'ইশ, তোমার গায়ে "করডাইট"-এর গন্ধ। মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরছ। কাপড়টা ছেড়ে ফেলো।'

রানা দরজা বন্ধ করে ফিরে দাঁড়াতেই ওর মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠে সুলতা বলল, 'তোমার মুখে এত কাটাকুটি কেন? রক্ত বেয়ে পড়ছে। এখন ডেটল কোথায় পাই বলো তো!' ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠল সুলতা।

'আমার সুটকেসে আফটার-শেভ লোশন আছে। বের করে দাও, তাই খানিকটা লাগিয়ে নিচ্ছি। আর আমার স্লীপিং গাউনটাও বের করো, এক্ষুণি খেয়ে শুয়ে পড়ব।'

একটা চেয়ারের উপর গাউন আর ওল্ড স্পাইসের শিশিটা বের করে রাখতেই একটা টার্কিশ টাওয়েল কাঁধে ফেলে ওগুলো তুলে নিতে গেল রানা।

'রাখো তো ওগুলো, আমি লাগিয়ে দেব,' বলে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে রানাকে বাথরুমের মধ্যে নিয়ে গেল সুলতা। 'কোথায় কোথায় লেগেছে দেখি?'

টী-শার্টের বোতামগুলো খুলে ফেলল সুলতা আলতো হাতে। গেঞ্জিটা খুলে রানার দেহের দৃঢ় পেশীগুলোর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, 'বাব্বা, কী অসম্ভব জোর তোমার গায়ে। তিনজন ষণ্ডামার্কা লোকও পারল না তোমার সাথে! নাও, এখন মুখটা ধুয়ে ফেলো তো আগে!'

মুখ ধুতে গিয়ে ডান হাতের তালুতে পানি লাগতেই জ্বালা করে উঠল। কাটা জায়গাটা দেখে আঁতকে উঠল সুলতা। কাঁচা দগদগে জখম থেকে তখনও রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি। নীল হয়ে আছে দু'পাশের জায়গাটা। খানিকটা লোশন ঢেলে দিতেই কড়ে আঙুলটা কাটা মুরগীর মত লাফিয়ে উঠল কয়েকবার আপনাআপনি। জ্বালার চোটে কাতরে উঠল রানা। নিজের একটা রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল সুলতা হাতটা। তারপর তোয়ালেটা পানিতে ভিজিয়ে মুছে নিয়ে মুখে, ঘাড়ে, পিঠে আর বাম কনুইয়ে লোশন লাগিয়ে দিল। রানার ভাল লাগল এই সেবা।

'আমার জন্যেই তোমার এই অবস্থা!' সুলতা নিজেকে অপরাধী মনে করছে।

দেহের উপরের ভাগটায় লোশন লাগানো হয়ে গেল। সুলতা জিজ্ঞেস করল, 'পায়ে-টায়ে কেটেছে কোথাও?'

'মনে হয় না।'

'তাহলে চলো, খেয়ে নাও ঘরে এসে।'

'তুমি যাও আমি কাপড়টা ছেড়েই আসছি।'

সাত কোর্সের ডিনার রাখা আছে টেবিলে। কিন্তু সবই ঠাণ্ডা। এক নজর দেখেই খাবার রুচি নষ্ট হয়ে গেল রানার। একজোড়া চিংড়ীর কাটলেটের মাঝখানে খানিকটা টম্যাটো সস্ ঢেলে নিয়ে নাক-মুখ বুঁজে কোন মতে খেয়ে নিল সে।

'আচ্ছা, বলতে পারো, আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল কারা?'

'কবীর চৌধুরীর ভাড়া করা গুণ্ডা।' এক গ্লাস পানি খেয়ে ঠক করে টেবিলের উপর গ্লাস রেখে জবাব দিল রানা।

'কিন্তু, কারণ কি?'

'কারণ তোমার রূপ। মনে ধরে গিয়েছিল ওর।'

'তাই নাকি?' হাসল সুলতা। 'কিন্তু লোকটাকে দেখে তো এমন বলে মনে হয়নি!'

'কেবল দেখে সবাইকে কি চেনা যায়? আমাকেই বা তুমি কতটুকু চিনেছ?'

কথাটা নিয়ে কয়েক সেকেণ্ড ভাবল সুলতা, তারপর বলল, 'তা তুমি হঠাৎ কোত্থেকে এলে? কোথায় গিয়েছিলে বাইরে? মনে হলো যেন আমাকে রক্ষা করবার জন্যেই দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলে?'

'একা-একা ভাল লাগছিল না, বেরিয়ে পড়েছিলাম বাইরে। একটা নাইট শোতে ঢুকেছিলাম, ভাল লাগল না—কিছুদূর দেখে হাফ টাইমের সময় বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরছিলাম।'

'জানো, আমি জীবনে কখনও এমন অবস্থায় পড়িনি। তুমি এসে না পড়লে কী যে হোত ভাবতেই শিউরে উঠছি।'

'কিন্তু ঘরে ঢুকল কি করে ওরা? দরজার ছিটকিনি লাগাওনি?'

'লাগিয়েছিলাম।'

রানা উঠে গিয়ে দেখল চৌকাঠের একটা ফাঁক দিয়ে অনায়াসেই ছিটকিনি খোলা যায়। নাহ্, আজ আর ঘুম নেই কপালে, জেগেই কাটাতে হবে রাতটা।

পশ্চিমের জানালাটা খুলে দিয়ে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল রানা। বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে পাশে এল সুলতা। স্নিগ্ধ চাঁদের আলো এসে পড়ল ওদের চোখে মুখে।

ঘুমিয়ে পড়েছে শহর। মাঝে মাঝে এক আধটা হর্ন শোনা যাচ্ছে নাইট-ক্লাব ফেরতা ভদ্রলোকদের গাড়ির। তাছাড়া নিঝুম। কাছেই কোন বাড়িতে বাচ্চা কেঁদে উঠল একটা। আবার চুপ। মিটমিট করছে তারাগুলো। উজ্জ্বল চাঁদের পাশে নিষ্প্রভ লাগছে ওদের।

'কি ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল সুলতা।

'কিছু না।'

'কিছুই না?'

'ভাবছি, কত লক্ষ কোটি বছর ধরে মিটমিট করছে ওই তারাগুলো। ওদের পাশে আমাদের জীবন কত নগণ্য!'

দূর থেকে একটা জাহাজের বাঁশি বেজে উঠে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলল এ-বাড়ি ও-বাড়িতে ধাক্কা খেয়ে। আবার সব চুপ।

অনেক গল্প হলো। কথায় কথায় রানা বুঝতে পারল কলকাতা অফিস থেকে কতগুলো শব্দই কেবল মুখস্থ করিয়ে দেয়া হয়েছে সুলতাকে। ডিনামাইটগুলো

কোথায় ফাটানো হবে সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই ওর। কি ঘটতে চলেছে সে সম্পর্কে ওকে কোন আভাস দেয়া হয়নি।

'সারাদিন অনেক ধকল গেছে,' বলল রানা, 'যাও শুয়ে পড়ো গিয়ে।'

'আর তুমি?'

'তিনটে পর্যন্ত পাহারা দেব, তারপর তোমাকে তুলে দিয়ে আমি ঘুমাব বাকি রাত।'

'ঠিক আছে,' বলে একটা হাই তুলল সুলতা, তারপর উঠে পড়ল বিছানায়।

সারা রাত জাগতে হবে আজ রানাকে। যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন দিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে। কাপড়ের ভাঁজে সযত্নে রাখা সাইলেন্সারটা বের করল সুটকেস থেকে, রাখল টেবিলের উপর। তারপর ইজিচেয়ারে গিয়ে বসল।

ঘুমে আর ক্লান্তিতে ভেঙে আসতে চাইছে শরীরটা। একটা বেঞ্জেড্রিন ট্যাবলেট মুখে ফেলে এক ঢোক পানির সাথে গিলে ফেলল রানা। তারপর গা এলিয়ে দিল ইজিচেয়ারে।

ঘুমন্ত সুলতার একটানা ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ আর রিস্টওয়াচের একঘেঁয়ে টিকটিক করে বেজে যাওয়া। এক ফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরের ভিতর। অনেক কথা মনে এল রানার। অনেক টুকরো টুকরো ঘটনার স্মৃতি। জীবনের কত ছোট-খাটো সাধারণ কথা কোন্ ফাঁকে স্মৃতির পাতায় লেখা হয়ে গেছে। মণিমুক্তোর মত অমূল্য মনে হচ্ছে সেগুলোকে এখন। বড় বিচিত্র মানুষের মন। দূরে কোথাও ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজল তিনবার। তিনটে বাজে।

ঘুমের ঘোরে সুলতাকে বিড় বিড় করে কিছু বলতে শুনে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। কিছুই বোঝা গেল না অস্পষ্ট এক আধটা অর্থহীন শব্দ ছাড়া। একটু হেসে টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে আধ গ্লাস পানি দুই ঢোকে শেষ করল রানা, তারপর পশ্চিমের জানালাটার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

ডুবে যাচ্ছে চাঁদ। নিষ্প্রভ হলদেটে দেখাচ্ছে ওটাকে। সেই ম্লান আলোয় হঠাৎ রানার নজরে পড়ল, দু'জন লোক উপরে উঠে আসছে ছাদের ট্যাঙ্কে পানি তুলবার পাইপ বেয়ে।

মৃদু হাসল রানা। এবারের আক্রমণটা তাহলে এই পথে আসছে!

উপরের দিকে না চেয়ে নিশ্চিন্ত মনে সন্তর্পণে উঠে আসছে লোকগুলো। টেবিলের উপর থেকে সাইলেন্সারটা এনে ধীরেসুস্থে পেঁচিয়ে লাগাল রানা পিস্তলের মুখে। পাঁচ-ছয় হাত বাকি থাকতে প্রথম লোকটা দেখতে পেল রানাকে। কিন্তু বড্ডো দেরি হয়ে গিয়েছে তখন। টুথপেস্টের টিউব থেকে বুদ্বুদ বেরিয়ে যেমন শব্দ হয় তেমনি 'ফট' করে একটা শব্দ বেরোল রানার ওয়ালথার থেকে। লোকটা তার সঙ্গীর উপর গিয়ে পড়ল পাইপ ছেড়ে দিয়ে। আচমকা আঘাতে সে-ও তাল সামলাতে পারল না। দু'জন একই সাথে দ্রুত নেমে গেল নিচে। ঠিক চার সেকেণ্ড পর পশ্চিম দিকের আবর্জনাময় সরু সুইপার প্যাসেজে ভারি কিছু পতনের শব্দ হলো।

খালি বিছানাটায় শুয়ে পড়ল রানা এবার। বালিশের তলায় পিস্তল রেখে সেটার বাঁটের উপর ডান হাতটা রাখল সে অভ্যাস মত। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্ত মনে।

## ছয়

কিন্তু অতখানি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়া উচিত হয়নি রানার। জেগে থাকলে পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটার দিকে আস্তে খুট করে দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দটা শুনতে সে পেতই। কবীর চৌধুরীকে ভয়ঙ্কর লোক হিসেবে সে চিনেছে, কিন্তু প্রয়োজনের সময় সে যে কতখানি দুর্দান্ত হয়ে উঠতে পারে সেটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারেনি।

ঘুম ভাঙল রানার সকাল আটটায়। সুলতা অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠে চান-টান করে আপন মনে সারা ঘরময় গুনগুন করে বেড়াচ্ছে। এটা ওটা গুছিয়ে রাখছে নিপুণ হাতে। চুপচাপ শুয়ে শুয়ে তাই দেখছিল রানা। হঠাৎ ওর দিকে চোখ পড়তেই থমকে গেল সুলতা, তারপর ভ্রূকুটি করল।

একটু হেসে উঠে বসল রানা। সুটকেস থেকে টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, সাবান আর কাপড় বের করে দিল সুলতা। ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে খুশি মনে শিস দিতে দিতে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল রানা। বাথরুমের দরজায় ভিতর থেকে আর ছিটকিনি লাগাল না।

বাথটাবের কলটা খুলে দিয়ে বেসিনের সামনে দাঁত মেজে নিল রানা। আরও দু-একটা কাজ সেরে নিয়ে স্লীপিং গাউনটা খুলে দেয়ালের গায়ে ব্র্যাকেটে রাখল ঝুলিয়ে। বাথটাব প্রায় ভরে এসেছে—দু'মিনিট অপেক্ষা করে কল বন্ধ করে দিল রানা। তারপর সম্পূর্ণ দিগম্বর অবস্থায় নেমে পড়ল টাবের ভিতর।

মস্ত বড় বাথটাবটা মসৃণ পিচ্ছিল সাদা পাথরে তৈরি—ইচ্ছে করলে তার মধ্যে সাঁতার কাটা যায়। অকারণ পুলকে রানার গায়ে কাঁটা দিল। ধীরে ধীরে গা-হাত-পা ঘষতে ঘষতে গতরাতের ঘটনাগুলো মনে মনে উল্টে-পাল্টে দেখছে সে।

হঠাৎ পিছনের পর্দাটা কেঁপে উঠল। সামনের দেয়ালে একটা ছায়া নড়ল, আবছামত। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা উদ্যত ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে আছে ইয়াকুব। দ্রুত উঠবার চেষ্টা করল সে বাথটাব থেকে—কিন্তু পিছলে গেল হাত। তাছাড়া দেরিও হয়ে গিয়েছে। ভোর সাড়ে-পাঁচটা থেকে বাথরুমের মধ্যে পর্দার আড়ালে অপেক্ষা করছে ইয়াকুব, সুযোগ বুঝে এক ঝটকায় পর্দা সরিয়ে রানার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল সে। তারপর এক হাতে রানার চুলের মুঠি ধরে চেপে রাখল মাথাটা পানির তলায়।

চোখ বন্ধ করে রানা আশা করল এবার ছুরিটা আমূল ঢুকে যাবে ওর বুকের ভিতর। পানির নিচে টুঁ শব্দ করতে পারবে না সে। লাল হয়ে যাবে বাথটাবের পানি, নিঃশব্দে কয়েক সেকেণ্ড ছটফট করে মৃত্যু হবে তার। ছুরিটা যখন বিঁধবে, খুব বেশি কষ্ট হবে কি?

তিন-চার সেকেণ্ড অপেক্ষা করবার পরও যখন তার বুকটা অক্ষত রইল তখন চোখ মেলে দেখল রানা, ছুরিটা হাতে ধরাই আছে—সেটা ব্যবহারের কিছুমাত্র আগ্রহ নেই ইয়াকুবের। ঠিকই তো, যখন নিঃশব্দে নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ সারতে পারছে, তখন ছুরি-ছোরার কি দরকার?

দুই হাতে প্রাণপণে চেষ্টা করল রানা চুলের মুঠি ছাড়াবার। আরও শক্ত করে এঁটে বসল হাতটা—একটুও আলগা হলো না সে মুঠি। ছটফট করতে থাকল রানা একটু দম নেবার জন্যে। মনে হলো বুকের ছাতিটা ফেটে যাবে বুঝি।

পিঠের উপর ভর করে পা দুটো উপর দিকে উঠিয়ে বাথটাবের কিনারায় বাধাবার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু সেয়ানা ইয়াকুব তখন চুল ধরে টেনে ওর পিঠটা আলগা করে দেয়—পিঠের নিচে শক্ত কিছু না থাকায় ঝপাৎ করে পা-দুটো পড়ে যায় আবার টাবের মধ্যে।

প্রায় এক মিনিট ধরে একের পর এক নানান কৌশলে বাঁচার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু বিফল হলো প্রতিবারই। পিচ্ছিল বাথটাব থেকে কিছুতেই মুক্তি পেল না সে। ঝিমিয়ে এল ক্রমে ওর দেহটা।

হঠাৎ রানা বুঝতে পারল যে সে মারা যাচ্ছে। সম্পূর্ণ নিরুপায় ও এখন। এর হাত থেকে তার মুক্তি নেই—বৃথাই চেষ্টা করা। মাথার কাছের লোকটা আসলে ইয়াকুব নয়, স্বয়ং যমদূত আজরাইল। মনে পড়ল জ্যোতিষী বলেছিল, আটান্ন বছর পর্যন্ত ওর আয়ু। এইবার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল যে জ্যোতিষ-শাস্ত্র ভুল, কিন্তু এই সত্যটা প্রমাণ করবার উপায় নেই—ও তো মরেই যাচ্ছে। প্রমাণ করবে কে? হাসি পেল রানার।

চোখ খুলে দেখল পানির উপর জ্বলজ্বলে দুটো চোখ চেয়ে আছে ওর দিকে। ঝকঝক করছে সাদা দাঁতগুলো; ছোট ছোট ঢেউয়ে দুলছে এলোমেলো ভাবে।

ছোট একটা সরু শিকলে পা ঠেকল রানার। বুঝল, বাথটাবের পানি বেরোবার রাস্তাটা যে রাবারের প্লাগ দিয়ে আটকানো আছে, এ শিকল তারই সাথে লাগানো। আস্তে করে শিকলটা পা দিয়ে সরিয়ে দিলেই প্লাগ খুলে পানি বেরিয়ে যাবে টাব থেকে। কিন্তু অবসন্ন হয়ে গেছে রানার শরীর। একবার চেষ্টাও করল সে শিকলটা সরাবার, কিন্তু পা নড়ল না একটুও। মস্তিষ্কের হুকুম স্নায়ুগুলো আর বয়ে নিয়ে যেতে পারছে না অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলছে রানা।

শেষ বারের মত রানা চাইল উপর দিকে। তেমনি জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখ। হঠাৎ তিনটে চোখ দেখতে পেল রানা। দুটো চোখের ঠিক মাঝখানটায় যেন আরেকটা চোখ দেখা যাচ্ছে। চুলের মুঠি আলগা হয়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়ল অসহায় মাসুদ রানা।

রানা বাথরুমে গিয়ে ঢুকতেই সুলতা এগিয়ে গেল রানার এলোমেলো বিছানাটার দিকে। বালিশ সরাতেই সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা দেখল সে। চাদর সাট করে আবার বালিশের তলায় রেখে দিল সে পিস্তলটা যত্নের সাথে আঁচল দিয়ে মুছে। সুবীরের জিনিস বলে পিস্তলটাকেও আদর করতে ইচ্ছে করছে ওর।

বেশ অনেকক্ষণ কেটে গেল। একটা সিনেমা পত্রিকা নিয়ে ছবিগুলোর উপর আনমনে চোখ বুলিয়ে গেল সে। নিচের ক্যাপশনগুলো পর্যন্ত পড়ল না। কিছুতেই মন বসছে না কোন কাজে। মেরিলিন মনরোর আত্মহত্যার তাজা খবর বেরিয়েছে সদ্য, সেই সাথে তার জীবনী। সেটাতেও মন বসল না। হলো কি ওর? উল্টাতে উল্টাতে যখন শেষ হয়ে গেল সব ক'টা পাতা তখন ঝপাৎ করে টেবিলের উপর পত্রিকাটা চিৎ

করে ফেলে উঠে দাঁড়াল সুলতা। বেরোচ্ছে না কেন সুবীর এখনও? সে-ই বা এত অস্থির হচ্ছে কেন লোকটার জন্যে, ভেবে লজ্জা পেল ও।

জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল এবার। বাইরে বেশ রোদ উঠেছে। সারি সারি একতলা, দোতলা, তেতলা বাড়িগুলোর ছাতের উপর বিছিয়ে পড়েছে সে রোদ। দৈনন্দিন হট্টগোলে লিপ্ত হয়েছে কর্মব্যস্ত চট্টগ্রাম বন্দর। এই আবছা কোলাহল নিরালায় বসে কান পেতে শুনলে উদাস হয়ে যায় মন।

হঠাৎ নিচের দিকে চোখ পড়তেই দেখল সুলতা দু'জন লোক পড়ে আছে গলির মধ্যে। বোধহয় মৃত। পাশে জটলা করছে কয়েকজন লোক। একজন তাদের মধ্যে সাদা পোশাক পরা, আর বাকি ক'জন খাকি পোশাক পরা পুলিসের লোক।

দৌড়ে এসে বাথরূমের সামনে দাঁড়াল সুলতা। কয়েকবার ডাকল, 'শুনছ, এই শুনছ?' ভিতর থেকে কোন জবাব এল না। আবার ডাকল। কোন জবাব নেই। কি মনে করে চাবির গর্তে চোখ রাখল সে। ফুটো দিয়ে দেখল, অপরিচিত এক লোক উবু হয়ে বসে আছে বাথটাবের মাথার কাছে। এক হাতে মস্ত এক ছুরি, আর অপর হাতে পানির মধ্যে কি যেন ঠেসে ধরে আছে।

মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল সুলতার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা। হত্যা করা হচ্ছে সুবীরকে। ছুটে গিয়ে পিস্তলটা নিয়ে এল সে বালিশের তলা থেকে। বাথরূমের দরজার হাতল ঘোরাতেই খুলে গেল দরজা। ধাক্কা দিয়ে হাঁ করে দিল কপাট, তারপর লোকটার বুক লক্ষ্য করে টিপে দিল ট্রিগার।

সোজা গিয়ে গুলি লাগল লোকটার কপালে—দুই চোখের ঠিক মাঝখানটায়। দ্বিতীয় গুলির আর প্রয়োজন হলো না। গভীর ক্ষতস্থলটা দেখতে হলো ঠিক শিবের তৃতীয় নেত্রের মত। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। পড়ে গেল লোকটা মেঝের উপর। কলকল করে লাল রক্ত গড়িয়ে যাচ্ছে ড্রেনের দিকে।

বহুকষ্টে রানাকে টেনে বের করল সুলতা বাথটাব থেকে। পরিশ্রম আর উত্তেজনায় নিজেই হাঁপাচ্ছে সে, তাই ঠিক বুঝতে পারল না নাড়ী চলছে কিনা। ফার্স্ট এইড কোর্স কমপ্লিট করাই ছিল—আর্টিফিশিয়াল রেসপিরেশন দিতে আরম্ভ করল সে রানার মুখে মুখ লাগিয়ে, আর পাঁজরের দু'পাশে দু'হাতে চাপ দিয়ে।

ঠিক এমনি সময় দমাদম ধাক্কা আরম্ভ হলো দরজায়। ভয়ে পাংশু হয়ে গেল সুলতার মুখ। হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপতে আরম্ভ করল তার। নিশ্চয়ই পুলিস এসেছে। বাথরূমে রক্তারক্তি কাণ্ড—নিচে মৃতদেহ—এদিকে সুবীর জ্যান্ত না শেষ ঈশ্বরই জানেন! পাকিস্তানে এসে এবার হাতকড়া পড়ল ওর হাতে। জল বেরিয়ে এল চোখ দিয়ে। চোখটা মুছে নিয়ে মন শক্ত করবার চেষ্টা করল ও। ভাবল, যে ক'জনকে পারি গুলি করে মেরে তারপর ধরা দেব। পিস্তলটা হাতে তুলে নিল সুলতা।

দরজায় করাঘাতের শব্দ বেড়েই চলল। সেই সাথে শোনা গেল কয়েকজন লোকের হাঁক-ডাক। ঠিক সেই সময়ে একটু নড়ে উঠল রানার দেহ। আশার আলো দেখতে পেল সুলতা। সুবীরের জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারলে নিশ্চয় এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। এই অল্প পরিচয়েই বুঝতে পেরেছে সুলতা, এই অদ্ভুত বেপরোয়া লোকটার উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায়।

বার কয়েক জোরে জোরে ঝাঁকি দিতেই লাল চোখ মেলে চাইল রানা। আধ মিনিট ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল সে, ঘাড়টা ঘুরিয়ে এদিক ওদিক চাইল কয়েকবার, তারপর মনে হলো ধীরে ধীরে যেন বুঝতে পারছে ও সবকিছু।

কিছুক্ষণ চুপচাপ ছিল দরজার ওপাশের লোকগুলো, হঠাৎ দরজার ছিটকিনি খুলে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল এবার ঘরের মধ্যে। নিচের সেই সাদা পোশাক পরা লোকটা সবার আগে। ঘরে ঢুকে প্রথমেই হাতের ডান ধারে পড়ল খোলা বাথরুম।

মরিয়া হয়ে পিস্তল তুলল সুলতা। গুলিটা বেরোবার ঠিক আগের মুহূর্তে লাফিয়ে উঠে এক ঠেলায় সুলতার হাতটা লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিল রানা। তারপর কেড়ে নিল পিস্তলটা ওর হাত থেকে। ছুটে যাওয়া গুলিটা ছাতে লেগে চ্যাপ্টা হয়ে টুপ করে পড়ল সুলতার কোলের উপর। হতভম্ব সুলতা হাঁ করে রানার মুখের দিকে দুই সেকেণ্ডে চেয়ে থেকে ফিস ফিস করে বলল, 'পুলিস!'

'কি ব্যাপার, সুবীর বাবু! একি দশা আপনার? খুন হয়ে পড়ে রয়েছে কে?' প্রশ্ন করল পি.সি.আই-এর চিটাগাং এজেন্ট আবদুল হাই এক সেকেণ্ডে অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে উঠে।

প্রথমে রানা চেয়ে দেখল ইয়াকুবের লম্বা দেহটা। কুঁকড়ে পড়ে আছে সে মাটিতে—এখনও রক্ত বেরোচ্ছে কপাল থেকে। তারপর নিজের নগ্ন দেহের দিকে নজর যেতেই সংবিৎ ফিরে পেল সে। একটানে ব্র্যাকেট থেকে তোয়ালেটা নিয়ে শরীরের মাঝামাঝি জায়গায় জড়িয়ে নিল। তারপরই আবার মাথাটা ঘুরে উঠে চোখ আঁধার হয়ে এল। 'আমাকে ধরুন···' বলেই পড়ে যাচ্ছিল সে মেঝের উপর, লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে ধরে ফেলল ওকে আবদুল হাই।

একজন সেপাইয়ের সাহায্যে রানাকে ওর বিছানায় এনে শোয়ানো হলো। নিচের 'বার' থেকে আউন্স দুয়েক ব্র্যাণ্ডি এনে খাওয়ানো হলো। সিপাইদের ঘরের বাইরে দাঁড়াতে বলে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আবদুল হাই শুনে নিল আদ্যোপান্ত ঘটনাটা সুলতাকে প্রশ্ন করে করে। তারপর বাইরে দাঁড়ানো সাব-ইন্সপেক্টারকে কিছু বলল নিচু গলায়। বিনা বাক্যব্যয়ে একটা মোটা ক্যানভাসের বড় থলের মধ্যে মৃতদেহটাকে ভরে নিয়ে বাথরুমের রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে চলে গেল সিপাইরা—যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে।

রানাকে চোখ মেলতে দেখে ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে আবদুল হাই সুলতাকে বলল, 'আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, সুলতা দেবী। আমার নাম পুলক ব্যানার্জী। খাকি ড্রেস পরা ওই লোকগুলো আমাদেরই লোক। সরিয়ে ফেললাম লাশটা কারও টের পাবার আগেই। কিন্তু আর একটু হলেই তো আপনি সেম-সাইড করে ফেলছিলেন, সুলতা দেবী। আমার তো আত্মাটাই চমকে গিয়েছিল একেবারে!'

'আমি কি করে বুঝব বলুন যে আপনি পাকিস্তানী পুলিসের লোক নন?' একটু সলজ্জ হাসি হেসে বলল সুলতা।

'তা অবশ্যি ঠিকই বলেছেন। আপনার অবস্থায় পড়লে আমিও বোধহয় তাই করতাম। যাক্, ভাগ্যিস ঠিক সময় মত সুবীর বাবুর জ্ঞান ফিরে এসেছিল! যা সই আপনার হাতের; নির্ঘাৎ কপালে লাগত গুলিটা!'

'যাহ্, সই না আরও কিছু! ভয়ে এমন কাঁপছিল হাতটা—গুলি করলাম হার্ট লক্ষ্য

করে, ছুটে লাগল গিয়ে কপালে।'

হো-হো করে হেসে উঠল আবদুল হাই। রানাও যোগ দিল হাসিতে। বলল, 'ভালই সই বলতে হবে। যাক, এখন কলিং বেলটা টিপে দাও তো, কিছু খেয়ে নিয়ে আধ ঘন্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ব আমি।'

'কোথায় যাচ্ছ?' বেলটা টিপে দিয়ে জিজ্ঞেস করল সুলতা।

'কাপ্তাই।'

'কাপ্তাই কেন?'

'কাজ আছে।'

'অসুস্থ শরীর নিয়ে আজ না গেলেই কি নয়?'

আবদুল হাই মুখ টিপে হাসল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রানা বলল, 'না, যেতেই হবে।'

'আর আমি?'

'তুমি ইচ্ছে করলে যেতে পারো আমার সঙ্গে। ইচ্ছে করলে পুলক বাবুর সাথে ঘুরে ফিরে দেখতে পারো চিটাগাং শহর।'

'আমি তোমার সাথেই যাব।'

'গেলে জলদি কাপড় পরে তৈরি হয়ে নাও।'

সুলতা যেই কাপড় ছাড়তে বাথরুমে ঢুকল, অমনি ইশারায় হাইকে কাছে ডাকল রানা। বিছানার পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল হাই।

'কবীর চৌধুরীকে চেনেন? ২৫৭ নম্বর বায়েজিত বোস্তামী রোডে ওর বাসা।'

'চিনি মানে? খুব ভাল করে চিনি।'

'ওর সম্বন্ধে যা জানেন সংক্ষেপে বলুন।'

'তিনিই তো চৌধুরী জুয়েলার্সের মালিক। অজস্র টাকা। খুবই বিনয়ী ভদ্রলোক। তেমনি আবার দান খয়রাতে দরাজ হাত। এমন লোক হয় না। বহু দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল আর কলেজ ওঁরই টাকায় চলে। জনসাধারণের কাছে যেমন সুনাম আছে ওঁর, তেমনি আছে গভর্নমেন্ট অফিসের উঁচু সার্কেলে দহরম-মহরম। প্রথম দিকে প্রায়ই ঢাকা-করাচী-লাহোর, এমন কি নিউইয়র্ক-লণ্ডন-মস্কো পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করেছেন, এখন চিটাগাং-এর বাইরে বড় বেশি যান না। কি ব্যাপার! হঠাৎ এঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন যে?'

'এই কবীর চৌধুরীই আমাদের টার্গেট। একটু আগে যে সব লোককে পাচার করলেন থলেয় ভরে তারা ওরই অনুচর।'

হাঁ হয়ে গেল আবদুল হাইয়ের মুখটা।

'বলেন কি, মশাই?'

'মশাই নয়, সাহেব; কিন্তু যা বলছি ঠিকই বলছি। ভারতীয় ডিনামাইটগুলো ওরই কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে কাল রাতে। আমার উপর আক্রমণের বহর দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমাকে চিনে ফেলেছে। ও-ই যে আসল লোক, এতক্ষণ সেটা জানতাম একা আমি, এখন আপনিও জানলেন। কাজেই আমারই মত আপনার মাথার ওপরেও এই মুহূর্ত থেকে ঝুলল ওর মৃত্যু পরোয়ানা।'

'আশ্চর্য কথা শোনালেন আপনি!'

'বিস্মিত হবেন না, মি. হাই। দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ···ইত্যাদি, ইত্যাদি। এখন কাজের কথায় আসা যাক। খুব সাবধানে নিজের গা বাঁচিয়ে ওর সম্পর্কে যতখানি সম্ভব তথ্য উদ্ধার করুন, আজই। আমার যতদূর বিশ্বাস, চিটাগাং-এর কাছাকাছি ওর আরেকটা আস্তানা আছে—সেখানে সে ল্যাবরেটরি করেছে একটা। সে ব্যাপারেও একটু সন্ধান করবেন। কিন্তু সাবধান, চৌধুরীর বাড়ির ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবেন না, ওটা একটা দুর্গম দুর্গ। আর একটা কাজ আছে। আপনি পাহাড়তলী স্টেশনে গিয়ে সুলতার নামে একটা টেলিগ্রাম করবেন। টেলিগ্রামের নিচে প্রেরকের নাম থাকবে জেটিটি—লিখবেন, কবীর চৌধুরী শত্রু, যেন সে সুবীরের কথা মত চলে।'

'আপনি কাপ্তাই থেকে ফিরছেন কখন?'

'ঠিক জানি না। তবে মনে হয় বেলা চারটের মধ্যেই।'

'বেশ, আমি চললাম। এরই মধ্যে সব খবর বের করে ফেলার চেষ্টা করব। ওহহো, ভুলেই গিয়েছিলাম; কাপ্তাই থেকে সোজা আমার বাংলোতে চলে যাবেন। আপনাদের মালপত্র আমার ওখানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি আমি। একটা চমৎকার ঘর আপনাদের জন্যে রেডি রাখা হবে।'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে আবদুল হাই বলল, 'এটা আমার অনুরোধ নয়, হেড অফিসের হুকুম। আমি চললাম। গুড বাই!'

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল আবদুল হাই।

'চিটাগাং থেকে কাপ্তাই পঁয়ত্রিশ মাইল। অতি চমৎকার রাস্তা। মোড় ঘুরবার সময় রাস্তার সুপার এলিভেশন এত সুন্দর যে যেখানে স্পীড লিমিট টেন মাইলস লেখা, সেখানেও পঞ্চাশ-ষাট মাইল বেগে অনায়াসে 'ইউ' টার্ন নেয়া যায়। পথে পাঁচটা চেক-পোস্ট।

এক লক্ষ বত্রিশ হাজার ভোল্টের গ্রিড সাব-স্টেশন দেখা গেল রেলগেট পার হয়ে কিছুদূর যেতেই হাতের বাঁয়ে। বিটকেল চেহারার সব যন্ত্রপাতি, কাঁটাতার দিয়ে এলাকাটা ঘেরা।

দু'পাশে উঁচু টিলা—মাঝে মাঝে পাহাড়ের উপর দিয়ে গেছে আঁকাবাঁকা মসৃণ পথ। চন্দ্রঘোনা পার হয়ে কর্ণফুলীর পাশ দিয়ে যাবার সময় চোখে পড়ে অপূর্ব সুন্দর সব দৃশ্য! নদীর অপর পারেই উঁচু পাহাড়। লম্বা লম্বা গাছ আর ছোট আগাছায় ভর্তি সেগুলো, শহুরে মনকে টানে অন্য এক অচঞ্চল সাদামাঠা জীবনের প্রতি, নীরব ইঙ্গিতে। চারদিকে কেবল পাহাড় আর পাহাড়।

হঠাৎ একটা সামান্য ব্যাপার চোখে পড়ল রানার। রাস্তার পাশে টেলিফোনের তার এতক্ষণ ছিল চারটে, নতুন চকচকে একটা তার রোদে ঝিক্‌মিক্ করছে বলে রানা লক্ষ করল তার এখন দেখা যাচ্ছে পাঁচটা। রানা মোটেই আশ্চর্য হয়নি প্রথমে, কিন্তু অবাক হলো কাপ্তাইয়ের শেষ চেক-পোস্টটা পার হবার পর যখন দেখল তার আবার চারটেই দেখা যাচ্ছে—পঞ্চমটা নেই।

ভি.আই.পি. রেস্ট হাউসে একটা কামরা বুক করে সুলতাকে সেখানে রেখে সোজা মি. লারসেনের অফিসে গিয়ে উঠল রানা। পরিচয় পেয়ে সাদর অভ্যর্থনা

জানালেন তিনি। তিনিই পি.সি.আই-এর সাহায্য চেয়ে টেলিগ্রাম করেছিলেন ডিফেন্স সেক্রেটারির কাছে। আবদুলকে ডাকিয়ে এনে বাইরে দাঁড়ানো দারোয়ানকে বিশেষ নির্দেশ দিয়ে ঘরের সব দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন তিনি।

সংক্ষেপে সেদিন সন্ধ্যার ঘটনাগুলো বললেন মি. লারসেন। তারপর বললেন, 'সেদিন আমি ইসলামের মাছের গল্পে ভুললেও আবদুলের তীক্ষ্ণ চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি। বাংলোয় ফেরার পথে ও আমাকে চার্জ করল ইসলামকে পানিতে নামতে দেয়ায়, বলল লোকটাকে জ্যান্ত ধরে আনা যেত, ইসলাম যদি ওকে পানির তলায় খুন না করত। সব ব্যাপার চাপা দেয়ার জন্যে লোকটার মুখ চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে সে, ভিতরে আরও কিছু ব্যাপার আছে—অ্যাণ্ড হি ওয়াজ রাইট! সেদিন রাতেই তারা দুই-দুইবার অ্যাটেম্‌ট্ নিয়েছে আবদুলের ওপর। খুব হুঁশিয়ার না থাকলে সে রাতেই শেষ হয়ে যেত আবদুল।—যাক, সে কথায় পরে আসা যাবে। আবদুলের অবিশ্বাস্য মন্তব্য মাথার মধ্যে এমন ঘুরপাক খাচ্ছিল যে সে রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারিনি। সকালে উঠেই হাসপাতালে গিয়ে হাজির হলাম। লোকটা কিভাবে মারা গেছে জানেন? পটাশিয়াম সায়ানাইড। কেউ ইনজেক্ট করেছে ওর পিঠে। ইসলাম গায়েব—ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। হাসপাতালে যাচ্ছি বলে সোজা চিটাগাং চলে গেছে।'

'ইসলামকে তুমি কেন সন্দেহ করলে, আবদুল?' আবদুলের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল রানা। পানির নিচে মাঝপথে দেহটা আবদুলের হাতে ছিল, তাকেও তো খুনী হিসেবে সন্দেহ করা যেতে পারে।

'সেটা সাহেবকে বলেছি আমি, উনিই বলুন।' কথাটা বলতে বলতে একটা স্লিপ প্যাড থেকে ঘ্যাঁচ্ করে টান দিয়ে একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নিয়ে কিছু লিখল আবদুল, তারপর লারসেন সাহেবের চোখের সামনে ধরল লেখাটা।

লারসেন সাহেব ওটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, '১৯৬০ সালে যখন চ্যানেল ক্লোজ করা হলো তখন একটা ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ পেয়ে যায়। UTAH এবং IECO আগে থেকে টের পেয়ে সাবধান না হলে (রানার চোখের সামনে কাগজটা ধরল এবার আবদুল। তাতে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা, 'সামবডি লিসেনিং!') আজ আর ড্যাম কম্‌প্লিট করতে হত না। অন্ততঃপক্ষে আরও পাঁচ বছরের জন্যে পিছিয়ে যেত কাজ। সেই ঘটনার পর আবদুল আমার সঙ্গে হাতী শিকারে গিয়ে এই ইসলামের ব্যাপারে সাবধান…'

বিড়ালের মত নিঃশব্দে ডানধারের একটা দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল আবদুল। এক ঝট্‌কায় দরজাটা খুলেই কলার ধরে ভিতরে টেনে আনল একটা লোককে। এত আচমকা ঘটল ব্যাপারটা যে প্রথমে একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিল লোকটা। কান পেতে ঘরের কথাবার্তা শুনছিল সে নিবিষ্ট চিত্তে, হঠাৎ এমন বাঘের থাবা এসে পড়বে কে ভাবতে পেরেছিল! কিন্তু চট করে সামলে নিয়ে এক ঝটকায় আবদুলের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিল দরজার দিকে। কিন্তু ততক্ষণে রানা, লারসেন দু'জনেই এগিয়ে এসেছে। লোকটাকে ধরে পিছমোড়া করে হাত দুটো বেঁধে ফেলা হলো। অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেল না কিছুই।

লারসেন সাহেব থানায় ফোন করে রানার দিকে ফিরে বললেন, 'এ হচ্ছে

আমাদের ডিসপ্যাচ ক্লার্ক মতিন।'এর সম্বন্ধেও আবদুল আমাকে সাবধান করেছিল, আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম ওর কথা।'

কয়েকটা প্রশ্ন করেই বোঝা গেল কোন কথাই বেরোবে না মতিনের পেট থেকে। পরিষ্কার বলে দিল মতিন, 'নিশ্চিত মৃত্যুর চাইতে জেলের ভাত খেয়ে বেঁচে থাকা অনেক ভাল। একটা কথাও বের করতে পারবেন না আমার কাছ থেকে, যত অত্যাচারই করেন না কেন।'

রানা ভাবল—কথা তোমাকে বলতেই হবে বাছাধন। স্কোপালামিন ট্রুথ সেরাম ইন্‌জেকশন পড়লেই মুখে খৈ ফুটবে। কিন্তু কিছুই বলল না সে। মৃদু হেসে মি. লারসেনকে বলল, 'চিটাগাং এসেছিলাম অন্য কাজে, এখন দেখছি এক মহা ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম। যাক্‌, আমি সেদিন সন্ধ্যার সেই জায়গাটা একবার সরেজমিনে দেখতে চাই।'

'চলুন, আপনাকে বোটে করে নিয়ে গিয়ে দেখাব।'

ও.সি.-কে আড়ালে ডেকে কিছু বলল রানা, নিজের আইডেন্টিটি কার্ডও দেখাল, তারপর ফোক্সওয়াগেনের দরজাটা খুলল, ভুরুজোড়া একটু কোঁচকাল, তারপর আবার কি মনে করে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে লারসেন সাহেবকে বলল, 'চলুন, আপনার গাড়িতেই যাই, কথা বলতে বলতে যাওয়া যাবে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আসুন।' ভিতর থেকে পাশের দরজাটা খুলে দিলেন লারসেন।

'আচ্ছা, কালই তো প্রেসিডেন্ট আসছেন, তাই না?' রানা মুখে বলল এই কথা, কিন্তু মনে মনে ভ্রূকুটি করে চিন্তা করল, ফোক্সওয়াগেনের দরজাটা আলগা থাকবার তো কথা নয়! তারপর ভুলে গেল সে কথা।

'হ্যাঁ, লঞ্চঘাটে যাবার সময়ই দেখবেন মাঠের মধ্যে কী সুন্দর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নানান রঙের বাল্‌ব্‌ দিয়ে সাজানো হয়েছে স্টেজটাকে। পাকিস্তান আর ইউ.এস.এ-র পতাকা আঁকা হয়েছে; বন্ধুত্বের এম্ব্লেম্‌ 'দুইহাত' আঁকা হয়েছে। সামনে অসংখ্য লোকের বসবার ব্যবস্থা। প্রেসিডেন্টের সামনে টেবিলের ওপর একটা সুইচ থাকবে পাওয়ার হাউস থেকে কানেক্ট করা। বক্তৃতার পর সেই সুইচ টিপবেন প্রেসিডেন্ট—আর ঝলমল করে জ্বলে উঠবে সমস্ত বাতি। ওপেন হয়ে যাবে প্রজেক্ট। কী চমৎকার নাটকীয় হবে, তাই না?'

স্পীডবোটে উঠে আবদুল একমনে বকে যাচ্ছিল, 'আট বোচ্ছোর ধরে কাজ করছি আমি কাপ্তাইয়ে, হুজুর। আমি যোখোন কারাচী-হায়দ্রাবাদ ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসে কাজ করি, তোখোন হামার এক দোস্ত ছিল বাঙ্গালী—বাড়ি চিটাগাঁও। তার কাছে গোল্পো সুন্‌ছি—ষাট-সত্তুর মঞ্জিল দালান আছে চিটাগাঁওয়ে হাজারে হাজার। ডাবল-ডেক ট্রাম চোলে বহোত চওড়া রাস্তায়। ভাবলাম এ শাহার দেখতে হোবে। যোখোন পারথোম আয়লাম, আদমীকে জিগাই, "ভাইয়া, ডাবল-ডেক ট্রাম চালতা কৌন রাস্তে মে?" কেউ কোথা বুঝে না, ট্রামই দেখে নাই কাভি, বোলে, "হামি জানে না।"

'হামি মনে কোরলাম কে' "হামি জানে না," দুসরা কোঈ গাড়ি হোগা। বার বার বলি, "না না, ডাবল-ডেক ট্রাম, ডাবল-ডেক ট্রাম।" ' হা-হা করে হাসল

কিছুক্ষণ আবদুল।

'ওয়্যাস্ট পাকিস্তানে দুই পোয়সাকে 'টাকা' বোলে। পারথোম যোখোন হোটেলে খেলাম, বিল হোল এক টাকা। হামি ভি খোদার কাছে হাজার শোকর গোজার কোরে দুই পোয়সা বের কোরে দিলাম। দেখি, হোটেলওয়ালা মারতে চায় দিললাগী দেখে।' আবার এক পেট হেসে নিল সে।

'কিন্তু এই পাহাড়ী লোগ বোড়ো ভাল, হুজুর। দাস রাকোম ট্রাইব আছে;— মগ, চাক্‌মা, পাঙকো, তিপরা, খেয়াঙ, কুকী, মোরাঙ, তুঙতুনিয়া, লুসাই—লুসাই হোলো সব কিশ্চান, বোড়ো মেহমান নেওয়াজী। বহোত কাম্‌লা পাওয়া যায় সিখানে। "গুড বাই"-কে বোলে "দাম তা কিঙ-তু," "তুমহারা ক্যয়া নাম"-কে বোলে "নামিঙ তু"...'

হঠাৎ রানার বিস্ফারিত চোখের দিকে চেয়ে থেমে গেল আবদুল। বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে গেল যেন রানার সর্বশরীরে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল সে ড্যামের দিকে। ব্ল্যাকবোর্ডে সুলতার আঁকা নক্সাটা পরিষ্কার ফুটে উঠল ওর চোখের সামনে। এই ছবি! এই ছবিই আঁকছিল সুলতা কবীর চৌধুরীর বাড়িতে ব্ল্যাকবোর্ডের উপর। মনে মনে তিনটে লাল চিহ্ন আঁকল রানা বাঁধের গায়ে। নিঃসন্দেহ হলো সে, যখন ঠিক বাম দিকের চিহ্নটার উপর এসে লারসেন সাহেব বললেন, 'এই সেই স্পট্।'

# সাত

ফিরতি পথে রানার মাথার মধ্যে এত দ্রুত চিন্তা চলল যে গাড়ির মৃদু গুঞ্জন ধ্বনিটা না থাকলে মি. লারসেন আর আবদুল বোধহয় স্পষ্ট শুনতে পেত সে চিন্তা। বিগত দুই দিনের ঘটনাগুলো এক সূত্রে গাঁথা হয়ে গিয়েছে, এখন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার প্ল্যান চলছে রানার উর্বর মস্তিষ্কে। তা হলে দাঁড়াল এই, ভারতীয় ডিনামাইট এই বাঁধের তলায় বসানো হয়ে গেছে। এখন কেবল ফায়ার করবার অপেক্ষা। ওগুলো খুঁজে বের করে ওঠাতে পারলে অকেজো করে দেয়া যেত। এখন প্রথম কাজ, ওগুলো উদ্ধার করা। তারপর চৌধুরীর আস্তানা বের করে ধরতে হবে ওকে। সহজে হাল ছাড়বার পাত্র কবীর চৌধুরী নয়। চারদিকে ছায়ার মত কাজ করছে ওর লোকজন। মস্ত বড় জাল বিস্তার করেছে সে কাপ্তাইয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা করে।—কিন্তু কবীর চৌধুরী বাঁধ ভাঙতে চাইছে কেন? মতলবটা কি ওর?

ছোট্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর এই কাপ্তাই। শান্ত সৌম্য একটা ভাব বিরাজ করছে এর অন্তরের গভীরে। রিজারভয়ের থেকে বাঁশের চালান মাথার উপর দিয়ে রাস্তা পার করে মরা নদীতে নামিয়ে দেবার জন্যে ওভারহেড ক্রেন রয়েছে একটা। এ বাঁশ আসে উত্তর থেকে কর্ণফুলী পেপার মিলসের জন্যে। হাতের ডানদিকে ফিশারীর অফিস। সেই পথে গিয়ে আবার ডান দিকে মোড় ঘুরলেই পাওয়ার হাউস। এক লক্ষ বিশ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে এখনকার এই নীরব পাওয়ার হাউস।

বাঁধ শুরু হবার আগেই সারি সারি অফিসারস্ কোয়ার্টার। বাঁধ পার হয়ে

রাস্তাটা ডানদিকে মোড় ঘুরেছে। নিচে নেমে গেলে বাঁয়ে ডাকবাংলো, ডানে পুলিসের ফাঁড়ি, তারপর আবার বাঁয়ে বাজার। আর বাঁধ থেকে মোড়টা না ঘুরে সোজা চলে গেলে স্পিলওয়ে—উদ্বৃত্ত পানি বের করে দেয়া হয় এখান দিয়ে।

মি. লারসেনের অফিসের সামনে অনেক লোকের ভিড় দেখা গেল দূর থেকে। ব্যাপার কি? দ্রুত চালিয়ে এনে কাছেই পার্ক করলেন মি. লারসেন—তিনজনই লাফিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

তখনও আগুন সম্পূর্ণ নিভে যায়নি। ছিন্ন-ভিন্ন গদিগুলো পুড়ছে এখানে ওখানে। অফিসের সামনে দাঁড়ানো রানার ফোক্সওয়াগেনের ভগ্নাবশেষ এখন এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ে আছে।

জিজ্ঞেস করে জানা গেল মিনিট দশেক আগে এক প্রচণ্ড শব্দ শুনে অফিস থেকে সবাই হুড়মুড় করে বেরিয়ে দেখে গাড়িটার এই অবস্থা। পেট্রল ট্যাঙ্কে আগুন লেগে দাউ দাউ করে জ্বলছে। আশপাশে কেউ ছিল না তখন রাস্তায়—গাড়ির ভিতরেই বোধহয় ছিল বোমাটা।

কেউ টাইম-বম্ব দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে রানার গাড়ি।

অফিস কামরায় ফিরে এসে মি. লারসেন রানার দিকে চেয়ে একটু কাষ্ঠ হাসি হাসলেন। লাল মুখ তাঁর ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। প্রাণহীন হাসিটা মুখ-বিকৃতির মত দেখাল।

'আপনাকে খুন করতে চেয়েছিল ওরা!'

'তা চেয়েছিল।' বিচলিত ভাবটা চেপে রাখল রানা।

'আমার গাড়িতে না গিয়ে যদি ওই গাড়িটায় উঠতেন, তাহলে?' আতঙ্ক কাটছে না বিহ্বল লারসেনের। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন তিনি রানার জন্যে।

'যা হবার তাই হত। এই নিয়েই আমাদের কারবার, মি. লারসেন। যদি আপনার মত করে ভাবতে যেতাম, তাহলে আজই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হত। একদিন হঠাৎ এভাবেই মৃত্যু ঘটবে আমার—কিন্তু এসব কথা যতখানি মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। এখন কাজের কথায় আসা যাক। আমি এই ড্যামের একটা ছবি আঁকব এবং তার গায়ে তিনটে চিহ্ন দেব। তার আগে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি।' একটু থেমে মনে মনে গুছিয়ে নিল রানা কথাগুলো।

'একজন লোক খুব শক্তিশালী এক্সপ্লোসিভ্ দিয়ে ড্যামটা উড়িয়ে দিতে চায়।'

'কেন???' লারসেন সাহেব হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন চোখ দুটো কপালে তুলে। অসাবধানে ধরা মোটা চুরুটটা পড়ে গেল হাত থেকে।

'তা আমি জানি না। টি.এন.টি. এসেছে তার কাছে আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কোন দেশ থেকে। আর আপনাদের কথা শুনে যতদূর বুঝলাম সেগুলো সে ইতিমধ্যেই জায়গা মত বসিয়ে দিয়েছে।'

'লিম্পেট মাইন?'

'আমার মনে হয় ও জিনিসটা জাহাজের জন্যেই উপযুক্ত। এখানে ওরা হাই এক্সপ্লোসিভ টি.এন.টি. ব্যবহার করছে। দূর থেকে রেডিয়ো ট্র্যান্সমিশনের সাহায্যে ফাটানো হবে ওগুলো।'

'মাই গুডনেস, কখন?' আবার কথার মধ্যে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলেন মি. লারসেন।

'তা-ও আমার জানা নেই। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে ফাটাতে পারে। আমি এক সুযোগে ওদের নক্সাটা দেখে নিয়ে মুখস্থ করে ফেলি। এই বাঁধ কতখানি লম্বা তা আমার জানা নেই। আমি শুধু হুবহু ছবিটা এঁকে লাল চিহ্ন দিয়ে দেব তিনটে জায়গায়। আপনি হিসেব করে ঠিক ঠিক জায়গাগুলো বের করে নিয়ে জনাদশেক বিশ্বস্ত ডুবুরী নামিয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজাবেন সে জায়গা।'

'তা না হয় করলাম। কিন্তু পুলিসে খবর দিচ্ছেন না কেন? লোকটাকে ধরতে পারলেই তো সব গোলমাল চুকে যায়। জানেন এটা কতখানি সিরিয়াস ব্যাপার? এই ড্যাম এখন ভাঙলে—ওহ্, জেসাস! গোটা চিটাগাং শহর ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে বঙ্গোপসাগরে চলে যাবে। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, মি. রানা, কত লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাবে। সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় এর কাছে কি! একটা লোকও তো বাঁচবে না এই ভয়ঙ্কর বন্যার হাত থেকে!'

'সবই জানি। কিন্তু পুলিসকে জানিয়ে এখন কোন লাভ নেই। লোকটার আস্তানা কেউ জানে না। একটা গভীর চক্রান্ত দানা বেঁধে উঠেছে এই বাঁধকে ঘিরে। আপনাকে বলেছিলাম, এক কাজে এসে এখানে অন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি; কিন্তু এখন দেখছি দুটো ব্যাপারই এক। যাক, এখন একটা চক বা মোটা শিষের লাল-নীল পেন্সিল দিন, আমি মেঝেতে ছবিটা এঁকে দিয়ে যাই।'

বাম দিকের চিহ্নটা দেখে আবদুল বলল, 'এই জায়াগাটাই তো আপনাকে এখন দেখিয়ে আনলাম! এখন সব কোথা আমি বুঝতে পারছি, হুজুর। মাঝখানের ওই লাল দাগটাতে হামি পরথম দিন ভুড়ভুড়ি দেখ্ছিলাম!'

লারসেনের একান্ত অনুরোধে আজকের দিনের জন্যে তাঁর গাড়িটা ব্যবহার করতে রাজি হলো রানা। সোয়া একটা বাজে এখন। চাঁদি ফাটানো কড়া রোদ উঠেছে। লারসেনের এয়ার-কুলড্ ঠাণ্ডা অফিস থেকে বেরিয়ে এসেই অসম্ভব গরম লাগল রানার। চিট্পিট্ করে উঠল পিঠটা। বিকেলের দিকে ঝড় উঠতে পারে।

দুপুরেই উঠল সে ঝড় সুলতার মনে।

'তোমার গাড়ি কি হলো?' সুলতা এগিয়ে এল রানাকে দেখে।

'টাইম্-বম্ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে কবীর চৌধুরী।'

সুলতা ভাবল, একটু আগে যে লোকটা এসেছিল সে তাহলে সত্যি কথাই বলেছে! সে অবশ্য বলেছিল মাসুদ রানাও ছাতু হয়ে যাবে সেই সঙ্গে।

'তোমার কিছু হয়নি?'

'আমি তখন এই গাড়িতে ছিলাম। কিন্তু কি ব্যাপার, সুলতা—তোমার চোখ-মুখ এমন মলিন কেন? কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে রানা।

'একটা কথা সত্যি করে বলবে?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুলতার মুখের দিকে চেয়ে ওর মনের কথা অনেকখানি বুঝে ফেলল রানা। মৃদু হেসে বলল, 'বলব।'

'তোমার সত্যিকার পরিচয় কি?'

'আমি পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানা।'

দুই হাতে নিজের দুই কান চেপে বন্ধ করল সুলতা। একথা সে শুনতে চায় না! একথা ও বিশ্বাস করে না! না, না, এ হতেই পারে না! এ হতেই পারে না! ও মাসুদ রানা নয়, ও সুবীর, আমার সুবীর!

'টেলিগ্রামটা দেখি।' গলাটা একটু ভেঙে আসে সুলতার।

পকেট থেকে বের করে দিল রানা টেলিগ্রাম। সুলতা পড়ল:

সেন হসপিটালাইযড্ অ্যাট ঢাকা স্টপ নেগোসিয়েশন ব্রোক ডাউন স্টপ ক্লোজ ডিল উইথ নিউ কোম্পানী স্টপ ফর সলভেনসি রেফার চৌধুরী।

কয়েকবার লেখাগুলোর উপর চোখ বুলাল সুলতা। ধীরে ধীরে অক্ষরগুলো এলোমেলো ঝাপসা হয়ে গেল। টপ-টপ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল টেলিগ্রামটার উপর। তারপর ছিঁড়ে কুটিকুটি করে দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল কাগজটা জানালা দিয়ে বাইরে।

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম···আমি, আমি ভেবেছিলাম···' একটু থামল সুলতা, 'বলো, তুমি এভাবে আমার সঙ্গে প্রতারণা করলে কেন?' আহত সাপিনীর মত চাপা গর্জন করে উঠল সুলতা, 'বলো, কেন এইভাবে প্রতারণা করলে তুমি! ভাব দেখালে, ভালবাসো···'

'আমি তোমার কোন ক্ষতি করিনি, সুলতা। বরং তুমিই এসেছ আমার দেশের সর্বনাশ করতে। ভেবে দেখো।'

কিছু খেলো না সুলতা। কখনও কি স্বপ্নেও ভেবেছিল এতবড় আঘাত পাবে সে! যার সান্নিধ্যে এসে মনে হয়েছে ধন্য হলাম, পরিপূর্ণ হলাম—যাকে বিশ্বাস করলাম পরম নিশ্চিন্তে, সে বলছে, আমি অফিসের হুকুমে তোমার সাথে অভিনয় করেছি মাত্র। এখন নিশ্চয়ই তাকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেবে মাসুদ রানা। কথাটা মনে হতেই শিউরে উঠল সুলতা। নয়া দিল্লীতে প্রথম যখন চাকরিতে যোগ দিল তখন থেকেই এই নাম শুনে আসছে সে। রানার নামে আলাদা একটা মোটা ফাইলে নিত্য নতুন রিপোর্ট সে নিজ হাতে গেঁথে রেখেছে। লাল ফিতে বাঁধা মোটা ফাইলটা এখনও চোখে ভাসে সুলতার। কতদিন পাতা উল্টিয়ে পড়েছে সে এর ভয়ঙ্কর, দুর্ধর্ষ, রোমহর্ষক কার্যকলাপের বিবরণ। অদ্ভুত কৌশলী, বুদ্ধিমান এবং দৃঢ়চেতা এই যুবককে তাদের সার্ভিসের কে না ভীতির চোখে দেখে? আজ ভুল করে এরই মায়াজালে আটকে মরণ হবে সুলতার কে ভাবতে পেরেছিল?

রানারও খাওয়া হলো না কিছু। একটা সোফায় বসে চোখ বন্ধ করে মাথাটা এলিয়ে দিল সে পিছন দিকে। ভাবছে, এলো বিদায়ের পালা। কতটুকুই আর চিনি একে—কাল দুপুর থেকে আজ দুপুর—চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কত যুগের পরিচয়, জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধুত্ব। একে বিদায় দিতে বুকটা আজ এমনি করে পুড়ছে কেন?

চোখ বন্ধ করেও মানুষ দেখতে পায়। অস্পষ্ট একটা ছায়া দেখে ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা। দেখল তার কপাল থেকে ছয় ইঞ্চি দূরে সুলতার হাতে ধরা অ্যাস্ট্রা পিস্তলটা লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে।

'ধরা পড়বার আগে তোমাকে শেষ করে দিয়ে যাব, মাসুদ রানা। মৃত্যুর জন্যে

প্রস্তুত হয়ে নাও।'

মৃদু হেসে রানা বলল, 'আমি প্রস্তুত। মারো।'

'বাধা দেয়ার চেষ্টা করছ না কেন?' বিস্মিত হয় সুলতা।

'আমি দুর্বল, তাই।' হাসছে রানা।

কিছুক্ষণ সমস্ত ইচ্ছাশক্তি একত্রিত করেও যখন ট্রিগার টিপতে পারল না সুলতা, তখন রানা বলল, 'সেফটি ক্যাচ্টা অফ্ করে নাও, তবে না গুলি বেরোবে!'

কয়েক মুহূর্ত পাগলের মত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে রানার চোখে চোখে চেয়ে থেকে পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সুলতা। তারপর জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আরও পাঁচ মিনিট কেটে গেল নীরবে।

'লতা,' মনটা স্থির করে ডাকল রানা।

'বলো।' নির্বিকার কণ্ঠ সুলতার।

'তোমার কাছে কেউ এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'নিরাপদে কলকাতায় পৌঁছে দেয়ার কথা বলেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আমি বেরিয়ে গেলেই আবার সে আসবে, তাই না?'

চুপ করে থাকল সুলতা। মৃদু হেসে রানা বলল, 'আজ বিদায়ের ক্ষণে অবিশ্বাস না-ই বা করলে, লতা।'

রানার কণ্ঠে এমন একটা আন্তরিক আকৃতি ছিল যে ঘুরে দাঁড়াল বিস্মিত সুলতা, কিছুক্ষণ ওর চোখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'আসবে।'

'তুমি তার সাথে চলে যেয়ো, লতা। কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। তোমার সুটকেস যাতে তুমি ফিরে পাও সে ব্যবস্থাও আমি করব, কথা দিচ্ছি।'

'আমাকে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর জেনেও ছেড়ে দেবে?' ঠিক বিশ্বাস করতে ভরসা হচ্ছে না সুলতার।

'হ্যাঁ, ছেড়ে দেব। তোমাকে আটকে রাখায় এদেশের কোন লাভ নেই। তোমার কাছে এমন কোন তথ্য নেই যাতে আমাদের কোন উপকার হতে পারে। তাই তোমাকে মুক্তি দেব। অবশ্য নিজের ইচ্ছে মত তোমাকে ছেড়ে দেয়ায় আমাকে জবাবদিহি করতে হবে—কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি চলে যাও, লতা। তোমাকে আমি নিরাপদে চলে যাওয়ার সুযোগ দেব।'

'আর কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ। আর একটা ছোট্ট, সাধারণ অথচ অবিশ্বাস্য কথা বলব। কলকাতায় ফিরে গিয়ে কথাটা মনে পড়লে হাসি আসবে তোমার। তোমার কাছে এর কোন মূল্য নেই বলেই হয়তো চিরকাল এটা অমূল্য হয়ে থাকবে আমার কাছে। তোমার ক্ষতি আমি চাই না, তোমাকে আমার ভাল লেগেছিল, লতা। কথাটা বিশ্বাস কোরো।'

কথা শেষ করেই দ্রুত লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে যাচ্ছিল রানা ঘর থেকে, হঠাৎ জামার হাতায় টান পড়ল। ঘুরে দেখল সুলতা।

'যদি আমি না যাই?'

'যাবে না কেন?'

'কেন যাব! আমি তোমাকে ভালবেসেছি, রানা!' মাথাটা নিচু করল সুলতা একটু।

'সে তো সুবীর সেন মনে করে!'

'যদি বলি যাকে মন দিয়েছি তার নাম সুবীর হোক বা রানা হোক কিছুই এসে যায় না, মানুষটা সে একই—তবে তার পাশে চিরদিনের মত একটু স্থান পাব?'

'পাবে।'

'এক্ষুণি একবার থানায় আসতে পারবেন, মি. মাসুদ? আমি আতাউল হক, এস.পি. চিটাগাং, বলছি। আমি স্পেশাল ডিউটিতে কাপ্তাইয়ে আছি।' টেলিফোনে গলাটা একটু উত্তেজিত শোনাল।

এঁর সাথে আগে থেকেই পরিচয় আছে রানার। চিনতে পারল গলার স্বর এবং সিলেটি উচ্চারণ।

'আসতে পারি। কিন্তু ব্যাপার কি?'

'আপনার কথামত লোক পাঠিয়েছিলাম। সেই চক্চকে তারটার এই মাথায় একটা ক্যামেরা বসানো আছে। আশ্চর্য ব্যাপার! শিগগির চলে আসুন, নিজ চোখে দেখবেন।'

'আমি এক্ষুণি আসছি।'

'আরও একটা খবর, হ্যালো, হ্যালো…'

'বলুন, ধরেই আছি।' রিস্টওয়াচটা দেখল একবার রানা।

'কিছুক্ষণ আগে যাকে হ্যাণ্ডওভার করলেন ও.সি.-র কাছে, সেই মতিনকে মেরে ফেলেছে ওরা গুলি করে। থানায় এনে যেই জিপ থেকে নামানো হয়েছে অমনি একটা গুলি এসে লাগল একেবারে হৃৎপিণ্ডে। এক গুলিতেই শেষ। কোন আওয়াজ পাওয়া যায়নি গুলির। খুব সম্ভব সাইলেন্সার লাগানো রাইফেল দিয়ে মেরেছে বহুদূর থেকে। আপনি গাড়ি নিয়ে একেবারে ভেতর চলে আসবেন দালানটা ঘুরে থানার পেছন দিক দিয়ে। গাড়ি বারান্দায় গাড়ি থেকে নামবেন না। বুঝেছেন? রাখি, আপনি চলে আসেন।'

জেনারেল প্রিসিশন ইনক., ইউ.এস.এ.-র তৈরি শক্তিশালী সি.সি.টিভি. ক্যামেরা। একটা টিলার গায়ে জঙ্গলের মধ্যে বাঁধের দিকে মুখ করে বসানো। রোদ-বৃষ্টি থেকে আড়াল করবার জন্যে, এবং কিছুটা ক্যামোফ্লেজের উদ্দেশ্যে লেন্স ছাড়া বাকি সব সবুজ প্লাস্টিক দিয়ে ঢাকা।

'এ তারের আরেক মাথা কোথায় গেছে বের করা দরকার,' রানা বলল।

'জিপ দিয়ে অনেক আগেই লোক পাঠিয়ে দিয়েছি। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আশা করি ফিরে আসবে খবর নিয়ে,' আতাউল হক জবাব দিলেন।

'গোপনীয়তার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন তো?'

'হ্যাঁ। বলে দিয়েছি দূর থেকে দেখেই যেন ফিরে আসে।'

'ভাল করেছেন। খবরটা এলেই যেন আমি পাই সে ব্যবস্থা করবেন দয়া করে।

আমি যাচ্ছি এখন মি. লারসেনের অফিসে।'

লারসেনের অফিস থেকেই চিটাগাং-এ আবদুল হাইয়ের কাছে ফোন করল রানা। কিন্তু আসল কথাটাই জানা গেল না। কবীর চৌধুরীর গোপন আস্তানা বের করতে পারেনি আবদুল হাই। কেউ নাকি বলতে পারে না। এইটুকু কেবল জানা গেল, রাঙামাটির সাত-আট মাইল দক্ষিণে প্রায় দুই বর্গমাইল জায়গা কিনে নিয়েছিল কবীর চৌধুরী আট বছর আগে। এখন সব চলে গেছে রিজারভয়েরের পানির তলায়। ওখানে কোন আস্তানা থাকবার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

চৌধুরী এখন কোথায়, সে প্রশ্নের উত্তরে হাই বলল, সে গা ঢাকা দিয়েছে। সারা চিটাগাং শহরে ওর চিহ্নমাত্র নেই। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে কোথাও ওর নামে এক আঁচড় কালির দাগও নেই। তবে একবার মোটর পার্টস ইমপোর্ট করবার লাইসেন্স দিয়ে সে অদ্ভুত কতগুলো যন্ত্র…

কথা শেষ হবার আগেই টেলিফোনের কানেক্শন্ কেটে গেল। কিছুক্ষণ বিভিন্ন রকমের শব্দ হওয়ার পর নীরব হয়ে গেল রিসিভার।

এমনি সময়ে ঘরে ঢুকল আবদুল।

'পেলে কিছু?' লারসেন সাহেবই প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন।

'না, হাজুর। ওই তিন জায়গায় না পেয়ে তামাম বাঁধ চষে ফেলেছি আমরা কয়জন। কোথাও কিছু নেই। আর থাকলেও, হাজুর, বুঝবার উপায় নেই।' উর্দু ইংরেজিতে মিশিয়ে বলল ভগ্নমনোরথ আবদুল নিরুৎসাহিত কণ্ঠে।

'আচ্ছা, আবদুল, তুমিতো এই অঞ্চল খুব ভাল করে চেনো। কবীর চৌধুরী বলে কারও নাম শুনেছ কখনও?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'না, হাজুর, এ নাম শুনিনি। দেখলে হয়তো চিনতে পারি।'

'রাঙামাটি এখান থেকে কতদূর?'

'তেরো মাইল।'

'তাহলে কাপ্তাই থেকে পাঁচ-ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে মাইল দুয়েক জায়গা কিনে নিয়ে একজন লোক…'

'হাঁ, হাজুর! পাগলা এক লোগ ছিল সেখানে। এক টেঙরী থোড়া ল্যাংড়া ছিল। একবার বোড়ো দাবৃড়ি লাগাইছিল আমাদের। শিকারে গিয়ে…'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে-ই কবীর চৌধুরী। রাতের বেলায় সেই জায়গাটা চিনতে পারবে তুমি প্রয়োজন হলে?'

'ইনশাল্লাহ্। কিন্তু সে সব জমিন তো পানির নিচে চলে গেছে, হাজুর।'

'এক আধটাও উঁচু টিলা কি নেই, যেখানে এখনও পানি ওঠেনি?'

মি. লারসেন মাঝখান থেকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি মনে করেন এক আধটা টিলা যদি পানির ওপর মাথা তুলে থাকেই, সেখানে এখনও লোকটার আড্ডা আছে?'

'তা ঠিক নিশ্চিত করে বলতে পারছি না, তবে আমার সেই রকমই সন্দেহ। মোটর বোটে যখন সে এখানে লোক পাঠাচ্ছে, তখন এ সন্দেহটা একেবারে অমূলক নয়।'

রানা ভাবছে, দুটো মাত্র উপায় আছে। এক, ডিনামাইট খুঁজে বের করে অকেজো করে দেয়া। দুই, চৌধুরীর আড্ডা বের করে ওকে বাধা দেয়া।

ডিনামাইট তো তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না। সেটা পাওয়া গেলে হাতে কিছু সময় পাওয়া যেত। এখন যে-কোন মুহূর্তে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। তাই যে করে হোক চৌধুরীর আড্ডা বের করা চাই-ই চাই। এবং আজই রাতে। একমাত্র ভরসা টেলিভিশন ক্যামেরার তার। দেখা যাক, কি দাঁড়ায়। মনের উত্তেজনাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করল সে।

রেস্ট হাউসে ফিরে রানা দেখল ঘর খালি। বাথরুমের দরজাও খোলা হাঁ করা। সুলতা নেই। গেল কোথায়! একই মুহূর্তে অনেক চিন্তা ছুটোছুটি করল রানার মাথার মধ্যে। ছুটে গিয়ে ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করল। কেউ কিছুই বলতে পারল না। কেউ দেখেনি সুলতাকে বেরিয়ে যেতে।

মনে মনে একটা বিষণ্ন হাসি হাসল রানা। চলে গেছে সুলতা। যাবার আগে অমন অভিনয় না করলেও তো পারত! ঘরটা একেবারে খালি খালি লাগল রানার কাছে। জোর করে মাথা থেকে সব চিন্তা দূর করে শুয়ে পড়ল সে বিছানায় এসে। বিশ্রাম দরকার।

জানতেও পারল না রানা, মাত্র একশো গজ দূরে একটা খালি বাড়ির গ্যারেজের মধ্যে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে অসহায় সুলতা রায়।

ঠিক সাড়ে ছ'টায় এস.পি. সাহেব এসে ঘুম ভাঙালেন রানার।

'তারের শেষ মাথা পাওয়া গেল?' প্রশ্ন করল উদগ্রীব রানা।

'নাহ্। মাইল পাঁচেক রাস্তার পাশ দিয়ে গিয়ে তারটা চলে গেছে ডানধারে দুর্গম পাহাড়ের ওপর দিয়ে। আমাদের লোক সেই পাহাড় ডিঙিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিল—কিন্তু তারের শেষ আর পায়নি। পানির মধ্যে চলে গেছে তারটা। ওখান থেকেই ফিরে এসেছে ওরা।'

'সন্ধ্যার পর ঠিক যেখানে তারটা পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে, সেই রাস্তায় আমাকে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন, মি. হক?'

'নিশ্চয়ই, এ আর এমন কি কথা হলো।'

হাত-মুখ ধুয়ে নিল রানা। চা খেতে খেতে এস.পি. সাহেব বলেই ফেললেন, 'হঠাৎ কী আরম্ভ হয়ে গেল কাপ্তাইয়ে, মি. রানা, কিচ্ছু তো বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন?' সিগারেটে লম্বা এক টান দিয়ে নিয়ে নড়েচড়ে বসলেন এস. পি.। রানা বলল সব কথা।

'তা হলে তো থানায় ফিরে যাওয়া নিরাপদ নয়। পানির লেভেলের অনেক নিচে ফাঁড়িটা—আমার কোয়ার্টারও নিচে। যে কোন মুহূর্তে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে আমাদের!' শঙ্কিত এস. পি. বেসামাল হয়ে পড়লেন সব শুনে।

'আপনি নিজের কথা ভাবছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের কী অবস্থা হবে ভাবুন একবার। আর কাল যদি প্রেসিডেন্ট পৌঁছবার পর পরই বাঁধটা ভাঙে, তাহলে?'

'ভয়ঙ্কর, মি. রানা! সাঙ্ঘাতিক প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার! এখন লোকটাকে বাধা দেবার জন্যে কি করতে চান? পুলিস ফোর্স দেব আপনার সঙ্গে?'

'তাতে কোন লাভ হবে না। সতর্ক হয়ে গেলেই পালিয়ে যাবে কবীর চৌধুরী ওর আস্তানা থেকে। তারপর যে-কোন জায়গা থেকে রেডিও ট্র্যান্সমিটার দিয়ে উড়িয়ে দেবে এ বাঁধ। ওকে কোন উপায়ে আচমকা অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরতে হবে।

ফোর্স নিয়ে গিয়ে লাভ নেই—আমি একা যাব।

আবদুল এসে দাঁড়াল। রানা তখন জিপে উঠে বসেছে।

'আমিও যাব, হাজুর!' আবদুলের কণ্ঠে অনুনয়।

'যে-কোন রকমের বিপদ ঘটতে পারে, আবদুল। তুমি থাকো, একাই যাব আমি।'

'হাজুর, বিপোদ হামি ডোর পায় না; হামি সাথে থাকলে বহোত আসানি হোবে আপনার—পাহাড়ে পাহাড়ে আট বোচ্ছোর চলসি আমি।'

ও. সি.-ও আবদুলের কথায় সায় দিলেন। যে-কোন ভয়ঙ্কর কাজে যেতে এই আবদুলের খোঁজ পড়ে সব সময়। শেষ পর্যন্ত আবদুলের একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারল না রানা। ওকেও নিতে হলো সাথে।

আবদুলের কথার সত্যতা প্রমাণ হলো পাহাড়ে কিছুদূর চলেই। দিনের বেলা হয়তো কষ্টে-সৃষ্টে আছড়ে-পাছড়ে এই পাহাড়ী পথে চলা রানার পক্ষে অসম্ভব হত না, কিন্তু আবদুল না থাকলে এই রাতে সত্যিই চোখে আঁধার দেখত সে। ঝোপ-ঝাড় আর কাঁটার মধ্যে দিয়ে গা বাঁচিয়ে একটার পর একটা উঁচু-নিচু টিলা পার হয়ে চলল ওরা। মাঝে মাঝে বন্য জন্তু জানোয়ারের তৈরি পথ পেয়ে যাচ্ছে ওরা—কিছুদূর ভালই চলছে, কিন্তু আবার টেলিভিশন-তারটাকে অনুসরণ করতে গিয়ে বিপথে চলতে হচ্ছে ওদের। দুর্গম গোটা কতক খাড়াইয়ে আবদুল আগে উঠে গিয়ে টেনে তুলল রানাকে।

মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে টেলিভিশনের তার দেখে নিচ্ছে ওরা। হঠাৎ ছুরি বের করল আবদুল। পিছন ফিরে কানে কানে রানাকে বলল, 'পিস্তোল থাকলে রেডি হয়ে যান, হাজুর, কি যেন আসতেছে এদিক!'

দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। আধ মিনিট পর রানা শুনতে পেল সামনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কিছু একটা এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। আবদুলের অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তির প্রমাণ আগেই পেয়েছিল রানা লারসেনের অফিসে, তাই এত আগে থেকে সাবধান হয়ে যাওয়ায় বিস্মিত হলো না। শব্দটা কিসের ঠিক বোঝাও গেল না। হাত দশেক সামনে এসে থমকে থাকল দু'তিন সেকেণ্ড, তারপর ডান দিকে চলে গেল শুকনো পাতার ওপর দিয়ে মচ্ মচ্ শব্দ তুলে। কোন বন্য জানোয়ার হবে।

'এদিকে বাঘ-টাঘ আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আছে, হাজুর।'

টর্চ জ্বাললে মাঝে মাঝে ওদের সচকিত করে দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে ছোট ছোট ভীতু খরগোশ কিংবা শিয়াল। ওরা থামলেই শুনতে পায় আশেপাশে সাবধানী পদক্ষেপ। রানার মনে হলো সবাই যেন নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ওদের পিছন পিছন আসছে। হঠাৎ এক-আধটা প্যাঁচা ডেকে উঠছে। অশুভ ইঙ্গিত। ছমছম করে ওঠে গা।

একটা ঠাণ্ডা ভেজা দমকা হাওয়া আসতেই দু'জন একসাথে চাইল আকাশের দিকে। পুব দিকে পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু পশ্চিমের আকাশ ঘন অন্ধকার। আসছে কালবৈশাখী ঝড়।

একটু পরেই ঝড় উঠল—তার অল্পক্ষণ পর শুরু হলো বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি।

চাঁদটা মেঘে ঢাকা পড়তেই চারিটা দিক সূচীভেদ্য অন্ধকারে ছেয়ে গেল। একটা বড় গাছের তলায় আশ্রয় নিল ওরা। ঠাস ঠাস ডাল ভেঙে হুড়মুড় করে পড়ছে এদিক ওদিকে। রানার রিস্টওয়াচে বাজে সাড়ে আটটা।

'না, আবদুল। আর অপেক্ষা করা চলে না, এরই মধ্যে এগোতে হবে।' আধঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে মনস্থির করে ফেলল রানা।

এবার পথ চলা আরও দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। পাহাড়ী আঠালু মাটি পিচ্ছিল হয়ে গেছে বৃষ্টির পানিতে। এক জায়গায় পা ফেললে অন্য জায়গায় চলে যেতে চায়। তার উপর দমকা ঝোড়ো হাওয়া এক ইঞ্চিও এগোতে দিতে চায় না।

উঁচু পাহাড়ের গায়ে গভীর খাদ। তারই পাশ দিয়ে যেতে হবে প্রায় গজ বিশেক। একটু পা ফসকালে একেবারে দু'তিন শ' গজ নিচে গিয়ে পড়তে হবে। অর্থাৎ একেবারে ছাতু। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে এগোল ওরা। কিন্তু সাবধানেরও মার আছে। হঠাৎ পা পিছলে গেল রানার। এক হাতে পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা একটা শিকড় ধরল রানা, কিন্তু তা-ও গেল ছিঁড়ে। চট করে ওর একটা হাত ধরে ফেলল আবদুল, কিন্তু সাথে সাথে নিজেও গেল পিছলে। সড় সড় করে হাত ধরাধরি করে পনেরো ফিট নেমে এসে একটা গাছের গুঁড়িতে আটকে গেল দু'জন। ঠিক সময় মত আবদুল ধরে ফেলতে না পারলে একেবারে খাদের নিচে গিয়ে পড়ত রানা।

'চোট তো লাগে নাই, হাজুর!'

মৃদু হেসে রানা ভাবল, একেই আমি সন্দেহ করেছিলাম। মনে করেছিলাম, ইসলাম না হয়ে এ-ও সেই লোকটাকে খুন করে থাকতে পারে পানির তলায়!

তিন মাইল এভাবে চলবার পর দেখা গেল সত্যিই পানির মধ্যে চলে গেছে তারটা। বোঝা গেল, আর খুব বেশি দূরে নেই গন্তব্যস্থল।

পানিতে নেমে পড়ল দু'জন। কোয়ার্টার মাইলটাক তার ধরে এগোবার পর সামনে একটা উঁচু পাহাড় দেখা গেল। বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ। ছোট-বড় কালো-সাদা হরেক রকমের মেঘ মাঝে মাঝে চাঁদটাকে আড়াল করছে। যেই হাওয়ায় ভেসে সরে যাচ্ছে মেঘগুলো, অমনি আবার ফিক্ করে হেসে উঠছে চাঁদ, ছোট ছোট ঢেউগুলোর মাথায় ঝিলমিল করছে তার আলো। পাহাড়টার কাছাকাছি আসতেই রানা দেখল পানির নিচে একটা লোহার পোস্ট পোঁতা। সেখানে এসে তারটা পোস্টের মধ্যে ঢুকেছে। পোস্টের চারদিকে হাতড়ে আবার তারটা পাওয়া গেল—সোজা চলে গেছে পাহাড়টার দিকে।

এগোতে গিয়েও কি মনে করে থেমে গেল রানা। আবদুলকে একটু অপেক্ষা করতে বলে দু'হাতে পোস্টটাকে বেষ্টন করে ডুব দিল। একটু পরেই হাত দশেক বাঁয়ে ভেসে উঠল সে। ফিরে এসে পোস্টটা আঁকড়ে ধরে বিশ্রাম নিল সে আধ মিনিট, তারপর বলল, 'আমাদের বাঁ দিকে যেতে হবে, আবদুল।'

'কেন, হাজুর, তার তো গেছে ওই পাহাড়টার দিকে।'

'ওটা একটা ভাঁওতা। ওটা অন্য তার। আসল তার এই থামের দশ ফুট নিচে দিয়ে বেরিয়ে বাম দিকে চলে গেছে। সামনের তার ধরে গেলে কিছুই পাওয়া যাবে না।'

আবদুলও ডুব দিয়ে হাত দশেক বাঁয়ে ভেসে উঠল। কাছাকাছিই ছিল রানা। বলল, 'এবার আমি ডুব দিয়ে আরও কিছুদূর এগোব তার ধরে, তারপর আবার ডুব দেবে তুমি।'

এইভাবে প্রায় পাঁচ-ছয়শো গজ যাবার পর ধীরে ধীরে পানির ওপর থেকে তারটার দূরত্ব কমে গেল। একটানা এতক্ষণ সাঁতরাবার পর দু'জনেই হাঁপাচ্ছে কামারের হাপরের মত আওয়াজ করে। কিছুক্ষণ চিৎ-সাঁতার দিয়ে এক জায়গায় পানির ওপর ভেসে থেকে জিরিয়ে নিল ওরা। তারপর পা দিয়ে আলতো করে তারটা ছুঁয়ে এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে 'ব্রেস্ট্ স্ট্রোক্' দিয়ে।

হঠাৎ রানার দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে সড়াৎ করে বেরিয়ে ওকে জোরে একটা লেজের বাড়ি মেরে নিজেই ভয় পেয়ে পাঁচ হাত শূন্যে লাফিয়ে উঠল একটা মস্ত বড় রুই মাছ। ছপাৎ করে ওটা আবার পানিতে পড়তেই হেসে উঠল আবদুল মৃদুস্বরে।

'হঠাৎ ডর্ লাগিয়ে দিছিল, হাজুর। এ মাছ দু'বরস আগে এ পানিতে ছাড়ল ফিশারী ডিপাটমেন্ট। সওয়া উনিশ লাখ টাকা খোরচা করছে তিনারা। বিয়াল্লিশ লাখ টাকা ইনকাম্ হোবে, হাজুর। এ বোড়ো আচ্ছা বিজ্নিস।'

আরও আধ মাইল এগোবার পর পানি থেকে আট-দশ ফুট উঁচু একটা টিলার মাথা দেখা গেল। তারটা সোজা চলে গেছে সেই ডুবুডুবু টিলার দিকে।

হতাশ হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল আবদুল। একটা আঙুল ঠোঁটের উপর রেখে চাপা স্বরে রানা বলল, ' শ্ শ্ শ্!'

একেবারে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল ওরা টিলাটার দিকে। দশ গজ বাকি থাকতেই রানা লক্ষ করল টিলার মাথায় কিছু একটা কাঁচের জিনিস চাঁদের আলোয় ঝিক্ করে উঠল একবার। থেমে পড়ল রানা। ওটা একটা রাডার। চারকোণা মুখের এই 'ডেকা' রাডার স্ক্যানার চারদিকে নজর রাখবার জন্যে বড় বড় জাহাজের ব্রিজের ওপর থাকে। টিলার ওপর ঘুরছিল রাডারটা, হঠাৎ রানাদের দিকে চেয়ে থেমে গেল। অবাক বিস্ময়ে যেন প্রশ্ন করছে নীরবে, 'কে তোমরা? কি চাও এখানে?'

ধড়াস করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। আবদুলকে ডুব দেয়ার ইঙ্গিত করে নিজেও ডুব দিল পানির তলায়। কিন্তু এত আলো কিসের? পানির ভেতর চোখ খুলেই টের পেল রানা যে উপরটা এখন আলোকিত। ধরা পড়ে গেছে, পালাবার আর পথ নেই। মরিয়া হয়ে ভেসে উঠল সে উপরে। সার্চ লাইটের তীব্র আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ। ঠিক এমনি সময়ে শক্ত একটা রশির ফাঁস এসে পড়ল গলায়। কয়েকটা হেঁচকা টানে চোখে সর্ষে ফুল দেখতে দেখতে ডাঙায় এসে ঠেকল রানার দেহ। প্রথমেই ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে চুপচুপে ভেজা শোল্ডার-হোলস্টার থেকে বের করে নেয়া হলো পিস্তলটা।

আবদুলকেও একই উপায়ে টেনে আনা হলো—কিন্তু বন্দী হবার আগেই বিদ্যুৎগতিতে কোমর থেকে ছোরা বের করে আমূল বসিয়ে দিল সে সামনের লোকটার বুকের মধ্যে। তীক্ষ্ণ একটা অপার্থিব চিৎকার দিয়ে পড়ে গেল লোকটা পানিতে। ততক্ষণে ছুরিটা টেনে বের করে নিয়ে আবদুল পাশের লোকটার কাঁকালে বসাতে যাবে, এমন সময় গর্জে উঠল একটা থম্সন্ মেশিনগান।

তিন সেকেণ্ড একটানা বিশ্রী শব্দ বেরোল মেশিনগান থেকে। করডাইটের

উৎকট গন্ধ এল নাকে।

চালুনির মত ফুটো ফুটো ঝাঁঝরা হয়ে গেল আবদুলের প্রশস্ত বুক। অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। লুটিয়ে পড়ল রানার পায়ের কাছে ওর প্রাণহীন দেহটা।

এবার ধীরে ধীরে মেশিনগানের মুখটা ফিরল রানার দিকে। অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে সেটার মুখ থেকে। লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে যেন রানার বুকের দিকে।

চারদিকে অথৈ জল, আকাশে শুক্লা ত্রয়োদশী, আর সেই সাথে মৃদুমন্দ জোলো হাওয়া।

নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো রানার।

# আট

নিশ্চিত মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে রানা। আবদুলের কথা ভাববার সময় এখন নয়, তবু নিজেকে মস্তবড় অপরাধী মনে হলো। ওর এই আকস্মিক নির্মম মৃত্যুর জন্যে মনে মনে নিজেকে দায়ী করল রানা। এই মৃত্যুর ফাঁদে কেন সে আনতে গেল ওকে। কবীর চৌধুরীর ভয়ঙ্কর রূপ কি সে চিটাগাং-এই দেখেনি? তবু আজ এ দুঃসাহস করতে গেল কেন সে? আরও অনেক ভাবনা চিন্তা করে অনেক সাবধানে পা বাড়ানো উচিত ছিল ওর। একটু পরেই লুটিয়ে পড়বে ওর প্রাণহীন দেহটা আবদুলের পাশে। তীক্ষ্ণ এক মরণ চিৎকার বেরিয়ে আসবে ওর মুখ দিয়ে। কিন্তু এ মৃত্যুতে লাভ তো কিছুই হলো না। রাহাত খান শুনলে কাঁচাপাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে বলবেন 'ফুলিশ'। মেশিনগানধারীর উদ্দেশে মনে মনে বলল, 'জলদি কর্, হারামজাদা, দেরি করছিস কেন, যা করবি কর্ তাড়াতাড়ি!'

'চলো, আগে বাড়ো।' ঠেলা দিল পিছনের লোকটা।

সামনের লোকটাও এবার মেশিনগানের মাথা দিয়ে ডানদিকে ইঙ্গিত করল। 'কোন রকম শয়তানির চেষ্টা করলে ওই নির্বোধ পাঠানের অবস্থা করে দেব। সাবধান।'

দুই পা এগিয়ে কি মনে করে থামল রানা। ঘুরে দাঁড়াল আবদুলের দিকে মুখ করে। মৃতদেহটার দিকে চেয়ে মনে মনে বলল, 'তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি নেব, আবদুল, প্রতিজ্ঞা করলাম।' তারপর এগিয়ে গেল সামনে।

টিলার মাথায় সযত্নে ঘাস আর উলুখাগড়া লাগানো বেশ খানিকটা অংশ নিচু হয়ে সরে গেল এক পাশে। সিঁড়ি নেমে গেছে ভিতরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। উজ্জ্বল না হলেও স্বচ্ছ আলোয় আলোকিত ভিতরটা। পাক খেয়ে খেয়ে সতেরো-আঠারো ধাপ নামতেই একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। দু'ভাগ হয়ে সরে গেল দরজাটা দু'পাশের দেয়ালের মধ্যে। সামনে প্রশস্ত একটা চারকোণা ঘর। জানালা নেই একটাও, শুধু চার দেয়ালের গায়ে বড় বড় চারটে দরজা।

পরিষ্কার আলোতে এসে আবদুলের হত্যাকারীর দিকে ভাল করে চাইল রানা। লোকটা বেঁটে। খুব বেশি হলে সোয়া পাঁচ ফুট উঁচু হবে। কিন্তু শরীর তো নয়, যেন পেটা লোহা। পরনে খাকি হাফ প্যান্ট আর শার্ট। হাত আর পায়ের থোকা থোকা

বলিষ্ঠ পেশী দেখলেই বোঝা যায় অসুরের শক্তি আছে ওর গায়ে। মাথায় চুলগুলো কদম ছাঁট দেয়া। ছোট কুঁতকুঁতে ধূর্ত চোখ দুটো যেন জ্বলছে সর্বক্ষণ। চ্যাপ্টা নাকের নিচে কালি মাখানো টুথব্রাশের মত খোঁচা-খোঁচা গোঁফ চেহারার সাথে বেমানান।

ডানধারের দরজাটার সামনে রানাকে ঠেলে নিয়ে যেতেই খুলে গেল সেটা। কোন রকম বোতামের বালাই নেই, সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই আপনাআপনি খুলে যাচ্ছে দরজাগুলো। খুব ছোট একটা ঘর সামনে। ধাক্কা দিয়ে সেই ঘরের মধ্যে রানাকে ঢোকাল বেঁটে লোকটা। একজন অনুচরের হাতে মেশিনগানটা দিয়ে রানার ওয়ালথারটা নিল নিজে। বুড়ো আঙুল দিয়ে ওপর দিকটা দেখিয়ে হুকুম করল, 'লাশ দুটো নিয়ে নিচতলায় মর্গে চলে যাও তোমরা সব। আমি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সেখানে। ওপরে ওঠার আগে রাডার গ্লাসটা দেখে নেবে ভাল করে।'

'ঠিক হ্যায়, সর্দারজী,' একজন উত্তর দিল।

এবার রানার পাশে দাঁড়াল বেঁটে সর্দার। দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই দেয়ালের গায়ে অনেকগুলো বোতামের মধ্যে ডানদিক থেকে তিন নম্বর বোতামটা টিপে দিল লোকটা। নিচু হয়ে রইল বোতামটা অন্যগুলোর চাইতে। নিচে নামতে আরম্ভ করতেই রানা বুঝল ওটা একটা লিফট।

লোকটা রানার থেকে মাত্র হাত তিনেক তফাতে। পিস্তলটা আলগা ভাবে রানার পেটের দিকে মুখ করে ধরা। ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি সে অতর্কিতে? প্রতিশোধের এমন সুযোগ কি পাবে সে আর?

'হেঁঃ, হেঁঃ হেঁঃ,' কর্কশ গলার হাসি শুনে রানা ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখল বিচ্ছিরি কালো গোঁফটার নিচে ঝক্-ঝক্ করছে সাদা দাঁত।

'ওসব ধানাই-পানাই ছেড়ে দাও, বাপধন। ভাবছ, ঝাঁপিয়ে পড়ে কাবু করে ফেলবে আমাকে। শালা, উল্লুকা পাঠ্ঠা! একবার চেষ্টা করেই দেখো না কেমন মজা!'

সামলে নিল নিজেকে রানা। সড় সড় করে নেমে চলেছে লিফট। চট্ করে গুনে নিল রানা মোট নয়টা বোতাম আছে দেয়ালের গায়ে। মনে মনে হিসেব করে ফেলল, এখন হয় সাত তলায় না হয় তিন তলায় নামছে ওরা। আধ মিনিট চলার পর থামল লিফ্ট্, রানা আন্দাজ করল, তিন তলায় পৌঁছল ওরা। 'ক্লিক' করে একটা শব্দ হতেই যে দরজা দিয়ে লিফ্টে ঢুকেছিল তার ঠিক উল্টো দিকে অন্য একটা দরজা খুলে গেল। লিফ্ট্ থেকে বেরিয়েই একটা দশ ফুট চওড়া মোজাইক করা করিডর। লম্বা প্রায় পঞ্চাশ গজ হবে। দু'পাশে দেয়ালের গায়ে পরপর নম্বর লেখা। কিছুদূর বাঁয়ে যাবার পর একটা গলি দিয়ে দশ গজ গিয়ে ইএল ৩৬৯ লেখা একটা নম্বরের সামনে দাঁড়াল বেঁটে সর্দার। একটা সাদা বোতাম একবার টিপল। প্রায় সাথে সাথেই নম্বরটার কিছু উপরে দু'বার জ্বলে উঠল সবুজ বাতি। রানাকে এবার দেয়ালের দিকে ঠেলে দিল লোকটা। নাকটা দেয়ালের গায়ে লাগবার আগেই সরে গেল দেয়াল। সিয়িং আই ফটো ইলেকট্রিক সেলের কারবার।

সেই দরজা দিয়ে মস্ত বড় একটা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল রানা। অবাক কাণ্ড! এ যেন পাতালপুরীর রাজপ্রাসাদ। পাহাড়ের ভিতর সবটা এয়ারকণ্ডিশন করা। মেঝেতে ঝকঝকে মোজাইকের টাইলে মিরর পালিশ দেয়া। চারদিকের দেয়াল

হালকা নীল রঙে ডিস্‌টেম্পার করা। বিভিন্ন আকারের অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি সাজানো রয়েছে প্রকাণ্ড ঘরটায়। গোটা কতক সেগুন কাঠের বড় আলমারি। মোটা মোটা ইংরেজি বই সাজানো তাতে। একটা পড়ার টেবিল। ঘরে কাউকে দেখতে পেল না রানা।

'এসব যন্ত্র হাঁ করে দেখা ছাড়া আর কোন উপায় নেই, মি. মাসুদ রানা। আপনি কেন, পৃথিবীর কেউ কখনও দেখেনি এ যন্ত্র। বুঝিয়ে না দিলে কিছুই বুঝবেন না এর মাহাত্ম্য।' একটা যন্ত্রের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল কবীর চৌধুরী। 'আহা, দাঁড়িয়ে কেন, বসুন!'

একটা চাকা লাগানো স্টীলের চেয়ারে বসানো হলো রানাকে। চৌধুরীর ইঙ্গিতে একটা নাইলন কর্ড দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হলো তাকে সেই চেয়ারের সঙ্গে নিপুণভাবে, এক বিন্দু নড়াচড়া করবার ক্ষমতা রইল না আর। সন্তুষ্ট চিত্তে এবার বাঁকা পাইপটা ধরাল কবীর চৌধুরী।

'আপনার মুখ দেখে বুঝতে পারছি আমার গবেষণাকেন্দ্র দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন। কিন্তু আপনি যেটুকু দেখেছেন তা পুরোটার ছত্রিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এ পাহাড়টাকে লম্বালম্বি চার ভাগ করে নিয়েছি আমি। পাহাড়ের মাথা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যে ঘরটায় এসে লিফটে উঠলেন, সে ঘরের চার দেয়ালে চারটে দরজা দেখেছেন—প্রত্যেকটাই লিফট। একটায় উঠে আমার ল্যাবরেটরিতে এসেছেন। অন্য লিফট দিয়ে নেমে অন্যান্য ল্যাবরেটরিতে যাওয়া যায়। এই রকম আরও তিনটে গবেষণাগারে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করছেন পৃথিবীর দশজন সেরা বৈজ্ঞানিক।এই চার ভাগের প্রত্যেকটি আবার নয়তলা। নিচ থেকে কাজ শুরু করে উপর পর্যন্ত সম্পূর্ণ করতে আমাদের পুরো পাঁচ বছর সময় লেগেছে। এটাকে একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ ছোটোখাটো শহর বলতে পারেন।'

'কিসের গবেষণা হচ্ছে আপনাদের এখানে?'

'তা বলতে আমার আপত্তি নেই। তবে তার আগে একটা কথা আপনার জানা দরকার—আপনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। আগামী কাল ঠিক সন্ধে সাতটায় এক অভিনব উপায়ে আপনাকে হত্যা করা হবে। এ খবর জানবার পরেও কি আমাদের গবেষণা সম্পর্কে জানার আগ্রহ আছে?'

'নিশ্চয়ই। মরতে যখন হবে, জেনেই মরি।' ভীত হয়ে পড়েছে এমন ভাব দেখাতে চায় না রানা। 'শুনি, কি নিয়ে পাগলামি চলছে আপনাদের।'

কয়েক সেকেণ্ড রানার চোখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মৃদু হাসল চৌধুরী। বলল, 'বেয়াদবি আমি সহ্য করি না, মি. মাসুদ রানা—চিটাগাং-এ তার প্রমাণ পেয়েছেন। কিন্তু এখন আপনাকে আমি কিছুই বলব না। তার কারণ আপনার কথায় কণা পরিমাণ সত্যতা সত্যিই আছে। পাগলামিই বটে। লোভও বলতে পারেন। তীব্র এক ক্ষমতার লোভ। থার্স্ট ফর পাওয়ার। পৃথিবীতে সব মানুষ চায় সার্থকতা। মানবজীবনের সার্থকতা তার পরিপূর্ণ আত্মবিকাশে। আমি নিজেকে কর্ষণ করে বিরাট ক্ষমতা অর্জন করেছি। কোন মহাপুরুষ যদি অসামান্য প্রতিভা নিয়ে জন্মে এবং নিজ প্রতিভাবলে প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গোটা পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় এনে ইচ্ছেমত ঢেলে সাজাতে চায়, তবে তাকে আপনার মত সাধারণ লোক

তো পাগলই বলবে। বল্টু, তুমি মাসুদ সাহেবকে সমস্ত গবেষণাগার ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে এসো। আমি ততক্ষণে কয়েকটা কাজ সেরে নিই।'

একটা যন্ত্রের ওপর ঝুঁকে পড়ল চৌধুরী। রানাকে চেয়ারসুদ্ধ ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বল্টু, কবীর চৌধুরী আবার বলল, 'কেবল ঘুরিয়ে দেখাবে, কারও সাথে কোন কথা বলতে দেবে না।' মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল বল্টু। রানা ভাবল, বল্টু! নামটা বড় মানানসই হয়েছে। বল্টুর মতই বেঁটে-খাটো শক্ত-সমর্থ চেহারা লোকটার।

একটা পাহাড়ের মধ্যে যে এমন বিরাট কারবার চলতে পারে তা রানার ধারণার বাইরে ছিল। পথ তো নয় যেন গোলক ধাঁধা। এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে আরেক দিকে; কখনও লিফটে উঠছে, কখনও আপনাআপনি দরজা খুলে গিয়ে পথ তৈরি হচ্ছে। ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মোজাইক-ফ্লোর। মুখ দেখা যায়। অবাক হয়ে রানা যা দেখল তাতে বুঝতে পারল আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে কয়েকজন সুশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক দিনরাত পাগলের মত পরিশ্রম করছে যেন কী এক নেশার ঘোরে। এত সব যন্ত্রপাতির মধ্যে কেবল গোটা কতক কম্পিউটার দেখে চিনতে পারল রানা। বোঝা গেল ফালতু লোক এরা নয়। মিথ্যে ভড়ং করেনি কবীর চৌধুরী। সত্যি সত্যিই বিরাট কিছু কাজ চলেছে এই পাহাড়ের মধ্যে। মিনিট বিশেক পক্ষাঘাতে পঙ্গু রোগীর মত চেয়ারে বসে ঘুরে ঘুরে বিরক্ত হয়ে উঠল রানা। বলল, 'ওহে, বেঁটে বাঁদর, কথা বলতে দিচ্ছ না যখন, তখন কিছুই না বুঝে শুধু শুধু এভাবে বোকার মত ঘোরার কোন মানে হয় না। ফিরে চলো।'

এত তাড়াতাড়ি ওদের ফিরে আসতে দেখে অবাক হলো চৌধুরী।

'এরই মধ্যে সব দেখা হয়ে গেল?'

'দুই সেকশন দেখেই ফিরে এসেছে,' জবাব দিল বল্টু।

'কিসের গবেষণা হচ্ছে বুঝতে না পারলে শুধু শুধু ঘুরে লাভ?'

'দেখুন, বিজ্ঞান এই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এমন এক পর্যায়ে চলে এসেছে, এত স্পেশালাইজড্ হয়ে পড়েছে এর প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখা যে, আপনি তো কলা বিভাগের গ্র্যাজুয়েট মাত্র—একজন ভিন্ন শাখার বৈজ্ঞানিকেরও আপনার দশাই হত এই গবেষণাগারে ছেড়ে দিলে। তথ্যগাণিতিকের হিসেবে টেকনোলজি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতি দশ বছরে আমাদের এতদিনকার সঞ্চিত জ্ঞানের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতিটা কল্পনা করুন একবার! এবং এই অগ্রগতির সবচাইতে পুরোভাগে রয়েছি আমরা—এই গুপ্ত পাহাড়ের গোপন বৈজ্ঞানিকেরা। এক মহা পরিকল্পনাকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছি আমরা দ্রুত সাফল্যের দিকে।'

'সে তো খুব ভাল কথা, কিন্তু এর মধ্যে আবার বাঁধটা ভাঙার মতলব ঢুকল কেন মাথায়?'

'বলছি। তার আগে আমাদের গবেষণার কথা বলে নিই। আমার নিজের রিসার্চ হচ্ছে আলট্রা-সোনিক্স। অতিশব্দ। সব কথা আপনি বুঝবেন না—মোটামুটি জেনে রাখুন ভয়ঙ্কর শক্তি আছে এই অতিশব্দের। একে বশে এনে আমি পারমাণবিক অস্ত্রের চাইতে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী এক অস্ত্র তৈরি করেছি। গোটা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় আনবার এই আমার প্রথম অস্ত্র। এর ভাল দিকও আছে। সেদিকেও আমার নজর আছে। বিভিন্ন দিক থেকে এই অতিশব্দকে মানব-কল্যাণের কাজে

লাগানো হবে। পরে সে নিয়ে আরও আলোচনা করা যাবে। এখন অন্যান্য গবেষণাগুলো সম্বন্ধেও মোটামুটি একটা ধারণা দিয়ে নিই আপনাকে।'

পাইপটা আবার ধরিয়ে নিল চৌধুরী।

'আমার দু'জন জার্মান বন্ধুকে দিয়ে লেভিটেশন-এর গবেষণা করাচ্ছি। লেভিটেশন হচ্ছে গ্র্যাভিটেশন বা মাধ্যাকর্ষণের ঠিক বিপরীত। কল্পনা করুন, কোন বস্তুকে যদি মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবমুক্ত করে দেয়া যায় তবে তার কী অবস্থা হয়। শূন্যে ছেড়ে দিলেও সেটা মাটিতে পড়বে না। এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে দুই জার্মান বৈজ্ঞানিক। এ আবিষ্কার বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এক মহা বিপ্লবের সূচনা। হাজারো রকম কাজে লাগানো হবে এই শক্তিকে। কিন্তু সবচাইতে প্রথম আমি ব্যবহার করব একে আমার জেটে। আমার মহাপরিকল্পনাকে সফল করতে আমার প্রয়োজন দ্রুততম ট্রান্সপোর্ট। এরোপ্লেন বলুন আর জেটই বলুন এদের সবাইকে কেবল শূন্যে ভেসে থাকবার জন্যেই প্রায় পঁচাত্তর ভাগ শক্তি নষ্ট করতে হয়। আমার জেট আপনিই ভেসে থাকবে, পুরো শক্তি ব্যবহার করব আমি এগিয়ে যাবার কাজে। বুঝতে পারছেন?'

আত্মতৃপ্তির একটা হাসি ফুটে উঠল কবীর চৌধুরীর মুখে।

'আজকাল বিলেতে ওরা হোভার ক্র্যাফ্‌ট্ তৈরি করছে জলে ডাঙায় সবখানে চলবার জন্যে। বাতাসকে প্রেশারাইজ্ করে এই গাড়ি মাটি বা পানি থেকে এক ফুট উঁচুতে থাকবে সবসময়—চলবে জেট প্রপাল্‌শনে। শুনছি নাকি ইংলিশ-চ্যানেলের উপর হোভার-ক্র্যাফ্‌টের ডেইলি-প্যাসেঞ্জারী শুরু হবে অল্পদিনেই। কিন্তু এ সবের চাইতে আমার জেট কতখানি উন্নত হবে ভাবুন একবার।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ পাইপ টানল কবীর চৌধুরী।

'যা বলছিলাম—এই লেভিটেশন। এ ব্যাপারটা পৃথিবীতে নতুন কিছুই নয়; এবং এর প্রিন্সিপলটাও খুবই সহজ। মিশরের পিরামিড হচ্ছে পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের এক আশ্চর্য বস্তু। আজকে কারিগরি বিদ্যার এত উন্নতির পরও বিংশ শতাব্দীতে আরেকটা পিরামিড তৈরি করা অসম্ভব। কেন জানেন? আজকের বড় বড় এঞ্জিনিয়াররা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও বের করতে পারেনি অত প্রকাণ্ড পাথর অখণ্ড অবস্থায় পিরামিডের অত ওপরে কি করে তোলা সম্ভব হলো। আমার, এবং আমার বন্ধুদ্বয়ের বিশ্বাস, সেই যুগে অর্থাৎ আজ থেকে পাঁচ ছ'হাজার বছর আগেই মিশরীয়রা এ বিদ্যা আয়ত্ত করেছিল, এবং লেভিটেশনের সাহায্যেই প্রত্যেকটা পাথরকে ওজন-শূন্য করে নিয়ে অত ওপরে উঠিয়েছিল অনায়াসে।'

এসব আজগুবি গল্প নীরবে হজম করে চলেছে রানা। আবার আরম্ভ করল কবীর চৌধুরী।

'আরেক দিকে ছ'জন বৈজ্ঞানিক রিসার্চ করছেন পারমাণবিক অস্ত্র সম্পর্কে। আমরা আণবিক অস্ত্র তৈরি করতে চাই না। প্রয়োজনের সময় যেন বৃহৎ শক্তিবর্গের এই ঠুনকো অস্ত্র বানচাল করে দিতে পারি সে উদ্দেশ্যেই এই গবেষণা আমাদের। আটটা বিশাল কম্‌পিউটারের পাঁচটাকেই ওইখানে দেখেছেন। আর দেখেছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এক অ্যাটম স্ম্যাশার। এর সাথে তুলনা করা যায় এমন আর একটা মাত্র স্ম্যাশার শুধু পাবেন আমেরিকার ব্রুক হ্যাভেন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে। আমাদের

সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি আমরা এই ব্যাপারে।'

দেয়াল ঘড়িটার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে চৌধুরী বলল, 'আমার হাতে বেশি সময় নেই। আলট্রা সোনিক্স গেল, লেভিটেশন গেল, অ্যাটমিক রিসার্চ গেল, এখন অ্যান্টি-ম্যাটার। পৃথিবী বিখ্যাত পদার্থবিদ ডক্টর আর্থার ডুনিং এবং তাঁর স্ত্রী গবেষণা করছেন এ নিয়ে। প্রতিটি অ্যাটমের একটা অ্যান্টি-অ্যাটম আছে। প্রতি...'

'এসব শুনে আমার কোন লাভ নেই,' রানা বাধা দিল, 'তাছাড়া ভালও লাগছে না শুনতে। বুঝলাম, আপনারা কয়েকজন বিকৃতমস্তিষ্ক বৈজ্ঞানিক বিকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানের মাধ্যমে। কিন্তু এর সাথে কাপ্তাই বাঁধের কি সম্পর্ক?'

'দুই বর্গমাইল জুড়ে ছিল আমার গবেষণাগার। আরও আটটা অপেক্ষাকৃত নিচু টিলা আমার বহু মূল্যবান যন্ত্রপাতিসহ ডুবে গেছে পানির তলায়। আর পনেরো দিনের মধ্যে এটাও যেত। তাই উড়িয়ে দিচ্ছি আমি বাঁধটা।'

'লক্ষ লক্ষ মানুষকে সেজন্যে খুন করবেন আপনি?'

'দেখুন, আমার কষ্টার্জিত কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে আমি তৈরি করেছি এই গবেষণাগার। মাত্র কয়েক লক্ষ প্রাণের চাইতে এর দাম আমার কাছে অনেক বেশি। আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যে এদেশের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। তখন এই ক্ষতিকে লাভই মনে হবে।' মৃদু হাসল কবীর চৌধুরী। 'পানি এখন চুইয়ে চুইয়ে পাহাড়ের ভেতরে ঢুকতে আরম্ভ করেছে। আজ দেখি সোডিয়ামের ঘরের দেয়ালও ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে। অতগুলো ড্রামের সোডিয়ামে যদি কোন ভাবে পানি বা অক্সিজেন ঢোকে, তবে চুরমার হয়ে যাবে সমস্ত পাহাড়।

রানার মনে পড়ল একটু আগে একটা ঘরের ভিতর দিয়ে যাবার সময় বড় বড় অনেকগুলো ড্রাম দেখেছে সে।

'ইণ্ডিয়ার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কিসের?'

'প্রয়োজনবোধে রামকেও বানরের সাহায্য নিতে হয়েছিল। বাঁধটা ভাঙবার প্রয়োজন যখন হলো তখন তাদের সাহায্য চাইলাম। খুশি হয়ে তারা এগিয়ে এল সাহায্য করতে। তবে তাদের একটা ছোট্ট অনুরোধ: প্রেসিডেন্ট যখন প্রজেক্ট ওপেন করতে আসবে সেই সময় ফাটাতে হবে ডিনামাইট। রাজি হতেই হলো।'

উত্তেজিত রানার মুখটা হাঁ হয়ে গেল। লোকটা মানুষ না পিশাচ! কি স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে যাচ্ছে কথাগুলো!

'আপনার দিন ঘনিয়ে এসেছে, মি. কবীর চৌধুরী। আপনার পরিচয় আর কারও কাছে গোপন নেই। চিটাগাং আর কাপ্তাইয়ের...'

'আমি জানি সে সব। আপনি আমাকে আর আড়ালে থাকতে দেননি। এর ফলে বহু প্রাণ নষ্ট হবে। কিন্তু ওই যে বললেন দিন ঘনিয়ে আসা—সেটা একেবারে অসম্ভব। আপনাকে বলেছি আমার মারণাস্ত্রের কথা। পৃথিবীর কারও সাধ্য নেই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ-পাহাড়ের ধারে-কাছে আসে। পাকিস্তানের গোটা মিলিটারি ফোর্সও যদি একসাথে আসে, এক নিমেষে ছাই করে দিতে পারি আমি এই ঘরে বসে শুধু ছোট্ট একটা বোতাম টিপে।'

'কিন্তু বাঁধ আপনি ওড়াবেন কি করে? কড়া পাহারা রয়েছে সেখানে—

ডিনামাইট বসাতেই পারবেন না আপনি।'

বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠল কবীর চৌধুরীর মুখে। বলল, 'ডিনামাইটগুলো জায়গা মত বসে আছে, মি. রানা। যে তিন-জায়গা আজ দুপুরে এত লোক নামিয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজালেন, ঠিক তার থেকে তিন গজ করে বাঁয়ে সত্তর ফিট পানির নিচে বসানো আছে ডিনামাইট। বাঁধের গায়ে গর্ত খুঁড়ে সেগুলো বিশ ফুট ঢুকিয়ে দিয়ে আবার মাটি চাপা দেয়া হয়েছে। কারও সাধ্য নেই ওগুলো খুঁজে বের করে। আগামী কাল সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে আপনি নিচতলার একটা ঘরে শুয়ে টেলিভিশনে দেখতে পাবেন—শত চেষ্টা করেও আপনি আমাকে রুখতে পারলেন না—বাঁধ আমি উড়িয়ে দিলাম। প্রেসিডেন্ট বক্তৃতা শেষ করে বোতাম টিপবে, জ্বলে উঠবে সমস্ত বাতি, পরক্ষণেই ঘটবে মহাপ্রলয়। তারপর একটা বোতামে চাপ দিলেই ধীরে ধীরে পানি উঠতে শুরু করবে আপনার ঘরে। চট করে ঘরটা ভরবে না পানিতে—এর মধ্যে আরও অনেক মজা আছে। সবই আমার নিজস্ব উদ্ভাবন। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না কতখানি ভয়ঙ্কর এবং বিভীষিকাময় হতে পারে আমার মৃত্যুদণ্ড। আগে থেকে এর বেশি আর কিছুই বলব না, বললে এর আকস্মিকতা কমে যাবে আপনার কাছে।'

'সুলতা কোথায় বলতে পারেন?'

'পারি। কিন্তু আজ আর সময় নেই, মি. মাসুদ রানা। আপনি আপনার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। কাল আবার দেখা হবে।'

চেয়ারের বাঁধন খুলে দিতেই উঠে দাঁড়াল রানা। হাত দুটো এখনও পিছমোড়া করে বাঁধা। হঠাৎ ভয়ঙ্কর এক কাজ করে বসল সে। একলাফে কবীর চৌধুরীর সামনে গিয়ে ওর তলপেট লক্ষ্য করে মারল এক প্রচণ্ড লাথি। ঠিক জায়গা মত পড়লে সাত দিন আর উঠতে হত না চৌধুরীকে বিছানা ছেড়ে। কিন্তু চট করে একটু সরে গেল কবীর চৌধুরী। লাথিটা গিয়ে পড়ল ওর ডান ঊরুর উপর। খট করে কিছু শক্ত জিনিসের উপর লাগল রানার পা। অবাক হয়ে দেখল রানা চৌধুরীর ডান পা-টা খুলে প্যান্টের ফাঁক গলে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে পড়ল মেঝের উপর। ওটা একটা কাঠের নকল পা। টাল সামলাতে না পেরে দড়াম করে মেঝেতে পড়ে গেল চৌধুরীর প্রকাণ্ড দেহটা। এবার বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা ওর উপর। দুই হাঁটু জড়ো করে ঝপাং করে পড়ল সে কবীর চৌধুরীর পেটের উপর। 'হুঁক' করে একটা শব্দ বেরোল চৌধুরীর মুখ দিয়ে।

ঠিক সেই সময় কানের পিছনে পিস্তলের বাঁটের একটা প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে আঁধার হয়ে এল রানার চোখ। এক ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দিল বল্টু চৌধুরীর দেহের উপর থেকে। একটা টেবিলের পায়া ধরে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল আবার কবীর চৌধুরী। ওপাশ থেকে ছুঁড়ে দিল বল্টু রানার ওয়ালথারটা। খপ করে ধরল সেটা চৌধুরী। রানার বুকের দিকে লক্ষ্য স্থির করতে গিয়ে দেখল রাগে এবং উত্তেজনায় হাতটা কাঁপছে থর থর করে। পিস্তল ফেরত দিয়ে বলল, 'চাবুক বের করো।'

তারপর চলল এক অবর্ণনীয় নির্যাতন। হাত দুটো ছাতের একটা কড়ার সাথে বেঁধে শরীর থেকে সমস্ত কাপড় খুলে নেয়া হলো রানার।

তিন মিনিট ক্রমাগত চাবুক চালিয়ে হাঁপাতে লাগল কবীর চৌধুরী। শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক। চৌধুরীর প্রিয় অস্ত্র। চোখ দুটো টর্চের মত জ্বলছে।

তখনও রানার জ্ঞান সম্পূর্ণ হারায়নি। সারা শরীরে বিষাক্ত বিচ্ছুর কামড়ের মত জ্বালা, শরীরের রক্ত যেন সব মুখে উঠে আসতে চাইছে, কান দিয়ে গরম ভাপ বেরোচ্ছে। রানার তীব্র আর্তনাদ তিন মিনিটেই গোঙানিতে পর্যবসিত হয়েছে। মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে এখন ওর।

কপালের ঘাম মুছে নিয়ে আবার শুরু করল কবীর চৌধুরী। শরীরের কোন অংশই বাদ থাকল না আর। চাবুকের লম্বা লম্বা দাগগুলো গায়ের চামড়া চিরে প্রথমে সাদা তারপর লাল হয়ে উঠল। রক্ত গড়িয়ে নামতে শুরু করল নিচের দিকে। জিভটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে রানার।

জ্ঞান হারিয়ে হাত বাঁধা অবস্থায় ঝুলতে থাকল রানার জর্জরিত দেহ। সপাং সপাং আরও কয়েক ঘা বসিয়ে থামল কবীর চৌধুরী। রক্তে ভিজে চটচটে হয়ে গেছে চাবুকটা।

মাঝরাতে জ্ঞান ফিরল রানার। অন্ধকার ঘরে একটা খাটের উপর শুয়ে আছে ও চিৎ হয়ে। অসম্ভব তেষ্টা পেয়েছে। পাশ ফিরতে গিয়ে টের পেল হাত-পা খুব শক্ত করে খাটের পায়ার সঙ্গে বাঁধা। কপালে হাত না দিয়েও বুঝল গায়ে প্রবল জ্বর। বিস্বাদ হয়ে আছে মুখের ভিতরটা। হঠাৎ ওরকম বোকামি করে ফেলার জন্যে রাগে দুঃখে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে ওর। মনে মনে নিজেকে গাল দিয়ে বলল, 'বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে! যেমন কর্ম তেমনি ফল!'

হঠাৎ কানের কাছে বেজে উঠল একটা মিষ্টি সুর। গোটা ঘর যেন ভরে গেল সেই সুর মূর্ছনায়। আরও কয়েকটা শব্দ হতেই রানা বুঝল এ হচ্ছে সরোদের সুর। কেউ সারোদ বাজাচ্ছে। অদ্ভুত মিষ্টি হাত। ভাগ্যিশ এ ঘরের স্পীকারটা 'অন' করা ছিল। বাজনা তো কতই শুনেছে সে, কিন্তু এত ভাল তো কই লাগেনি কখনও আর! মস্ত বড় কোন ওস্তাদের বাজনা হবে হয়তো। দেহ মনের সব জ্বালা সব বেদনা দূর হয়ে যায় এমন মিষ্টি রাগিণী শুনলে। মনে হয় পৃথিবীটা 'মায়াবী এক স্বপ্নের দেশ'। মিষ্টি চাঁদের আলো, মাতাল হাওয়া, সামনে অথৈ জল, দূরে আবছা গ্রামের আভাস, হিজলের ছায়া, দোল দোল ঢেউ, শাম্পান, আর সেই সঙ্গে তীব্র এক একাকীত্ব।

মধুর একটা আবেশে জড়িয়ে এল রানার চোখের পাতা। মনে হলো লেভিটেশনের সাহায্যে যেন তার দেহটাকে ওজন-শূন্য করে দেয়া হয়েছে।

দরজায় চাবি লাগানোর শব্দ পাওয়া গেল একটু পরেই। ঘরে এসে ঢুকল বল্টু, সঙ্গে আরও দু'জন লোক। বল্টু বলল, 'চৌধুরী সাহেব তলব করেছেন, একটু কষ্ট করতে হবে হুজুরকে।'

খাট থেকে খুলে আবার পিছমোড়া করে বাঁধা হলো রানার হাত দুটো। দুর্বল পায়ের উপর দাঁড়িয়ে নিজের দেহকে বড় ভারি বলে মনে হলো ওর। কিন্তু কোন রকম দুর্বলতা প্রকাশ করল না এদের সামনে। দোতলায় সোডিয়ামের ঘরটা পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠে এল ওরা। আবার সেই ইএল ৩৬৯, সবুজ বাতি, কবীর চৌধুরীর নির্বিকার মুখ, প্রতিভাদীপ্ত উজ্জ্বল দুই চোখ।

চমকে উঠল রানা ঘরের মধ্যে সুলতাকে দেখে। ওকে দেখেই সুলতা উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না—চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে ওর দেহ। কেবল বলল, 'তোমাকেও ধরে এনেছে এরা!'

জবাব দিল না রানা; মাথাটা শুধু একটু নিচু করল একবার। দেখল সুলতার দুই চোখের কোলে কালি পড়েছে। অবসন্ন ঘাড়টা যেন মাথাটাকে সোজা রাখতে পারছে না আর।

'সারা রাত আমাকে জাগিয়ে রেখেছে এরা এই চেয়ারে বসিয়ে, চোখের সামনে বাল্‌ব্ জ্বেলে।'

কথাটা শোনাল ঠিক নালিশের মত। মৃদু হেসে মাথাটা আবার একবার ঝাঁকাল রানা। তারপর কবীর চৌধুরীর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইল সে।

'আমার এক অনুচরকে গত রাতে আপনাদের আবদুল হাই বন্দী করেছে চিটাগাং-এ। মিলিটারি আমার বাড়িটা দখল করে নিয়েছে আজ সকালে। তাতে কিছুই এসে যেত না, কিন্তু আমার অনুচরটির কাছে একটা নোট বইয়ে ডিনামাইট ফাটাবার ওয়েভ লেংথ এবং সিগন্যাল কোড লেখা ছিল—সেটাও আবদুল হাইয়ের হস্তগত হয়েছে। এখন একমাত্র ভরসা সুলতা দেবী।'

রানার মনে পড়ল, চৌধুরীর বাড়িতে সুলতা সেই নোট বইয়ে কি যেন লিখে দিয়েছিল। সিগন্যাল কোড এবং ওয়েভ লেংথই হবে বোধহয়।

'আমাদের কারোই জানা নেই সে সিগন্যাল। কিন্তু সুলতা দেবী পণ করেছেন কিছুতেই আমাদের বলবেন না। সারারাত অনেক চেষ্টা করেও বের করা গেল না ওঁর কাছ থেকে। তাই আপনাকে একটু কষ্ট দিতেই হলো, মি. মাসুদ রানা।'

বল্টুকে ইঙ্গিত করতেই রানার জামা কাপড় খুলে নেয়া হলো। পরনে রইল কেবল ছোট একটা আণ্ডারওয়্যার।

রানার দিকে চেয়েই আঁতকে উঠল সুলতা।

'ইশশ্! মাগো! এই অবস্থা করেছে তোমাকে পিশাচেরা!' সমস্ত গায়ে চাবুকের দাগগুলো এখন কালো হয়ে গেছে। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল সুলতার।

ততক্ষণে রানার হাত দুটো আবার ছাতের কড়ার সাথে বাঁধা হয়ে গেছে। কবীর চৌধুরীর হাতে কালকের সেই চাবুকটা দেখে ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠল রানা একবার।

'সুলতা দেবী! মিটার ওয়েভ এবং সিগন্যাল কোডটা দয়া করে আবার লিখে দিতে হবে আপনাকে। কাগজ কলম তৈরি আছে আপনার হাতের কাছে টেবিলের উপর। যদি এক্ষুণি লিখে না দেন তবে আপনার চোখের সামনে চাবকে খুন করে ফেলব আপনার প্রিয়তম মাসুদ রানাকে। বল্টু, তুমি এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণবে। এর মধ্যে যদি সুলতা দেবী মত না পাল্টান তাহলে চাবুক মারতে শুরু করব আমি।'

সুযোগ পেয়ে বল্টু খুব দ্রুত এক, দুই, তিন, চার গুণতে আরম্ভ করল। সপাং করে খুব জোরে মাটিতে চাবুকটা একবার আছড়ে নিল কবীর চৌধুরী। চমকে উঠল সুলতা।

'দেব। আমি লিখে দেব!' চিৎকার করে উঠল সে।

'ভুল কোরো না, সুলতা। কিছুতেই লিখে দিয়ো না। তুমি লিখে দিলেও

আমাকে খুন করবে, না দিলেও করবে। এই শয়তানের কাছে কিছুতেই আত্মসমর্পণ কোরো না তুমি।'

'তোমাকে এভাবে চাবুক মারবে, কি করে সহ্য করব আমি?'

'চোখ বন্ধ করে রাখো, সুলতা।'

'আমার দুই চোখের পাপড়ি কেটে দিয়েছে—চোখ বন্ধ করতে পারি না। খোঁচা লেগে লেগে ঘা হয়ে গেছে।' হু-হু করে কেঁদে উঠল সুলতা।

মাথার মধ্যে যেন আগুন ধরে গেল রানার। কিন্তু নিরুপায় সে। মনের সমস্ত ঘৃণা দুই চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরোচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে শুধু বলল, 'কুত্তার বাচ্চা!'

'শাট্ আপ্!' গর্জন করে উঠল কবীর চৌধুরী। তারপর সুলতার দিকে ফিরে বলল, 'আপনি যদি এখন লিখে না দেন, তবে আজ হয়তো ড্যাম ওড়াতে পারব না আমি, কিন্তু আগামী কালই আপনার বদলে আরেকজন আসবে ভারত থেকে। কাজেই এভাবে আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছেন না। চিন্তা করে দেখুন কোন্‌টা করবেন। এক্ষুণি লিখে দিলে হয়তো আপনাদের দু'জনেরই জীবন রক্ষা পেতে পারে। হয়তো ঢাকায় ফিরে গিয়ে সুখের নীড় বাঁধবার সুযোগ পেতেও পারেন আপনারা।'

'বিশ্বাস কোরো না ওর কথা, সুলতা। মিথ্যে ধোঁকা দিচ্ছে,' রানা বলল।

'বেশ, আপনারা যত পারেন নাটক করুন। আবার দশ পর্যন্ত গোনো, বল্টু। এইবার শেষ সুযোগ দেয়া হবে আপনাকে, সুলতা দেবী।'

এক, দুই, তিন,···আট, নয়, দশ। সপাং, সপাং। যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল ঘরের মধ্যে দু'বার।

'দোহাই আপনার, বন্ধ করুন। আমি লিখে দিচ্ছি!' কাতরে উঠল সুলতা। তারপর রানার দিকে চেয়ে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করো, রানা, আমি দুর্বল মেয়েমানুষ মাত্র।'

লিখে দিল সুলতা খশ খশ করে। তারপর বলল, 'কই, আমাদের ছেড়ে দিন এখন।'

হাঃ হাঃ, করে হেসে উঠল কবীর চৌধুরী।

'কি লিখলেন কে জানে! আগে সত্যিসত্যিই বাঁধটা উড়ে যাক, তারপর দেখা যাবে। আর তাছাড়া, তেমন কোন কথা তো আমি দিইনি; বলেছি, হয়তো রক্ষা পেতে পারেন আপনারা। তার মানে, হয়তো রক্ষা না-ও পেতে পারেন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হা।'

'মিথ্যুক, নীচ, পাষণ্ড!' গর্জে উঠল সুলতা। সাথে সাথেই চাবুকটা পড়ল ওর ঊরুর উপর। 'মাগো,' তীক্ষ্ণ এক আর্তনাদ। একজন ঠেলে নিয়ে বেরিয়ে গেল চেয়ারে বাঁধা সুলতাকে। রানা পাগলের মত টানাটানি করল হাতটা ছাড়াবার জন্যে, বাঁধন আরও চেপে বসল কব্জিতে। রানাকেও খুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল বল্টু ও তার দুইজন ষণ্ডামার্কা অনুচর। রেডিও ট্র্যান্সমিটারটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল চৌধুরী।

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছে রানা। সন্ধে সোয়া ছ'টা বাজে। আর পনেরো মিনিট পরই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে কাপ্তাই ড্যাম। কেউ আর ঠেকাতে পারবে না কবীর চৌধুরীকে। এতক্ষণে বোধহয় পৌঁছে গেছেন প্রেসিডেন্ট কাপ্তাইয়ে। মি. লারসেন কি করছেন এখন? ওকে গায়েব হয়ে যেতে দেখে এস.

.পি.-ই বা কি করছেন? নিচু কোয়ার্টার ছেড়ে উঁচু কোন বাসায় উঠে গেছেন বোধহয় এতক্ষণে এস.পি. সাহেব। আর চিটাগাং-এর সদা হাসিখুশি আবদুল হাই? পি. সি. আই.-চীফ রাহাত খান? আর সুলতা?

সুলতার কথা মনে পড়তেই সচকিত হয়ে উঠল রানা। ওর কি কিছুই করবার নেই? নির্যাতন এবং মৃত্যুর তো আরও পনেরো মিনিট দেরি আছে। এই অবস্থাকে স্বীকার করে নিচ্ছে কেন সে? মনে পড়ল রাহাত খানের একটা কথা: 'কোনও অবস্থাতেই কখনও হাল ছেড়ে দিয়ো না, রানা, মনে রেখো, যে কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাবার কিছু না কিছু উপায় সব সময়ই থাকে।' রানা ভাবল, 'আমার অবস্থায় পড়লে টের পেতে, বাছাধন। সাততলার অফিসে বসে আর উপদেশ খয়রাত করতে হত না!'

কী আজেবাজে কথা ভাবছে সে! মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে সজাগ করবার চেষ্টা করল রানা। হাত এবং পা খাটের পায়ের সাথে টেনে বাঁধা। একটু নড়াচড়া করবার উপায় নেই।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল রানার মাথায়। আধমিনিট চুপচাপ পড়ে থেকে দেহমনের সমস্ত শক্তি একত্রীভূত করবার চেষ্টা করল সে। তারপর এক হেঁচকা টানে খাটের ডানধারটা বেশ খানিকটা শূন্যে উঠিয়ে ফেলল। ডানধারটা যেই ফিরে এসে মাটি স্পর্শ করল অমনি আরেক ক্ষিপ্র এবং প্রবল হেঁচকা টানে খাটের বাঁ ধারটা শূন্যে তুলে ফেলতেই উল্টে গেল খাট। উল্টাবার সময় ছয় ইঞ্চি পুরু তোষকটা সড়সড় করে পায়ের তলা দিয়ে সরে গেল ডান দিকে বেশ খানিকটা। বাঁ পা-টা ঢিল পেল ইঞ্চি ছয়েক। সেই পা দিয়ে দুটো লাথি মারতেই গদিটা পায়ের দিক থেকে বেরিয়ে গেল খাটের বাইরে। ডান পা-টাও ঢিল পেল এবার। এবার হাঁটু দিয়ে কয়েকটা ঠেলা দিতেই পিঠের উপর থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে গিয়ে মেঝেতে পড়ল গদিটা। হাত দুটোও ঢিল পেল ছয় ইঞ্চি।

অমানুষিক শক্তিতে হেঁচকা টান দেয়ায় কব্জিতে চেপে বসে গিয়েছিল রশি, মিনিট পাঁচেক ধরে নখ দিয়ে খুঁটবার পর মুক্ত হয়ে গেল ডান হাত। বাঁ হাত এবং দুই পা খুলতে আর এক মিনিট সময় লাগল।

প্রথমেই খাটটা জায়গা মত ঠিক করে রেখে তোষক তুলে দিল রানা খাটের উপর। তারপর বিশ্রাম নিল কিছুক্ষণ খাটে বসে।

হঠাৎ ঘরের এক কোণে একটা বাতি জ্বলে উঠল। চমকে সেদিকে চেয়ে দেখল রানা ওটা টেলিভিশন সেট। কাপ্তাই বাঁধটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাতে। নিশ্চিন্ত মনে লোকজন চলাচল করছে। দু'জন লোক বসা একটা ওয়ান ফিফ্‌টি হোণ্ডা মোটর সাইকেল দ্রুত চলে গেল বাঁধের উপর রাস্তা দিয়ে। স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ কাপ্তাইয়ের পরিবেশ। তবে কি শেষ পর্যন্ত তার কথা অবিশ্বাস্য ভেবে উড়িয়ে দিল মি. লারসেন এবং এস. পি. আতাউল হক?

আর সময় নেই। কয়েক মিনিট পরেই ঘটবে প্রলয়কাণ্ড। উঠে গিয়ে ঘরের দেয়াল পরীক্ষা করে দেখল রানা দরজা খোলার কোন উপায় পাওয়া যায় কিনা। নাহ্। কোন বোতাম নেই ঘরের মধ্যে। হঠাৎ দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনে ছুটে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল রানা। ক্লিক্ করে দরজার তালা খোলার শব্দ পাওয়া

গেল। সাথে সাথেই উজ্জ্বল বাতি জ্বলে উঠল ঘরের মধ্যে। হাতে পায়ে আলগা করে দড়ি পেঁচিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে থাকল রানা ঘাপটি মেরে।

পরক্ষণেই ঘরে ঢুকল বল্টু। একা। হাতে একটা প্লেটের উপর কিছু ফলমূল কেটে সাজানো। সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করে এগিয়ে এলো বল্টু খাটের কাছে।

'দ্যাখ, হারামজাদা, চৌধুরী সাহেব কত দয়ালু মানুষ। মরার আগেও বিকেলের নাস্তা পাঠাতে ভোলেননি।'

কাঁটা চামচ দিয়ে আপেলের একটা টুকরো তুলে রানার মুখে দিল বল্টু। তারপর হঠাৎ রানার বাঁ গালটা কাঁটা চামচ দিয়ে জোরে আঁচড়ে ছিলে দিল। বলল, 'বেঁটে বাঁদরের খামচি। বুঝলি, শালা হারামখোর?'

টপ টপ করে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল রানার গাল বেয়ে গদির উপর। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে নিল রানা। টুঁ শব্দ পর্যন্ত করল না। কিন্তু দ্বিতীয় টুকরো খাওয়াবার পর যখন আবার নাকে খামচি দিতে এল, তখন এক ঝটকায় কাঁটা চামচটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বল্টুর বাম চোখের মধ্যে বসিয়ে দিল ধাঁই করে।

'গ্যাক্' করে একটা বিটকেল শব্দ বেরোল বল্টুর গলা দিয়ে। এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। চামচটা টান দিয়ে বের করে নিতেই রক্ত ছুটল বল্টুর চোখ দিয়ে। তিন চারটে রেখায় নেমে এল সে-রক্ত গাল বেয়ে। রানা চেয়ে দেখল কাঁটা চামচের কাঁটাগুলোয় বল্টুর চোখের ভিতরের অংশ লেগে আছে।

এবার লাফিয়ে উঠে ওর কণ্ঠনালী চেপে ধরল রানা। তারপর ঠেলতে ঠেলতে দেয়ালের গায়ে নিয়ে গিয়ে ঠেসে ধরল প্রাণপণে। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে বল্টুর ডান চোখটা কোটর থেকে। রানার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল সে। ওর আঙুলের নখগুলো বসে গেল রানার কব্জিতে। কিন্তু সে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। হাত দুটো ঝুলে পড়ল দু'দিকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আধহাত জিভ বেরিয়ে পড়ল বল্টুর। পুরো দুই মিনিট পর ছেড়ে দিতেই একটা পা ভাঁজ হয়ে হুমড়ি খেয়ে সামনে পড়ল বল্টুর মৃতদেহ। মৃদু একটা ঘড় ঘড় শব্দ বেরোল বল্টুর গলা দিয়ে। রানা বুঝল, ফুসফুসটা তার স্বাভাবিক অবস্থায় আসবার জন্যে খানিকটা বাতাস গ্রহণ করল বাইরে থেকে।

বল্টুর কাছে কোনও অস্ত্র পাওয়া গেল না। আস্তে করে দরজাটা খুলে একটু ফাঁক করে দেখল রানা কিছুদূরেই পায়চারি করে বেড়াচ্ছে কোমরে রিভলভার ঝোলানো একজন প্রহরী। রানার হাত-পা বেঁধেও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি চৌধুরী—চব্বিশ ঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থা করেছে।

জোরে কয়েকটা টোকা দিল রানা দরজায়। প্রায় সাথে সাথেই অপর পাশে এসে গেল প্রহরী।

'ক্যয়া হ্যায়, সর্দারজী?'

'আন্দার আও!' বল্টুর গলা নকল করবার চেষ্টা করল রানা।

সন্দেহমাত্র না করে অপ্রস্তুত প্রহরী ঘরে ঢুকেই ধাঁই করে নাকের উপর খেলো রানার হাতের প্রবল এক মুষ্ট্যাঘাত। নাকের জল আর চোখের জল এক হয়ে গেল প্রহরীর। ততক্ষণে ওর কোমরের হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করে নিয়েছে

রানা। লোকটা একটু সামলে নিতেই ওর দিকে রিভলভারটা ধরে রানা বলল, 'এই ঘরের চাবিটা বের করো ভালয় ভালয় নইলে ওই অবস্থা করে দেব।'

বল্টুর বীভৎস চেহারার দিকে চেয়ে শিউরে উঠল প্রহরী। বিনা বাক্যব্যয়ে পকেট থেকে চাবি বের করল, 'ওখানেই মাটিতে রাখো চাবিটা। তারপর খাটের উপর গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

খাটের সাথে বেঁধে ফেলল রানা প্রহরীকে। তারপর রিভলভারটা ওর বুকের সাথে ঠেসে ধরে বলল, 'সুলতা রায় কত নম্বর রূমে আছে?'

'হামি জানে না, সারকার।'

'আলবাত জানে।' রিভলভার দিয়ে একটা খোঁচা দিল রানা ওর পাঁজরে, 'কাল যে জানানাকে ধরে নিয়ে এসেছে তাকে কোথায় রেখেছে?'

'ওহ-হো, উও আওরাত? সে তো চার তলার উপর।'

'কত নম্বর রূম?'

'দো শও ছাপ্পান্।'

আর দেরি করা চলে না। পথটা জানাই আছে। ঘরটায় চাবি লাগিয়ে দিয়ে তিন তলায় উঠে এল রানা। পথে কাউকে দেখা গেল না। আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা বোধহয় কম এখানে। ইএল ৩৬৯-এর সামনে এসে বোতামটা টিপল রানা একবার। সাথে সাথেই দু'বার জ্বলে উঠল সবুজ বাতি। আপনা আপনি খুলে গেল দরজাটা।

'কি খবর, বল্টু?' রেডিও ট্র্যান্সমিটারের একটা বোতামের ওপর বুড়ো আঙুলটা রেখে ঘড়ির দিকে চেয়ে বসে আছে কবীর চৌধুরী। রানাকে তাই দেখতে পেল না সে। আবার বলল, 'আর আধ মিনিট, বল্টু! তারপরই ওই টেলিভিশনে দেখতে পাবে...'

হঠাৎ ট্র্যান্সমিটারটা রানার এক লাথিতে ছিটকে গিয়ে দেয়ালে লাগল। সেখান থেকে মাটিতে পড়ে দুই টুকরো হয়ে গেল। হতভম্ব চৌধুরী উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। সাথে সাথে ব্যান্টামওয়েট চ্যাম্পিয়ন মাসুদ রানার একটা নক্ আউট এসে পড়ল একেবারে নাক বরাবর। গল গল করে রক্ত বেরিয়ে এল নাক দিয়ে। এবার প্রচণ্ড এক লাথি চালাল রানা। লাথি খেয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল কবীর চৌধুরী। তক্ষুণি রানার গুলি করা উচিত ছিল, কিন্তু তা না করে, এমনিতেই কাবু করে এনেছে ভেবে যেই আরেকটা লাথি মারতে গেছে অমনি খপ করে পা-টা ধরে ফেলল চৌধুরী। পা ধরে জোরে একটা মোচড় দিতেই পড়ে গেল রানা মাটিতে। রিভলভারটা ছিটকে হাত দুয়েক দূরে পড়ল।

'এবার? এখন কোথায় যাবে?'

দাবার ছকটা এক মুহূর্তে পাল্টে গেল যেন। হাতী, নৌকো, মন্ত্রী নিয়ে চারদিক থেকে অপর পক্ষের রাজাকে আটকে নিয়ে যেন দেখা গেল সামান্য ঘোড়ার এক আড়াই চালে নিজেই কিস্তি মাত হয়ে বসে আছে। রানার পা-টা ভেঙে ফেলবার জোগাড় করল কবীর চৌধুরী। এক পা খোঁড়া হলে কি হবে প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে ওই প্রকাণ্ড দেহে। অসহ্য যন্ত্রণায় জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলো রানার।

হঠাৎ কি যেন ঠেকল হাতে। তুলে দেখল সেই চাবুকটা। প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল রানার মধ্যে। শুয়ে শুয়েই নৃশংসভাবে চাবুক চালাল সে।

ব্রিজ খেলায় ট্রাম্পের উপর দিয়ে ওভার-ট্রাম্পের মত অবস্থা হলো এবার। কবীর চৌধুরীর দুই হাত বন্ধ। চাবুক বাঁচাতে পা ছাড়লেই রানা রিভলভার তুলে নেবে। হেরে গেল চৌধুরী। সাঁই সাঁই চাবুক পড়ছে ওর মুখে-গালে-গলায়-হাতে। নরম মাংস পেয়ে কেটে বসে যাচ্ছে চাবুকটা। তীব্র জ্বালা সহ্য করতে না পেরে রানার পা ছেড়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে লুকাল কবীর চৌধুরী একটা বড় আলমারির পিছনে। রানাও তড়াক করে লাফিয়ে উঠে রিভলভারটা কুড়িয়ে নিল মাটি থেকে, তারপর সেটা বাগিয়ে ধরে বলল, 'মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও, কবীর চৌধুরী।'

কিন্তু কোথায় চৌধুরী? কেউ নেই আলমারির পিছনে। 'ক্লিক' করে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ কানে আসতেই রানা বুঝল অদৃশ্য হয়ে গেল কবীর চৌধুরী আলমারির পিছনে দেয়ালের গায়ের কোন গুপ্ত দরজা দিয়ে।

ছুটে বেরিয়ে এল রানা সে ঘর থেকে। এবার চারতলার দু'শো ছাপ্পান্ন নম্বর ঘর। লিফটে করে উঠে এল চারতলায়। কিন্তু সেখানে নম্বরগুলো সবই ছ'শোর উপরে। রানা ভাবল, মিছে কথা বলল না তো লোকটা? আচ্ছা, অন্য ব্লকের চার তলায়ও তো রাখতে পারে সুলতাকে!

লম্বা করিডরটার ঠিক মাঝামাঝি এসেই অন্য ব্লকের রাস্তা পেল রানা। এবার দৌড়াতে আরম্ভ করল সে। দেরি হলেই ধরা পড়ে যাবে।

এমন সময় অ্যালার্ম সাইরেন বেজে উঠল পাহাড়ের মধ্যে। সবাইকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে বিপদ-সঙ্কেত দিয়ে। একটা মোড় ঘুরতেই দেখল একজন প্রহরী ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ওর দিকেই আসছিল—ওকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে রিভলভার বের করতে যাচ্ছে। গুলি করল রানা। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা মাটিতে। কাছে গিয়ে দেখল রানা শেষ হয়ে গেছে। দেয়ালের গায়ে লেখা পিএমকে ২৫৪। চটপট প্রহরীর রিভলভার আর চাবির গোছা নিয়ে এগিয়ে গেল রানা। আর মাত্র দুটো ঘর বাদেই দু'শো ছাপ্পান্ন।

তেমনি চোখ খুলে বসে আছে সুলতা চেয়ারে বাঁধা অবস্থায়। চাবি খোলার শব্দ শুনে নতুন কোন নির্যাতনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল মনে মনে—রানাকে ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেল। ওর হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে রানা বলল, 'জলদি উঠে পড়ো, সুলতা। কোন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না এখন। সবাই সজাগ হয়ে গিয়েছে। যে করে হোক বেরোতে হবে আমাদের এখান থেকে।'

'তুমি! কি করে ছাড়া পেলে, রানা!'

'সব বলব পরে। এখন উঠে পড়ো, লক্ষ্মী। একটুও সময় নেই—দেরি করলেই আবার ধরা পড়তে হবে।'

ছুটল দু'জন লিফটের দিকে। উপরের দিকে না গিয়ে দুই নম্বর বোতাম টিপল রানা। লিফ্‌ট্‌ থেকে নামতেই কবীর চৌধুরীর গলা শুনতে পেল লাউড্‌-স্পীকারে। সমস্ত পাহাড়ের লোককে নির্দেশ দিচ্ছে সে।

'দোতলায় ছোট সবাই। ওরা ওপর দিকে যায়নি। দোতলায় সোডিয়ামের ঘরের দিকে যাচ্ছে এখন। যে যেখানে আছ দোতলায় যাও। যার সামনে পড়বে সে-ই গুলি করবে।' ইনফ্রা রেড রে-র সাহায্যে রানার গতিবিধি টের পাচ্ছে চৌধুরী পরিষ্কার।

মস্ত বড় বড় টিনের ড্রামের মধ্যে সোডিয়াম রাখা। আকারে একেকটা

আলকাতরার ড্রামের তিনগুণ হবে। পাশাপাশি আটটা ড্রামের পেট বরাবর গুলি করল রানা। ড্রাম ফুটো হয়ে গিয়ে কলের জলের মত কেরোসিন তেল বেরিয়ে মেঝেতে পড়তে আরম্ভ করল। রানা জানে অক্সিজেন থেকে বাঁচাবার জন্যে কেরোসিন তেলের মধ্যে চুবিয়ে রাখা হয় সোডিয়াম। এই তেল বেরিয়ে গেলেই অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে গরম হয়ে উঠবে সোডিয়াম—তারপরই ঘটবে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ। 'তার আগেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে এখান থেকে যেমন করে হোক,' ভাবল রানা।

কিন্তু বেরোবে কোনদিক দিয়ে? পাহাড়ের উপর দিকটা এতক্ষণে সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনে ফেলেছে কবীর চৌধুরী। উপরে উঠতে গেলেই গুলি খেয়ে মরতে হবে। তাহলে? এখন এগোবেই বা কোনদিকে?

চারদিক থেকে লোকজনের হৈ-হল্লা এবং পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। একটা রিভলভার ফেলে দিল রানা। গুলি শেষ। এখন অবশিষ্ট রিভলভারের তিনটে গুলিই সম্বল।

সুলতার একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল রানা ডান দিকে সেই তেল চুপচুপে মেঝের উপর দিয়ে। কিছুদূর গিয়েই মোড় ঘুরেছে রাস্তাটা। সেখানটায় এসেই রানা দেখল তিন চারজন লোক এগিয়ে আসছে হন্তদন্ত হয়ে। এত কাছে জলজ্যান্ত ওদের দু'জনকে সামনে দেখে একটু হকচকিয়ে গেল লোকগুলো। পর পর দুটো গুলি করে দু'জনকে ধরাশায়ী করল রানা। আর বাকি দু'জন তীরবেগে ছুট দিল উল্টো দিকে জানপ্রাণ নিয়ে। পিছন থেকে বহু লোকের হৈ-হল্লা এগিয়ে আসছে দ্রুত। সেই সঙ্গে খুব কাছ থেকে লাউড স্পীকারে কবীর চৌধুরী বলছে, 'মাসুদ রানা এখন একতলার সিঁড়ির কাছে। আর মাত্র একটা গুলি আছে ওর রিভলভারে। এগিয়ে যাও।'

কয়েক পা গিয়ে সত্যিই সিঁড়ি পাওয়া গেল। তর তর করে নেমে এল ওরা একতলায়। এখন? এক দিকে গজ বিশেক গিয়ে শেষ হয়েছে করিডর। সেই দিকেই দৌড় দিল রানা পাগলের মত।

হাঁফাতে হাঁফাতে সুলতা বলল, 'হাতটা একটু ছাড়ো। খুব লাগছে।'

চট করে হাত ছেড়ে দিল রানা। উত্তেজনার বশে সুলতার কব্জিটা প্রায় গুঁড়ো করে দেবার জোগাড় করেছিল ও।

এক সঙ্গে কয়েকটা পিস্তল গর্জে উঠল। দেয়ালের সাথে সেঁটে দাঁড়িয়ে রানা দেখল প্রায় পঁচিশ-তিরিশ জন লোক এগিয়ে আসছে। লাউডস্পীকারে কবীর চৌধুরী বলল, 'এবারে মাথার ওপরে হাত তুলে দাঁড়াও, মাসুদ রানা। বাধা দিয়ে আর লাভ নেই।'

দেয়ালের গায়ে হাতড়ে যে বোতাম খুঁজছিল রানা পেয়ে গেল সেটা। টিপতেই সরে গেল দেয়ালটা একপাশে। সুলতাকে ধাক্কা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে নিজেও ঢুকে পড়ল ভিতরে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আবার।

'আমাদের বোধহয় ওপর দিকে যাওয়া উচিত ছিল,' বলল সুলতা।

তখন আর কথা বলবার বা কারণ ব্যাখ্যা করবার সময় নেই। ছুটে গেল রানা ঘরের অপর দেয়ালের কাছে। টিম টিম করে একটা বাতি জ্বলছে ঘরে। উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার মুখ। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। হাত দিয়ে দেখল দেয়ালটা ভেজা।

'শিগগির আমার কাছে এসো, লতা। খুব কষে আমাকে জড়িয়ে ধরো। জলদি। সময় নেই।'

দেয়ালের সাথে লাগানো একটা লোহার কড়া এক হাতে শক্ত করে ধরল রানা। দেখল ওর গায়ের সাথে সেঁটে থাকা সুলতার দেহ থর থর করে কাঁপছে ভয়ে। তারপরই বোতাম টিপে দিল রানা। দুরু দুরু করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা অজানা আশঙ্কায়। কি ঘটতে চলছে সে-ই কি জানে ভালমত?

পানি! ভয়ানক জোরে পানি এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে। ভাগ্যিশ পানির তোড়টা প্রথমে গিয়ে ধাক্কা খেল অপর দিকের দেয়ালে, নইলে কিছুতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না ওরা। এক সেকেণ্ডেই কোমর পর্যন্ত উঠে এল পানি। বোতামটা ছেড়ে দিল রানা। ততক্ষণে পানি উঠে এসেছে গলা পর্যন্ত। বন্ধ হয়ে গেল পানি আসবার পথটা।

এবার খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে রানা বলল, 'সাঁতার জানো, সুলতা?'

'না জানি না। কিন্তু এত জল কোত্থেকে এল ঘরের মধ্যে?'

'এই পাহাড়টার চারদিকেই পানি। আমরা পানির লেভেলের প্রায় নব্বই ফিট নিচে আছি এখন। পাহাড়টার চারপাশ যখন শুকনো ছিল তখন এই পথ ছিল বাইরে যাতায়াতের জন্যে। এটা আসল গেট না হয়ে কোন গুপ্ত পথও হ' পারে। এই পথেই আমাদের এখন বেরোতে হবে বাইরে।'

ঠিক এমনি সময়ে যে দরজা দিয়ে ওরা এ ঘরে ঢুকেছিল সেই দরজা খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল। অতর্কিত পানির এক ধাক্কায় দরজার সামনের লোকটা ছিটকে সরে গেল। সাথে সাথেই আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

'আমার সমস্ত শরীর জ্বালা করছে পানি লেগে। আমি আর বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারব না, সুলতা। তাড়াতাড়ি সারতে হবে আমাদের সব কাজ। আমি যখন বলব তখন লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে নেবে। বোতাম টিপলেই দরজা খুলে গিয়ে ঘরটা ভরে যাবে পানিতে। সবটা না ভরলে স্থির হবে না পানি, আমরা পানির তোড় ঠেলে বেরোতে পারব না। পানি স্থির হলে আমরা এই পথ দিয়ে বেরিয়ে সাঁতরে উঠব ওপরে, বুঝলে? ততক্ষণ দম বন্ধ করে রাখতে হবে।'

'এত নিচ থেকে ওপরে উঠবে কি করে আমাকে নিয়ে? আমাকে না হয় এখানে ছেড়ে দিয়ে তুমি চলে যাও।'

'পাগল! বাজে বকো না, লতা। তোমাকে ছেড়ে গিয়ে আমি নিজের প্রাণ বাঁচাতে চাই না। তার চেয়ে এসো দু'জন একসাথে চেষ্টা করি—মরি যদি, একসাথে মরব।'

'আশ্চর্য মানুষ তুমি, রানা।'

'বিয়ের রাতে আমার অনেক প্রশংসা কোরো—এখন তোমার শাড়ি খানিকটা ছিঁড়ে চারটে ছোট ছোট টুকরো করো তো। ওগুলো কানের মধ্যে গুঁজে না নিলে এত গভীর পানিতে চাপ লেগে কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে।'

নতুন শাড়িটা ছিঁড়তে এক মুহূর্ত একটু দ্বিধা করল সুলতা। হাজার হোক মেয়েমানুষ তো! তারপরই রানার কথা মত কাজ করল।

রানা বলল, 'রেডি?'

মাথা ঝাঁকাল সুলতা।

এক হাতে সুলতাকে জড়িয়ে ধরে আরেক হাতে সাঁতার কাটছে রানা উপরে উঠবার জন্যে। পা দুটো ঠিকমত ব্যবহার করতে পারছে না—বেধে যাচ্ছে সুলতার শাড়িতে, পায়ে।

শেষের তিরিশ ফুট মনে হলো যেন আর শেষ হবে না। একে নির্যাতনে দুর্বল শরীর, তার উপর এই অমানুষিক পরিশ্রম—বুকের ছাতি ফেটে যেতে চাইছে রানার। কপালের দুই পাশে দুটো শিরা দপ-দপ করছে। প্রাণপণে সাঁতরে চলল রানা। নিজের কষ্ট ভুলে মনে মনে ভাববার চেষ্টা করল সুলতার কতখানি কষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু এই ওপরে ওঠার কি শেষ নেই? ফুট দশেক থাকতেই হাল ছেড়ে দিল রানা। আর পারা যায় না। ধীরে ধীরে নামতে আরম্ভ করল আবার ওরা। এভাবে নামতে ভালই লাগছে রানার। ঘাড়ে, গলায়, কানের পাশে সুড়সুড়ি লাগছে পানি লেগে। হঠাৎ সুলতা একটু নড়ে উঠতেই হুঁশ হলো রানার। শেষ চেষ্টা করে দেখবে সে একবার। বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটছে যেন কেউ। আবার উঠতে থাকল ওরা ওপরে। ইয়াকুবের মুখটা একবার ভেসে উঠল রানার মনের পর্দায় কেন জানি।

ওপরে উঠে নাক মুখ দিয়ে অনেক পানি বেরোল সুলতার। দু'জনেই খানিকক্ষণ হাঁ করে মুখ দিয়ে শ্বাস নিল বুক ভরে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গোধূলির সব রঙ মুছে গেছে মেঘের ফালি থেকে। আবছা চাঁদের আলোয় পনেরো গজ দূরে পাহাড়ের ছোট্ট মাথাটা দেখে যেন জ্ঞান ফিরে পেল রানা। পালাতে হবে। এই অভিশপ্ত পাহাড়ের কাছ থেকে পালাতে হবে দূরে। মনে পড়ে গেল গতরাতের অভিযানের কথা, আবদুলের কথা। এখনও 'ডেকা' রাডার স্ক্যানার ঘুরছে টিলাটার চূড়ায়।

সুলতার মাথা পানি থেকে অল্প একটু ভাসিয়ে রেখে 'ব্যাক্‌স্ট্রোক' দিয়ে পিছনে সরে যেতে শুরু করল রানা।

হঠাৎ পাহাড়ের মাথায় কবীর চৌধুরীর প্রকাণ্ড দেহটা দেখে চমকে উঠল রানা। কবীর চৌধুরীও দেখল ওদের। তারপর ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ল পানিতে। দ্রুত এগিয়ে আসছে চৌধুরী ওদের দিকে।

এইবার প্রমাদ গুণল রানা। একটা মাত্র গুলি আছে ওর রিভলভারে। কবীর চৌধুরীর তা অজানা নেই। যদি এক গুলিতে ওকে ঘায়েল করা না যায় তবে ওর হাতে নিশ্চিত মৃত্যু হবে দু'জনের। কাজেই আগে গুলি ছুড়বে না বলে স্থির করল রানা। কবীর চৌধুরীর মনে গুলি খাওয়ার ভয় থাক কিছুটা।

কিন্তু চৌধুরী নিজে আসছে কেন লোক না পাঠিয়ে? ও নিশ্চয়ই টের পেয়েছে সোডিয়ামের ড্রাম ফুটো হবার কথা। তাই কাউকে কিছু না বলে সরে আসছে পাহাড় থেকে। সেই সাথে ওর সব কিছু ধ্বংস করে দেয়ার প্রতিশোধটাও তুলে নেবে।

প্রাণপণে ব্যাক্‌স্ট্রোক্ দিয়ে চলল রানা—সেই সাথে পা দুটো চলছে প্রপেলারের মত। কিন্তু এক হাতে কত আর সাঁতরাবে সে? তার উপর সুলতার ভার। এখন মনে হলো আরও একটা গুলি অন্তত হাতে রাখা উচিত ছিল।

ধীরে ধীরে দূরত্ব কমে আসছে ওদের। পনেরো গজ দূরে থাকতেই প্রথম গুলি

করল কবীর চৌধুরী। রানা অনুভব করল ওর হাতের মধ্যে হঠাৎ সুলতার দেহটা অস্বাভাবিকভাবে চমকে উঠল। পরক্ষণেই রানার চোখে মুখে কি যেন ছিটে এসে পড়ল। কিছু দেখতে পাচ্ছে না রানা আর। তাড়াতাড়ি পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নিল রানা চোখমুখ। হাতে লাগল চটচটে কি যেন।

হঠাৎ কি মনে হতেই আঁতকে উঠে সুলতার মুখের দিকে চাইল রানা। দেখল মাথাটা হেলে পড়েছে এক দিকে। হ্যাঁ! অব্যর্থ চৌধুরীর হাতের টিপ। তাজা রক্ত আর মগজের অংশ ছিটকে বেরিয়ে এসে লেগেছিল রানার চোখে মুখে।

রিভলভার বের করল রানা। কিন্তু সামনে কি যেন দেখে এগোনো বন্ধ করেছিল কবীর চৌধুরী। রানা গুলি করবার আগেই ডুব দিল পানির মধ্যে।

প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে গিয়ে উঠল কবীর চৌধুরী। গুলি করল রানা। দূর থেকে একটা অট্টহাসির শব্দ ভেসে এল। চলে গেল কবীর চৌধুরী।

সামনে যতদূর দেখা যায় কেবল জল আর জল। মেঘবিহীন বৈশাখের আকাশে নিঃসঙ্গ পূর্ণিমার চাঁদ। ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় চাঁদের মুকুট। ফুর ফুর করে বইছে পুবালী হাওয়া। মাথার উপর দিয়ে বাদুড় উড়ে গেল একটা।

চাঁদের আলোয় নিষ্প্রাণ সুলতার মলিন মুখটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল রানা। ছোট্ট একটা চুম্বন এঁকে দিল ওর কপালে। তারপর ছেড়ে দিল পানির ভেতর। দ্রুত নেমে গেল দেহটা নিচে। সুলতার চিহ্নও থাকল না আর। নিজেকে বড় অসহায় একা মনে হলো রানার। হু-হু করে উঠল বুকের ভিতরটা এক অবর্ণনীয় বেদনায়। অবসন্ন দেহটাকে ভাসিয়ে রাখতে কষ্ট হচ্ছে খুব।

কিন্তু কিসের এক মোহে ওখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাঁতার কাটতে থাকল রানা—জায়গাটা ছেড়ে কিছুতেই চলে যেতে পারছে না ও।

হঠাৎ বেশ কাছ থেকে কয়েকটা টর্চের উজ্জ্বল আলো পড়ল রানার চোখের উপর। চোখটা ধাঁধিয়ে যাওয়ায় কিছুই দেখতে পেল না ও সামনে। কানে এল কে বলছে, 'ওই যে, আরেক ব্যাটাকে পাওয়া গেছে। মেশিনগান রেডি রাখো, এর কাছেও পিস্তল থাকতে পারে। সাবধানে ঘিরে ফেলো নৌকা দিয়ে।'

স্বাভাবিক আত্মরক্ষার তাগিদে ডুব দিতে যাবে রানা—এমন সময় কানে এল আবদুল হাইয়ের পরিচিত স্বর।

'আরে, এ যে দেখছি মাসুদ রানা! এই, লতীফ, জলদি কাছে নিয়ে চল শাম্পান! আপনি এখানে কি করছেন, মাসুদ সাহেব?'

রানা জবাব দিতে চেষ্টা করল কিন্তু আওয়াজ বেরোল না গলা দিয়ে। রানার মুমূর্ষু দেহটা তিনজনে টেনে তুলল নৌকার উপর। ঠিক সেই সময় প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ হলো কাছেই কোথাও। রানা চেয়ে দেখল অভিশপ্ত পাহাড়ের চুড়োটা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে পানির নিচে। মস্ত বড় বড় ঢেউ উঠল বিশাল রিজারভয়েরের গভীর হৃদয় মন্থন করে।

বিস্মিত আবদুল হাই বলল, 'কী হলো! ভয়ঙ্কর এক্সপ্লোশন হলো বলে মনে হচ্ছে!'

এবারও কোন জবাব দিতে পারল না রানা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজল নৌকোর পাটাতনে শুয়ে।

# ভারতনাট্যম

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৬৬

## এক

৩০ আগস্ট, ১৯৬৫

'এবারে কথক নৃত্য পরিবেশন করছেন শ্রীমতি মিত্রা সেন।'

ঘোষকের মিষ্টি গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গেই গিজগিজে ঠাসা প্রকাণ্ড হলঘরের প্রচণ্ড কোলাহল মৃদু গুঞ্জনে পরিণত হলো। হল কাঁপিয়ে বেজে উঠল তবলার তেহাই।

তিক ধা ধিগি ধিগি থেই। তিক ধা ধিগি ধিগি থেই।

তিক ধা ধিগি ধিগি।

ধা ধিন ধিন ধা। ধা ধিন ধিন ধা। না তিন তিন না।

তেটে ধিন ধিন ধা।...

এক এক করে সব বাতি নিভে গেল। স্তব্ধ প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে উঠল দর্শকবৃন্দ। নিশ্চুপ হয়ে গেল মস্ত হল ঘরটা।

কালো স্ক্রীন সরে যেতেই প্রথমে লাল, পরে হালকা নীল আলো ঝিলমিল করতে থাকল ঢেউ খেলানো সিল্কের সাদা পর্দার ওপর। তারপর সে পর্দাও দু'ফাঁক হয়ে সরে গেল ধীরে ধীরে। দেখা গেল নমস্কারের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে কলকাতার সাংস্কৃতিক শুভেচ্ছা মিশনের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ, অতুলনীয়া সুন্দরী শ্রীমতি মিত্রা সেন। স্পট লাইটের স্বপ্নিল আলো একটা মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে মিত্রা সেনকে ঘিরে। এক শ্রেণীর দর্শকের মধ্যে থেকে একটা আধা-অশ্লীল উল্লাস-ধ্বনি উঠেই মিলিয়ে গেল।

তা তে থেই তাত। আ তে থেই তাত। থেই আ থেই আ থেই।

থেই থেই তাত তাত থা। তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা আ।

তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা আ। তেরে কেটে গদি ঘেনে।

ধা ধিন ধিন ধা। ধা ধিন ধিন ধা। না তিন তিন না।

তেটে ধিন ধিন ধা।...

আরম্ভ হলো নাচ। শতকরা নব্বুই জন দর্শকই সেই মুহূর্তে মনে মনে স্থির করল, যে করে হোক আগামী দিনের টিকেট যোগাড় করতেই হবে—ব্ল্যাকে দশগুণ দামে হলেও।

হলঘরের অসহ্য ভ্যাপসা গরমে ফটোগ্রাফারের জন্যে নির্দিষ্ট আসনে বসে বসে ঘামছে মাসুদ রানা। আর মনে মনে পিণ্ডি চটকাচ্ছে ঢাকায় এয়ার-কণ্ডিশনড রুমে সুখে নিদ্রামগ্ন পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কর্ণধার মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের। যতসব রদ্দি পচা কাজের ভার বুড়ো বেছে বেছে ওর কাঁধে চাপায়।

কেন? আর লোক নেই? ইণ্ডিয়ার নাম শুনলেই একেবারে যেন বাই চড়ে যায় বুড়োর মাথায়। ডন কুইকজোটের মত খেপে গিয়ে হাওয়ায় তলোয়ার ঘোরাতে আরম্ভ করে দেয় একেবারে।

আরে বাবা, একদল ন্যাকা মেয়েছেলে আর তাদের সঙ্গে মেয়েলী স্বভাবের মিনমিনে কতগুলো ননীর পুতুল এসেছে কলকাতা থেকে গায়ক-গায়িকা-নর্তকী সেজে। এদের মধ্যে তাকে ঢোকাল বুড়ো কোন আক্কেলে? তাও যদি রিপোর্টার বা অন্য কোনও পরিচয়ে হত তো এক কথা। তা নয়। তার কাজ কি—না ফটো খিঁচা। এখন যে গরম লাগছে, তার কি হবে? পচা গরমে ঘামতে ঘামতে হঠাৎ পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল রানার। সব রাগ গিয়ে পড়ল রাহাত খানের ওপর। দুই মিনিটের চেষ্টায় অনেক কষ্টে দূর করল রানা মন থেকে সব বিক্ষোভ।

ভাদ্রের প্রায় মাঝামাঝি। শরৎ কাল। কিন্তু এবারের শরৎ যেন গুমোট ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। মায়ের আঁখির মত নীল আকাশ, পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের অক্লেশে হাওয়ায় ভেসে যাওয়া, মাঝে মাঝে উত্তর থেকে অনেক স্মৃতি জাগিয়ে তোলা নীলুয়া বাতাস, সন্ধেবেলায় পুজোর ঘণ্টা, শিউলীর জমাট সুগন্ধ, আমেজ—সবই আছে। কিন্তু গরমটা যেন চেপে বসেছে গদির ওপর স্বৈরাচারী শাসকের মত; নড়বে না কিছুতেই।

তার ওপর সিগারেটের ধোঁয়া আর এতগুলো লোকের আড়াই ঘণ্টা ধরে অবিরাম নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ভারি হয়ে উঠেছে রাজশাহী টাউন হলের বদ্ধ বাতাস। কতক্ষণ আর সহ্য করা যায়? চোখ দুটো অল্প অল্প জ্বালা করে রানার। সম্মোহিত দর্শকবৃন্দের দিকে একবার নির্লিপ্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

রানার বাঁ কাঁধে ঝুলছে ব্রাউন হবি EL 300 ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ গান এবং বিভিন্ন ফোকাল লেংথের নিকর লেন্স, ফিল্টার; এক্সট্রা লেন্স-হুড; কেবল্-রিলিজ, একটা মোটর ড্রাইভ এবং অন্যান্য হাবিজাবিতে ভর্তি একখানা গ্যাজেট ব্যাগ; আর ডান কাঁধে টু-পয়েন্ট এইট লেন্সের একটা রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা। গলায় ঝুলছে একখানা বিখ্যাত নিকন-এফ ক্যামেরা। লেন্স-হুড্ লাগানোই আছে তাতে। দ্রুত ফোকাস করবার জন্যে স্প্লিট ইমেজ রেঞ্জ ফাইণ্ডার স্ক্রীন ব্যবহার করছে সে আজ।

পাকা ফটোগ্রাফারের বেশে নিজেকে কেমন বিদঘুটে দেখাচ্ছে কল্পনা করে মুচকি হাসল রানা। তারপর ফ্ল্যাশ গানটা ধীরেসুস্থে ক্যামেরার ওপর লাগিয়ে নিল। আড়চোখে একবার চেয়ে দেখল, সেই ছয়জন ইয়াং টাইগার্স-এর মধ্যেখানে বসে আছে দলপতি জয়দ্রথ মৈত্র। স্টেজের দিকে ওদের কারও চোখ নেই—চাপা গলায় কি যেন আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে। নিকন-এফ ক্যামেরায় অ্যাপারচার এফ্ এইট্ দিয়ে ডিস্ট্যান্স বিশ ফুটে সেট করে নিল রানা। এতে ডেপ্থ অফ ফোকাস নয় ফুট থেকে ইনফিনিটি পাওয়া যাবে। একটা আধ-খাওয়া সিগারেট পড়ে আছে সামনে মাটিতে। আগুনটা পিষে ফেলল সে জুতো দিয়ে। জমে উঠেছে নাচ।

ধিক তেই ধিগি তেই। ধিক তেই ধিগি তেই। ধিগি ধিগি থেই।
ধিগি ধিগি ধিক্ থেই। ধিগি ধিগি থেই। তা থেই তা থেই।
থেই তা থা। থেই তা থা। থেই তা। ধিক তেই ধিগি তেই।

ধিক তেই ধিগি তেই। ধিগি ধিগি থেই। ধিগি ধিগি ধিক থেই।
ধিগি ধগি থেই। তা থেই তা থেই। থেই তা থা। থেই তা থা।
থেই তা।
ধা ধিন ধিন ধা। ধা ধিন ধিন ধা। না তিন তিন না।
তেটে ধিন ধিন ধা।···

এবার এগিয়ে গেল রানা দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদন করে স্টেজের মাঝ বরাবর। তারপর হঠাৎ ঘুরে, যেন দর্শকদের ছবি তুলছে এমনি ভাবে সেই ছোট্ট দলটির ছবি তুলে নিল। অপ্রস্তুত দলটি ফ্ল্যাশ লাইটের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপর জয়দ্রথ ছাড়া বাকি সবার হাত দ্রুত উঠে এসে নিজ নিজ চেহারা আড়াল করার চেষ্টা করল। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। মৃদু হাসল রানা।

এক, দুই করে নয় সেকেণ্ড পার হলো। জ্বলে উঠল ফ্ল্যাশ গানের পেছনে লাল বাতি। রি-চারজিং সাইক্‌ল্‌ কমপ্লিট হয়েছে। এবার আরও কয়েকটি ছবি তুলল সে মিত্রা সেনের বিশেষ বিশেষ নৃত্য ভঙ্গিমার, বিভিন্ন দূরত্ব থেকে বিভিন্ন অ্যাপারচার দিয়ে। মাথার মধ্যে দ্রুত চিন্তা চলছে রানার। ঢাকার কুখ্যাত ইয়াং টাইগার্স পিছু ছাড়েনি তাহলে। কিন্তু এদের সঙ্গে কলকাতার সাংস্কৃতিক মিশনের দলপতির এই দহরম-মহরম কেন? কুষ্টিয়ায় মিত্রা সেনকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল যারা, যাদের হাত থেকে রানা রক্ষা করেছিল মিত্রাকে কিন্তু প্রতিদানে পেয়েছিল দুর্ব্যবহার, সব জেনেশুনেও তাদের সঙ্গে জয়দ্রথ মৈত্রের এই মৈত্রী কিসের? ঈশ্বরদি জংশনের রিফ্রেশমেন্ট রুমেই প্রথম রানার চোখে পড়ে এদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছে জয়দ্রথ মৈত্র। কি মতলব আঁটছে সে এদের সঙ্গে? রাজশাহীতে পৌঁছে ডাকবাংলোতে মিত্রা সেনের ব্যবহারই বা এমন হঠাৎ পাল্টে গেল কেন? ঠিক তার পাশের ঘরটা বুক করল মিত্রা—দলপতি তাতে আপত্তি করল না। ট্রেনে তাহলে গুলিবর্ষণ করল কে? তাছাড়া আজ সারাদিন মনে হচ্ছিল মিত্রা যেন কিছু বলতে চায় তাকে, কিন্তু বলি বলি করেও সুযোগ করে উঠতে পারছে না। কী সে কথা? নিশ্চয়ই কোনও ট্র্যাপ পেতেছে ওরা। সামনে বিপদের গন্ধ পাচ্ছে রানা।

হঠাৎ রানার মনে হলো মিত্রা যেন তার দিকে চেয়ে আবছা কি একটা ইঙ্গিত করল। আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। শেষ বারের মত ক্লিক করে শাটার টিপে দিল সে। এক ঝলক তীব্র আলো ছুটে গিয়ে আলিঙ্গন করল মিত্রা সেনকে। শাটারের ওপর আঙুলের চাপ পড়তেই এক মুহূর্তের জন্যে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল ভিউ ফাইণ্ডার, পরমুহূর্তেই ইনস্ট্যান্ট রিটার্ন মিরর যথাস্থানে ফিরে গিয়ে ভেসে উঠল আবার মিত্রার ছবি। নিজের আসনে গিয়ে বসে পড়ল রানা। ক্যামেরার লেন্স বদল করছে। আগাগোড়া সবটা ব্যাপার ভেবে দেখা দরকার। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে নিল সে।

ক্রেধা আধা তেটে তেটে। কৎ তেটে ক্রেধা তেটে। ক্রেধা তেটে ধা।
ক্রেধা তেটে ধা। ক্রেধা তেটে। ক্রেধা আধা তেটে তেটে।
কৎ তেটে ক্রেধা তেটে। ক্রেধা তেটে ধা। ক্রেধা তেটে ধা।
ক্রেধা তেটে। ক্রেধা আধা তেটে তেটে।

কৎ তেটে ক্রেধা তেটে। ক্রেধা তেটে ধা। ক্রেধা তেটে ধা।

ক্রেধা তেটে।

ধা ধিন ধিন ধা। ধা ধিন ধিন ধা। না তিন তিন না।

তেটে ধিন ধিন ধা।...

মুখে চক্রধর বোল বলছে তবল্‌চি। মিত্রা সেন এবার নাচের মুদ্রায় সে ছন্দকে মূর্ত করে তুলবে। চতুর্গুণ বেড়ে গেছে লয়। অত্যন্ত দ্রুত লয়ে চলছে নাচ।

হঠাৎ মনে হলো যেন মিত্রার পা আর মাটিতে নেই—সারাটা স্টেজময় যেন সে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। মুগ্ধ, চমৎকৃত দর্শকবৃন্দের করতালিতে হলের ছাদ উড়ে যাবার উপক্রম। রানাও অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল—প্রশংসা না করে পারল না মনে মনে। সত্যিকার শিল্প দেশ-জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে।

হাততালি থেমে যেতেই হলের মাঝামাঝি জায়গায় বসে এক ফাজিল ছোকরা 'ম্যা...এ্যাঁ...' করে জোরে ছাগলের ডাক ডেকে উঠল। চাপা হাসির গুঞ্জন উঠল। দু'একটা ধমক-ধামকের আওয়াজও এল।

নিকন এফ-এর লেন্সটা খুলে ফেলল রানা। খুলে ২০০ মি. মি. অটো নিকর এফ-২.৫ টেলিফটো লেন্সটা লাগিয়ে নিল। বেয়োনেট মাউন্টের ওপর ক্লিক করে বসে গেল লেন্স। এবার ক্যামেরাটা চোখে তুলে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করতে চেষ্টা করল সে। টেলিফটো লেন্সের ছোট অ্যাঙ্গেলের মধ্যে মিত্রা সেনকে ধরতে কয়েক সেকেণ্ড লেগে গেল। নিকন-এর উজ্জ্বল ভিউ ফাইণ্ডারের পর্দায় পৃথিবীর অদ্বিতীয় নিকর লেন্সের মাধ্যমে পরিষ্কার ভেসে উঠল এবার মিত্রার সুন্দর মুখচ্ছবি। প্রতিটি রেখা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রানা। উপলব্ধি করল ও, এ মুখটাও পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। কপালে চাঁদির টিপ আলো পড়ে মাঝে মাঝে ঝিক্ করে উঠছে, দু'চোখে টেনে কাজল পরা, ঠোঁট লিপস্টিকে লাল।

সোজা তার দিকে চেয়ে আবার ইঙ্গিত করল মেয়েটি। না, চোখের ভুল নয়। দূর হলো রানার সন্দেহ।

প্রবল করতালি এবং শেয়ালের ডাকের মধ্যে শেষ হলো নাচ। কালো পর্দাটা ধীরে ধীরে নেমে এসে আড়াল করল মিত্রাকে।

সবাই একসঙ্গে বেরোতে চাইছে হল থেকে। গেটের কাছে দারুণ ভিড় ঠেলে রানা এগোল গ্রীনরুমের দিকে। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ হাত ঢোকাল রানার প্যান্টের পকেটে। ধরতে পারল না রানা হাতটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল একটা লোমশ হাত সরে গেল পেছনের ভিড়ে।

পকেটে হাত দিয়ে একটা ছোট্ট কাগজ পেল রানা। ভাবল, বার্তা হবে কিছু।

চারকোনা ছোট কাগজের ওপর ইংরেজিতে টাইপ করা:

BEWARE GENTLEMAN, DANGER AHEAD!

প্রথমেই রানা ভাবল: টাইপ করা যখন, এটা তাকে দেবে বলে কেউ আগে থেকেই মনস্থ করে এসেছে, হঠাৎ তার মাথায় আসেনি এই সাবধানবাণী—অর্থাৎ, পূর্ব-পরিকল্পিত। কিন্তু কে তাকে সাবধান করতে চায়, শত্রু না মিত্র? এবং কেন? কিসের বিপদ সামনে? ঘাই হরিণীর মত কি মিত্রা ডাকছে তাকে মৃত্যুর পথে? নাকি কেউ ভয় দেখিয়ে দূরে সরাতে চাইছে ওকে?

দুই হাত মাথার ওপর তুলে চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ল রানা—যেন ওর ওপর যে বা যারা লক্ষ রাখছে, তারা স্পষ্ট দেখতে পায় ওর কার্যকলাপ। তারপর ওপর দিকে টুকরোগুলো ছুঁড়ে ফুঁ দিয়ে ছিটিয়ে দিল চারদিকে। আশেপাশে সবার মাথায় ঝরে পড়ল সেগুলো পুষ্প-বৃষ্টির মত।

ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে স্টেজের পেছন দিকে চলে এল রানা। গেটের কাছে দাঁড়ানো বুকে নীল ব্যাজ আঁটা ভলান্টিয়ার রানাকে দেখে পথ ছেড়ে দিল। ভেতরে ঢুকে এদিক ওদিক চাইতেই একটা ছোট ঘরের আধ-ভেজান দরজা দিয়ে মিত্রা সেনকে দেখতে পেল রানা। দ্রুত কাপড় ছাড়ছে সে। স্টেজের পেছনে অনাদর অবহেলায় পড়ে থাকা গোটাকতক ক্যানভাসের উইং, এলোমেলো করে ফেলে রাখা কয়েকটা বাঁশ আর কিছু নারকেলের রশি টপকে ড্রেসিংরুমের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা।

'ভেতরে আসুন!' মিত্রার চাপা কণ্ঠস্বর।

ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল রানা। কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? এভাবে হুট করে ড্রেসিংরুমে ঢুকে পড়া···

'কই, দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে আসুন।'

এবার রানার টনক নড়ল। মেয়েটির চাপা খসখসে অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে ধৈর্যচ্যুতির আভাস পাওয়া গেল। এ যেন অনুরোধ নয়, আদেশ। ঢুকে পড়ল রানা ঘরের ভেতর।

'ছিটকিনি লাগিয়ে দিন দরজার। লজ্জা করার সময় এটা নয়। জরুরী কথা আছে। দোহাই আপনার, বোকার মত দাঁড়িয়ে না থেকে তাড়াতাড়ি করুন—সময় নেই মোটেও। এক্ষুণি ওরা সব এসে পড়বে।'

মেয়েটির কণ্ঠস্বরে এমন একটা উত্তেজিত জরুরী ভাব প্রকাশ পেল যে প্রায় চমকে উঠল মাসুদ রানা। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল তার। অদ্ভুত কিছু শুনবার জন্যে মনটাকে প্রস্তুত করে নিল সে মুহূর্তে।

নড়বড়ে বল্টুটা লাগানো না লাগানো সমান কথা। তবু সেটা লাগিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা। স্থির দৃষ্টিতে আপাদমস্তক একবার দেখল মিত্রাকে। ভাবল, হঠাৎ আজ এই মুহূর্তে নিজের দলটা 'ওরা' হয়ে গেল কেন এই মেয়েটির কাছে? কুষ্টিয়ার অনুষ্ঠানে তার প্রতি স্পষ্ট ঘৃণা দেখতে পেয়েছে রানা মিত্রার চোখে। আজ সে-ই আপন লোক হয়ে গেল, অন্যেরা পর—কেমন করে হয়! এর মধ্যে গোলমাল আছে কিছু। সাবধান!

'আপনাকে এখানে ঢুকতে দেখেছে কেউ?' জিজ্ঞেস করল মিত্রা।

'বোধহয় না,' উত্তর দিল রানা নিরাসক্ত কণ্ঠে। এগিয়ে গিয়ে গ্যাজেট ব্যাগ আর ফ্ল্যাশ-গানটা নামিয়ে রাখল একটা চেয়ারের ওপর। বলল, 'কি ব্যাপার মিত্রা সেন? আকারে ইঙ্গিতে কি বোঝাতে চাইছেন আপনি আমাকে?'

'আপনার, আমার দু'জনের সামনেই ভয়ানক বিপদ এখন।'

গ্রীনরুমের পেছন দিকের খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ঠাণ্ডা এক ঝলক মুক্ত বাতাস এল জানালা দিয়ে। বুক ভরে শ্বাস গ্রহণ করল সে। বাইরে প্রায় জানালার সঙ্গে লাগানো একটা কচুরিপানা ভর্তিপুকুর। কানায় কানায় টইটম্বুর।

মোলায়েম জ্যোৎস্নায় পুকুরপাড়ের নারকেল গাছ দুটোকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে দেখতে। রানা ভাবে, 'সুন্দর' আর 'বিপদ' এই দুটো জিনিসে কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে। পৃথিবীর বেশির ভাগ জিনিস যা সুন্দর, রানা দেখেছে তার আশেপাশে ওত পেতে থাকে বিপদ। অপূর্ব সুন্দরী এই মেয়েটির চারপাশে বিপদ ঘনিয়ে আসবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

পাশে এসে দাঁড়াল মিত্রা।

'একটা ভয়ঙ্কর চক্রান্তের জাল পাতা হয়েছে আপনার জন্যে, মি.…'

'আমি নগণ্য এক ফটোগ্রাফার—তরিকুল ইসলাম। আপনি এসব কি ভয়ঙ্কর কথা শোনাচ্ছেন?' সত্যিসত্যিই বিস্মিত হবার ভান করল রানা।

'বাজে সময় নষ্ট করবেন না, মি. মাসুদ রানা।' মিত্রার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট তিরস্কার। 'সেই প্রথম দিন থেকেই আমি কেন, সাংস্কৃতিক মিশনের প্রত্যেকটি লোক জানে আপনার আসল নাম, পরিচয়। হাতে সময় নেই, এক্ষুণি ওরা এসে পড়বে, দয়া করে আমার কথাগুলো বলতে দিন।' কপাল থেকে একগুচ্ছ অবাধ্য চুল নিয়ে গুঁজে দিল মিত্রা কানের পাশে। তারপর আবার বলল, 'আজ রাতে আপনাকে খুন করা হবে, মি. রানা!'

মিত্রার মুখে নিজের নাম শুনে অবাক হলো না রানা। মনে মনে ভাবল, আমাকে খুন করা হলে তোমার কি ক্ষতি, সুন্দরী। মুখে বলল, 'কেন? আমার অপরাধ?'

'দলপতির বিশ্বাস, আপনি আমাদের বিরুদ্ধে এমন কিছু তথ্য জানতে পেরেছেন যা আমাদের জন্যে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কাজেই আর কোন পথ নেই; সরিয়ে দিতে হবে আপনাকে এই পৃথিবী থেকে। আর আপনাকে এই নিশ্চিত মৃত্যুর ফাঁদে ফেলবার জন্যে আমাকে ওরা ব্যবহার করছে টোপ হিসেবে।' খুব দ্রুত কথাগুলো বলে গেল মিত্রা। ওর চোখে-মুখে স্পষ্ট উত্তেজনা।

'চক্রান্ত, ফাঁদ, মৃত্যু, এইসব দুঃসংবাদ শুনে মন খারাপ করছে, কিন্তু টোপটা আমার ভারি পছন্দ হয়েছে। আমি এই টোপ গিলতে রাজি আছি। যা থাকে কপালে!' হাসল রানা।

'আপনি হাসছেন? উহ্, এর গুরুত্ব যদি আপনাকে বোঝাতে পারতাম!' তর্জনী ভাঁজ করে কামড়ে ধরল অসহিষ্ণু মিত্রা সেন। 'ওই যে ওরা সব এসে পড়েছে!'

বাইরে কয়েকটা পায়ের শব্দ শোনা গেল। এগিয়ে আসছে কারা কাঠের মেঝের ওপর মচ্‌মচ্ শব্দ তুলে। আর সময় নেই। রানা চেয়ে দেখল উত্তেজনা, ভয় আর হতাশায় রক্তশূন্য হয়ে গেছে মিত্রার মুখ। বুঝল, এটা অভিনয় হতে পারে না।

হঠাৎ রানার বাঁ হাতটা তুলে নিল মিত্রা তার হাতে। চাপা গলায় বলল, 'আমাকেও জড়িয়েছে ওরা। এই নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র যদি সফল হয় তবে আত্মহত্যা ছাড়া পথ থাকবে না আমার। আমি বাঁচতে চাই, রানা! এই বিদেশে আপন কেউ নেই আমার। মৈত্র মশাই নিজেই এই চক্রান্তের উদ্যোক্তা। আমাকে ভাসিয়ে দিচ্ছে এরা বানের জলে। রক্ষা করবে আমাকে, রানা? তোমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছি আমি। বলো, বাঁচাবে আমাকে?'

আকুল মিনতি মিত্রার চোখে। রানা বুঝল, সে এমন একটা ফাঁদে পা দিতে

যাচ্ছে যেখান থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হবে। স্থির দৃষ্টিতে মিত্রার চোখের দিকে চেয়ে সে বুঝল এই কাতর মিনতি অবহেলা করবার সাধ্য তার নেই। কিন্তু কি সেই চক্রান্ত যাকে মিত্রার এত ভয়? লোকগুলো দরজার কাছে এসে গেছে। আর সময় নেই সব কথা শুনবার।

'চেষ্টা করব,' বলল রানা।

মিত্রার কাছে এই আশ্বাসটুকুর অনেক দাম। কৃতজ্ঞতায় দু'ফোঁটা জল বেরিয়ে এল ওর চোখ থেকে। রানার বাঁ হাতটায় আলতো করে চাপ দিয়েই ছেড়ে দিল।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

'নিজেকে বড় স্বার্থপর বলে মনে হচ্ছে। নিজের বিপদ উদ্ধারের জন্যে জেনে শুনে তোমাকে মৃত্যু-ফাঁদে পা দেবার অনুরোধ করছি। কিন্তু আমি বড় অসহায়। তুমি জানো না কত ভয়ঙ্কর লোক ওরা।' শিউরে উঠল মিত্রা। 'আরেকটা শেষ কথা—যদি দ্বিধা হয়, যদি মৃত্যুর ঝুঁকি এড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করে, তবে বাঁচার পথও বলে দিচ্ছি—আজ রাতে কিছুতেই ঘর থেকে বেরিয়ো না। কোন অবস্থাতেই না। আমার যা হওয়ার হোক…'

মিত্রার খসখসে কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে প্রবল বেগে আবার কড়া নাড়ার শব্দ হলো।

'তুমি লুকিয়ে পড়ো কোথাও।'

'না।' গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়ে রানা দেয়ালে বসানো চার বাই তিন ফুট আলমারিটার ছোট্ট তালা এক ঝটকায় ভেঙে ফেলল। যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। ডালাটা খুলতেই দেখা গেল একখানা জাপানী ট্র্যানজিস্টর টেপ-রেকর্ডার। নিশ্চিন্ত মনে ঘুরছে দুটো স্পূল। ওদের কথাবার্তা সব রেকর্ড হয়ে গেছে।

ক্ষুদ্রাকৃতি স্পূল দুটো তুলে নিল রানা টেপ-রেকর্ডার থেকে। তারপর গ্রীনরুমের পেছনের খোলা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল পানা ভর্তি পুকুরে।

'তুমি জানতে?' আলমারির ডালাটা বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না।'

এবার প্রবল এক ধাক্কায় ছিটকিনি ভেঙে দু'ফাঁক হয়ে খুলে গেল দরজা। হুড়মুড় করে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল জয়দ্রথ মৈত্র। পেছনে আরও কয়েকজন লোক।

হলুদ দৃষ্টি মেলে দু'জনকে দেখল জয়দ্রথ মৈত্র। তারপর বলল, 'সরি ফর দা ইন্টারাপশন।' পরিষ্কার বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে।

'দ্যাট্স অল রাইট,' উত্তর দিল রানা। তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে মৈত্রকে পাশ কাটিয়ে চেয়ার থেকে গ্যাজেট ব্যাগ আর ফ্ল্যাশগানটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যেতে যেতে মিত্রার কৈফিয়ত কানে গেল তার।

'উনি একটা ক্লোজ-আপ ছবি নিতে…'

'দরজা বন্ধ করে নিয়েছিলে কেন?'

'আমি, মানে, উনি…'

মৃদু হেসে রাস্তায় গিয়ে পড়ল মাসুদ রানা।

# দুই

২৭ আগস্ট, ১৯৬৫

মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়ায় ছয়তলার ওপর একটা কার্পেট বিছানো ঘরের পশ্চিমমুখী জানালাটা খোলা। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট মাসুদ রানা সে-জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আনমনে স্টেডিয়ামের সবুজ ঘাসের দিকে চেয়ে রয়েছে। অসম্ভব বৃষ্টি হওয়ায় মাঠে পানি জমে আজ বিকেলের ফুটবল খেলা বাতিল হয়ে গেছে। পতাকা নামিয়ে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বেশ কিছুক্ষণ হয় বৃষ্টি থেমেছে। পশ্চিম আকাশের সাদা মেঘের গায়ে এখন নানা রঙের খেলা। দর্শকদের গ্যালারি একেবারে ফাঁকা। দুটো ছাগল, বোধহয় দারোয়ানের হবে, নিশ্চিন্ত মনে চরছে মাঠে। পাশে সুইমিং পুলের টলটলে পরিষ্কার জলে সাঁতার অভ্যাস করছে আট-দশজন তরুণ। বায়তুল মোকাররমের গম্বুজের ওপর চোখ পড়ল এবার রানার। তারপর সিঁড়িতে। জনা কয়েক মুসল্লি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছেন মগরেবের আজান শুনে। প্রকাণ্ড জি. পি. ও. বিল্ডিংটা গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য ডেড লেটার-এর বোঝা বুকে নিয়ে। আরও অনেক দূরে রেসকোর্সের শিব মন্দিরের চুড়ো দেখা যাচ্ছে আবছা। ঢাকা নগরীর বুকে সন্ধ্যা নামছে ধীরে ধীরে।

হঠাৎ সাইলেন্সার পাইপ-ভাঙা একটা বেবী ট্যাক্সি এমন বেয়াড়া শব্দ করে সামনের রাস্তা দিয়ে চলে গেল যে রানার বিরক্ত দৃষ্টি এইসব সুন্দর দৃশ্য ছেড়ে ফিরে এল কালো পীচ ঢালা ভেজা রাস্তাটার ওপর। সাইড লাইট জ্বেলে মৃদু গুঞ্জন তুলে হরেক রঙের সুন্দর সুন্দর স্যালুন, সেডান চলে যাচ্ছে ছবির মত। অপেক্ষা করছে রানা।

'এক কাপ কফি দেব?' মোলায়েম নারী কণ্ঠের প্রশ্নে চমকে উঠল রানা। দেখল নব-নিযুক্ত সুন্দরী স্টেনো টাইপিস্ট নাসরীন রেহানা এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। রানার কাজের সুবিধার জন্যে ওকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে।

এরা আবার কফি খাওয়ায় নাকি? শিওর হওয়া দরকার। 'কি বলছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কফি?'

দাঁত বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানার।

'বাতিটা জ্বেলে দাও, রেহানা। আর হ্যাঁ, কফি এক কাপ দিতে পারো। তার আগে এক দৌড়ে U-সেকশন থেকে একটা ফাইল নিয়ে এসো। ফোনে পারটিকুলারস দিয়ে দিয়েছি, মিসেস চৌধুরীর কাছে চাইলেই পাবে। কুইক্।'

'রাইট, স্যার,' লাইট জ্বেলে দিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল মেয়েটা ঘর থেকে। খুশি হয়ে উঠল রানা—বেশ কাজের মেয়ে মনে হচ্ছে!

ফাইলটা দেখেই চমকে উঠল রানা। তাহলে এই ব্যাপার! আবার সেই ইণ্ডিয়া? অল্প কিছুক্ষণ আগে মেজর জেনারেল রাহাত খানের আদেশ এসেছিল ইন্টারকমে—'রানা, U-সেকশন থেকে IF/VII/65 ফাইলটা আনিয়ে পড়ে ফেল।

লিখে নাও: IF/VII/65। আমি একটু ডিফেন্স সেক্রেটারির অফিসে যাচ্ছি। অল্পক্ষণেই ফিরব। তুমি অফিসেই থেকো—কথা আছে।'

তখনই বুঝেছিল রানা, বুড়োর মাথায় নতুন কোন পোকা ঢুকেছে। ফাইলটা দেখেই টের পেল আর একটা অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি হচ্ছে তার জন্যে। আবার শক্তি পরীক্ষায় নামতে হবে তাকে কোন বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে। খুশি হয়ে উঠল রানার মন।

ফাইলের পাতায় ডুবে গিয়েছিল মাসুদ রানা। একটা সিগারেট ঠোঁটে লাগিয়ে সেটা ধরিয়ে নিতেও ভুলে গিয়েছিল। শেষ পাতাটা ওল্টাতেই হঠাৎ খট করে একটা শব্দে চমকে উঠল রানা। দেখল ওর রনসন লাইটারের ছোট্ট চোয়ালটা হাঁ হয়ে আছে। রেহানার হাতে ধরা সেটা।

সিগারেট ধরিয়ে রানা বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'ইউ আর ওয়েলকাম, স্যার। আপনার কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

ফাইলটা বন্ধ করে কফির কাপে চুমুক দিল রানা। তারপর সপ্রশংস দৃষ্টিতে রেহানার দিকে চেয়ে বলল, 'অপূর্ব হয়েছে তো কফিটা। বানিয়েছে কে?'

'আমি।'

'চমৎকার! ভেরি গুড, ভেরি গুড। কিন্তু তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, রেহানা। ওই বুড়োকে (ছাতের দিকে চোখের ইঙ্গিত করল রানা) কোন দিন কফি খাওয়াতে পারবে না।'

'কেন?' সত্যিই বিস্মিত হলো রেহানা। 'ওঁকে কফি খাওয়ালে কি হবে?'

'এক কাপ কফি খেলেই বুড়ো তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিজের স্টেনো করে নেবে। আর ওই গোলাম সারওয়ার ভূতটা এসে পড়বে আমার ঘাড়ে।'

'তাহলে ভালই হবে,' হেসে ফেলল রেহানা। সহজ হতে পেরে যেন বেঁচে গেল ও।

ঠিক এমনি সময়ে ইন্টারকমের মধ্যে থেকে একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর যেন চাবুক মারল রানাকে।

'ওপরে এসো, রানা। আর এইসব হালকা আলাপ করবার সময় ইন্টারকমের সুইচটা অফ করে দিয়ো।'

জিভ কাটল রেহানা চোখ বড় বড় করে।

'সরি, স্যার। এক্ষুণি আসছি, স্যার,' বলেই অফ করে দিল রানা ইন্টারকমের সুইচ। যেন চুরি করে ধরা পড়েছে এমনি মুখের ভাব হলো ওর।

নিজের টাইপ রাইটারের সামনে ফিরে গিয়ে মুখটা হাঁ করে নিঃশব্দে হাসছে রেহানা রানার এই পর্যুদস্ত অবস্থায় আন্তরিক খুশি হয়ে। জোরে হাসতে সাহস হচ্ছে না, পাছে রাহাত খান শুনে ফেলেন। পিত্তি জ্বলে গেল রানার তাই দেখে।

ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সে রেহানার ডেস্কের সামনে। তারপর ধাঁই করে প্রচণ্ড এক কিল বসাল ডেস্কের ওপর। আধ হাত লাফিয়ে উঠল টাইপ রাইটার।

'হাসছ কেন? ফাজিল মেয়ে কোথাকার! এত হাসির কি আছে?'

রানার ছেলেমানুষি রাগ দেখে এবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল রেহানা। তীব্র দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তার প্রতি কপট অগ্নি বর্ষণ করে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল রানা

ঘর থেকে।

সাততলার ওপর গোলাম সারওয়ারের কামরার মধ্যে দিয়ে গিয়ে মেজর জেনারেল রাহাত খানের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। হাতলে হাত দিয়ে, বরাবর যেমন হয়, হঠাৎ বুকের মধ্যে ছলাৎ করে উঠল এক ঝলক রক্ত। অন্যমনস্ক ভাবে গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ সামনে লোক পড়ে গেলে যেমন হয় তেমনি। ছুরির ফলার মত শান দেয়া ক্ষীণ দীর্ঘকায় এই বুদ্ধিমান লোকটির তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ভাবলেই কেন জানি রানার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে আসে। এই বৃদ্ধকে সে কতখানি ভালবাসে, কত ভক্তি করে তা সে জানে; কিন্তু এত ভয় যে কেন করে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না রানা।

মস্ত এয়ার-কণ্ডিশনড রুমে একটা দামী সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওধারে পিঠ-উঁচু রিভলভিং চেয়ারে সোজা হয়ে বসে একটা প্যাডের উপর খস খস করে কি যেন লিখছেন রাহাত খান। চোখ না তুলেই বললেন, 'বসো।'

একটা চেয়ারে বসে ঘরের চারধারে চেয়ে দেখল রানা। মাস চারেক আগে যেমন দেখেছিল প্রায় তেমনি ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে ঘরটা। বদলের মধ্যে এই টেবিলের ওপর কিং সাইজ চেস্টারফিল্ডের বদলে এক বাক্স হল্যাণ্ডের তৈরি হাডসন হাভানা চুরুট। সপ্রতিভ অভিজাত চেহারায় এতটুকু পরিবর্তন নেই। তেমনি ধবধবে সাদা ইজিপশিয়ান কটনের স্টিফ কলার শার্ট, সার্জের স্যুট আর ব্রিটিশ কায়দায় নট্ বাঁধা দামী টাই।

'হংকং-এর ব্ল্যাকহক অ্যাসাইনমেন্ট-এ আমাদের সাফল্যে চাইনিজ গভর্নমেন্ট এতই সন্তুষ্ট হয়েছে যে পি.সি.আইকে কংগ্রাচুলেট করে বার্তা পাঠিয়েছে একটা। কিন্তু আমার ধারণা অতখানি ঝুঁকি নেয়া তোমার উচিত হয়নি। ডক্টর হকের পুরো রিপোর্ট আমি পড়ে দেখেছি। ছোরাটা আর এক ইঞ্চি বাম দিকে লাগলেই তোমার দুঃসাহসের ইতি হয়ে যেত। যাক, এখন বিষের ক্রিয়া আর নেই। এফ-সেকশন তোমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে সারটিফাই করছে।'

রানা কোনও কথা বলল না। বুঝল, এই কথাগুলোর মানে এবার নতুন কাজের ভার নিতে হবে তোমাকে, প্রস্তুত হয়ে নাও। বাক্স থেকে একখানা সেলোফেন পেপার মোড়া সিগার বের করে সযত্নে কাগজ ছাড়িয়ে ধরিয়ে নিলেন রাহাত খান রানার উপহার দেয়া রনসন ভ্যারাফ্লেম গ্যাস লাইটার জ্বেলে। দামী তামাক পাতার কড়া গন্ধ এল নাকে।

'ইউ-সেকশনের ওই ফাইলটা পড়েছ? কি লিখেছে ওতে?'

'পড়েছি, স্যার। সাংস্কৃতিক মিশন এসেছে কলকাতা থেকে গত বাইশ তারিখে। নাচ-গান-বাজনার জন্যে জনা পনেরো শিল্পী আর দশ-বারোজন টেকনিশিয়ান এসেছে স্টেজ ডেকোরেশন, মাইক ও লাইট কন্ট্রোলের জন্যে। নামগুলো মনে নেই, স্যার। পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করে বেড়াচ্ছে ওরা।'

'ব্যস! এই? আর কিছু চোখে পড়েনি তোমার?'

'আর একটা ব্যাপারে একটু খটকা লেগেছে, স্যার। ঢাকার পরেই চিটাগাং যাওয়া উচিত ছিল ওদের। তা না গিয়ে ওরা গেছে খুলনায়। তারপর যশোর। ওদের

প্রোগ্রাম দেখছি: খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী এবং দিনাজপুর। অর্থাৎ আগাগোড়া পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্ত বা পশ্চিম-বঙ্গের পূর্ব সীমান্ত ধরে।' রাহাত খানের মুখের দিকে চেয়ে রানা দেখল একটা প্রশংসা-সূচক সূক্ষ্ম হাসির রেখা। রানা তাঁর দিকে চাইতেই মিলিয়ে গেল হাসিটা।

'বেশ। এখন বলো দেখি অল ইণ্ডিয়া রেডিও যখন দৈনিক চারপাঁচ ঘণ্টা চিৎকার করে পৃথিবীর কাছে নালিশ জানাচ্ছে আমরা কাশ্মীরে ইনফিলট্রেটর ঢুকিয়েছি, ছত্রী সেনা এবং স্যাবোটিয়ার পাঠিয়েছি শ্রীনগরে, কাশ্মীরের মুক্তি-সংগ্রামীরা আসলে পাকিস্তানী সৈন্য ইত্যাদি, ইত্যাদি; ঠিক সেই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক শুভেচ্ছা মিশন পাঠাবার পেছনে কি মহৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে? নিশ্চয়ই এদের কোন বিশেষ মতলব বা স্বার্থ লুকানো আছে এর পেছনে। তাই না?' পায়ের ওপর পা তুলে একটু আরাম করে বসলেন রাহাত খান।

'অসম্ভব নয়,' উত্তর দিল রানা।

'কী সেই স্বার্থ, তাই বের করতে হবে তোমাকে।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ। এ কাজের ভার ছিল আমাদের খুলনা এজেন্ট রহমানের ওপর। সে এদের সঙ্গে আঠার মত লেগে গিয়েছিল। হয়তো কিছুদূর অগ্রসরও হয়েছিল। কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক আগে খবর এসেছে তাকে কেউ নির্মমভাবে হত্যা করেছে। যশোর এয়ারপোর্টের কাছে একটা ঝোপের ধারে তার রক্তাক্ত মৃতদেহ পাওয়া গেছে।'

'আমাদের রহমান!' অবাক হয়ে গেল রানা। রহমানের প্রাণবন্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত চেহারাটা ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। কিন্তু আমাদের দেশে এসে আমাদের লোক মেরে রেখে যাবে, এ কেমন কথা!

রানার চোখে সংকল্প দেখতে পেলেন রাহাত খান। কয়েক সেকেণ্ড সময় দিলেন ওকে সামলে নেয়ার জন্যে। নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরিয়ে নিলেন। তারপর আবার আরম্ভ করলেন, 'কাল দশটার ফ্লাইটে তুমি যাবে ঈশ্বরদি। টিকেট বুক করা হয়ে গেছে। ওখান থেকে ট্রেনে যাবে কুষ্টিয়ায়। তোমার নাম তরিকুল ইসলাম, এ.পি.পি.-র ভ্রাম্যমাণ ফটোগ্রাফার। আইডেন্টিটি কার্ড এবং অন্যান্য টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস সকালে তোমার বাসায় পৌঁছে যাবে।'

'ঠিক কি ধরনের কাজ হবে আমার, স্যার?'

'ওদের গতিবিধির ওপর নজর রাখবে। সোহেলকে পাবে ডাকবাংলোর বয়-বেয়ারাদের মধ্যে। ও তোমাকে অনেক সাহায্য করতে পারবে। আমার যতদূর বিশ্বাস, একটা ভয়ানক প্ল্যান এঁটেছে ওরা এবার। অনেক আঁটঘাট বেঁধে নেমেছে। আমার অনুমান যদি সত্যি হয় তবে কত সাঙ্ঘাতিক আঘাত আসছে আমাদের দেশের ওপর তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। ডিফেন্স সেক্রেটারি আজ আমার অনুমান শুনে হো-হো করে হেসে উঠলেন। বেয়ারাকে ডেকে ঠাণ্ডা একগ্লাস পানি খাওয়াতে বললেন আমাকে।' বিরক্তিতে কাঁচা-পাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল রাহাত খানের। 'কিন্তু তুমি তো আমাকে চেনো, রানা। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি তোমাকে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রাহাত খান। তারপর বিশাল কমপিউটারের

সামনে গিয়ে কয়েকটা বোতাম টিপে দিলেন। কয়েকটা বাতি জ্বলল নিভল ঘড়র্ ঘড় শব্দ হলো ওর ভেতর থেকে। আধুনিকতম বিরাটকায় কমপিউটার প্রয়োজনীয় তথ্য টাইপ করে দিল। কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে রানার হাতে দিয়ে রাহাত খান বললেন, 'কলকাতা থেকে এই ইনফরমেশন এসেছে।'

রানা চোখ বুলাল কাগজটার ওপর। বাংলা করলে দাঁড়ায়:

গুরুতর কিছু একটা চলছে টিটাগড়ে। নাম দিয়েছে অপারেশন গুডউইল।

সাংস্কৃতিক মিশনটা এই ব্যাপারে জড়িত। গ্রুপ লিডার হচ্ছে 'এইচ'।

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার কথা ক'টা পড়ে।

'ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছ এবার?' রানা মাথা নাড়লে আবার আরম্ভ করলেন রাহাত খান। 'H যেখানে দলপতি হয়ে এসেছে সেখানে রহমানকে দেয়া আমারই ভুল হয়ে গিয়েছিল। বিপদের জন্যে আমাদের রহমানও প্রস্তুত ছিল—কিন্তু মৃত্যুর জন্যে কে কখন প্রস্তুত থাকে? একটু কোথাও ভুল করেছে—ব্যস...।'

ডান হাতটা উপুড় করে রাখা ছিল টেবিলের ওপর, তিন ইঞ্চি ওপরে উঠিয়ে কব্জি থেকে সামনেটুকু ডান দিকে দ্রুত একবার ঝাঁকালেন রাহাত খান। অর্থাৎ—খতম।

'কাজেই সাবধান। রহমানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব আমরা। চুপচাপ হজম করব না। কিন্তু প্রথমে ওদের উদ্দেশ্য জানা দরকার। ও হ্যাঁ, ভাল কথা। ইয়ং টাইগারস্-এর নাম শুনেছ?'

'ইদানীং বেশ শোনা যাচ্ছে এদের নাম, স্যার। কতকগুলো বড়লোকের ছেলে।'

'হ্যাঁ। পূর্ব-পাকিস্তানে সব বাঘা বাঘা শিল্পপতিরা মিলে করেছে টাইগারস্ ক্লাব—আর তাদের বখে যাওয়া অপদার্থ ছেলেরা মিলে গড়েছে ইয়ং টাইগারস্। কোটিপতি বাপের টাকার জোরে মদ-জুয়া-মেয়েমানুষ নিয়ে যথেচ্ছাচার করে বেড়াচ্ছে। ওদের কয়েকটা অপকর্মের কথা আমার কানে এসেছে। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি টাকার জোরে ফাইল গায়েব। এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন নানান অপকৌশলের সাহায্যে ভাল ভাল এক আধটা ইণ্ডাস্ট্রি বাগিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যেই। যাক, যশোর থেকে খবর এসেছে কয়েকজন ইয়ং টাইগারস্ এই মিশনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। একজন নর্তকীর ওপর নাকি তাদের চোখ। এদেরও আণ্ডার-এস্টিমেট কোরো না। প্রয়োজন হলে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধা কোরো না। আমার সমর্থন থাকবে তোমার পেছনে। এখন তোমার কোন প্রশ্ন আছে?'

'না, স্যার।'

কেন জানি রানার মনে হলো কোন কারণে রাহাত খান ভেতর ভেতর বড় উদ্বিগ্ন এবং বিরক্ত। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না। ব্যক্তিগত প্রশ্ন পছন্দ করেন না রাহাত খান। হয়তো H-এর ধৃষ্টতা এই উদ্বেগের কারণ হবে। রহমানের মৃত্যু হয়তো কুরে কুরে যন্ত্রণা দিচ্ছে ওঁকে।

প্যাড থেকে একটা কাগজ টান দিয়ে ছিঁড়ে চার ভাঁজ করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

'এতে যা লেখা আছে কাল প্লেনে উঠে তারপর পড়বে। আজ সাড়ে সাতাশে

আগস্ট—ওরা আছে যশোরে, কুষ্টিয়ায় থাকবে আটাশ-ঊনত্রিশ, রাজশাহীতে তিরিশ-একত্রিশ, দিনাজপুরে পয়লা-দোসরা। কথাগুলো মনে রেখো। আর কেবল বিপদ নয়, মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থেকো। ব্যস, আর কোন কথা নেই, যেতে পারো।'

আস্তে দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল মাসুদ রানা ঘর থেকে।

# তিন

২৮ আগস্ট, ১৯৬৫

মোখলেস এসে খবর দিল ট্যাক্সি এসে গেছে। অর্থাৎ, এবার দয়া করে গাত্রোত্থান করুন।

'তুই আমার সুটকেসটা তুলে দে তো গাড়ির পেছনে,' রানা বলল।

'দিয়েছি, স্যার।'

'তবে যা ভাগ এখান থেকে। চা খেয়ে নিই—দাঁড়াতে বল ড্রাইভারকে।'

রানাকে দেখেই লাফিয়ে ট্যাক্সির ড্রাইভিং সীট থেকে নেমে এল ড্রাইভার। বেঁটে-খাটো হাসি-খুশি চেহারার লোকটা। ঢিলা খাকি কোর্তার বুক পকেট দুটো ফুলে আছে রুমাল, লাইসেন্স, টাকা পয়সা, কিংস্টর্ক সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই, চিরুনি আর হরেক রকম হাবিজাবি কাগজে। ময়লা পাজামার ততধিক ময়লা ফিতে ঝুলছে হাঁটুর কাছে। পায়ে প্রচুর ঝড়-ঝাপটাতেও টিকে থাকা একটা থ্যাবড়া নাকের লেস-হীন জুতো। লোকটার বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হবে। সামনের দিকে একটা দাঁত নেই—সেই ফাঁকের মধ্যে একটা খেলাল ধরা। মিলিটারি কায়দায় ঝটাং করে এক স্যালিউট লাগিয়ে দিল সে রানাকে দেখে আনন্দের আতিশয্যে। 'থুক' করে মুখ থেকে খেলালটা ফেলে দিয়ে ফোকলা হাসি হাসল।

'আরে, হুজুর, আপনে! আপনেরে বিচরাইতে বিচরাইতে তো এক্কেরে পেরেশান হোইয়া গেছি গা।' পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখল সে রানাকে। 'আমি দিলে ভাবি, মানুষটা গেল কই? এক্কেরে গায়েব হোইয়া গেল গা? ইমুন সাংগাতি পাওলানটারে হালায় এক্‌খি চাটকানা মাইরা রাবিস বানাইয়া ফালাইল। হিকমতটা কি···আরিব্বাপরে বাপ!'

রানাকে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবার বলল, 'আরে উইঠা পরেন, হুজুর; খামোস খায়া খারোয়া রইলেন কেলেগা?'

এমন বিচিত্র ভাব সংমিশ্রিত আকস্মিক অভ্যর্থনায় অবাক হয়ে গিয়েছিল রানা। ড্রাইভারের পাশের সীটে উঠে বসল সে। তারপরই মনে পড়ল সেই ঘটনার কথা। মাস ছয়েক আগে রাত প্রায় এগারোটার দিকে সাভার আর নয়ারহাটের মাঝামাঝি জায়গায় জঙ্গলের ধারে এর গাড়ি আটক করেছিল একদল দুর্বৃত্ত। রানা আসছিল মানিকগঞ্জ থেকে। দূর থেকেই ব্যাপারটা আঁচ করে হেড লাইট অফ করে গিয়ার নিউট্রাল করে নিঃশব্দে একেবারে কাছাকাছি এসে থেমেছিল রানা। প্রাণ ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল আর ভেউ ভেউ করে কাঁদছিল ড্রাইভার। ছোরা মারার ঠিক আগের মুহূর্তে যমদূতের মত এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রানা ওদের ওপর। বেশ

মারপিটও হয়েছিল। বেগতিক দেখে পালিয়েছিল দুর্বৃত্তরা। প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল (কী যেন নাম বলেছিল—ও, হ্যাঁ) ইদু মিঞার। সেই কৃতজ্ঞতা এই খাস ঢাকাইয়া কুট্টির মনে যে এমনই উজ্জ্বল হয়ে থাকবে ভাবতে পারেনি রানা।

'কেমন আছ, ইদু মিঞা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'যিমুন দোয়া করছেন, হুজুর।' বলেই গাড়িতে স্টার্ট দিল ইদু মিঞা। ফার্স্ট গিয়ারে দিয়ে ক্লাচটা ছাড়ার কায়দা দেখে বুঝল রানা, পাখোয়াজ ড্রাইভার।

হঠাৎ চোখ পড়ল রানার দরজায় দাঁড়ানো রাঙার মার ওপর। মুখের দিকে চেয়েই বুঝল রানা, অনর্গল দোয়া-দরুদ পড়ছে বুড়ি। গত রাতে জিনিসপত্র গোছগাছ করা দেখেই কয়েক রাকাত নামাজ বেড়ে গেছে বুড়ির। সাধে আর মোখলেস ওকে 'রানার মা' বলে খেপায় না। কোথায় যেন ওর মৃত মায়ের সঙ্গে মিল আছে এই স্নেহময়ী বৃদ্ধার। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়তে যাচ্ছিল, সচেতন হয়ে সামলে নিল রানা।

'রাতের বেলা আর সাভারের দিকে যাও না তো, ইদু মিঞা?'

'তোবা, তোবা। এই জিন্দেগীর মোদে তো আর না। আইজ ষোলো বচ্ছর ডাইবোরি করতাছি হুজুর, যাই নাইক্কা। আর উই দিনকা যে কি অইল—হালায় এউগা পাসিঞ্জার, আমাগো মাহাল্লারই কন্টেকদার...' হঠাৎ থেমে গিয়ে কণ্ঠস্বর নামিয়ে ইদু মিঞা বলল, 'আপনের পিছে আই. বি. লাগছে, হুজুর!'

'কি করে বুঝলে?' ঘাড় না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'এউগা মার্সিডিচ আইতাছে পিছে পিছে। পুরানা পল্টন থেইকা লাগছে পিছে! খারোন সাব, টাইম তো আছে। সিজিল কইরা দেই হালারে।'

হেয়ার রোড দিয়ে বেরিয়ে সাকুরার সামনে উঠে ডান দিকে না গিয়ে বাঁয়ে চলল ইদু মিঞা। রেডিও পাকিস্তান ছাড়িয়ে রিয়ার ভিউ মিররের দিকে চেয়ে বলল, 'আইতাছে।'

শাহবাগের ঝর্ণাটা চট করে ঘুরেই আবার এয়ারপোর্টের দিকে চলতে থাকল ট্যাক্সি।

'চেহারাটা দেইখা রাখেন, হুজুর।'

ওয়ান ওয়ে রোড। আত্মগোপন করার উপায় নেই। কালো মার্সিডিস বেঞ্জের ড্রাইভিং সীটে গোঁফদাড়ি পরিষ্কার করে কামানো সানগ্লাস পরা একজন ফর্সা লোক সোজা সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে। এক নজরেই রানা বুঝল লোকটা ভারতীয় গুপ্তচর।

যখন সত্যিসত্যিই পেছনের গাড়িটাও ঝর্ণা ঘুরে এয়ারপোর্ট রোড ধরল তখন দ্রুত একটা বালি ভরা ট্রাককে ওভারটেক করে পেট্রল পাম্প ছাড়িয়ে হাতির পুলের দিকে মোড় নিল ইদু মিঞা। পাওয়ার হাউসের পাশ দিয়ে যেতে বাতাসে ভেসে আসা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় সামনের উইণ্ডস্ক্রীন ঝাপসা হয়ে গেল। ওয়াইপারটা চালু করে দিয়ে প্রায় এক লাফে পুলটা পার হয়ে গেল ইদু মিঞার ট্র্যাক্সি। পুল থেকে নেমেই ডান দিকে মোড় ঘুরে নানান গলি ঘুঁচি পেরিয়ে গ্রীন রোডে গিয়ে পড়ল এবার ওরা। তারপর সোজা এয়ারপোর্ট।

ফার্মগেটের কাছে এসেই গাড়ি থামিয়ে মিটার ডাউন করে নিল ইদু মিঞা, যাতে এয়ারপোর্ট থেকে যে নতুন প্যাসেঞ্জার উঠবে তার ঘাড়ে কিছু পয়সা আগে

থেকেই উঠে থাকে।

এয়ারপোর্ট পৌঁছে রানা দেখল কালো মার্সিডিস বেঞ্জটা নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে আছে NO PARKING লেখা একটা সাইনবোর্ডের নিচে। এত চালাকি খাটল না দেখে ইদু মিঞার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চাপা গলায় বলল, 'হুজুর, নামলেই অ্যারেস করব আপনেরে। অখনও টাইম আছে। কন তো ভাইগা যাইগা।'

মনে মনে হাসল রানা। ইদু মিঞা তাকে হয় ক্রিমিন্যাল, নয় কমিউনিস্ট ঠাউরে নিয়েছে। মুখে বলল, 'না, তার দরকার নেই। ভাল গাড়ি চালাও তুমি, ইদু মিঞা।'

দু'জন পোর্টার এসে রানার সুটকেস নিয়ে গেল ওজন করে ট্যাগ লাগাতে। দুটো দশ টাকার নোট বের করে ইদু মিঞার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। আধ হাত জিভ বের করে কয়েকবার মাথা নাড়ল ইদু মিঞা।

'ট্যাকা দিয়া আমার ইজ্জতটা পাংচার কইরেন না, হুজুর। এর থেইকা দুইটা জুতার বাড়ি মাইরা যানগা।' আহত অভিমান ওর কণ্ঠে।

এই সূক্ষ্ম মান-অপমান জ্ঞান-সম্পন্ন ঢাকাইয়া কুট্টিকে আর বেশি না ঘাঁটিয়ে ব্রিফিং কাউন্টারের দিকে এগোল রানা। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ দিকের টেলিফোন-বুদের দরজাটা ফাঁক করে দেখল সেই সান গ্লাস পরা শ্রীমান ডায়াল ঘোরাচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে। মাল ওজন করিয়ে আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ এবং টিকেট দেখিয়ে সরু বোর্ডিং পাস নিল রানা।

'অ্যাটেনশন, ইওর অ্যাটেনশন প্লীজ। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্‌স অ্যানাউন্সেস্‌ দ্য ডিপারচার অভ ইট্‌স্‌ ফ্লাইট পি-কে ফাইভ টোয়েন্টি-ওয়ান টু ঈশ্বরদি। প্যাসেঞ্জারস্‌ অন বোর্ড প্লীজ। থ্যাঙ্ক ইয়ু।'

খনখনে মেয়েলী কণ্ঠস্বর।

প্লেনে উঠে একটা চেনা মুখও দেখতে পেল না রানা। খুশিই হলো মনে মনে। মাঝামাঝি জায়গায় জানালার ধারে বসে সীট বেল্ট বেঁধে নিল সে, তারপর খুলল রাহাত খানের দেয়া কাগজটা। শুধু একটা লাইন লেখা:

DON'T HESITATE TO KILL.

আকাশে উঠে গেল ফকার-ফ্রেণ্ডশিপ। হলুদ রোদ বিছিয়ে রয়েছে অনেক নিচে সবুজ মাঠের ওপর।

ছোট্ট শহর কুষ্টিয়া। রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তৈরির পর মিউনিসিপ্যালিটি বোধহয় মানুষকে টিকা দিয়েই আর ফুরসত পাচ্ছে না—রাস্তার গায়ে যে স্থায়ী বসন্তের দাগ পড়ে গেছে, সেদিকে লক্ষই নেই। যানবাহনের মধ্যে রিকশাই একমাত্র ভরসা।

খোলা অবস্থায় চললে নির্ঘাত ছিটকে পড়বে রাস্তার ওপর, তাই হুড্‌ তুলে দিয়ে চাঁদিতে খটাং-খটাং বাড়ি খেতে খেতে চলল রানা রিকশায় চেপে।

ডাকবাংলোতে সৌভাগ্যক্রমে একখানা ঘর খালি ছিল, পেয়ে গেল রানা। খোঁজ নিয়ে জানা গেল অন্যান্য ঘরগুলোতে বিশ্রাম নিচ্ছে সকালের ট্রেনে যশোর থেকে আসা কলকাতার সাংস্কৃতিক মিশনের শিল্পীবৃন্দ।

স্নান করে খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নেবে মনে করে সুটকেস থেকে

কাপড়, টাওয়েল আর সাবান বের করে নিয়ে অ্যাটাচ্‌ড্ বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে দেখল রানা দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। একটু ধাক্কাধাক্কি করে বুঝল ভিতর থেকে ছিটকিনি লাগানো। মিনিট পাঁচেক পরে খুট করে বল্টু খোলার শব্দ পাওয়া গেল। আরও দু'মিনিট পার হয়ে গেলেও যখন কেউ বেরিয়ে এল না, তখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মৃদু হেসে রানা গিয়ে ঢুকল বাথরুমে। ওটা পাশাপাশি দুটো ঘরের কমোন বাথরুম। পাশের ঘরের ভদ্রলোক কাজ সেরে এদিকের বল্টু খুলে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেছেন।

মিনিট দশেক শাওয়ারের ঠাণ্ডা পানিতে স্নান করে পরিতৃপ্ত মাসুদ রানা গুনগুন করতে করতে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে, ওদিকের বল্টুটা খুলে দেয়ার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে।

ঠিক বিকেল পাঁচটায় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রানার। দরজা খুলেই দেখল বিশ-বাইশ বছর বয়সের অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। মুখে এক-ফোঁটা মেকআপ নেই, শুধু কপালে একটা লাল কুমকুমের টিপ। খোলা এলোচুল। চোখ দুটো একটু ফোলা—এই মাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে মনে হচ্ছে। পরনে হালকা নীল অর্গ্যাণ্ডির ওপর সাদা ছাপ দেয়া সাধারণ শাড়ি। সাংস্কৃতিক মিশনের কোন শিল্পী।

'ভেতরে আসুন,' বলল রানা।

'আপনাকে বিরক্ত করতে হলো বলে আমি দুঃখিত,' পরিষ্কার বাংলায় বলল মেয়েটি। কথা ক'টা যেন নিক্তি দিয়ে ওজন করা। একটু ফ্যাসফেঁসে মেয়েটির কণ্ঠস্বর। যেন বেশ কিছুটা বাধা পেরিয়ে বেরোচ্ছে শব্দ। কিন্তু তীক্ষ্ণ, অদ্ভুত একটা মাদকতা আছে সে স্বরে। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবার কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না তার। চোখে মুখে বিরক্তির স্পষ্ট ছাপ।

এক সেকেণ্ডে রানার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু। ও বলল, 'আর আপনাকে দুঃখিত অবস্থায় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমে আমি বিস্মিত, তারপর চিন্তিত এবং সবশেষে একান্ত লজ্জিত। এক্ষুণি আমি বল্টু খুলে দিচ্ছি বাথরুমের। আর এই জোড়হাত করে মাফ চাইছি—জীবনে আর কোনদিন এরকম কাজ করব না।'

হেসে ফেলল মেয়েটি। রানার ভণ্ডামি দেখে রাগ জল হয়ে গেল তার।

'বেশ লোক তো আপনি! ইচ্ছে করেই ছিটকিনি লাগিয়ে রেখেছিলেন নাকি?'

'না। সত্যি বলছি, ভুলে। ছি ছি ছি, দেখুন তো, আপনাকে কত অসুবিধের মধ্যে ফেললাম!' আন্তরিক লজ্জিত হলো রানা।

'আপনি কি করে বুঝলেন আমি পাশের ঘরেই আছি এবং এই কারণেই এসেছি?'

'দেখুন আমি নিতান্ত শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষ। ভয় পেলে কেন জানি আমার বুদ্ধি খুলে যায়। আপনার অমন মারমুখো মূর্তি দেখেই ভড়কে গিয়ে আমার মাথাটা খুলে গিয়েছিল। আর তাছাড়া—'

'মিত্রা!' একটা ভয়ানক গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

চমকে উঠে রানা দেখল একজন লোক এগিয়ে আসছে বারান্দা ধরে। সাড়ে

পাঁচ ফুট লম্বা। বয়েস চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে—ঠিক কত বোঝা যায় না। পরনে শান্তিপুরী ধুতি আর খদ্দরের পাঞ্জাবী—কালো জহর কোট চাপানো তার ওপর। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, আর সারাটা মাথা জুড়ে চকচকে টাক। অদ্ভুত ফর্সা গায়ের রঙ। বড় বড় কানের ফুটো। দেহের সঙ্গে বেমানান প্রকাণ্ড গোল মাথাটা কাঁধের ওপর চেপে বসে আছে—ঘাড়ের চিহ্নমাত্র নেই। আরেকটু কাছে আসতেই রানা লক্ষ করল পূর্ণিমার চাঁদের সমান গোল মুখটায় দাড়ি, গোঁফ, ভুরু, কিচ্ছু নেই—বোধহয় কোনদিন ওঠেইনি; কিংবা ঝরে পড়েছে Alopecia totalis রোগে। ছোট ছোট লম্বাটে হলুদ মঙ্গোলিয়ান চোখ দুটো নিষ্প্রভ, অভিব্যক্তিহীন। লালচে পুরু ঠোঁট দুটো ঘেন্না ধরায়। মুখের দুই কোণে ঘায়ের চিহ্ন। সবটা মিলিয়ে অদ্ভুত রকমের চেহারা লোকটার। এক নজরেই অপছন্দ করল রানা লোকটাকে। লোকটার চারপাশে একটা অশুভ ছায়া দেখতে পেল সে। বিপদ, ভয় আর অমঙ্গলের প্রতীক যেন লোকটা।

জিভ দিয়ে বাঁ-দিকের ঘা-টা ভিজিয়ে নিয়ে মিত্রার দিকে চেয়ে সে বলল, 'এখানে কি করছ মিত্রা, ঘরে যাও।'

বিনা বাক্যব্যয়ে মাথা নিচু করে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল মিত্রা। এবার রানার ওপর চোখ পড়ল লোকটির। ভয়ঙ্কর হলুদ দৃষ্টি মেলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে রানাকে। সাপের মত পলকহীন সে দৃষ্টি। অস্বস্তি বোধ করল রানা সেই ঠাণ্ডা দৃষ্টির সামনে। সাধারণ ভদ্রতার খাতিরে রানা বলল, 'আমার নাম…'

'তরিকুল ইসলাম। এ. পি. পি.-র ফটোগ্রাফার।' রানার বক্তব্য নিজেই বলে দিল লোকটা। 'আর আমার নাম জয়দ্রথ। জয়দ্রথ মৈত্র। এই শুভেচ্ছা মিশনের অধিকারী। পরে ভাল করে আলাপ হবে, মি. ইসলাম—এখন আমি একটু ব্যস্ত।'

ডান দিকের ঘা-টা চেটে নিয়ে ধীর পায়ে চলে গেল জয়দ্রথ মৈত্র। রানাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এতক্ষণ যেন ভূতে ভর করেছিল ওর ওপর।

বাথরুমের দরজাটা খুলে দিয়ে একটা ইজি চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিল রানা। তারপর একটা খবরের কাগজ মেলে ধরল চোখের সামনে। জয়দ্রথ মৈত্রের চেহারাটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। তাহলে এ-ই হচ্ছে ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের সেই ভয়ঙ্কর H— যার সঙ্গে সংঘর্ষে বহু পাকিস্তানী দুঃসাহসী সিক্রেট এজেন্ট নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অথচ একটি আঁচড়ও পড়েনি এর গায়ে। অদ্ভুত বুদ্ধিমান এবং কৌশলী এই H সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মেজর জেনারেল রাহাত খান পর্যন্ত সমীহ প্রকাশ না করে পারেন না। দুর্দান্ত এই ভয়ঙ্কর লোকটির পাশে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেকে বড় ক্ষুদ্র মনে হলো রানার। মাথা ঝাঁকিয়ে এই ভাবটা দূর করবার চেষ্টা করল সে। মিত্রার কথা ভাবতে চেষ্টা করল। এই মেয়েটি কি শুধুই শিল্পী হিসেবে এসেছে, না এ-ও স্পাই? গানের শিল্পী, না নাচের? নাকি চেহারা ভাল বলে ধরে এনেছে—কোরাস গাইবে? অথবা অ্যানাউন্সারও হতে পারে। পুরো নামটা কি মেয়েটার? মিত্রা চৌধুরী? মিত্রা ব্যানার্জী? মিত্রা সেন গুপ্তা বা ঠাকুরতা। কিংবা নাগ, ভৌমিক, রায়, চক্রবর্তী, মুখোপাধ্যায়…

হঠাৎ একটু খুট আওয়াজ হতেই চোখ মেলে রানা দেখল হাসছে সোহেলের উজ্জ্বল দুই চোখ। এতদিন পর রানাকে পেয়ে আনন্দে উদ্ভাসিত। কাঁধে একটা দেড় টাকা দামের ছোট্ট টাওয়েল। বয়-বেয়ারার সাদা ড্রেস পরা। কোমরের বেল্টে পিতলের মনোগ্রামে লেখা KUSHTIA REST HOUSE.

'কি নাম হে তোমার, ছোকরা?' খুব ভারিক্কি চালে জিজ্ঞেস করল রানা।

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে ধরে চোখ পাকিয়ে প্রথমে ঘুসি দেখাল সোহেল, তারপর বিনয়-বিগলিত কণ্ঠে বলল, 'আজ্ঞে, রাখাল দাশ। ''চার নম্বর'' বলেও ডাকতে পারেন।' বুকে আঁটা নম্বর দেখাল সে।

'বেশ, বেশ। ঘরটায় চট করে ঝাড়ু লাগিয়ে দাও তো, বাবা রাখাল। বড় নোংরা হয়ে আছে।' চোখ টিপল রানা; ভাবটা—কেমন জব্দ!

সোহেল দেখল ওকে বেকায়দা অবস্থায় পেয়ে খুব এক হাত নিচ্ছে রানা। হেসে ফেলল সে। বলল, 'আজ্ঞে, এখন ঝাঁট দিলে ধুলোয় টিকতে পারবেন না। আপনি বাইরে যাবার সময় চাবিটা দিয়ে যাবেন, পরিষ্কার করে দেব সব নোংরা।'

'তাই দিয়ো। এখন চা-টা কি খাওয়াবে খাওয়াও দেখি জলদি। সন্ধের দিকে একটু বাইরে যাব ঘণ্টা খানেকের জন্যে।'

ইঙ্গিতটা বুঝল সোহেল। বাইরে মানে সোহেলের বাংলো। হেড অফিসের সঙ্গে কথা আছে বোধহয়। নীরবে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

হাঁটার সময় সোহেলের ডান হাতটা দুলছে, বাঁ হাতটা স্থির হয়ে রয়েছে দেখে হঠাৎ তীব্র একটা বেদনা বোধ করল রানা। এক সময় রাহাত খানের সব চাইতে প্রিয়পাত্র ছিল ওরা দু'জন। বক্সিং, যুযুৎসু, পিস্তল ছোঁড়া, শক্তি, বুদ্ধি, সাহস, সব ব্যাপারেই দু'জন কেউ কারও চেয়ে কম যেত না। নিজেদের মধ্যে যেমন ছিল ওদের তীব্র প্রতিযোগিতা, তেমনি ছিল গভীর বন্ধুত্ব। কিন্তু ভাগ্য সোহেলের বিরূপ। একবার একটা অ্যাসাইনমেন্ট-এ চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে পাথরে পা পিছলে টাল সামলাতে না পেরে চাকার তলায় কাটা পড়ল বাম হাত। একেবারে ছাঁটাই না করে বিপজ্জনক কাজ থেকে সরিয়ে ওকে যশোর-কুষ্টিয়া ব্রাঞ্চের হেড করে দিয়েছেন রাহাত খান। কে জানে, হয়তো রানারও একদিন এমনি অবস্থা হবে। নিজের অজান্তেই ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রানার বুক চিরে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ট্রে-তে করে এক পট চা আর কিছু বিস্কিট নিয়ে ফিরে এল সোহেল। রানার পাশে টিপয়টা টেনে দিয়ে সেগুলো নামিয়ে রাখতে রাখতে চাপা গলায় বলল, 'তোকে চিনে ফেলেছে ওরা, রানা! আমার যদ্দূর বিশ্বাস জেনে গেছে ওরা তোর পরিচয়। জয়দ্রথ মৈত্রের কাছ থেকে এক টুকরো কাগজ নিয়ে ওদের দলের একজন প্রত্যেক ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাইকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে খুব সম্ভব। আমি এখনও ওদের সন্দেহের বাইরে আছি। হিন্দু বলে বিশেষ ফেভারও পাচ্ছি।'একটা চাবি বের করল সোহেল পকেট থেকে। 'এই নে, আমার ওয়্যারলেস রুমের চাবি। আমি সন্ধের সময় বেরোতে পারব না। তুই সোজা রেল-স্টেশনে চলে যাবি। ওখান থেকে আমার লোক তোকে নিয়ে যাবে আমার বাড়িতে। রাতে আমি নজর রাখব, আর হঠাৎ যদি দরকার মনে করিস, এই বেল টিপে দিস। আজই সকালে লাগিয়েছি।' খাটের পায়ায় লাগানো গোপন কলিং বেলের সুইচ দেখিয়ে দিল

সোহেল।

'বেশ জমিয়ে নিয়েছিস দেখছি, দোস্ত!' সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাইল রানা ওর দিকে। কিন্তু সেই সঙ্গে জুড়ে দিল, 'দেখিস, ভুলে যাস নে আবার, আমি বেরিয়ে গেলেই ঘরটায় একহাত ঝাড়ু লাগিয়ে দিস, বাবা!' চোখে মুখে দুষ্টামি হাসি রানার।

'যা-যা, বাজে বকিস না। ফাই-ফরমাস খাটতে খাটতে জান বেরিয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে। পিঠটা ব্যাঁকা হয়ে গেছে আমার। ঘর ঝাড়ু দেব না, শালা ঝেঁটিয়ে তোর বিষ ঝেড়ে দেব।'

বেরিয়ে গেল সোহেল। আবার রানার চোখে পড়ল, বাম হাতটা স্থির হয়ে ঝুলছে সোহেলের। কিন্তু দমে যায়নি সোহেল। তেমনি হাসিখুশি চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল দুই চোখ। হার মানেনি সে ভাগ্যের কাছে।

সেই রাতে মিত্রা সেন সত্যিই মুগ্ধ করল রানাকে। নৃত্যকলাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি দিল সে এই প্রথম। কিন্তু নাচের শেষে অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে গিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হলো রানাকে। পরিষ্কার ঘৃণা প্রকাশ পেল মিত্রার ব্যবহারে। আহত রানা বুঝল, সত্যিই ধরা পড়ে গেছে সে। ঢাকা এয়ারপোর্টের সেই সানগ্লাস পরা ছোকরাকে অবজ্ঞা করা তার উচিত হয়নি।

# চার

২৯ আগস্ট, ১৯৬৫

অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঠিক বিড়ালের মত চোখ মেলে চাইল রানা। ঘুমের লেশমাত্র নেই সে চোখে। যেন জেগেই ছিল এতক্ষণ। আবছা একটা ধস্তাধস্তির শব্দ এল কানে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসল রানা বিছানার ওপর। আন্দাজে বুঝল শব্দটা আসছে মিত্রা সেনের ঘর থেকে।

নিঃশব্দে বাথরুমের ছিটকিনি খুলে পা টিপে মিত্রার ঘরের দিকের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। মৃদু আলো আসছে মিত্রার ঘর থেকে। একটা ফুটোয় চোখ রেখেই তাজ্জব হয়ে গেল সে। চোখটা একবার কচলে নিয়ে আবার রাখল ফুটোতে। সেই একই দৃশ্য। টেবিল্ ল্যাম্পটা মাথা নিচু করে জ্বালানো আছে টেবিলের ওপর। সেই আলোয় দেখা গেল চারজন ষণ্ডা মার্কা মুখোশধারী লোকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে মিত্রা সেন। মুখে রুমাল পুরে চিৎকারের পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে আগেই। এবার দু'হাত পেছনে নিয়ে দুই কনুই একসঙ্গে টেনে বেঁধে ফেলা হলো। আঁচল খসে পড়ে শাড়িটা লুটোপুটি খাচ্ছে মাটিতে। কিন্তু সমানে পা চালাচ্ছে মিত্রা। সামনের লোকটার তলপেট বরাবর ঝেড়ে একটা লাথি মারল সে। দু'পা পিছিয়ে গেল লোকটা। হঠাৎ পাশ থেকে একজন লোক এগিয়ে এসে চোখা ছুরিটা মারাত্মক ভঙ্গিতে বুকে ঠেসে ধরে নিচু গলায় কানের কাছে কিছু বলল। স্থির হয়ে গেল মিত্রা সেন। আর বাধা দেবার চেষ্টা করল না। চোখ দুটো ভয়ে বিস্ফারিত। নিজের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে জল গড়িয়ে পড়ল ওর চোখ থেকে।

ছিটকিনির অবস্থান আন্দাজ করে নিয়ে জোরে একটা লাথি মারল রানা

বাথরুমের দরজায়। খুলে গেল কপাট। কেউ কিছু বুঝবার আগেই সামনের দু'জন লোক ধরাশায়ী হলো রানার প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে। তৃতীয়জন ছুরি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার ওপর। প্রথমে ছোরাসুদ্ধ হাতটা ধরে ফেলল রানা, তারপর যুযুৎসুর এক প্যাঁচে আছড়ে ফেলল মাটিতে। এবার দুই হাঁটু জড়ো করে ঝপাং করে পড়ল ওর পেটের ওপর। 'হুঁক' করে একটা আওয়াজ বেরোল ওর মুখ দিয়ে; নড়বার আর শক্তি রইল না। কিন্তু রানা উঠে দাঁড়াবার আগেই প্রথম আক্রান্ত একজন উঠে এসে পেছন থেকে সাপটে ধরল রানাকে। চতুর্থ লোকটি এবার কোমর থেকে টান দিয়ে একটা থ্রোইং নাইফ বের করল। মুখে বিজয়ীর হাসি।

'আব কাঁহা যাওগে, উল্লুকে পাটঠে!'

রানার বুক বরাবর ছুরিটা ছুঁড়তে গিয়ে থমকে গেল সে। যেন যাদুমন্ত্রের বলে পেছনের লোকটা রানার সামনে চলে এসেছে। একটু হলেই সেমসাইড হয়ে যেত। মাজার ওপর রানার প্রচণ্ড এক লাথি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে লোকটা গিয়ে পড়ল চতুর্থ জনের ওপর। টাল সামলাতে গিয়ে ছুরিটা পড়ে গেল হাত থেকে মাটিতে। আর মাটিতে পড়তেই পা দিয়ে এক ঠেলা দিয়ে মিত্রা সেটাকে পাঠিয়ে দিল ঘরের এক কোণে। খালি হাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ভীষণ আকৃতির চতুর্থ লোকটা রানার ওপর। নাক বরাবর রানার গোটা দুই নক্-আউট পাঞ্চ খেয়ে সে ছিটকে পড়ল জানালার ধারে।

রানা চেয়ে দেখল জানালার সবক'টা শিক বাঁকানো। এই পথেই প্রবেশ করেছে লোকগুলো। বাইরে ঝমাঝম বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে কখন সে টেরই পায়নি। কি করবে ভাবছে রানা, এমন সময় বাইরের অন্ধকার থেকে মস্ত একখানা ঢিল ছুটে এসে খটাশ করে লাগল ওর কপালে। আঁধার হয়ে গেল রানার চোখ। পড়ে যাচ্ছিল, চেয়ারের হাতল ধরে সামলে নিল। মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কিন্তু জ্ঞান হারিয়ে ফেললে চলবে না। এখন জ্ঞান হারালে নিশ্চিত মৃত্যু।

যেন বহুদূর থেকে কয়েকটা কথা কানে এল রানার।

'সালা ডাকু হ্যায়। ভাগো! ভাগো সাবলোক ইয়াহাঁসে!'

সেকেণ্ড চারেক পাঁজর বরাবর একটা ছুরির আঘাত এবং তীব্র বেদনা আশা করল রানা। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। তখনও ঘুরছে মাথা। চেয়ে দেখল চারজন মুখোশধারীই অদৃশ্য হয়ে গেছে। মিত্রা ছাড়া ঘরে কেউ নেই। ছুটে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল রানা। বৃষ্টির ছাঁট লাগল চোখে মুখে। একটু পরেই দেখল বড় রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি সোজা উত্তর দিকে চলে গেল সামনের অনেক দূর পর্যন্ত আলোকিত করে। মিত্রাও পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'চলে গেল?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

ঘরের এক কোণ থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে মিত্রা সেনের হাতের বাঁধন কেটে দিল রানা। তখনও থরথর করে কাঁপছে মেয়েটা। রানা বলল, 'আপনি ওই চেয়ারটায় বসুন, আমি আপনার জন্যে একটু ব্র্যাণ্ডি নিয়ে আসছি।' বাথরুমের মধ্যে দিয়ে নিজের ঘরে চলে এল রানা।

সুটকেস থেকে বোতল বের করে আধ গ্লাস ব্র্যাণ্ডি ঢেলে নিয়ে পাশের ঘরে এল

রানা। দেখল বিছানার ওপর বসে আছে মিত্রা সেন আড়ষ্ট ভঙ্গিতে।

'ঢুক করে এটুকু খেয়ে ফেলুন, আমি মৈত্র মশাইকে ডেকে আনছি।'

চট করে একবার রানার চোখের দিকে চেয়ে নিল মিত্রা সেন। তারপর গ্লাসটা নিয়ে একহাতে নাক টিপে ধরে তিন ঢোকে খেয়ে ফেলল ব্র্যাণ্ডিটুকু। রানা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কি মনে করে মিত্রা ডাকল, 'শুনুন।'

'কি।'

'মৈত্র মশায়কে ডাকা যাবে পরে। এখন এই চেয়ারটায় বসুন তো, কপালটা অসম্ভব ফুলে গেছে, জলপট্টি লাগিয়ে দিই। তাছাড়া, মৈত্র মশাই এসে এখন আহা-উহু ছাড়া আর কি করবেন?'

একটা রুমাল চার ভাঁজ করে এক মগ পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ফোলা জায়গাটায় ধরল মিত্রা, তারপর ভেজা রুমালটা কপালে বসিয়ে আরেকটা কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল রানার মাথাটা।

'মৈত্র মশায়কে ডাকার কোন দরকার নেই। বিপদগ্রস্তা ভদ্রমহিলার জন্যে নিরীহ, শান্তিপ্রিয় ফটোগ্রাফারের কাছাকাছি থাকাই বেশি নিরাপদ।'

'ভাবছি, এই লোকগুলো কে। আপনি চেনেন এদের? আপনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল কোথায়?'

'আমি কিচ্ছু জানি না। কোনদিন এদের দেখিনি।'

'সাধারণ গুণ্ডা বলেই তো মনে হলো। কিন্তু কোন আভাসই পাননি আপনি, এ কেমন কথা?'

'এমনি কানাঘুষোয় শুনেছি, একটা বদমাইশের দল আছে, ইয়ং টাইগারস্ না কি একটা নাম—ওরা নাকি লোক লাগিয়েছে, সুযোগ পেলেই আমাকে ধরে নিয়ে যাবে ওদের আড্ডায়। তেমন কোন গুরুত্ব দিইনি এসব কথার।'

ইয়ং টারগারস্-এর নাম শুনে একটু কঠিন হয়ে গেল রানার মুখ। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলল, 'আপনার দলের কাউকে যদি ডাকতে বলেন তো ডেকে দিতে পারি। আর নইলে আপনি বিশ্রাম করুন, আমি আমার ঘরে যাই। রাত এখনও অনেক বাকি আছে, এভাবে গল্প করলে কাটবে না।'

উঠে দাঁড়াল রানা। তখনও ঝমঝম অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। কাছেই কোন পুকুরে ব্যাঙ ডাকছে ক্যাঁ-কোঁ, ক্যাঁ-কোঁ একঘেয়ে সুরে। বিজলী চমকে উঠল আকাশ চিরে।

মিত্রাও উঠে দাঁড়াল।

'কেমন লোক আপনি? এই ঘরে একা আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছেন যে বড়। একা কি করে থাকব আমি এই জানালা ভাঙা ঘরে?'

একটু ভেবে নিয়ে রানা বলল, 'বেশ তো, আপনি আমার বিছানায় গিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ুন। আমি না হয় এই ঘরে আপনার পাহারায় থাকব।'

'আমার এমনিতেই আজ রাতে আর ঘুম আসবে না। আসুন না, আপনার ঘরে বসে গল্প করে কাটিয়ে দিই রাতটা?'

'না। আপনার ঘুম না এলেও আমার ঘুম আসবে।' ঘুরে দাঁড়াল রানা।

'আপনি আমাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচেন মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ।'

'কারণ? অনুষ্ঠানের শেষে দুর্ব্যবহার করেছিলাম, তাই?'

'না।' মিত্রার চোখের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাইল রানা। 'সেজন্যে নয়। কারণটা খুবই সাধারণ। মানুষে খারাপ বলে···সব দোষ পড়ে মেয়েদের ঘাড়ে।'

মন দিয়ে কথাগুলো শুনল মিত্রা। বুঝল কথাটা বিশ্রী হলেও সত্য। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর। তারপর হঠাৎ ঘুরে চলে গেল রানার ঘরে।

এক মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরে এল মিত্রা। হাতে রানার ওয়ালথার পি.পি.কে. পিস্তল।

'এই নিরীহ, শান্তিপ্রিয় বস্তুটি বালিসের তলায় থাকলে অস্বস্তি লাগছে। জিনিসটা আপনার কাছেই থাক—কোন কাজে লেগে যেতে পারে।'

ঘণ্টা দেড়েক পার হয়ে গেল। বাতি নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে উসখুস করছে রানা। কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। বালিশে মিত্রার চুলের সুবাস। বৃষ্টি থেমে গেছে বেশ কিছুক্ষণ, তাই দ্বিগুণ জোরে শোনা যাচ্ছে ব্যাঙের ডাক। জানালার বাইরে টিপ টিপ জোনাকির দীপ জ্বলছে, এখনও পুরোদস্তুর শহর হয়ে উঠতে পারেনি জায়গাটা।

বাথরুম চেপেছে কিছুক্ষণ ধরে। লাইট জ্বালাবার ঠিক আগের মুহূর্তে দেখতে পেল সে আবছা একটা লম্বা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক ঘরের মাঝখানে। হাতের পিস্তলটা ওর দিকে ফেরানো। চমকে উঠল রানা।

'একটু নড়াচড়া করলেই খুলি ফুটো করে দেব,' মৃদু অথচ গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

মরার মত কাঠ হয়ে পড়ে থাকল রানা। অসতর্ক থাকার জন্যে ভয়ানক রাগ হলো নিজের ওপর। একবার ভাবল বালিশের তলায় পিস্তলটার কথা। কিন্তু এখন চেষ্টা করা বৃথা। দেখা যাক কি হয়।

'কে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তোমার যম!' সংক্ষিপ্ত উত্তর।

এক পা এক পা করে পিছিয়ে গেল লোকটা। পিস্তলটা তেমনি ধরা। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিল সে। লোকটার চেহারা দেখেই অবাক হয়ে উঠে বসল রানা বিছানার ওপর।

'তুই! তুই শালা এত রাতে এ ঘরে ঢুকেছিস কেন?'

উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত সোহেলের মুখ।

'দিয়েছিলাম তো ঘাবড়ে, বোক্-চন্দর! টেরও পেলি নে জলজ্যান্ত মানুষটা ঢুকলাম ঘরের ভেতর! কালই শালা তোর চাকরি খেয়ে দেব আমি দেখিস বুড়োকে বলে।'

ওর একান্ত প্রিয় নাইন মিলিমিটার হ্যামার লেস ল্যুগার পিস্তলটা প্যান্টের নিচে তলপেটের কাছে লুকোনো হোলস্টারে ঢুকিয়ে দিল সোহেল।

'আরে যা যা! তোর মত দশটা বয় বেয়ারা আমার এক ডাকে ছুটে আসে, তা জানিস? তুই আমার কচু করতে পারবি। আর একটু হলে যেই হার্টফেলটা করতাম—বারোটা বেজে যেত তোর। কিন্তু দোস্ত, মনে হচ্ছে আজ রাতের সব ঘটনাই তোর জানা?'

'স-অব, স-অব! সব দেখেছি তো আমি। আহাহা! তোর কপালে যখন জলপট্টি লাগাচ্ছিল না, উহ্!' জিভ দিয়ে একটা বিশেষ শব্দ বের করল সোহেল। 'তখন

আমার কি ইচ্ছে করছিল জানিস? মনে হচ্ছিল নিজের কপালে নিজেই একটা ইট মেরে গিয়ে হাজির হই সামনে।'

হাসল রানা। হাতল-বিহীন একটা চেয়ারে উল্টো হয়ে বসল সোহেল। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ বলল, 'আমার কথা হেড অফিসের সবাই ভুলে গেছে, নারে? কেউ আমার কথা কিছু বলে না?' কেমন যেন একটা হাহাকার, একটা করুণ সুর ধ্বনিত হলো ওর কণ্ঠে।

'বলবে না কেন? সবাই বলে।' মিথ্যে কথা বলল রানা। নিত্যনতুন কাজের চাপে অতীতকে মনে রাখবার উপায় আছে? সে নিজেই তো প্রায় ভুলতে বসেছিল। তবু বলল, 'কেন, তোর ওই সিঙ্গাপুর অ্যাসাইনমেন্ট-এর দৃষ্টান্ত দিয়ে সেদিন মেজর জেনারেল তো মস্ত এক লেকচারই ঝেড়ে বসল আমাদের ওপর।'

কেন জানি কথাটা অকপটে বিশ্বাস করল সোহেল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল ওর। বলল, 'কী দিন ছিল, তাই না রে!' তারপর হঠাৎ শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। কাছে এসে এক টানে রানার পট্টি খুলে দিল।

'ন্যাকামি হচ্ছে, না? মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে একবারে সিনেমার হিরো! অ্যাঁ? মুখটা ওপরে তোল, শালা!'

কপালের আঘাতটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল সোহেল। তারপর পকেট থেকে বের করল একটা মলমের কৌটো। কৌটোর নিচের দিকটা শক্ত করে চেপে ধরে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল। ঢাকনিটা খুলে দিল রানা। কালো মত ওষুধ।

'কি ওষুধ রে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আইয়োডেক্স। ডাক-বাংলোর ফার্স্ট-এইড বক্সে পেলাম। শিশিটা ভেঙে গেছে বলে বোধহয় এই কৌটোয় তুলে রেখেছে লেবেল লাগিয়ে।'

রানার কপালে লাগিয়ে দিল সোহেল মলমটা। তারপর আঙুল দুটো নিশ্চিন্ত মনে রানার পরিষ্কার শার্টে মুছে নিয়ে পকেট থেকে গোটা দুই নোভালজিন ট্যাবলেট বের করে দিল।

'এ দুটো মেরে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়। সাড়ে তিনটে বাজছে। আমি বাকি রাতটুকু পাহারা দেব।'

'বেশ। অতি উত্তম প্রস্তাব। আর সকালে গোটা আষ্টেক ডিম পোচ, ছ'স্লাইস বাটার টোস্ট, চারটে অমৃত সাগর কলা আর ফাস ক্লাস করে এক কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে আসবি বেল বাজানো মাত্র। নইলে ম্যানেজারকে বলে তোর কান…'

কানটাকে কি করা হবে হাতের ইঙ্গিতে দেখাল রানা। মৃদু হাসল সোহেল। তারপর রানার ওষুধ খাওয়া শেষ হয়ে গেলে জানালা গলে বেরিয়ে গেল জোনাক-জ্বলা রাতের অন্ধকারে।

# পাঁচ

২৯ আগস্ট, ১৯৬৫

সকালে প্রবল করাঘাতের শব্দে ঘুম ভাঙল রানার। দরজা খুলে দেখল সামনে

দাঁড়িয়ে জয়দ্রথ মৈত্র। ভূত দেখার মত চমকে উঠল জয়দ্রথ ও রানা একসঙ্গে। হলুদ দৃষ্টি রানার চোখের ওপর স্থির হয়ে গেল। ডান দিকের ঘা-টা চাটল মৈত্র।

'আপনি এ ঘরে কেন?' দৃষ্টিটা রানার চোখ থেকে সরে সারা ঘরে একবার ঘুরে জানালার ওপর থমকে দাঁড়াল, তারপর আবার স্থির হলো এসে রানার মুখে। ঠিক এমনি সময় মিত্রা এসে ঘরে ঢুকল বাথরুমের দরজা দিয়ে। জয়দ্রথের চোখে কুৎসিত একটা সন্দেহের ছায়া দেখতে পেল মিত্রা। মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইল ওর।

গম্ভীর মুখে সব শুনল জয়দ্রথ মৈত্র। কতটুকু বিশ্বাস করল আর কতটুকু ইচ্ছেমত যোগবিয়োগ করে নিল কে জানে। সবশেষে রানার দিকে চেয়ে বলল, 'আপনার কাছে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ, মি. তরিকুল ইসলাম। আপনার সাহায্যের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।' ঘুরে দাঁড়িয়ে মিত্রাকে বলল, 'রাতেই আমাকে জানানো উচিত ছিল তোমার।' ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে একটু থেমে পেছনে না ফিরেই বলল, 'আমার ঘরে একটু শুনে যেয়ো, মিত্রা,' তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'তোমাদের সব ধরে ধরে ইয়ে করা দরকার। বুঝছ? এটা কি চা হয়েছে, না কানা চোখের পানি?' সোহেলের হাতে ট্রের ওপর চায়ের কাপের দিকে চেয়েই গর্জে উঠল মাসুদ রানা।

নাস্তার এঁটো তশ্তরি-বাসন তুলতে তুলতে নিচু গলায় সোহেল বলল, 'নে, ইয়ার্কি রাখ্। আজ দুপুরে ওরা সব চলল শিলাইদহ দেখতে। তুই যাবি নাকি?'

কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবল রানা। তারপর বলল, 'আমাকে ওরা চিনে ফেলেছে বলছিলি না কাল তুই?'

'হ্যাঁ।'

'আর তোকে? তোর ওপর কোন সন্দেহ হয়নি তো ওদের?'

'না। এখনও হয়নি।'

'তাহলে আমি যাব শিলাইদহে।'

'সন্দেহের সঙ্গে শিলাইদহের কি সম্পর্ক?' অবাক হলো সোহেল।

'সম্পর্ক আছে। শোন্, বলছি। আমি ওদের সঙ্গে যদি শিলাইদহে যাই তবে ওরা এদিকটায় এত কড়া পাহারা দেবে না। পাঁচ নম্বর রুমে ওদের কি আছে আমার জানা দরকার। কিন্তু সব সময় ওদের লোক ঘরটার ওপর এত কড়া পাহারা রাখে যে কোন রকমে ভিড়তেই পারছি না কাছে। তুই যখন বলছিস তোর ওপর ওদের কোন সন্দেহ নেই, যত সন্দেহ এই আমার ওপর, তখন আমি ওদের সঙ্গে শিলাইদহ গেলে ওই ঘরটার ব্যাপারে ওরা কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকবে। আর সেই সুযোগে তুই ঢুকবি ওই ঘরে, দেখে আসবি কি চলছে গোপনে ওই নিষিদ্ধ ঘরে। কি বলিস, পারবি না?'

'যো হুকুম, ওস্তাদ।'

সেদিন, অর্থাৎ ২৯ আগস্ট দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই দল বেঁধে বেরোল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহ কুঠি দেখতে। রানাও গেল। মিত্রাও। কিন্তু মিত্রা যেন সেই গতরাতের সহজ সাবলীল মিত্রাই নয়। সারা মুখে থমথমে গাম্ভীর্য। চোখ দুটো

কেমন উদভ্রান্ত। রানার সঙ্গে একটি বাক্য বিনিময়ও যেন না হয় সেদিকে কেবল জয়দ্রথই নয়, দলের প্রত্যেকটি লোক এবং স্ত্রীলোক সতর্ক দৃষ্টি রাখল। মিত্রার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ হলো না। শুধু এটুকু লক্ষ করল রানা, গভীর চিন্তামগ্ন মিত্রা সেন থেকে থেকে ওর দিকে চাইছে দূর থেকে। ও চাইলেই চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে অন্য দিকে। অনেক চিন্তা করেও যেন কিছু একটা কঠিন সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না মিত্রা।

লঞ্চঘাটে নেমে পায়ে হেঁটে এগোল ওরা। হাতের বাঁয়ে পড়ল রবীন্দ্রনাথের পোস্টাপিস বা ডাকঘর। এখানে গ্রামীণ ব্যাঙ্কও নাকি স্থাপন করেছিলেন তিনি। আরও কিছুদূর এগিয়ে দূর থেকে দোতলা কাছারি বাড়ি দেখা গেল, কিন্তু সেদিকে না গিয়ে ডান দিকে মোড় ঘুরল ওরা। কুঠি বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকেই ডান দিকে বিরাট আম বাগান, বাঁয়ে কিছু খেত ও ঝাউয়ের বন। সোজা এগিয়ে দেখা গেল সুন্দর বাংলো টাইপ পাকা দোতলা বাড়ি—ওপরটা টালি দেয়া। ফুলের বাগান ছাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই হলঘর। পাল্কিটা সত্যিই দেখবার মত। অল্পস্বল্প আসবাবপত্র আছে—কয়েকটা আলমারিতে কিছু বই। দোতলার ঘর আর ছাতের চিলে কোঠা দেখে দলবল এগিয়ে গেল আঙিনায় আম বাগানের সেই বিখ্যাত চাতাল দেখতে। হঠাৎ এদের সঙ্গ কেন জানি বড় তিক্ত লাগল রানার কাছে। পিছিয়ে পড়ল সে। বেরিয়ে এল বাইরে। ফুলের বাগান বাঁয়ে রেখে এগিয়ে গেল পুকুরের দিকে। ডানধারে চাকরদের একতলা লম্বা ঘর। ঘাটের দু'ধারে মস্ত দুটো বকুল গাছ। বিকেল বেলাতেই চারদিকটা নিঝুম হয়ে এসেছে। পুকুরে স্নানার্থী নেই আর।

শান বাঁধানো পুকুর ঘাটে চুপচাপ বসল গিয়ে রানা। একা। ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে নিল কাপে।

অদ্ভুত সুন্দর বিকেল। শরতের স্বচ্ছ নীল আকাশের সাদা মেঘগুলো ছায়া ফেলেছে কানায় কানায় ভরা পুকুরটার কালো জলে। মৃদু বাতাসে ঝির ঝির করছে ঝাউয়ের পাতা। চারদিকে স্নিগ্ধ, শান্ত, সমাহিত একটা ভাব।

বি. এ. ক্লাসে পড়া রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার ক'টা লাইন মনে পড়ল রানার:

'কাছে এলো পূজার ছুটি।
রোদ্দুরে লেগেছে চাঁপা ফুলের রঙ।
হাওয়া উঠছে শিশিরে শিরশিরিয়ে,
শিউলির গন্ধ এসে লাগে
যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা।
আকাশের কোণে কোণে সাদা মেঘের আলস্য—
দেখে, মন লাগে না কাজে ॥'

সেই মুহূর্তে ভুলে গেল রানা তার কাজের কথা, জয়দ্রথ মৈত্রের কথা, মিত্রার কথা। শহরের কর্মমুখর জীবনের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত থেকে হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে এসে এক অদ্ভুত পরিপূর্ণতাকে উপলব্ধি করল সে সমস্ত হৃদয় দিয়ে। অদ্ভুত। অদ্ভুত এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করছে এই জগৎ জুড়ে।

পৃথিবীটা সত্যিই মায়াবী এক স্বপ্নের দেশ!

*

দুপুরে ডাকবাংলোটা নিঝুম হয়ে গেল। দু'জন ছাড়া সাংস্কৃতিক মিশনের বাকি সবাই চলে গেছে শিলাইদহ দেখতে, রানা গেছে সঙ্গে। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল সোহেল একজন বিছানায় শুয়ে এবং অপর জন বিছানার পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে 'হানিমুন ব্রিজ' খেলছে। চেয়ারে বসা লোকটার হাতে একটা অনার্স কার্ডও নেই—কিন্তু হাঁক ছাড়ল: ফোর নো ট্রাম্পস।

আস্তে ঘরের শিকলটা তুলে দিল সোহেল বাইরে থেকে। তারপর এক গোছা চাবি হাতে নিয়ে দাঁড়াল সেই নিষিদ্ধ ঘরটার সামনে। কয়েকটা চাবি দিয়ে চেষ্টা করার পর একটা চাবি লেগে গেল তালায়।

বেশ বড় ঘর। একটা আলমারি আর ছোট একটা টেবিলের দু'ধারে দুটো চেয়ার ছাড়া আর কোন আসবাব নেই। ঘরের মধ্যে এলোমেলো করে ছড়ানো স্টেজ ডেকোরেশনের সাজ সরঞ্জাম। কিন্তু বাক্সগুলো কিসের?

প্রকাণ্ড সাইজের তিনটে বাক্স ক্যান্‌ভাসের তেরপল দিয়ে ঢাকা। তেরপল উঠিয়ে ডালা খুলল সোহেল। বড় সাইজের বেলের মত গোল সবুজ পেইন্ট করা অসংখ্য বল। বোম-টোম নাকি? তিনটের বাক্সেই একই জিনিস। হাতে তুলে নিল একটা। বেশ ভারি। টোকা দিয়ে দেখল ওপরটা প্লাস্টিকের।

সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও উল্লেখযোগ্য আর কিছুই পাওয়া গেল না। একটা বল হাতে বেরিয়ে এল সোহেল ঘর থেকে। বলটা দুই উরুতে চেপে ধরে তালা লাগিয়ে দিল আবার দরজায়।

জানতেও পারল না সে, আলমারির মাথায় নিখুঁত ভাবে লুকোনো একখানা সিক্সটিন মিলিমিটার মুভি ক্যামেরায় তার সমস্ত গোপন কার্যকলাপের ছবি উঠে গেল।

জয়দ্রথের মৃত্যু পরোয়ানা ঝুলল তার মাথার ওপর।

রাত তখন সাড়ে-বারোটা হবে। রানা শুয়ে আছে বিছানায়। ঘুম আসছে না কিছুতেই। আজ কুষ্টিয়ায় শেষ হয়ে গেল অনুষ্ঠান। আবার পাততাড়ি গুটিয়ে ভোর রাতের ট্রেনে রওনা হতে হবে রাজশাহীর পথে। পাশের ঘরে মিত্রা নেই। ওকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে অন্য ঘরে।

ইয়ং টাইগারস্‌-এর দলটাকে সোহেল চিনিয়ে দিয়েছে দূর থেকে। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আজকের রিপোর্ট পেয়ে রাহাত খান কেমন চমকে উঠবে ভাবতে ভাল লাগল রানার। স্যাম্পলটা রানার কাছেই আছে, ঈশ্বরদি পৌঁছে প্লেনে করে পাঠিয়ে দেয়া হবে ঢাকায়, হেড অফিসে। এতদিন পর একটা কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়ে গেছে সোহেল। আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু ওর জন্যে মনে মনে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারছে না রানা। কথায় কথায় সোহেল বলেছে: আমি ধরা পড়ে গেছি রানা। ওদের ব্যবহারেই টের পেয়েছি, আমার পরিচয় ওদের কাছে আর গোপন নেই। অবশ্য তাতে ক্ষতি নেই, আজই তো শালারা ভাগছে এখান থেকে—আমার ডিউটিও এখানেই শেষ।' কিন্তু রানা জানে সহজে ছাড়বার পাত্র জয়দ্রথ মৈত্র নয়।

ঠিক এমনি সময়ে গগনভেদী এক অপার্থিব চিৎকারে কেঁপে উঠল রাত্রির নিস্তব্ধতা। সোহেল না তো! একলাফে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল রানা। ঠিক

দশগজ দূরে আধো-অন্ধকারে ঘাসের ওপর পড়ে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করছে একজন লোক। পিঠের ওপর আমূল বিঁধে আছে একটা ছোরা। লোকটার হাতেও একখানা ছুরি ধরা। সোহেলের মতই লাগছে না অনেকটা? আরে ওই তো! দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে একটা মূর্তি। মাথায় খুন চেপে গেল রানার। একটানে পিস্তল বের করল সে হোলস্টার থেকে। এখনও রেঞ্জের বাইরে যায়নি আততায়ী।

ট্রিগারে আঙুল চেপে গুলি করবার ঠিক আগের মুহূর্তে থেমে গেল রানা। বিস্মিত দৃষ্টি মেলে দেখল দৌড়াবার সময় আততায়ীর একটা হাত দুলছে—আরেকটা হাত স্থির হয়ে ঝুলছে কাঁধ থেকে।

নিঃশব্দে জানালা থেকে সরে এল রানা।

বাইরে চিৎকার শুনে ছুটে আসা লোকজনের উচ্চকণ্ঠে আলাপ-আলোচনা নির্লিপ্ত ভাবে শুনতে শুনতে একসময় গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ল সে।

ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল। গার্ডের বাঁশি। হুইসল্ দিয়ে ছেড়ে দিল লোকাল প্যাসেঞ্জার ট্রেন। পোড়াদা-ভেড়ামারা-ঈশ্বরদি-আবদুলপুর-সারদা-রাজশাহী। পঁচাত্তর মাইল।

রানা উঠে পড়ল সেকেণ্ড ক্লাস একটা কম্পার্টমেন্টে। সাংস্কৃতিক মিশনের রিজার্ভ করা সব শেষের দুই কামরার বগিতে কিছুতেই উঠতে দিল না ওকে জয়দ্রথ মৈত্র। কাজেই যতখানি সম্ভব কাজের একটা কামরায় উঠতে হলো রানাকে। রানা লক্ষ করল সবশেষের কামরায় উঠেছে বাক্স তিনটে।

ব্রডগেজ লাইনে হু-হু করে স্পীড বেড়ে গেল ট্রেনের। চার সীটের কামরা। দু'জন প্যাসেঞ্জার নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে বাঙ্কের ওপর। আর যে লোকটা অনেক ধাক্কাধাক্কির পর বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দিয়েছিল, সে এখনও পাশের সীটের ওপর পা চড়িয়ে দিয়ে আধ-শোয়া হয়ে ঢুলছে। জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে শেষের কামরার দিকে চাইল রানা।

পার্টিশন কিসের? রানা দেখল শেষ বগির দরজা দিয়ে স্টেজ ডেকোরেশনের একটা ক্যানভাস-পার্টিশন বেরিয়ে আছে বাইরে। ব্যাপার কি? ওপাশের দরজা দিয়ে মাথা বের করে দেখল ওদিকেও ঠিক তাই। ফলে শেষের কামরাটা পুরো ট্রেন থেকে আড়াল হয়ে গেছে। কি চলছে শেষ কামরায়? এখান থেকে বোঝার উপায় নেই।

আট মাইল পেরিয়ে এসে পোড়াদহ স্টেশনে থামল ট্রেন। প্রায় লাফিয়ে নেমে এল রানা। দেখল পার্টিশনটা আর নেই। শেষ দুই কামরার পাশ দিয়ে এক চক্কর ঘুরে এল মাসুদ রানা। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না তার। এদিকে হুইসল্ দিয়ে ছেড়ে দিল ট্রেন। প্রাণপণ দৌড়ে কোন রকমে বাদুড় ঝোলা হয়ে উঠল গিয়ে নিজের কামরায়।

ভোর হয়ে আসছে। পুবের আকাশটা বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। হালকা কুয়াশায় আচ্ছন্ন ফসল ভরা আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। আউশ ধান। মাঝে মাঝে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। কুঁড়ে ঘর, উঠানে খড়ের গাদা, আম কাঁঠাল আর কলা গাছ; মেঠেলের ধারে বাঁশের ঝাড়।

আবার জানালা দিয়ে পার্টিশন দেখতে পেল রানা।

সুটকেস থেকে একটা নাইলন কর্ড বের করল সে। কামরার কেউ জাগেনি এখনও। আধ-শোয়া লোকটার মুখ থেকে লালা ঝরছে গেঞ্জির ওপর।

কামরায় উঠবার সুবিধের জন্যে যে লোহার হাতলটা থাকে তার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল রানা দড়ির এক প্রান্ত। ভারি দরজাটা খুলে হাঁ করে দিল। এবার খোলা দরজার ধারে বাইরের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল। একবার ভাবল, তার দেহের ওজন সহ্য করতে পারবে তো কর্ডটা? পারবে। হাঁটু সোজা রেখে রশিটা ধরে ধীরে ধীরে বাইরের দিকে শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে। মাটি থেকে সমান্তরাল ভাবে রয়েছে ওর দেহ। হু হু বাতাস আর সেই সঙ্গে প্রচুর ধূলিকণায় শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হলো। ডান চোখের ভিতর বুলেটের বেগে একটা কাঁকর এসে পড়ল। বেশিক্ষণ এই ভাবে থাকা সম্ভব নয়। যে কোন মুহূর্তে গাছের গুঁড়িতে কিংবা কোন খুঁটিতে লেগে ছাতু হয়ে যেতে পারে মাথাটা।

ডান চোখ আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাঁ চোখ মেলে রানা দেখল পার্টিশনের ওধারের কামরা থেকে ডাল তোলার চামচের মত দেখতে কিন্তু আয়তনে বহু গুণ বড় একটা চামচ বের হলো। চামচের ওপর সোহেলের সেই প্লাস্টিক বল একখানা। চামচের হাতলটা বড় হতে হতে বারো-চোদ্দ ফুট লম্বা হলো। একটা সবুজ খেতের পাশ দিয়ে যাবার সময় আলগোছে সেটা নামিয়ে দেয়া হলো চামচ থেকে। হাতল আবার ছোট হাত হতে অদৃশ্য হয়ে গেল কামরার ভেতর।

তাহলে এই শুভেচ্ছা বিলাচ্ছে এবারের সাংস্কৃতিক মিশন! আর এই জন্যেই রেলপথে চলছে এরা। গোটা পূর্ব-পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর এই বোমা ছড়িয়ে যাচ্ছে ওরা সবার অলক্ষে। কিন্তু কি ওদের উদ্দেশ্য? এই টাইম-বম্ব ফাটলে পরে কি হবে? কোন্ সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে আমাদের দেশের ওপর কে জানে। ভেড়ামারাতে পৌঁছেই রিপোর্ট লিখতে হবে। ঈশ্বরদিতে নঈমকে দিয়ে দেবে রিপোর্ট আর স্যাম্পল্।

'টাশশ!' ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ কানে এল রানার। চমকে উঠল ও। অনুভব করল, কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল বুলেট। পা দুটো ভাঁজ করে ফেলল রানা, তারপর দড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে আসতে থাকল। আবার সেই তীক্ষ্ণ শব্দটা এল কানে—'টাশশ!' এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলি। কামরার ভিতর চলে এল রানা।

বাথরুম থেকে চোখ-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। জানালার ধারে বসে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। বাসিমুখ কেমন যেন বিস্বাদ লাগছে। আকাশটা লাল করে দিয়ে সূর্য উঠছে পুব দিগন্তে।

# ছয়

৩০ আগস্ট, ১৯৬৫

গ্রীনরুম থেকে বেরিয়ে সোজা ডাকবাংলোর পথে হাঁটা ধরল মাসুদ রানা। রাত এগারোটা।

টেপ-রেকর্ডারের স্পুলগুলো না পেয়ে জয়দ্রথ মৈত্রের চেহারাটা কেমন হবে ভেবে খুশি হয়ে উঠল রানার মেজাজ। মোলায়েম চাঁদের আলোয় রানার সুঠাম দীর্ঘ দেহের ছায়া পড়েছে রাস্তায়। লম্বা জনবিরল রাস্তাটায় থেকে থেকে শিউলীর তীব্র সুবাস আর থমথমে একটা শূন্য মঞ্চের রোমাঞ্চ। কাছেই ডাকবাংলো, আর বেশি দূর নেই—এগিয়ে চলল রানা দৃঢ় পদক্ষেপে।

রানা ভাবছে, কথা তো সে দিয়ে এল মিত্রাকে সাহায্য করবে—কিন্তু কিসের সাহায্য? কি বিপদ? কেমন সে চক্রান্ত? কতখানি ভয়ঙ্কর ওদের মৃত্যু-ফাঁদ?

আজ রাতটা রানার জীবনে এক চরম পরীক্ষার রাত। কিন্তু সিলেবাস বা প্রশ্নপত্র সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই! এমন কি কোন্ সাবজেক্টে পরীক্ষা তাও জানবার কোন উপায় নেই। সে কি উত্তীর্ণ হতে পারবে? থাক, অত ভেবে আর কি হবে—'কে সারা সারা,' যা হবার তা হবে।

ওর পাশ দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল ডাকবাংলোর দিকে।

রানার রিপোর্ট এবং সোহেলের স্যাম্পল এতক্ষণে পৌঁছে গেছে হেড অফিসে। রাহাত খানের কাঁচা-পাকা ভুরু জোড়া হঠাৎ মনে পড়ল রানার। আশ্চর্য এক ব্যক্তিত্ব। কতদিন কত ভয়ঙ্কর কাজে রানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, পিঠে হাত রেখে শক্তি, সাহস জুগিয়েছেন পিতার মত। কিন্তু তবু যেন কত দূরে। এক আধটা কথায় স্নেহ ঝরে পড়েছে রানার মাথায় আশীর্বাদের মত, তেমনি আবার সামান্য ভুলে কঠিন শাসনের চাবুক ক্ষতবিক্ষত করেছে রানার মন। সত্যিই অদ্ভুত মানুষটা।

দোতলার ওপর নিজের ঘরে ঢুকেই রানা টের পেল, ওর অনুপস্থিতিতে এ ঘরে অন্য লোক ঢুকেছিল। চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সে ঘরের। পাশের ঘরে মিত্রার চুড়ির রিনিঠিনি শোনা যাচ্ছে। কি করছে মিত্রা?

পাশাপাশি দুই ঘরের মাঝখানে একটা দরজা আছে। ওদিক থেকে বন্ধ। দুপুরে রানা লক্ষ্য করেছিল দরজার ফুটোটা। ভাবল দেখি তো কি করছে মেয়েটা। ফুটোয় চোখ রেখে অবাক হয়ে গেল রানা। এক ইঞ্চি দূরে আরেকটা চোখ! হেসে ফেলল সে। ফুটোয় চোখ রেখে মিত্রাও দেখতে চেষ্টা করছে রানার কার্যকলাপ!

স্নান সেরে নিল রানা। এই নিয়ে তিনবার হলো। তারপর একটা অ্যাশ কালারের ফুলহাতা প্লে-বয় শার্ট এবং নেভি ব্লু রঙের ফুল প্যান্ট পরে নিল। বিছানায় বসে হোলস্টার থেকে ওর একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গী ডাবল অ্যাকশন সেমি-অটোমেটিক ওয়ালথার পি. পি. কে. পিস্তলটা বের করল। পয়েন্ট থ্রী-টু ক্যালিবার। বেশি বড় ক্যালিবার পছন্দ করে না রানা। ভারি পিস্তল দিয়ে কি হবে—হাতের সইটাই আসল। দ্রুত আটবার স্লাইড টেনে আটটা বুলেট বিছানায় ফেলল রানা। ইজেক্টার ক্লিপটা পরীক্ষা করল, কারণ ঠিকমত কাজ না করলে বিপদের সময় এ মারণাস্ত্র খেলনা হয়ে যাবে। ম্যাগাজিন রিলিজ বাটন্ টিপে খালি ম্যাগাজিন বের করে সাতটা গুলি ভরল সে তাতে। স্লাইড টেনে চেম্বারে বাকি গুলিটা ভরে দিয়ে আস্তে হ্যামারটা নামিয়ে রাখল। এবার ম্যাগাজিনটা যথাস্থানে ঢুকিয়ে দিতেই ক্লিক করে ক্যাচের সঙ্গে আটকে গেল সেটা। গুলি ভরা দুটো এক্সট্রা ম্যাগাজিন পকেটে ফেলে পিস্তলটা আবার হোলস্টারে ভরে রাখল সে নিশ্চিন্ত মনে। উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে বেড সুইচ টিপে তিন ওয়াটের নীল বাতি জ্বেলে দিল রানা। তারপর জুতো-মোজা পরা

অবস্থাতেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। এক ঘণ্টা পর নীল আলোটাও গেল নিভে।

চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আধ হাত দূর থেকেও নিজের হাত দেখা যায় না। এত অন্ধকার, মনে হচ্ছে যেন চোখ না বুজেও ঘুমানো যাবে। চুপচাপ অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় শুয়ে আছে রানা। প্রতীক্ষা করছে। বাইরে ঝিঁঝি পোকার কোরাস ভরাট করে রেখেছে যেন অন্ধকারকে। কই, কিছুই তো ঘটছে না।

এই বিনিদ্র অপেক্ষার কি শেষ নেই? খুট্ করে একটা শব্দ হলো পাশের ঘরে। সজাগ হয়ে উঠল রানা। ঘটুক, যা হয় একটা কিছু ঘটুক। এভাবে অনির্দিষ্টকাল প্রতীক্ষা করা যায় না। কয়েকজন লোকের সাবধানী পায়ের শব্দ। চটাশ করে একটা চপেটাঘাতের আওয়াজ। মৃদুস্বরে দুই একটা কথাবার্তা। রানা বুঝল সময় উপস্থিত।

হঠাৎ তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে এল রানা। কি হলো? এমন জোরে ইলেকট্রিক শক্ লাগল কেন? বুকের ভেতর জোরে হার্ট-বিট্ হচ্ছে। পেন্সিল টর্চটা জ্বেলে দেখল লোহার খাটের পায়ার সঙ্গে দুটো তার জড়ানো। তার দুটোর অন্য মাথা চলে গেছে পাশের ঘরে। রানা আগে টের পায়নি এ তারের অস্তিত্ব। আলতো করে খাটটা ছুঁয়ে দেখল কারেন্ট নেই এখন।

ব্যাপার কি? তাকে কি ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে মারবার ফন্দি এঁটেছিল এরা? তাহলে এখন আর কারেন্ট নেই কেন? নাকি একটা বিশেষ মুহূর্তে যেন শক্ খেয়ে ওর ঘুম ভেঙে যায়, তাই এ ব্যবস্থা? রানা ঘুমিয়ে থাকলে এই শক্ লেগে তার ঘুম ভেঙে যেত, কিন্তু কিছুতেই সে বুঝতে পারত না হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল কেন। কিন্তু তার ঘুম ভাঙাতেই বা চাইবে কেন জয়দ্রথ মৈত্র।

কাঠের সিঁড়িতে কয়েকটা পায়ের শব্দ শুনতে পেলো রানা। একটু পরেই একটা গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার শব্দ পাওয়া গেল।

মিত্রাকে নিয়ে যাচ্ছে না তো লোকগুলো! কথাটা মনে আসতেই একলাফে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল রানা। দেখল মিত্রার ঘরের কপাট খোলা। একটা জীপ গাড়ি ডাকবাংলো থেকে বেরিয়েই ডান দিকে মোড় ঘুরল। পেছনে জ্বলছে দুটো লাল ব্যাক লাইট।

ছুটে মিত্রার ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালল রানা। খাঁ-খাঁ করছে খালি ঘর। তবে কি সে রক্ষা করতে পারল না মিত্রাকে? কি মনে করবে মিত্রা? মনে করবে প্রাণভয়ে বিপদের সময় ঘর থেকে বেরোতে সাহস পায়নি ও।

তিনলাফে সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে এল রানা। গাড়ি বারান্দায় একটা লাল রঙের হোণ্ডা ওয়ান-ফিফ্‌টি মোটর সাইকেল দাঁড়িয়ে আছে স্টার্ট দেয়া অবস্থায়। ডাব্‌ল একজস্ট পাইপ দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে। নাম্বার প্লেটে বিদেশী নম্বর দেখে রানা বুঝল কোন টুরিস্ট হবে। হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে একটা ক্যানভাসব্যাগ আর ওয়াটার-বট্‌ল্ ঝোলানো। পেছনের ক্যারিয়ারে কিছু মালপত্র চামড়ার বেল্ট দিয়ে বাঁধা।

ফ্রস্টেড কাঁচের জানালা দিয়ে আবছা দেখল রানা একজন ফর্সা মত লম্বা লোক কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছে। কাঁধে ঝোলানো একটা ফ্লাস্ক। টুরিস্টই হবে।

একবার একটু দ্বিধা হলো রানার। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কি? লাফিয়ে উঠে বসল সে মোটর সাইকেলের ওপর। হেডলাইট অফ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল ডাকবাংলো থেকে। রাস্তায় পড়েই ডানদিকে মোড় নিল মোটর সাইকেল।

জীপ গাড়িটার কোন চিহ্ন নেই। পাকা মসৃণ নির্জন রাস্তা দিয়ে ফুলস্পীডে এগিয়ে চলল রানা। উইণ্ডস্ক্রীন নেই। হু হু করে বাতাস লাগছে চোখে মুখে। বাতাসের বেগে দুই চোখের কোণ দিয়ে পানি বেরিয়ে কানের নিচ দিয়ে গিয়ে শার্টের কলার ভিজছে।

হঠাৎ খটকা লাগল রানার মনে। সবগুলো ঘটনা অস্বাভাবিক নয়? ঠিক সময় মত ঘুম ভাঙাবার ব্যবস্থা, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, জীপগাড়ি, চালু অবস্থায় রাখা হোণ্ডা মোটর সাইকেল। সব যেন সাজানো-গোছানো ছিল রানার জন্যে। এমন তো হবার কথা নয়। ঠিক যেন মিল খাচ্ছে না। তাছাড়া এত রাতে ম্যানেজারের তো কাউন্টারে থাকবার কথা নয়। কার সঙ্গে কথা বলছিল টুরিস্ট? বুঝল রানা, ট্র্যাপে পা দিয়েছে সে। বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে।

দূরে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে জীপ গাড়ির লাল ব্যাকলাইট। স্পীড কমাল রানা।

রাজশাহী-নাটোর রোডে চলেছে ওরা।

এদিকে মিত্রার মনের মধ্যে চলছে তুমুল ঝড়।

জয়দ্রথ মৈত্রের ভয়ঙ্কর-প্ল্যান শুনে চমকে উঠেছিল সে। ও বলেছিল, 'আমাকে এভাবে ব্যবহার করবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে? আমার মামাকে যদি বলি তখন আপনার কি অবস্থা হবে?'

হেসেছিল জয়দ্রথ। বলেছিল, 'মামার ভয় আমাকে দেখিয়ো না, মিত্রা। তুমি ছেলেমানুষ, সব কথা বুঝবে না। আমার ক্ষমতা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই তোমার। আমার একটি মাত্র মুখের কথায় তোমার মামার মন্ত্রীত্বের পদ চিরতরে ঘুচে যেতে পারে। ও-ভয় আমাকে দেখিয়ো না। আমি যা বলছি তা-ই তোমায় করতে হবে।'

'আমি কি বাজারের মেয়েমানুষ?' চোখের জল আর সামলাতে পারেনি অসহায় মিত্রা। রাগে, দুঃখে, অপমানে গলা বুজে এসেছিল ওর।

'দেখো মিত্রা, দেশের প্রয়োজনে অনেক ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয়। মাসুদ রানা শত্রু, ওকে ধ্বংস করতে হবে; তাতে তোমার আপত্তি নেই। কিন্তু, এটা বুঝছ না কেন, পাকিস্তানে এসে আমরা যথেষ্ট করেছি, এর পরেও আবার নিজেরা খুন-খারাবির মধ্যে জড়িয়ে পড়লে আমাদের এতদিনের মাস্টার প্ল্যান একদম ফেঁসে যাবে। আমরা ও-কাজে হাত দেব না। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব। ইয়ং টাইগারস-এর সঙ্গে চুক্তি হয়েছে তোমাকে আমরা তাদের হাতে তুলে দেব—বিনিময়ে তারা মাসুদ রানাকে সরিয়ে দেবে পৃথিবী থেকে। এজন্যে যদি কোন হাঙ্গামা হয়, টাকার জোরে সব সামলে নেবে ওরা, আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।'

একদিকের ঘা ভিজিয়ে নিয়ে আবার আরম্ভ করেছিল জয়দ্রথ মৈত্র, 'অনেক ভেবে এই প্ল্যান এঁটেছি আমি। তোমাকে ছেড়ে আমরা চলে যাচ্ছি ভারতে।

তোমার প্রতি ইয়ং টাইগারস্-দের আগ্রহ অল্পদিনেই ফুরিয়ে যাবে। তারপর ওরা তোমাকে ব্যবহার করবে বড় বড় ব্যবসা ধরবার টোপ হিসেবে। অনেক বড় বড় অফিসার ওরা নিয়ে আসবে তোমার কাছে। তুমি তাদের নাচ দেখাবে, বিনিময়ে তথ্য সংগ্রহ করবে আমাদের প্রয়োজন মত। ঢাকায় আমাদের লোক তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবে।'

শিউরে উঠেছিল মিত্রা।

'আর একটা কথা ভালমত জেনে রাখো। যদি বিশ্বাসঘাতকতা করো, নির্মম মৃত্যু ঘটবে তোমার। এখন থেকে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কার্যকলাপ আমরা লক্ষ করব।'

'আপনার পায়ে পড়ি, মৈত্র মশাই, আমাকে রেহাই দিন।' সত্যিই পা ধরতে গিয়েছিল মিত্রা।

'আমি দুঃখিত,' সরে গিয়েছিল জয়দ্রথ। 'তুমি এখন যেতে পারো।'

'আর আপনার প্ল্যান অনুযায়ী মাসুদ রানা যদি আমাকে রক্ষার জন্যে এগিয়ে না আসে? তাহলে? আমাকেও ভাসিয়ে দিলেন, ওকেও খুন করতে পারলেন না।'

'আসতেই হবে তাকে। সে যে ধাতুতে গড়া—কোন নারীর অবমাননা সে সহ্য করবে না। গাধা একটা—সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেই। সে সব তোমার ভাবতে হবে না, নিখুঁত জাল পেতেছি আমি—শিকার তাতে পড়বেই।' হেসে চলে গিয়েছিল জয়দ্রথ পাশের ঘরে।

এতখানি অসহায় অবস্থা মিত্রার জীবনে আর কখনও আসেনি। এ কী চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়ল সে? ভয়ানক রাগ হলো মাসুদ রানার ওপর। ওই, ওই শয়তানটার জন্যেই আজ ওর এই অবস্থা। ওকে যদি খুন করতে না চাইত জয়দ্রথ তবে তো মিত্রাকে ইয়ং টাইগারস্-এর হাতে তুলে দেবার প্রশ্নই উঠত না। আবার ভাবল, বেচারা রানা জানবে কি করে যে ওকে হত্যা করার বিনিময়ে জয়দ্রথ মিত্রাকে তুলে দিচ্ছে একদল বদমাইশের হাতে। জয়দ্রথই আসলে পাপিষ্ঠ, নীচ, নরাধম। তারপর আবার ভাবল, জয়দ্রথ তো নিজের স্বার্থে কিছু করছে না, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এঁটেছে এই ভয়ানক ষড়যন্ত্র। এ না করলে তো জয়দ্রথ কর্তব্যচ্যুত হত।

তবে? তবে দোষ কার? মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে যায় মিত্রার। দোষ মিত্রার ভাগ্যের। দোষ ওর রূপের, ওর গুণের। সে আত্মহত্যা করবে। আর তো কোন পথ খোলা রইল না তার জন্যে!

হঠাৎ বিদ্রোহ করে বসল মন। কেন? কেন সে ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর খেলাকে নীরবে সহ্য করবে? এ ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসবার কি কোন পথই নেই? নিজেকে রক্ষা করবার অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। সে বাঁচতে চায়। বাঁচতে কে না চায়। দেশ, দলপতি, চক্রান্ত সব চুলোয় যাক। সে নিজেকে রক্ষা করবে। কিন্তু কি করে? এই বিদেশে কে আছে ওর আপনজন যে এগিয়ে এসে সাহায্য করবে? মাসুদ রানা?

অনেক ভেবে সে স্থির করেছিল সমস্ত চক্রান্তের কথা খুলে বলবে রানাকে। কিন্তু সুযোগ পেল কোথায়? চোখের ইঙ্গিতে ডেকে এনে গ্রীনরুমে যে দু'একটা কথা

হলো, তাতে রানার কাছে কিছুই তো পরিষ্কার হলো না। কোনও কথা খুলে বলা হলো না, এসে পড়ল জয়দ্রথ মৈত্র। কি ধরনের বিপদ ওর জন্যে অপেক্ষা করছে সে-সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই রানার। দলপতির বদ্ধমূল ধারণা, রানা যে চরিত্রের মানুষ—কেউ বিপদে পড়লে সে ঝাঁপিয়ে পড়বেই। এবং এগোলেই নিশ্চিত মৃত্যু। আজ সাবধান করে দেয়ার ফলে সে যদি মিত্রার সাহায্য প্রার্থনাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে মিথ্যা অভিনয় বলে মনে করে? যদি এগিয়ে না আসে, তাহলে? তাহলে মিত্রার নিশ্চিত মৃত্যু। সে যদি আত্মহত্যা না-ও করে, জয়দ্রথ হত্যা করবে ওকে।

মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে নাকি মিত্রার? রানা তো কথা দিয়েছেই। নিষ্ঠুর চেহারার লোক হলে কি হবে—নিশ্চয়ই সে তার কথা রাখবে। আশ্বাস খোঁজে মিত্রা এসব ভেবে।

উপায় নেই। তার খাটের তলায় ঘাপটি মেরে বসে আছে একজন। টেপরেকর্ডারের স্পূল পুকুরে ফেলে দেয়ায় মিত্রার ওপর সন্দেহ হয়েছে জয়দ্রথ মৈত্রের—সে আর কোন সুযোগ দেবে না মিত্রাকে। অথচ ওই টেপরেকর্ডারের কথা মিত্রার জানা ছিল না। ভাগ্যিস রানা ওগুলো ফেলে দিয়েছিল—নইলে ওর বিশ্বাসঘাতকতার কথা আর গোপন থাকত না হিংস্র জয়দ্রথের কাছে। বুঝল কি করে মানুষটা!

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকল পাঁচজন ইয়ং টাইগার। একজন টর্চ ধরল মিত্রার দিকে, আর একজন তুলে নিল ওকে বিছানা থেকে পাঁজাকোলা করে। মুখে অশ্লীল হাসি। ঠাঁই করে এক চড় দিল মিত্রা তার গালে। দলের অন্যান্যদের কি একটা ইঙ্গিত করে বেরিয়ে এল লোকটা দরজা দিয়ে বাইরে। গাড়িতে এনে তোলা হলো মিত্রাকে। মিত্রা চেয়ে দেখল মোটর সাইকেলটা যথাস্থানেই আছে।

ছেড়ে দিল গাড়ি। মিত্রা এখন ওদের।

চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল মিত্রার।

রানা কি কথা রাখবে? ও কি আসবে এই পিশাচদের হাত থেকে ওকে উদ্ধার করতে? কতদূর চলে এসেছে ওরা? রানা কি খোঁজ পাবে এদের তাঁবুর? যদি দেরি হয়ে যায়? শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করল মিত্রা।

চোখ খুলেই দেখতে পেল মিত্রা বহুদূরে আবছা মত কি একটা আসছে গাড়ির পিছন পিছন। মাসুদ রানা! আসছে সে! হঠাৎ কেন জানি অদ্ভুত মায়া লাগল তার ওই দুঃসাহসী লোকটার জন্যে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল মিত্রা শত্রুপক্ষের ওই দুর্দান্ত লোকটির জন্যে। ইশ্, কেন সে এই নিশ্চিত মৃত্যুর পথে টেনে আনল এমন একটা মানুষকে? যদি এখনও ওকে ফিরিয়ে দেয়ার উপায় থাকত কোনও। কিছু বুঝবার আগেই শেষ করে দেয়া হবে যে ওকে।

ইয়ং টাইগাররাও দেখল রানাকে। কিছু কথা হলো ওদের নিজেদের মধ্যে এক বিচিত্র ভাষায়। মিত্রা তার একবর্ণও বুঝল না।

বাম দিকের একটা সরু রাস্তায় ঢুকল এবার জীপ। কিছুদূর গিয়েই থামল জীপটা একবার। একটা বেরেটা অটোমেটিক সাবমেশিনগান হাতে নেমে গেল একজন। আরও আধ-মাইল খানেক গিয়ে হাতের ডাইনে মাঠের মধ্যে আলো দেখা গেল। পাশাপাশি তিনটে তাঁবু খাটানো। জীপ এসে থামল একটা তাঁবুর সামনে।

সাঙ্কেতিক কিচির মিচির ভাষায় একমিনিট কথাবার্তা বলল ওরা। চারজন রিভলভার হাতে ছড়িয়ে পড়ল তাঁবুর চারদিকের অন্ধকারে। আর একজন ধরল মিত্রা সেনের হাত।

'হাত ছাড়ো!' হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল মিত্রা সেন।

'ছোড় দেঙ্গে? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হা!' আরও শক্ত হলো মুঠো।

এমনি সময় দূর থেকে দশ-বারো সেকেণ্ড মেশিনগানের একটানা কর্কশ আওয়াজ ভেসে এল। এদিকে ওদিকে প্রতিধ্বনি উঠল তার। কান পেতে শুনল সে শব্দ ওরা দু'জন। দপ করে সব আশা ভরসা নিভে গেল মিত্রার। বুকের ভিতরটা দুর-দুর করে উঠল অজানা আশঙ্কায়। হাত-পা অবশ হয়ে এল।

মিত্রার অবস্থা দেখে খুব একচোট হাসল লোকটা, তারপর টানল ওকে তাঁবুর দিকে। 'কিঁউ বেকার ল্যড়তি হো, ল্যড়কি।'

বন-বিড়ালীর মত আঁচড়ে-কামড়ে-খামচে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল এবার মিত্রা সেন মরিয়া হয়ে। ওর উন্মত্ত আক্রমণে ব্যথা পেয়ে একটু যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল লোকটা। সেই সুযোগে এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিল মিত্রা।

বিশ গজও যায়নি, পিছন থেকে ছুটে এসে ওর চুল টেনে ধরল লোকটা, তারপর প্রচণ্ড জোরে চড় কষাল মিত্রার গালে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল মিত্রা সেন। সেই অবস্থায় ওর একটা হাত ধরে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল সে তাঁবুর দিকে। ব্যথায় কাতরাচ্ছে মিত্রা, তাতে আনন্দ হচ্ছে ওর।

তাঁবুর ভেতর একখানা খাটিয়ার ওপর বিছানা পাতা। ছোট একটা টেবিলের ওপর হ্যাজাক বাতি জ্বলছে। আর কোন আসবাব নেই। তাঁবুর মাঝখানে টেনে এনে মিত্রার হাত ছেড়ে দিল লোকটা। 'ফির অ্যায়সা কারোগে তো খুন কার ডালুঙ্গা। উটঠো, খাড়া হো যাও।'

মিত্রা উঠছে না দেখে লাথি মারবে বলে পা তুলল এবার লোকটা। ভয়ে কুঁকড়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল মিত্রা হামাগুড়ি দিয়ে। প্রচণ্ড জোরে এক লাথি এসে লাগল কোমরে। ছিটকে খাটিয়ার পাশে গিয়ে পড়ল মিত্রা। এগিয়ে আসছে লোকটা। আরেক লাথি থেকে বাঁচবার জন্যে এক পাক ঘুরেই স্থির হয়ে গেল মিত্রা। একটা দীর্ঘ মূর্তির ওপর চোখ পড়েছে ওর। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

তাঁবুর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাসুদ রানা!

# সাত

৩১ আগস্ট, ১৯৬৫

'চোখ বন্ধ করো, মিত্রা।'

গম্ভীর কণ্ঠ রানার। হাতে ওয়ালথার পি.পি.কে। নলটা আরও কয়েক ইঞ্চি বড় হয়ে গেছে সাইলেন্সার লাগানোতে। চোখ বন্ধ করল মিত্রা। এক লাফে ঘুরে দাঁড়িয়েছে লোকটা, হেঁচকির মত আঁৎকে ওঠার শব্দ পাওয়া গেল। 'দুপ্।' একটা

মৃদু গম্ভীর শব্দ। তারপরই একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। ধড়াস করে আছড়ে পড়ল মাটিতে ভারি কিছু।

'শিগগির বাইরে চলে এসো। মাটির দিকে চেয়ো না।'

তাঁবু থেকে বেরিয়েই এক দৌড়ে একটা আমগাছ তলায় এসে দাঁড়াল ওরা। রানা বলল, 'চিৎকার শুনে এক্ষুণি আরও লোক এসে পড়বে। সিকি মাইল দূরে মোটর সাইকেল। পালাতে হবে এখন, জলদি।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই তিন দিক থেকে টর্চ জ্বলে উঠল। গর্জে উঠল তিনটে রিভলভার। চট করে আমগাছের আড়ালে সরে গেল রানা মিত্রাকে নিয়ে, তারপর একটা টর্চ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল।

'বাপ্স্!' মোটা কর্কশ গলায় আওয়াজ এল। গুলি গিয়ে ঢুকল একটা টর্চের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গেই নিভে গেল সব টর্চ রানার অব্যর্থ গুলির ভয়ে। কিন্তু আরও একবার গর্জে উঠল তিন রিভলভার। মিত্রাকে নিয়ে মাটির ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে সরে গেল রানা বেশ অনেকটা বাম দিকে। আগেই রাস্তার দিকে গেল না। বিশগজ ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে রাস্তা। তিনজনই আশা করবে রানা ওই পথে যাবে। গুলি এড়িয়ে রাস্তায় ওঠা সহজ হবে না।

গাছের আড়ালে চলে গেছে চাঁদ। মিনিট দু'য়েক চুপচাপ থেকে একটা টর্চ হঠাৎ রাস্তার দিকে একবার ফোকাস করেই নিভে গেল। সেই আলোয় রানা দেখল, গলিমুখের কাছাকাছি মেশিনগানধারী যে লোকটাকে কায়দা করে ও বন্দী করেছিল, সেই লোক কোন রকমে হাত-পায়ের বাঁধন খুলে তাঁবুতে ফিরে আসছে।

তিনটে রিভলভার গর্জে উঠল একসঙ্গে। ঢিল খেলে কুকুর যেমন শব্দ করে ঠিক তেমনি একটা শব্দ করে বসে পড়ল লোকটা মাটিতে। রানা এবার দ্রুত বাম দিকের ঝোপঝাড়ের দিকে সরতে থাকল। দুটো টর্চ জ্বলে উঠল এবার অনেকটা নির্ভয়ে। ইচ্ছে করলে তিনজনকেই শেষ করে দিতে পারে রানা, কিন্তু তা না করে চুপচাপ মাটির সঙ্গে সেঁটে থাকল। রানার কয়েক ফুট পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল তিনজন আহত লোকটার দিকে। মাটিতে পড়ে ছটফট করছে বটে, কিন্তু পাল্টা গুলি করতে পারে ভেবে আরও কয়েক রাউণ্ড গুলি করল ওরা গজ দশেক দূরে দাঁড়িয়ে। একেবারে স্থির হয়ে যেতে এগিয়ে গেল সামনে।

রানা ততক্ষণে মিত্রার হাত ধরে জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। মিনিট পাঁচেক একটানা ছুটে একটা ঝোপের ধারে দাঁড়াল রানা। মোটর সাইকেলটা নিয়ে এল ওপাশ থেকে।

একটু দ্বিধা করল মিত্রা মোটর সাইকেলের পেছনে উঠতে। টাইমবম্বটার কথা মনে হলো। কিন্তু আর তো উপায় নেই এখন। কাঁচা রাস্তা দিয়ে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে চলল ওরা বড় রাস্তার দিকে।

'বড় রাস্তায় বাস-টাস পাওয়া যাবে না?' জিজ্ঞেস করল মিত্রা।

'এত রাতে কি করে বাস পাবে? আর বাসের দরকারই বা কি? এই ষাট মাইল যেতে বড় জোর সোয়া ঘণ্টা লাগবে হোণ্ডায়।'

'না, মানে, আমরা কোন ঝোপঝাড়ের মধ্যে তো লুকিয়ে থাকতে পারি রাতটা। সকালে না হয় বাসে ফেরা যাবে রাজশাহী।'

'হঠাৎ বাসের প্রতি তোমার এত ভক্তি এসে গেল কেন, মিত্রা?' হেসে জিজ্ঞেস করল রানা।

কোন উত্তর দিল না মিত্রা। ওর অস্বস্তিটা মনে মনে উপভোগ করছে রানা। বড় রাস্তায় উঠল ওরা। হেড লাইট জ্বেলে দিয়ে মাইল মিটারের দিকে চেয়ে বলল, 'সিক্সটি ফাইভ।'

পেছনে শক্ত করে রানার কাঁধ ধরে বসে আছে মিত্রা। বাতাসে ওর চুল উড়ে এসে সুড়সুড়ি দিচ্ছে রানার গলায়।

'মোটর সাইকেলটা আমাদের ছেড়ে দেয়া উচিত,' বেশ কিছুক্ষণ উসখুস করে বলল মিত্রা।

'কেন বলো তো?'

'তুমি জানো না, এতে টাইম-বম্ব ফিট করা আছে। অল্পক্ষণেই ফাটবে।'

'টাইম-বম্ব? তা, এতক্ষণ বলোনি কেন?' আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। কিন্তু মোটর সাইকেলের স্পীড কমাল না একটুও।

'সেই কখন থেকেই তো বলছি, শুনছ তো না। আর শুনেও তো থামাচ্ছ না!' উদ্বেগ প্রকাশ পেল মিত্রার গলার স্বরে।

'ওটা এখন আমার পকেটে।' নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিল রানা।

মিত্রা ভাবল, সাঙ্ঘাতিক ধুরন্ধর তো ব্যাটা! নইলে আর এত নাম! আমাদের সার্ভিসে এর মতন একটা লোকও যদি থাকত। এতবড় বুকের পাটা আর এমনি বিরাট মন!

'তুমি ঠিক সময় মত না পৌঁছলে আমার কি যে হত! মেশিনগানের আওয়াজ শুনে আমি তো সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই চেয়েছিলাম। পেছন থেকে গিয়ে ব্যাটাকে কাবু করে ফেলে ফাঁকা আওয়াজ করেছিলাম, যাতে সবাই নিশ্চিন্ত থাকে আমার মৃত্যু সম্পর্কে।'

'উহ্! কি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল ওরা সেই লোকটাকে তুমি মনে করে।'

মাইল মিটারের কাঁটা একেকবার সত্তরের ঘরে গিয়ে থর থর কাঁপছে—আবার খারাপ রাস্তায় চল্লিশ এমন কি তিরিশে আসছে নেমে। জোর বাতাসে আঁচল উড়ছে মিত্রার। সামনের রাস্তাটা আলোকিত করে এগিয়ে চলেছে ওরা। পেছনে বিশাল অন্ধকার যেন গ্রাস করতে চাইছে ওদের, তেড়ে আসছে হিংস্র নখদন্ত বের করে, কিন্তু ধরতে পারছে না, পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা সামনে। আকাশে মেঘের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তারার চোখে নীল আলো। মুক্তির আনন্দে মিত্রা বলছে জয়দ্রথের চক্রান্তের কথা—কিন্তু অনেক কিছু রেখে ঢেকে।

'তাহলে এই ছিল প্ল্যান? আমাকে হত্যার বিনিময়ে ওরা পাচ্ছিল তোমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'আহ্-হা। আমি যদি পেতাম এমন সুযোগ। সব শালাকে সাফ করে দিতাম।'

'বুঝলাম, মস্ত বীরপুরুষ তুমি। কিন্তু আমাকে নিয়ে কি করতে বলো তো? বৌ-ছেলেমেয়ে নেই?'

'নাহ্। প্রথমটাই হলো না—শেষেরগুলো আসবে কোত্থেকে?'

'বিয়ে করোনি কেন?'

'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না। তাছাড়া আমার এই বিপজ্জনক জীবনে কে আসবে? মেয়েরা বড় হিসেবী।'

'ভুল করে চেয়েছিলে কাউকে?'

'চেয়েছি।'

'কাকে?'

'শুনে তোমার লাভ? ভাবছ গদগদ কণ্ঠে তোমার নাম বলব, না? আর কলকাতায় ফিরে পাকিস্তানী এক ছোঁড়াকে পাগল করে দিয়ে এসেছ ভেবে অনাবিল আনন্দ লাভ করবে। সেটি হচ্ছে না।'

'তুমি একটা ছোটলোক।'

কথাটা বলেই কাঁধ ছেড়ে দিয়ে আলতো করে রানার মাথার পেছনে চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিল মিত্রা। কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে একমুঠি চুল আলগা করে ধরে ঝাঁকিয়ে দিল রানার মাথাটা। আবার বলল, 'তুমি একটা ছোটলোক।'

একটু পরেই চমকে উঠল মিত্রা। পিছন থেকে একটা গাড়ি আসছে না?

'রানা!' ভয়ে কেঁপে উঠল মিত্রার কণ্ঠস্বর। 'ওরা আসছে!'

'হ্যাঁ, রিয়ার-ভিউ মিররে অনেকক্ষণ ধরে দেখছি। বিপদেই পড়া গেল। এগিয়ে আসছে ওরা ফুল স্পীডে। আমরা চল্লিশের বেশি স্পীড দিতে পারছি না। আর দশ মিনিটেই ধরে ফেলবে।'

'তাহলে উপায়!' উৎকণ্ঠিত মিত্রার কণ্ঠে স্পষ্ট হতাশা। জবাব দিল না রানা, দ্রুত চিন্তা চলছে তার উর্বর মস্তিষ্কে।

ধীরে ধীরে পেছনের হেডলাইটের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর কোন উপায় নেই। একটা পিস্তল নিয়ে মেশিনগানের বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়া বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়। এগিয়ে আসছে জীপ। এবার নিশ্চিত মৃত্যু।

হঠাৎ সামনের হ্যাণ্ডেল থেকে মিলিটারি মডেলের বড় ওয়াটার বট্‌লটা নিয়ে মিত্রাকে দিল রানা। বলল, 'এর মুখটা খুলে ভেতরের পানি সব ফেলে দাও তো, মিত্রা।'

'এটা দিয়ে কি হবে?' জিজ্ঞেস করল মিত্রা।

'যা বলছি তাই করো। জলদি!' ধমকে উঠল রানা। পানি ফেলে দিল মিত্রা কর্ক খুলে।

হঠাৎ ডাইনের মোড়টা ঘুরেই লাইট অফ করে দিয়ে কষে ব্রেক চাপল রানা। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ওকে মিত্রা। কয়েক গজ গিয়েই থেমে গেল ভারি মোটর সাইকেল। স্ট্যাণ্ডে তুলে দিয়ে মিত্রার হাত থেকে বোতলটা নিয়ে টান দিয়ে ফুয়েল পাইপটা খুলে ফেলল সে। বোতলটা ধরল পাইপের মুখে। দ্রুত নেমে আসতে থাকল পেট্রোল।

পিছনের গাড়িটা একেবারে কাছে এসে পড়েছে এবার। ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হেড লাইটের আলোয় রাস্তার সোজাসুজি মস্ত ছাতার মত ছাতিম গাছটা আলোকিত। দ্রুত এগিয়ে আসছে ওরা। এক্ষুণি এসে পড়বে। আর অপেক্ষা করা যায় না। বোতলটার চারভাগের তিনভাগ ভরতেই পেট্রোল শেষ হয়ে গেল ট্যাঙ্কের। মিত্রার হাত ধরে এবার দৌড়ে রাস্তার ডানদিকের একটা শুকনো নালা পেরিয়ে

ঝোপের ধারে সজনে গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল রানা। পকেট থেকে রুমাল বের করে ভিজিয়ে নিল পেট্রোলে। রুমালের অর্ধেকটা ঢুকিয়ে দিল পেট মোটা ওয়াটার-বট্‌লের মধ্যে, বাকি অর্ধেক বাইরে বের করে রেখে ওটার মুখে কর্ক এঁটে দিল শক্ত করে। মুখে বলল, 'মলোটভ কক্‌টেল।'

মোড় ঘুরেই ব্রেক করল জীপটা রাস্তার মাঝখানে মোটর সাইকেল দেখে। রাস্তার ওপর হেঁচড়ে কিছুদূর গিয়ে পেছন দিকটা স্কিড করে একটু বাঁয়ে হেলে থামল জীপ। তিন সেকেণ্ড থমকে থাকল। তারপর এক পশলা গুলি বর্ষণ করল মোটর সাইকেলটার ওপর।

একটা শেয়াল বোধহয় এতক্ষণ গোপনে লক্ষ করছিল রানা ও মিত্রার সন্দেহজনক কার্যকলাপ। গুলির শব্দে হাত পাঁচেক দূরের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল। পাতার ওপর মচমচ শব্দ হতেই আবার গর্জে উঠল সাব-মেশিনগান। একটা চিৎকার করেই পড়ে গেল শেয়ালটা মাটিতে।

এবার একজনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। 'উতারো স্যব্ গাড়িসে! ঢুণ্ড্‌কে নিকালো উও কুত্তাকো।'

খট করে শব্দ হলো রানার লাইটারের। রুমালের এক কোণে আগুনটা ছুঁইয়ে দিয়েই বোতলটা ছুঁড়ে মারল সে গাড়ির ওপর। আলো দেখেই আবার ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল বেরেটা সাব-মেশিনগান। নরম সজনে গাছের গায়ে ফুটো হয়ে গেল অনেকগুলো।

ব্যাপারটা বোঝার আগেই রানার আগুনে বোমাটা গিয়ে পড়ল জীপের ভিতর। বিস্ফোরণের শব্দ হলো একটা। দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেল গাড়িতে। সর্বাঙ্গে আগুন লেগে গেছে ভেতরের লোকদের। হতবুদ্ধি হয়ে গিয়ে পাগলের মত চিৎকার করছে চারজন ইয়ং টাইগার। সারা শরীরে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আরেকটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো। জীপের পেট্রোল ট্যাঙ্ক বার্স্ট করল। নরক কুণ্ড জ্বলে উঠল যেন। আগুনের লেলিহান শিখা উঠল পঁচিশ-তিরিশ হাত উঁচু পর্যন্ত। সেই উত্তাপের হল্কা এসে লাগল রানা ও মিত্রার মুখে। মাংস পোড়া গন্ধ ছুটছে চারদিকে। এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে চোখ ঢাকল মিত্রা।

বহু কষ্টে একজন লোক জীপ থেকে বেরোল। মশালের মত আগুন জ্বলছে ওর সারা দেহ ঘিরে। একটা চুলও নেই মাথায়। দু-তিন পা এগিয়েই আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পড়ে গেল রাস্তার ওপর। বীভৎস দৃশ্য।

আগুন একটু কমলে পর মোটর সাইকেলটা স্ট্যাণ্ড থেকে নামাল রানা। ঠেলে আরও কয়েক গজ দূরে নিয়ে গেল আগুন থেকে।

'ট্যাঙ্কে তো আর পেট্রোল নেই। এখন ফিরব কি করে?' মিত্রা জিজ্ঞেস করল।

উত্তর না দিয়ে ফুয়েল পাইপটা যথাস্থানে লাগিয়ে নিয়ে রিজার্ভ ট্যাঙ্কের চাবি খুলে দিল রানা। স্টার্টার বাট্‌ন টিপতেই মৃদু গর্জন করে চালু হয়ে গেল ফোর-স্ট্রোক এঞ্জিন।

আবার হু-হু করে বাতাস কেটে অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে চলল ওরা রাজশাহীর দিকে। আরও বিশ মাইল আছে। মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে রানার। বিয়োগান্ত নাটক দেখে হল থেকে বেরিয়ে এসেছে যেন। জোর করে দূর করে দিল

সে মন থেকে দুঃস্বপ্নের মত ঘটনাগুলোর স্মৃতি।

চাঁদ ডুবে গিয়েছে। জ্বলজ্বল করছে শিশির ভেজা শুভ্র তারাগুলো। থেকে থেকে হাসনাহেনা, শিউলি আর ছাতিমের ভারি সুগন্ধ জমাট বেঁধে আছে রাস্তার ওপর। একটা নক্ষত্র খসে পড়ল।

'রানা।'

'বলো।'

'যখন তারা খসে পড়ে তখন নাকি মনে মনে যে যা চায় তাই পায়? তুমি বিশ্বাস করো একথা?'

'তুমি নিশ্চয় করো? কি চাইলে শুনি?'

'তোমার বন্ধুত্ব।' গালটা রাখল সে রানার পিঠের ওপর।

'তথাস্তু?' খোদ ভগবানের মত বলল রানা। তারপর হাসল।

'রানা।' আবার ডাকল মিত্রা একটু পর।

'কি বলছ?'

'তোমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলাম; তুমি দিয়েছ। আমার কাছে কি তোমার কিছুই চাওয়ার নেই?'

'আছে, যা চাইব দেবে?'

'তোমার জন্যে সব দিতে পারি আমি।'

'সত্যিই?'

'সত্যি। কি চাও তুমি বলো।'

'ইনফরমেশন।'

কেউ যেন কালি মাখিয়ে দিল মিত্রার মুখে। এক মুহূর্তে বাস্তব জগতে ফিরে এল সে। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানা ইনফরমেশন চাইছে ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের মিত্রা সেনের কাছে। কথা দিয়েছে সে। এখন ফেরাবে কি করে? চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ।

'দ্বিধা হচ্ছে, মিত্রা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। নিজের স্বার্থে জয়দ্রথের বিরুদ্ধে, দেশের বিরুদ্ধে গিয়ে তোমার কাছে সাহায্য চেয়েছি আমি, রানা। কেবল নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে। তোমার বিরুদ্ধে জয়দ্রথের চক্রান্ত সফল হলো না আমি স্বার্থপরের মত বিশ্বাসঘাতকতা করলাম বলে। অদ্ভুত এক মানসিক পীড়ায় ভুগছি আমি, রানা। আমার বিবেক ছিন্নভিন্ন করছে আমাকে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে আমি অন্যায় করেছি। তবু সান্ত্বনা ছিল—নিজেকে রক্ষা করবার অধিকার সবার আছে। কিন্তু তোমাকে যদি আমি কোন ইনফরমেশন দিই তবে কোন সান্ত্বনাই আর থাকবে না আমার, রানা। তোমাকে কথা দিয়েছি, যদি বলো দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হতে…'

'থাক তাহলে।'

'আমাকে ক্ষমা করো রানা। তাছাড়া আমার কাছ থেকে বিশেষ কিছু…'

'বেশ, ক্ষমা করে দিলাম।'

'আর কিছু চাইবে না?'

'না।'

'আমি যদি কিছু দিই গ্রহণ করবে?'

'দিয়েই দ্যাখো না!'

'তোমার বাম হাতটা দাও।'

পিঠের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল রানা। নিজের অনামিকা থেকে খুলে একটা ছোট্ট রিং পরিয়ে দিল মিত্রা ওর কড়ে-আঙ্গুলে। 'আমার স্মৃতিচিহ্ন।'

'অনেক, অনেক ধন্যবাদ।'

তীরের মত বাতাস ভেদ করে এগিয়ে চলল শক্তিশালী দ্বিচক্র যান। এসে পড়েছে রাজশাহী। সারি সারি বন্ধ দোকানপাট আর দালান কোঠা ছাড়িয়ে চলল ওরা ডাকবাংলোর দিকে। মোটর সাইকেলটা ডাকবাংলো থেকে বেশ খানিকটা দূরে ছেড়ে দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে উঠে এল ওরা দোতলায়। সারা ডাকবাংলো ঘুমে অচেতন। ঘড়িতে তখন চারটা।

মিত্রাকে ওর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে রানা চলে এল নিজের ঘরে। প্রথমেই পিস্তলটা পরিষ্কার করল যত্নের সঙ্গে। আরও দুটো গুলি ভরে নিল ম্যাগাজিনে। শরীরে ক্লেদাক্ত ক্লান্তি। স্নান সেরে নিল রানা। তারপর ঘরের সঙ্গে লাগানো ছোট্ট ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। গোটা শহরটা নিঝুম ঘুমে আচ্ছন্ন। দূরে লাইট পোস্টের আলোর চারধারে কতগুলো পোকা ঘুরছে অনবরত। অনেক কথা ভাবছে সে। অনেক, অনেক পুরানো কথা।

বিশ মিনিট পর বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল রানা।

গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল একটু পরেই।

সকাল আটটায় ঘুম ভাঙল রানার। এত চুপচাপ কেন? দেখল, পাশের ঘরে কেউ নেই। সারা ডাকবাংলোতে সে ছাড়া আর কেউ নেই। ভোজবাজির মত যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে সাংস্কৃতিক মিশনের গোটা দলটা। যেন কোথাও কেউ কখনও ছিল না।

## আট

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

'মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে নাও, মাসুদ রানা!' ঠিক চার ফুট সামনে থেকে ভেসে এল জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

এয়ারকুলারের একটা মৃদু গুঞ্জন আসছে কানে। সাউণ্ডপ্রুফ ঘরটায় একজনকে গুলি করে হত্যা করা হলে পাশের ঘরের কেউ টের পাবে না। কিন্তু চমকে উঠল না রানা। ডান হাতটা দ্রুত চলে এল না কোটের নিচে বগলের নিচে লুকানো স্প্রিংলোডেড শোল্ডার হোলস্টারের কাছে। এক লাফে সরে গেল না সে আততায়ীকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবার জন্যে। যেমন ছিল, তেমনি স্থির হয়ে বসে রইল। কোন রকম চাঞ্চল্যই প্রকাশ পেল না রানার ব্যবহারে। কারণ, কথাটা উচ্চারিত হয়েছে পুরু কাঁচ ঢাকা দামী সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে পিঠ-উঁচু চেয়ারটায় উপবিষ্ট মেজর জেনারেল (অব) রাহাত খানের কণ্ঠ থেকে।

'বড় বীভৎস মৃত্যু, স্যার! যাই হোক, আমি প্রস্তুত। কিন্তু ঘণ্টা তিনেক সময় দিতে হবে। মৃত্যুর পর তো আর হবে না—কয়েকটা কাজ সেরে নিতে চাই।'

'আজ সন্ধে পর্যন্ত সময় আছে।' হাডসন হাভানা ধরিয়ে নেয়ার জন্যে থামলেন রাহাত খান, তারপর টেবিলের ওপর থেকে একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন, 'আর এই চিঠিটা রেখে দাও। ইচ্ছে করলে আজই নাভানা ট্রেডার্স থেকে ডেলিভারি নিতে পারো তোমার নতুন টয়োটা করোনা গাড়ি।'

করোনা পেয়ে রানার ভিতরে কি প্রতিক্রিয়া হবে ভাল করেই জানা আছে রাহাত খানের। তাই আর রানার মুখের দিকে না চেয়ে একটা ফাইল নিয়ে পাতা ওল্টাতে আরম্ভ করলেন।

রানা তুলে নিল চিঠিটা। শেষ কালে ফিফটিন হাণ্ড্রেড সি. সি. ফ্যামিলি কার! ছি, ছি। ক্ষোভে, দুঃখে নিজের আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করল রানার। মনটা বিষিয়ে গেল রাহাত খানের ওপর। অনেক চেষ্টায় মুখের চেহারাটা ভদ্রোচিত রেখে বলল, 'কিন্তু অন্য কোন বাজে গাড়ি নিয়ে গেলে হয় না, স্যার? আমার জাগুয়ারটা এভাবে ভেঙেচুরে···মানে ওটা আমার···'

'যত প্রিয় গাড়িই হোক না কেন ওটাতেই তোমার অ্যাকসিডেন্ট করতে হবে। গাড়ির চেয়ে তোমার প্রাণের মূল্য অনেক বেশি। আমি চাই না ভবিষ্যতে তুমি একটা অসাধারণ গাড়ি চালিয়ে ফিল্ম স্টারের মত সবার মুখ-চেনা হয়ে যাও। ওই গাড়ি চালানো আজই শেষ। চোখে পড়ার মত কোন শখ বা অভ্যাস তোমার জীবনে হারাম।'

'বুঝলাম, স্যার। কিন্তু হঠাৎ আমার মৃত্যু-সংবাদ ছাপছেন কেন কাগজে? চেনাজানা লোক জিজ্ঞেস করলে কি বলব?' কাজের কথায় আসতে চেষ্টা করল রানা।

'আগামী কয়েকদিন চেনাজানা লোকের সঙ্গে তোমার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কাল ভোর চারটের ফ্লাইটে তুমি যাচ্ছ ব্যাঙ্কক। রেঙ্গুন হয়ে। তারপর থাইল্যাণ্ডের ব্যবসায়ী হিসাবে আসছ কলকাতায়—ওখান থেকে যাচ্ছ টিটাগড়ে। আমি চাই আই.এস.এস. যেন তোমার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে। সহজে যেন তোমার ছদ্মবেশ ধরতে না পারে। ওরা খবরের কাগজ এবং গোপন ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সংবাদ পাবে তোমার মর্মান্তিক মৃত্যুর। কল্পনাও করতে পারবে না তোমার টিটাগড়ে উপস্থিতি। তারপর যখন কাজ উদ্ধার করে ফিরে আসবে এখানে, অবশ্য যদি ফেরা সম্ভব হয়, তখন ভুল সংশোধন করে ছোট্ট দু'তিন লাইন আবার ছাপা যাবে পত্রিকায়। সে সব তোমার ভাবতে হবে না।'

'টিটাগড় গিয়ে কি করতে হবে আমাকে?'

'সেটা বলবার জন্যেই ডেকেছি তোমাকে। আধঘণ্টার মধ্যেই আসছেন জুয়োলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ডক্টর আলী আকবর। অনেক কথা জানতে পারবে তাঁর কাছে। তার আগে এই পৃষ্ঠা দুটোতে একবার চোখ বুলিয়ে নাও। "B" লেখা কাগজটা ভাল করে পড়ো; ওইটাই আসল।'

সাগ্রহে ফাইলটা নিল রানা। কিন্তু পরমুহূর্তেই চুপসে গেল ফাটা বেলুনের মত। হাফ্ ফুলস্ক্যাপ কাগজের ওপর ইংরেজীতে টাইপ করা:

'A'

LOCUST

Species;

1. Locusta migratoria L.–widest range of distribution, universal between L. 20; N–60.S: five sub-Species.

(a) L. migratoria migratoria–South East Russia.

(b) L. migratoria rossica–Central Russia & Western Europe.

(c) L. migratoria migratorioides–Africa & Western Asia.

(d) L. migratoria capito–Madagascar.

(e) L. migratoria manilensis–Malaysia, East Indies, Phillipines & China.

2.Melanophis Spretus Walsch (M. mexicanus Sanss). Plains of America.

3. Chortoicetes Terminifera (walker)—Australian Plague Locust.

4. Docistaurus Moroccanus—Moroccan Locust—Countries of the Mediterranean, West & South Russia.

5. S. peranensis—South American Locust.

6. Locustana Pardalina—Brown Locust—South Africa.

7. Nomadacris Septemfasciata—Red Locust—South Africa.

8. Schistocera Gregaria—Desert Locust—Whole of Africa and Western Indo—pakistan.

9. Patanga Succincta—(Acridium succinctum)—Bombay Locust—Indo-Malaysia.

'B'

Patanga Succincta

Bombay Locust

(1) Breeding habitat—desert or semi desert areas.

(2) 150 to 200 eggs at a time in the sand by a single female.

(3) Humidity and temperature have great efffect at all phases.

(4) Morphological diff.— Ph. gregaria—6 eyestrips

26

antennal segments
Ph. solitaria—6-7 eye strips
27-28 antennal segments.

(5) Stages a) Egg) b) Pupa c) Larva (hopper) d) Adult.

(6) Swarm Movements—Down-wind direction.

(7)Wing movement—17 cycles per second.

(8) Speed—2.5 miles to 3 miles per hour.

(9) Flight habit—Day time. Never fly at night or early morning.

(10) Locusticides. r-BHc and DNC are effective. But no locusticide can repulse a swarm at flight.

কাগজ দুটো শেষ করেই চোখ তুলল রানা। দেখল তার দিকে চেয়ে আছেন রাহাত খান। ঠোঁটে রহস্যময় হাসি।

'এ যে দেখছি পঙ্গপালের ইতিবৃত্ত! এর সঙ্গে চিটাগড়ের সম্পর্ক কি?'

'সত্যিই কোন সম্পর্ক আছে কি না আমরা কেউ-ই জানি না। সবই অনুমান। নিশ্চিত হবার জন্যেই তোমাকে পাঠানো হচ্ছে সেখানে। এখন শোনো, সবটা ব্যাপার খুলে বলি। তুমি যে সবুজ গোলাকার জিনিসটা পাঠিয়েছিলে ঈশ্বরদি থেকে, সেটা একটা বিচিত্র টাইমবম্ব। এর মধ্যে ঘড়ির মত কোন ব্যবস্থা নেই। ছোট্ট একটা ছিদ্র বিশিষ্ট অ্যাসিডের ক্যাপসুল আছে। একটা প্লাস্টিকের ফিউজকে নির্দিষ্ট গতিতে জ্বালাতে জ্বালাতে এগোচ্ছে সে অ্যাসিড। যখনই পুরো প্লাস্টিকের ফিউজটা ক্ষয় হয়ে যাবে, অমনি ফাটবে বম্ব।'

এইবার কিছুটা উৎসাহ বোধ করল রানা। সোজা হয়ে বসল সে। চুরুটের ছাই ঝেড়ে নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন রাহাত খান।

'কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানো? ওর ভেতর লোহা লক্কড়ের বদলে আছে পাতলা কয়েকটা কাঁচের গোলক। তেল জাতীয় একটা জিনিস ভরা সবগুলোর মধ্যে। বোমাটা ফাটলে পরে এগুলো ছিটকে অনেক দূরে গিয়ে পড়বে।'

'কি জিনিস ভরা সেই কাঁচের বলে?'

'Molasses scent—চিটাগুড়ের গন্ধ। আর কিছু না। বল ভাঙলেই দশ মিনিটের মধ্যে উড়ে যাচ্ছে বাতাসে ভেসে। ডক্টর আলী আকবর ল্যাবরেটরিতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন একটা বল। ওঁর রিপোর্টে দেখছি প্রথমে চিটাগুড় থেকে তেল জাতীয় এই গন্ধ এক্সট্র্যাক্ট করে নিয়ে তার মধ্যে হাইপ্রেশার দিয়ে হাইড্রোজেন মলিকিউল তুলে নিয়ে বয়লিং পয়েন্ট পনেরো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেট করে দেয়া হয়েছে। একে ডিহাইড্রোজেনেশন বলে। বয়লিং পয়েন্ট যদি অতখানি নিচু করে দেয়া যায় তাহলে এ ধরনের যে কোন জিনিস মিনিমাম অ্যাটমসফেরিক টেম্পারেচারেও এভাপোরেট করবে। উড়ে যাবে বাতাসে স্পিরিটের মত।'

'কিন্তু এতে লাভ কি হবে ভারতের?'

'সেটাই তো প্রশ্ন। হিসেব করে দেখা গেছে, যে হারে প্লাস্টিক ফিউজটা ক্ষয় হচ্ছে, তাতে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর ভোর সাড়ে তিনটেয় ফাটবে টাইম বম্ব।

প্রত্যেকটা বোমাই একসঙ্গে ফাটবে বলে ধারণা করে নেয়া অসঙ্গত হবে না। এখন ওই বিশেষ দিনে যদি সারা পূর্ব-পাকিস্তানের সীমানা বরাবর এই সেন্ট-বম্ব ফাটে, তাহলে কি এমন সুবিধা হতে পারে ভারতের? ডক্টর আকবর সমাধান দিচ্ছেন—পঙ্গপাল।'

'পঙ্গপাল!' রানার বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ির ঘা দিল একটা। একসঙ্গে দ্রুত অনেকগুলো চিন্তা খেলে গেল মাথার মধ্যে। একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা উঁকি দিল ওর মনের কোণে। হতেও তো পারে, ওদের দ্বারা অসম্ভব কি?

ইন্টারকমে গোলাম সারওয়ারের গলা শোনা গেল।

'ডক্টর আলী আকবর, স্যার।'

'ভেতরে পাঠিয়ে দাও। আর নাসরীনকে বলো, যেন নিজ হাতে তিন কাপ কফি বানিয়ে পাঠিয়ে দেয় আমার কামরায়।'

চট করে একবার রাহাত খানের দিকে চেয়ে নিয়ে মৃদু হাসল রানা। মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন ঘরের ভিতর। উঠে দাঁড়িয়ে সাদরে ডেকে বসালেন তাঁকে রাহাত খান। ফর্সা গায়ের রঙ, খয়েরি চোখের মণি। ছিমছাম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিলেতি ছাঁটের নীল স্যুট। প্রশস্ত কপালে প্রতিভার ছাপ। রানার পাশের চেয়ারটা ছেড়ে বসলেন ডক্টর আলী আকবর। হাতের অ্যাটাচি কেসটা রাখলেন খালি চেয়ারের ওপর। পরিচয় করিয়ে দিলেন রাহাত খান।

'আমি রানাকে সমস্ত ব্যাপার মোটামুটি বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম। ও যাচ্ছে আমাদের তরফ থেকে টিটাগড়ে। রানা আমাকে জিজ্ঞেস করছিল ওই সেন্ট থেকে আপনি পঙ্গপালের কথা মনে করলেন কেন। আপনিই বরং বুঝিয়ে দিন।'

'এটা খুব সাধারণ কথা। এই গন্ধ লোকাস্টকে আকর্ষণ করে, এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় রিসার্চ সেন্টারে পঙ্গপাল ধ্বংস করবার জন্যে লোকাস্টিসাইড্ তৈরি হচ্ছে এবং এই সেন্ট-এর সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই গন্ধের সঙ্গে পঙ্গপাল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।'

'কিন্তু,' রাহাত খান সূত্রটা ধরলেন কথার, 'দেখা যাচ্ছে লোকাস্টিসাইডের কোন চিহ্নও নেই, শুধু গন্ধটাই ছড়াতে চাইছে ওরা আমাদের আকাশে বাতাসে। তার মানে কি হতে পারে? একটাই অর্থ আপাতত মনে আসছে: ওরা সীমান্ত থেকে পঙ্গপাল ছাড়বে ওই দিন। বিনা যুদ্ধেই আমাদের এই কৃষি-প্রধান দেশটা ধ্বংস করে দেবে। তাই না?'

'সত্যিকার কোন ক্ষতি করবার মত অত পঙ্গপাল পাবে কোথায় ওরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার কাছেও ব্যাপারটা খুবই অবাস্তব বলে মনে হয়েছে, মি. খান।' বললেন ডক্টর আলী আকবর। 'যদিও আমি একে সম্ভব বলে বিশ্বাস করি না, তবু সারাদিন ছটফট করেছি দুশ্চিন্তায়, এবং শেষ পর্যন্ত কাল সারা রাত পরিশ্রম করে একটা সলিউশন তৈরি করেছি। স্প্রে-গানে ভরে এনেছি সেটা। যদি সত্যিই ওখানে গিয়ে দেখেন পঙ্গপালের কারবার, তাহলে এই সলিউশনটা স্প্রে করে আসবেন।' অ্যাটাচি কেস থেকে একটা কৌটা বের করে সযত্নে টেবিলের ওপর রাখলেন তিনি।

'কি আছে এতে?'

'ম্যাটারিজিয়াম।'

কফি এল। চুপচাপ কফি খেলেন, তারপর হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর আকবর।

'এটা দিতেই এসেছিলাম। পরে আরও আলাপ হবে, এক্ষুণি আমার একটা ক্লাস আছে, আজ আসি।'

'আপনি কি ইউনিভারসিটিতে এখনও আছেন?' জিজ্ঞেস করেন রাহাত খান।

'তা ঠিক নেই, পুরানো অভ্যেস, বুঝলেন না? এক-আধটা ক্লাস নিই। আচ্ছা আসি।'

ব্যস্ত-সমস্ত প্রফেসর বেরিয়ে গেলেন। ওঁর দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন রাহাত খান। বললেন, 'অদ্ভুত মানুষ! জীবনে ছুটি কাকে বলে জানেন না। এই রকম আরও কিছু লোক থাকা দরকার ছিল আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে।'

আবদুল কাপ নিতে এল। এক চুমুকে কফি শেষ করে আবার কাজের কথায় ফিরে গেলেন রাহাত খান।

'তাহলে দাঁড়াল এই, আমাদের দেশে ভারতীয় গুপ্তচরদের তৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে; কিন্তু আসল উদ্দেশ্য সঠিক জানা যাচ্ছে না। অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে সবটুকু। কাজেই তোমাকে যেতে হচ্ছে টিটাগড়। দুই বর্গ মাইল জায়গা জোড়া ওদের সেই নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকতে হবে তোমার। প্রথম কাজ ওদের হাতে ধরা না পড়া। কারণ, তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু। দ্বিতীয় কাজ, সত্যিসত্যিই ওরা কি করছে ওখানে, কি ওদের ভবিষ্যৎ প্ল্যান ইত্যাদি জেনে আসা। কিছুতেই একা কিছু করবার চেষ্টা কোরো না। একটা গোটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একা তোমার কিছুই করবার নেই। ক্ষতিকর কিছু দেখলে আমরা অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

'আর যদি ধরা পড়ে যাই, তবে?'

'বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে প্রাণত্যাগ কোরো।'

'কোন রকম সাহায্যের ব্যবস্থা থাকছে না?'

'না। আপাতত সম্ভব হচ্ছে না।'

'কিন্তু ওদের আড্ডার ভেতর আমি ঢুকব কেমন করে?'

'সেটা এখানে বসে আমি কি করে বলি বলো? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তুমি নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মত। ওই যে, ওদের একটা মেয়ে স্পাই··· কি যেন নাম···ও, মিত্রা সেন। যার জন্যে এতগুলো ক্ষমতাশালী লোককে পুত্রহারা করলে তুমি—তার সঙ্গে তো তোমার খুব, মানে (বাম হাতের মধ্যমা দিয়ে ডান চোখের নিচটা একটু চুলকে নিলেন রাহাত খান), বেশ খানিকটা অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। তার কাছ থেকে কোন রকম সাহায্যের আশা আছে?'

'না, স্যার। ও একটু অন্য ধরনের মেয়ে। মানে,···'

'আচ্ছা, আচ্ছা। ও কেমন মেয়ে আমার না জানলেও চলবে। এদিকে ইয়ং টাইগারসের পিতৃদেবরা আমার মাথা চিবিয়ে খাবার চেষ্টা করছে। উঁচু মহলটা তোলপাড় করে ফেলেছে একেবারে। মহা ঝামেলায় পড়েছি। যাক, সেইদিন যদি শুভেচ্ছা মিশনের দলটাকে ধরতে পারতে, তবে আর এত ঝামেলা পোহাতে হত না।'

'ভোরে উঠে দেখছি ডাকবাংলো সাফ। নদীপথে পার হয়ে গেছে।'

'তোমার আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল।' অসমর্থন-সূচক মাথা নাড়লেন রাহাত খান।

এরপর অপারেশন গুডউইল সম্পর্কে আলোচনা হলো। কয়েকটা ম্যাপ এঁকে রাহাত খান কিসব বোঝালেন রানাকে। সব রকম সম্ভাবনাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হলো। তারপর এক সময় আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে এল রানা সে ঘর থেকে।

রাহাত খানের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের কামরায় গিয়ে বসল রানা চিন্তিত মুখে। মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছে ভবিষ্যৎ কাজগুলো।

'কি ব্যাপার? বড় সাহেব মেরেছে নাকি?' নাসরীন রেহানা সামনে এসে দাঁড়াল।

'মেরেছে মানে? একেবারে খুন করে ফেলেছে। কাল খবরের কাগজে দেখবে।'

'বুঝলাম না।'

'এখন বুঝে কাজ নেই। কাল কাগজ হাতে নিয়েই বুঝতে পারবে। এখন এই চিঠিটা নিয়ে নাভানা ট্রেডার্সে চলে যাও তো সোজা! ওদের শো-রুম থেকে যে রঙটা তোমার পছন্দ হয় সেইরঙের একটা করোনা নিয়ে চলে এসো। এখন থেকে টয়োটা গাড়ি চালাতে হবে আমার। যাও, নিয়ে এসো গাড়িটা।'

'টয়োটা করোনা?' দুই চোখ কপালে তুলল রেহানা।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, করোনা। কানে কম শোনো নাকি? যাও ভাগো। আমার মেজাজ এখন তিন-চার রকম হয়ে আছে। ঘাঁটিয়ো না আমাকে।'

'ওরেব্বাপ্স্!' কেটে পড়ল রেহানা।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল মাসুদ রানা।

গ্রীন রোডের একটা ছোট্ট মোটর ওয়ার্কশপের সামনে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে থামল লরেল গ্রীন মেটালিক কালারের একখানা আনকোরা নতুন টয়োটা সিডান। সামনে-পিছনে ON TEST লাগানো।

'আরে, আসুন আসুন। আপনার কথাই ভাবছিলাম। বাঁচবেন অনেক দিন।' রানাকে দেখেই হেঁ-হেঁ করে এগিয়ে এল দেওয়ান মটর ওয়ার্কসের এনামুল হক; পাতলা-সাতলা ছিমছাম চেহারা। কপালটা ক্রমেই বড় হয়ে যাচ্ছে—মাঝখানে কিছু চুল রেখে মাথার দুই পাশ দিয়ে এগোচ্ছে টাক। ডান গালে চোয়ালের কাছে কোন হাতুড়ে ডাক্তারের অপারেশনের দাগ, গর্ত হয়ে আছে। বাড়ি মুর্শিদাবাদ। রানার গাড়ির একমাত্র অভিভাবক।

'এ যে দেখছি নতুন গাড়ি। কোন বন্ধুর বুঝি?' করোনাটার দিকে একবার চেয়েই ঔৎসুক্য হারিয়ে ফেলল এনামুল হকের পাকা চোখ। অন্য কথায় চলে গেল সে।

'আপনার জাগুয়ারের পিস্টন রিং চেঞ্জ করে দিয়েছি, আর ধোঁয়া নেই। ট্যাপেট আর ডিসট্রিবিউটার এবার ঠিকমত অ্যাডজাস্ট হয়েছে, খেয়াল করেছেন?'

জাগুয়ারের কথায় মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার। ঘণ্টা দেড়েক পর নিজ হাতে ধ্বংস করতে হবে ওর একান্ত প্রিয় গাড়িটা। খবরটা জানতে পারলে রানার মতই আঘাত পেত এনামুল হক।

'গাড়িটা বন্ধুর নয়। আমার। এখন থেকে এটাই চালাতে হবে আমাকে। জাগুয়ার বাদ।'

'জাগুয়ার বাদ? জাগুয়ার ছেড়ে এই গাড়ি চালাবেন আপনি?' তাজ্জব হয়ে গেল হক সাহেব।

'হ্যাঁ। ওপরওয়ালার হুকুম। তাই আপনার কাছে এটা নিয়ে এলাম। একটু মানুষ করে দিতে হবে।'

'তা করা যাবে, কিন্তু জাগুয়ারটা—ছি ছি ছি। আচ্ছা যাই হোক, কি আর করা।' গলাটা হঠাৎ উঁচু স্বরে হাঁক ছাড়ল হক সাহেব, 'ও পিচ্চি, দিলু মিঞাকে বল মাসুদ সাহেব এসেছেন, ফাসকেলাস করে ডালপুরি আর চা। তাড়াতাড়ি করতে বলিস, বাবা।'

একটা চেয়ার হক সাহেবের খুব কাছে টেনে নিয়ে বসল রানা। তারপর ঘাড়ের ওপর দিয়ে বুড়ো আঙুলে করোনাটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'এগুলো বোধহয় ঘণ্টায় আশি-পঁচাশি করে। না?'

'হ্যাঁ, তা ওইরকমই। এর বেশি আর কি আশা করেন?'

'কমপক্ষে একশো তিরিশ। পারবেন?'

'পারব না কেন? একটু সময় লাগবে। নতুন গাড়ি, মাত্র শো-রূম থেকে বের করেছেন, ক'দিন চালান, তারপর এক সময়—'

'নতুন গাড়ির মোহ আমার নেই, হক সাহেব, আপনি ভাল করেই জানেন। তাছাড়া আগামী কয়েকদিন আমি ঢাকার বাইরে যাচ্ছি। এটা আমি এখনই এখানে ছেড়ে ট্যাক্সিতে ফিরব বাসায়। ফিরে এসে কমপ্লিট চাই। কি কি বদলাতে হবে?'

'সে অনেক কিছু। প্রথমে তো চেসিস আর বডির ওজন কমাতে হবে; ইঞ্জিনের রোটেটিং আর রেসিপ্রোকেটিং পার্টসের ওজন কমাতে হবে। সিলিণ্ডার হেড মেশিনিং করে কম্প্রেশন রেশিও বাড়াতে হবে; ইনলেট পার্টগুলোকে হাই পলিশ লাগাতে হবে—যাতে ভাল ফ্লো পাওয়া যায়, কাস্ট আয়রন থাকলে ফ্লো অত সুবিধের হয় না; সাইলেন্সার বক্স উড়িয়ে দিয়ে ডাইরেক্ট একজস্ট পাইপ দিতে হবে; টুইন ডাউনড্রাফট কারবুরেটর লাগাতে হবে; (সিগারেটের প্যাকেট থেকে একখানা কিংস্টর্ক বের করল এনামুল হক) তাছাড়া কমবাসশন চেম্বারের ডিজাইন বদলে ফেলতে হবে; আরও শক্তিশালী ভ্যালভ স্প্রিং দিতে হবে; স্পেশাল ক্যামশ্যাফট ফিট করতে হবে; ট্যাপেট-ক্লিয়ারেন্স বাড়িয়ে দিতে হবে; ইনডাকশন র‍্যামিং এফেক্টের জন্যে সুপার চার্জার লাগাতে হবে। তার ওপর একখানা ওভার ড্রাইভ ইউনিট ফিট করে দেব—ইঞ্জিন স্পীড হুইল স্পীডের সমান হয়ে যাবে, পেট্রোলও খাবে অপেক্ষাকৃত কম। সাধারণ গাড়িতে ইঞ্জিন স্পীড হুইল স্পীডের ডবল থাকে—সমান করে দিলে, বুঝতে পারছেন না, কত বেশি স্পীড পাচ্ছেন? এছাড়া আরও দু'একটা টুকিটাকি জিনিস আছে। যেমন, কুলিং সিস্টেমটা ইমপ্রুভ করতে হবে, কারণ বুঝতেই পারছেন...'

'কিচ্ছু বুঝতে পারছি না,হক সাহেব,' আর সহ্য করতে পারল না রানা। 'এবং বুঝবার কিছুমাত্র আগ্রহও নেই। এসব আপনি বুঝলেই চলবে। স্পীড কত পাচ্ছি শুধু সেটাই বলেন, মশাই।'

'তা কমপক্ষে হানড্রেড টোয়েনটি তো বটেই। ঠিক কত পাবেন বলা মুশকিল। বেশিও হতে পারে।'

'ব্যস, তাহলেই খুশি। কিন্তু হবে তো?'

'হবে না কেন, বিদেশে হরদম হচ্ছে। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, যে রকম স্পীড আর পিক-আপ চাইছেন, তাতে পেট্রোল কনজাম্পশন বেড়ে যাবে অনেক।'

'তা হোক। এই দশ হাজার টাকার চেক রেখে যাচ্ছি—আরও যা লাগে লাগিয়ে দেবেন। এক হপ্তার মধ্যে আসছি আমি।'

'আরে সে-সব আমাকে বলতে হবে না। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, নিন আরম্ভ করুন।'

রানার প্রিয় ডালপুরি—দিলুর নিজ হাতে তৈরি—আর চা শেষ করে সিগারেট ধরাল এনামুল হক। ঠিক এমনি সময় ঢুকল এসে ইদু মিঞা।

'ওস্তাদ, আমার গাড়িটা আবোর ফির টেরাবোল দিতাছে! ইক্‌জিরিসা দেইখা দিবার লাগব।' হঠাৎ রানার দিকে চোখ পড়তেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ইদু মিঞা। 'আরে আপনে এইখানে, হুজুর! ওস্তাদের লগে জান-পয়চান আছে বুজি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, জান পয়চান আছে। আয় দেখি তোর গাড়ির কি হয়েছে!' ধমকের সুরে বলল হক। তারপর তিনজন এসে দাঁড়াল ট্যাক্সির সামনে। 'দে, স্টার্ট দে দেখি!'

ইদু মিঞা স্টার্ট দিল কিন্তু কোন ট্রাবল পাওয়া গেল না। রানা একটু অবাক হলো।

'ব্যাটা শয়তান, এই রাস্তা দিয়ে যখনই যাবে, নেমে এসে এরকম বিরক্ত করবে। কিছু না, ঠিক আছে গাড়ি।' রানার দিকে চেয়ে বলল, 'এটা ওর একটা বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই পথে যেতে একবার থামা চাই।'

'আরে না না, ওস্তাদ। আপনেরে দেখলেই হালায় টেরাবল যায় গা।'

হাসে ইদু মিঞা। 'আহেন হুজুর, কোন্ দিকে যাইবেন?' রানাকে ডাকল এবার সে।

'তোমার গাড়িতে উঠব না।'

'কেলেগা হুজুর, ব্যাদ্দবি হইছে কোন?'

'না। ভাড়া না নিলে তোমার গাড়িতে আর ওঠা যাবে না।'

'কি কন, হুজুর। বারার লগে কি? দিলে দিবেন, না দিলে না দিবেন। মাগার বেইনসাফ দিবার পারবেন না। পুরানা পল্টন থেইকা এয়ারপোর্ট—ঘ্যাচ কইরা বিশটা ট্যাকা বাইর কইরা দিলেন। পাঁচ ট্যাকা বি কেরায়া অহে না। বেইমান পাইছেন আমারে?'

'আর এদিক-ওদিক যে ঘুরলে?' গাড়িতে উঠে বসে বলল রানা।

'গুরলাম তো বেহুদা, হুজুর। আপনে বি চুপ থাকলেন। আই.বি. লাগছে মনে কইরা খামাখা লৌর পারলাম।' গাড়ি ছেড়ে দিল ইদু মিঞা। রানা হাত নাড়ল

এনামুল হকের দিকে।

'মতিঝিল। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং করপোরেশন।'

কথার খেই ধরে আবার আরম্ভ করল ইদু মিঞা।

'উই হালার পিছে লাগছিলাম আমি এয়ারপোর্ট থেইকা, দেখি হালায় যায় কই। আই.বি. না কচু উইটা। ভাগতে ভাগতে এক্কেরে রমনা পার্ক। গাড়ি ফালায়া গেল গা হালায়। আমি…'

'আজ রাত তিনটের সময় আমার বাসায় আসতে পারবে?'

'পারুম না কেলেগা? মাহাজনের গাড়ি তো না, আপনা গাড়ি।'

'বেশ, এসো তাহলে।'

ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ল রানা সাততলা বাড়িটার মধ্যে। ভাবল ভোর রাতে ইদু মিঞাকে বলে দেবে যেন আগামী কাল একবার এনামুল হকের সঙ্গে দেখা করে দুপুরের দিকে। নিশ্চয়ই এনামুল হক ওকে রানার মৃত্যু-সংবাদ দেবে—তারপর অবাক হয়ে শুনবে ভোর রাতে রানার ঢাকা ত্যাগের কথা। ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়ে চেপে যাবে হক সাহেব। কাজ বন্ধ করবে না করোনার। ক'দিন পর ঢাকায় ফিরে তৈরি গাড়ি পাবে সে।

# নয়

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

রেঙ্গুনে দুই ঘণ্টা থামতে হবে। পি.আই.এ.-র দৌড় ওই পর্যন্তই। এরপর বিওএসি-তে যেতে হবে ব্যাঙ্কক। ব্যাঙ্ককযাত্রীরা বেশির ভাগই বেরিয়ে পড়ল ভোরের রেঙ্গুন দেখতে। একা রানা বসে থাকল প্যাসেঞ্জারস লাউঞ্জে। ঢাকা এয়ারপোর্টে কেনা আজকের বাংলা কাগজটা খুলল মাসুদ রানা। এতক্ষণ প্লেনে ওটা ভাঁজ করে নিয়ে বসেছিল, খুলতে সাহস হয়নি, পাছে কেউ চিনে ফেলে।

খবরের কাগজে পরিষ্কার উঠেছে ছবিটা প্রথম পৃষ্ঠায়। ভাঙাচোরা জাগুয়ার গাড়িটার দুমড়ানো দরজা দিয়ে বেরিয়ে আছে রানার দেহের অর্ধাংশ। রক্তে (লাল কালিতে) ভেসে গেছে কপাল, গাল, জামার একাংশ। কিন্তু চেনা যাচ্ছে রানাকে। হেডিং—'সড়ক দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু।' নিচে লেখা:

(নিজস্ব সংবাদদাতা)
গতকল্য বৃহস্পতিবার বৈকাল সাড়ে-ছয়টায় চন্দ্রার
নিকট, গাছের সহিত ধাক্কা খাইয়া একটি জাগুয়ার
গাড়ি, ই, বি, এ, ৪৭৮৪, সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত
হইয়া চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হইয়াছেন।
বেপরোয়া গতিতে গাড়িটি ঢাকা হইতে আসিতেছিল।
পথের উপর ক্রীড়া রত দুইটি বালককে
রক্ষা করতে গিয়া ডান দিকে কাটিয়া গাড়িটি
একটি গাছের সহিত ধাক্কা খাইয়া চুরমার হইয়া

যায়। নিহত চালক জনাব মাসুদ রানা ঢাকার
ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং করপোরেশনের ম্যানেজার
ছিলেন। ময়না তদন্তের জন্য লাশ ঢাকা মেডিকেল
কলেজ হাসপাতালে আনয়ন করা হইয়াছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রানা ভাবল সত্যিই যদি ওর মৃত্যু ঘটত তাহলেও ঠিক এমনি নিরুত্তাপ ভাষায় লাইন ক'টা লেখা হত। তারপর ভুলে যেত সবাই ওর কথা। নতুন নতুন মানুষ আসত এই পৃথিবীতে—ঢেউয়ের পর ঢেউ আসত নতুন জেনারেশন—হাজার হাজার বছর পার হয়ে যেত। তেমনি চাঁদ উঠত আকাশে দুনিয়াটাকে স্নিগ্ধ আলোয় মায়াময় করে দিয়ে, তেমনি সাগর দুলত আবেগে, মাতাল হাওয়া এসে নিবিড় করে তুলত বিরহ বেদনা। তরুণ তার স্বপ্নের রঙে রাঙিয়ে নিত এই ভুবন; যৌবনের গর্বে বুক ফুলিয়ে বলত 'আমি ভালবাসি, ভালবাসি এই সুন্দর পৃথিবীকে।' তারপর একদিন সে-ও হারিয়ে যেত রানার মতন কালের অতলে। মানুষের জীবনটা কী!

মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে এসব বাজে চিন্তা দূর করে দিল মাসুদ রানা। যতক্ষণ বেঁচে আছে অন্তত ততক্ষণ তো সে স্বেচ্ছাধীন। তার ইচ্ছের ঘোড়া যেদিক খুশি ছোটাতে পারে—কাল-মহাকালের থোড়াই পরোয়া করে সে! তারপর যা হবার হোক না, কে মানা করতে গেছে।

লাগাও ব্রেকফাস্ট। তারপর আবার প্লেন। পাহাড় পর্বত পেরিয়ে ব্যাঙ্কক।

ব্যাঙ্ককে কাস্টমস চেকিং শেষ হতেই বেরিয়ে এল রানা। মৃদু হেসে ভাবল, ওর অ্যাটাচি কেসটা দেখলেই হয়েছিল কাজ। পঞ্চাশটা একশো ডলারের কড়কড়ে নোট ছিল একটা চোরা পকেটে। কাউকে না জানিয়ে এগুলো এনেছে সে হোম ডেলিভারি স্কিমে এক বন্ধুর জন্যে কিছু শখের জিনিস কিনে পাঠাবে বলে।

'মিস্টার মাসুদ রানা?' গগলস আঁটা এক ভদ্রমহিলা কাছে এসে দাঁড়াল। বয়স ছাব্বিশ সাতাশ হবে। গায়ের রঙ রীতিমত ফর্সা। চমৎকার স্বাস্থ্য। বোধহয় অ্যাংলো-থাই হবে। নাক মুখের চেহারা অপূর্ব বলা যাবে না। চীনা টাইপ। কিন্তু চমৎকার একপাটি ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল মেয়েটি।

'ইয়েস।'

'দিস ইজ ক্যাথি ডেভন। গ্ল্যাড টু মিট ইয়ু।'

'গ্ল্যাড টু মিট ইয়ু,' উত্তর দিল রানা।

'আপনার জন্যে গাড়ি তৈরি। আসুন আমার সঙ্গে। ব্রিস্টল হোটেলে আপনার জন্যে রুম রিজার্ভ করা আছে। মি. ক্রিয়াং শ্রীসানান জরুরী কাজে সায়গন গেছেন। আমার ওপর আপনার ভার পড়েছে। আশা করি প্লেনে সময়টা ভালই কেটেছে।'

'নাহ্। খুব খারাপ! পাহাড়গুলোর ওপর দিয়ে আসবার সময় এত বাম্প করেছে যে মাথাটা ঘুরছে এখনও। ভাবছি পায়ে হেঁটে দেশে ফিরব।'

'আপনার দুর্ভাগ্য। আজ বোধহয় আবহাওয়া কিছু গোলমাল করেছে। সাধারণত এমন অনুযোগ শোনা যায় না।'

একটা স্যাণ্ড বীজ কালারের এইট-ফিফটি ফিয়াট দাঁড়িয়ে ছিল, ড্রাইভিং সীটে

বসে ভেতর থেকে ওপাশের দরজাটা খুলে দিল ক্যাথি ডেভন। ছোটখাটো টু-ডোর গাড়িটা বেশ পছন্দ হলো রানার। উঠে বসল পাশের সীটে। গাড়ির ওই সীটটাকে ডেথ সীট বলে—কোন এক আমেরিকান ম্যাগাজিনে পড়েছিল। একটু মুচকে হাসল রানা।

পাকা হাত মেয়েটির। যখন ডান দিকে মোড় ঘুরবে তখন ঠিক ডানদিকেই সিগন্যাল দিচ্ছে; বেশিরভাগ মেয়ে ড্রাইভারের মত বাঁয়ে সিগন্যাল দিয়ে ডাইনে ঘুরছে না। কাজেই নিশ্চিন্ত মনে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে চলল রানা। পীচ ঢালা রাস্তা দিয়ে বেশ কয়েক মাইল গিয়ে শহরে ঢুকল গাড়ি। একেবারে বাংলাদেশের মত দেশটা। কিন্তু অনেক দ্রুত এখানকার জীবন-যাত্রা। শহরের মধ্যে অসংখ্য খাল—ফলে, অসংখ্য কালভার্ট। প্রচুর আমেরিকান মুখ দেখা গেল। সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে এটা ওটা চেনাতে চেনাতে এগিয়ে চলল ক্যাথি ডেভন। চারতলা ব্রিস্টল হোটেল। তিনতলায় রানার ঘর।

'বিকেলে আমাদের মেক-আপ ম্যান এসে আপনার চেহারা পাল্টে দিয়ে ফটো তুলে নিয়ে যাবে। মি. ক্রিয়াং শ্রীসানান সব ব্যবস্থা করে গেছেন। কাল আপনার নতুন পাসপোর্ট পেয়ে যাবেন দশটার ভেতর। আপনি আপনার ঘরে বিশ্রাম নিন। টেলিফোন আছে, যা লাগবে রুম-সার্ভিসে বলে দেবেন, সোজা আপনার ঘরে চলে আসবে।'

'দুপুরের লাঞ্চটা কোথায় সারা যায় বলুন তো? আসুন না এক সঙ্গেই লাঞ্চ করা যাক?' রানা বলল।

একটু ইতস্তত করে ক্যাথি বলল, 'ঠিক আছে। আমি ক'টা কাজ সেরে চলে আসছি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে।'

ক্যাথি ডেভন চলে যেতেই রানা স্নান সেরে নিল। ইজি চেয়ারে শুয়ে এক কাপ কফি অর্ডার দিয়ে আবার বাংলা কাগজটা খুলল। চুরি, নৃশংস ভাবে স্ত্রী-পুত্র হত্যা, মোহামেডান স্পোর্টিং-এর ৩-০ গোলে জয়লাভ, ভিয়েৎকং সৈন্যদের গুলিতে তিনটি মার্কিন বিমান ভূপাতিত, প্রেসিডেন্টের পিণ্ডি প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি শেষ করে বিজ্ঞাপনগুলোর ওপর কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে আর একবার নিজের মৃত্যু-সংবাদটা পড়ল। হাসি পেল ওর।

এনামুল হক নিশ্চয়ই এতক্ষণে ইদু মিয়ার কাছ থেকে খবর পেয়ে টয়োটা করোনার কাজ শুরু করে দিয়েছে। রাহাত খান মোটা হাভানা চুরুট ধরিয়ে কাজে মগ্ন। রেহানা রানার অবর্তমানে রানার সহকর্মী জাহেদ ইকবালের ডিক্টেশন লিখছে শর্ট হ্যাণ্ডে। পলাতক কবীর চৌধুরীর মনটা খারাপ হয়ে যাবে নিজ হাতে রানাকে শেষ করতে পারল না বলে। চিটাগাং-এর আবদুল হাই, কুষ্টিয়ার সোহেল এরা চমকে উঠবে। ভাববে—আহা, ব্যাটা নেহাত খারাপ লোক ছিল না। জয়দ্রথ মৈত্র ঠোঁটের কোণের ঘা চেটে নিয়ে হাসবে তার বীভৎস হাসি। আর মিত্রা? দুঃখ পাবে? খুশি হবে?

মিত্রার মনের অবস্থাটা ঠিক কল্পনা করতে পারল না রানা। ওর জটিল মনের মধ্যে রানার জন্যে কতখানি দুর্বলতা আছে তা জানা সম্ভব হয়নি রানার পক্ষে। দেশ-প্রেম ওর কাছে অনেক বড়। হিন্দুসমাজ সংস্কারের প্রতি গভীর অনুরক্তি, অথচ ভাল

লেগেছে এক বিদেশী মুসলমানকে। রানার মৃত্যু সংবাদে হয়তো মিত্রা হাঁফ ছেড়ে বেঁচে যাবে। নিজের দেশ, নিজ আত্মীয়স্বজন, সমাজ, এতদিনকার মজ্জাগত সংস্কার, সব ত্যাগ করে নতুন জীবনে ঝাঁপ দেয়ার দ্বন্দ্ব থেকে তো অন্তত মুক্তি পেল।

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে রানা ভাবল মানুষের কাজ না থাকলে বোধহয় এসব বেহুদা চিন্তা মাথার মধ্যে কিলবিল করে। সে এসব কি ভাবছে? জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল সে আনমনে।

'ব্যাক গিয়ারটা কোন্ দিকে?' ড্রাইভিং সীটের নিচে লিভারটা ডান দিকে চাপ দিয়ে সীটটা কয়েক ইঞ্চি পিছিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'অন্যান্য গিয়ার জানেন তো? ব্যাক হচ্ছে চেপে নিচু করে ফোর্থ গিয়ার।'

সাঁ করে বেরিয়ে গেল রানা হোটেল থেকে ক্যাথি ডেভনকে নিয়ে।

'লাঞ্চের আগে আমি একটু বাসা হয়ে যেতে চাই। বাড়ির কাউকে বলা হয়নি, ওরা অপেক্ষা করবে। দু'মিনিট লাগবে আমার।' লজ্জা পেল ক্যাথি একটু।

'তাতে কি আছে—চলুন না। আপনি শুধু ডাইনে-বামে বলে দেবেন। বাড়িতে টেলিফোন নেই বুঝি?'

'না, এখন আর নেই। এখন আমরা খুব গরীব হয়ে গেছি।'

'গাড়িটা আপনার না?'

'আমার হবে কেন? অফিসের। আমার হলে তো এক্ষুণি বেচে দিতাম।'

'কেন?'

চট করে অন্য কথায় চলে গেল ক্যাথি। রানা বুঝল ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা ঠিক হয়নি। পাঁচ মিনিট পর একটা সরু গলির ভিতর ঢুকল গাড়িটা। একটা পুরানো ইঁট বের করা, প্লাস্টার খসে পড়া বাড়ির সামনে থামল গাড়ি। রাস্তার পাশে কল থেকে পানি নেবার জন্যে লাইন লেগে গেছে। বালতি-হাতে একটা ছোট্ট অর্ধ-উলঙ্গ মেয়েকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল ক্যাথি, 'বাবা কি করছে রে? মেজাজ কি রকম?'

'এই রকম!' চোখ মুখ পাকিয়ে একটা ভঙ্গি করে খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি। তারপর অবাক, বিস্ফারিত চোখে রানাকে দেখতে থাকল। অপলক দৃষ্টি।

'আমার বোন,' বলল ক্যাথি রানাকে। 'আপনি গাড়িতে বসুন এই ইলেকট্রোফ্যানটা ছেড়ে দিয়ে, আমি এক্ষুণি আসছি।'

'আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন না?'

একটু ইতস্তত করল ক্যাথি, তারপর ডাকল।

নোংরা ঘর। মেঝেটা খাওয়া খাওয়া। খুবই সস্তা দরের কয়েকটা কাঠের চেয়ার, তাও আবার কোনটার হাতল ভাঙা, কোনটার পা মচকানো। একটা ময়লা পর্দা ঝুলছে দরজায়।

হঠাৎ সেই দরজা দিয়ে একটা ইনভ্যালিড চেয়ারে বসে এক হাতে চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে একজন বৃদ্ধ এসে ঢুকল ঘরে। ক্যাথি পরিচয় করিয়ে দিল বাবার সঙ্গে। এক ফোঁটা হাসি নেই বৃদ্ধের মুখে। গম্ভীর মুখে তীক্ষ্ণ দুটো সন্দেহপূর্ণ চোখ মেলে আপাদমস্তক লক্ষ করল বৃদ্ধ রানাকে। রানার পরিচয় যে সে একবিন্দু বিশ্বাস

করল না তা স্পষ্ট বোঝা গেল। অস্বস্তি লাগছে রানার। ক্যাথি বলল, 'আমরা দুপুরে বাইরে খাচ্ছি আজ, তাই বলতে এলাম।'

হঠাৎ বৃদ্ধ পরিষ্কার ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল ক্যাথিকে, 'এতক্ষণ এই লোকটার সঙ্গে ছিলে তুমি? একে চেনো তুমি যে বিয়ে করতে যাচ্ছ?'

চমকে উঠল রানা। ফ্যাকাসে হয়ে গেল ক্যাথি ডেভনের মুখ। শুধু বলল, 'বাবা!'

'ন্যাকামী কোরো না। ভেবেছ আমি কিচ্ছু টের পাই না? শয়তান মেয়ে! বিয়ের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছ! বাপ-মা-ভাই-বোন কিচ্ছু না? দূর হ তুই আমার বাড়ি থেকে। তোর টাকা না খেলেও চলবে আমার।' এবার রানার দিকে অগ্নি-দৃষ্টি ফেলল বৃদ্ধ, 'আর তুমি, হারামজাদা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছ? জামাই হতে এসেছ? মনে করেছ কোলে বসিয়ে দুই গালে চুমু দেব সকাল-বিকেল? জানো, তোমাকে পুলিসে দেব আমি! বদমাইশ, সর্বনাশ করতে এসেছ আমাদের!'

দুই হাতে চোখ ঢেকে কেঁদে ফেলল ক্যাথি। এমন সময় একজন প্রৌঢ়া থাই ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকল। রানা এবং ক্যাথির দিকে এক নজর চেয়েই ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়ে বলল, 'অ্যাই, আবার তুমি বাইরের ঘরে এসেছ?' ইনভ্যালিড চেয়ারটা ঠেলে পাশের ঘরে নিতে নিতে রানার দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি দয়া করে কিছু মনে করবেন না, মি...'

রানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল বুড়ো চিৎকার করে বলছে, 'সবাই জোচ্চোর, সব শয়তান! আমি এদের চিনি না মনে করেছ? এখন আমাদের কি অবস্থা হবে? বিয়ে করলে আর টাকা দেবে ক্যাথি?'—গলাটা ভেঙে গেল। কাঁদতে আরম্ভ করল বৃদ্ধ। 'এত বড় সংসার নিয়ে এবার পানিতে ভাসলাম রে...'

মহিলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'চুপ করো! আহ্ চুপ করো তো, লক্ষ্মী। ক্যাথি বিয়ে করছে কে বললে তোমাকে? ছি ছি, ওই ভদ্রলোকের সামনে তুমি মেয়েটাকে কত বড় অপমান করলে বলো তো!'

'ভদ্দোরনোক! উহ্! পরিষ্কার ডাকাতের চেহারা। সে আবার ভদ্দোরনোক সাজতে এসেছে...'

রুমালে চোখ মুছে নিয়ে ক্যাথি বলল, 'মাফ করবেন, মি. রানা। আপনি গাড়িতে গিয়ে বসুন, আমি মাকে বলেই চলে আসছি।'

হতবাক রানা গাড়িতে গিয়ে বসল। ঠিক দু'মিনিটেই চলে এল ক্যাথি। লাবন্ লুয়াং রোডের রেইনবো হোটেলে ইংলিশ লাঞ্চ অর্ডার দিল রানা।

সুপের মধ্যে গোল মরিচের গুঁড়ো ফেলতে ফেলতে রানা বলল, 'আপনার বাবার এই অবস্থা কতদিন ধরে?'

'কি অবস্থা?'

'এই, মানে, একটু অপ্রকৃতিস্থতা...'

'আমার বাবা পাগল নন। উনি ভুগছেন সন্দেহ রোগে। আর এই রোগও আরম্ভ হয়েছে অল্পদিন ধরে। পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়ায় ওঁর মস্ত ব্যবসা বন্ধু-বান্ধব, পার্টনার আর কর্মচারীরা মিলে উচ্ছন্নে দিয়েছে। অনেক টাকা ধার হয়ে গেল

বাজারে। সেই থেকে সবাইকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছেন উনি। আমি আর আমার এক বোন উপার্জন করে সংসার না চালালে সবাই না খেয়ে মারা যাবে। তাই ওঁর সন্দেহ আমরা নিজের সুখের জন্যে স্বার্থপরের মত বিয়ে করে ফেলব, এবং সংসারে টাকা আসা বন্ধ হয়ে যাবে। সব সময় এ অবস্থা থাকে না। প্রত্যেক মাসের প্রথমে যখন টাকা তুলে দিই বাবার হাতে, বাবা তখন ছেলেমানুষের মত হাউ-মাউ করে কাঁদে। বলে—তোদের আমি নিংড়ে শুষে ছোবড়া বানিয়ে ফেলছি রে, ক্যাথি। দোহাই তোদের, আমাকে একটু বিষ এনে দে। আমি মরলেই তোরা সুখে সংসার বাঁধতে পারবি।' হঠাৎ সচকিত হয়ে ক্যাথি বলল, 'ছি ছি, আপনাকে এসব কি বলছি!'

'আমার কিন্তু শুনতে বেশ লাগছে। আপনার বাবা কি এদেশের…'

'উনি আইরিশ। আমার মায়ের প্রেমে পড়ে বিয়ে করে এখানেই সেট্‌ল্ করেছিলেন। তাই আমরা হয়েছি এক মিশ্র জাত। ধর্ম আমাদের ক্রিশ্চানিটি। সমাজে স্থান নেই। সবাই "অ্যাংলো" বলে মুখ বাঁকায়।'

'আপনার বোনও কি চাকরি করেন?'

'না সে নৃত্য-শিল্পী। ঠিক শিল্পী বলা যায় না। নেচে টাকা উপার্জন করে আর কি। কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলে আছে সে এখন। নেচে যা পায় খরচটা রেখে সব পাঠিয়ে দেয় বাবার কাছে। আমাদের বোধহয় প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা উচিত। এসব দুঃখের কথা আপনি শুনে কি করবেন?'

পুডিং শেষ হতেই কফি এল। কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে রানা বলল, 'আপনার ভবিষ্যৎ প্ল্যান কি?'

'ভবিষ্যতের চিন্তা একদম বন্ধ করে দিয়েছি।'

'কেন?'

'আমরা যে পাঁকে পড়েছি, এ থেকে বেরোতে আরও দশ বছর লাগবে। আমার বয়স কত জানেন? দেখলে অনেক কম মনে হয়, আসলে বত্রিশ। দশ বছর পর বয়স হবে বেয়াল্লিশ। তারপরেও কি আর কোন ভবিষ্যৎ থাকতে পারে মেয়েমানুষের? প্ল্যান করে লাভ আছে কোন? আমার জন্যে অনন্তকাল তো আর অপেক্ষা করতে পারবে না উইলিয়াম!'

'দশ বছর কেন?'

আমরা দু'বোন সমস্ত সংসার খরচের পর গড়পড়তা একশো ডলার করে জমাচ্ছি প্রতিমাসে। আড়াই বছরে তিন হাজার ডলার জমিয়েছি আমরা। যখন আরও বারো হাজার জমাতে পারব তখন আমাদের সব ঋণ শোধ হয়ে যাবে। এই রাস্তার ওপরেই আমাদের একটা ছয়তলা বাড়ি আছে। সেটা মর্টগেজ মুক্ত হয়ে যাবে। সে বাড়ির ভাড়াই মাসে এক হাজার ডলার—আবার বড়লোক হয়ে যাব আমরা। কিন্তু তখন আমাদের আর বয়স থাকবে না সে-সুখ উপভোগ করবার।' ম্লান হাসি ফুটে উঠল ক্যাথির পাতলা ঠোঁটে।

'আচ্ছা এতবড় দায়িত্বের বোঝা ইচ্ছে করলেই তো কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজে সুখী হতে পারেন আপনি। কেন আপনি নিজের জীবনটা…'

'ওকথা বলবেন না।' দুই হাতে কান ঢাকল ক্যাথি। 'ওকথা শোনাও পাপ।

অনেকে বলেছে, এমন কি উইলিয়ামও। ভুলেও যদি করে বসি একাজ—তাহলে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে আত্মহত্যা।'

'কোনও আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার পাওয়া সম্ভব নয়?'

'না। সে চেষ্টা করেছি।'

'তবে তো দেখছি আপনার সুখের সব দরজা বন্ধ।'

'হোটেলের দরজা তো আর বন্ধ নয়। বেলা অনেক হয়েছে। চলুন, আপাতত ওই দরজা দিয়ে বেরোনো যাক।' হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল ক্যাথি। রানার মনে পড়ল ঠিক এমনি করেই হাসে ক্যাথির দশ বছরের অর্ধ-উলঙ্গ দুষ্টু বোনটা। 'এবং ধন্যবাদ। আপনাকে সব কথা বলে নিজেকে অনেক হালকা লাগছে এখন।'

বিকেলে মেক-আপ ম্যান এসে আধ ঘণ্টা পরিশ্রম করল রানার মুখের ওপর। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অন্য একটা লোককে দেখতে পেল রানা। মোটামুটি মঙ্গোলিয়ান চেহারা দাঁড়িয়েছে।

'উঠিয়ে না ফেললে এই দাগ হপ্তাখানেক থাকবে। তারপর প্রয়োজন হলে আবার এক পোচ বুলিয়ে নেবেন। ক্যামিক্যালসের শিশি দুটো রেখে যাচ্ছি।' উঠে দাঁড়াল লোকটা। তারপর রানার একটা ফটো তুলে নিল। 'এটা পাসপোর্টে যাবে। আপনার নাম চরোসা থিরা। থাই আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল ইণ্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর।'

লোকটা বেরিয়ে যেতেই এসে ঢুকল ক্যাথি ডেভন।

'বাহ্, চমৎকার হয়েছে। এখন তৈরি হয়ে নিয়ে চলুন দেখি, আপনার জন্যে সুটকেস, জামা-কাপড়, সবকিছু নতুন করে কিনতে হবে। আপনার এই থ্যাবড়া সুটকেস ফেরত যাবে পাকিস্তানে।'

কাপড়চোপড়, জুতো-মোজা, টাই-টাইপিন, ইত্যাদি যাবতীয় জিনিসপত্র কিনে সন্ধ্যার সময় ফিরল ওরা হোটেলে। ক্যাথি চলে যাচ্ছিল কাল দেখা হবে বলে, কিন্তু রানা ওকে যেতে দিল না।

'আজ সন্ধেটা আমার সঙ্গে কাটাতে হবে, মিস ডেভন। কাল দশটার পর কোথায় আমি আর কোথায় আপনি। জীবনে আর দেখা হবে না। আমার অনুরোধটা দয়া করে ফেলবেন না।' রানার মুখে উজ্জ্বল হাসি।

অবাক দৃষ্টিতে রানার দিকে চাইল একবার ক্যাথি। নাহ্। কোন খারাপ মতলব আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। কি ভেবে রাজি হয়ে গেল। মুখে বলল, 'কিন্তু আটটার বেশি থাকতে পারব না। বাড়ির অবস্থা তো দেখেই এসেছেন।'

গাড়িতে উঠে রানা বলল, 'এখানকার সবচেয়ে নাম করা ক্যাসিনো কোনটা? সবচেয়ে উঁচু স্টেকে খেলা হয় যেখানে?'

ক্যাসিনো কথাটা বোধহয় বুঝল না ক্যাথি, কিন্তু উঁচু স্টেকে খেলার কথা শুনে বুঝল জুয়া খেলার কথা হচ্ছে। বলল, 'ডায়মণ্ড হাউস।'

'কোথায় সেটা?'

'সুরায়োং রোডে। আমি ঢুকিনি কখনও ভেতরে। কেন?'

'চলুন ডায়মণ্ড হাউসেই কাটাই আজ সন্ধেটা।'

*

বিরাট ক্যাসিনোর চকচকে মোজাইক করা মেঝে। এন্ট্রি ফি দিয়ে দোতলায় উঠে এল ওরা। চারদিকে নানান রকম খেলার ব্যবস্থা। সুন্দরী থাই মেয়েদের সঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় প্রচুর আমেরিকান বসে আছে। Chemin de fer এবং Caisse-র পাশ কাটিয়ে ওরা একটা কোণের খালি টেবিলে গিয়ে বসল। নিজের জন্যে একটা কোক এবং ক্যাথির জন্যে অরেঞ্জ স্কোয়াশ অর্ডার দিল রানা।

একটু সামনে ঝুঁকে রানা বলল, 'আমি একজন পাকা জুয়াড়ি। খুব খারাপ লোক, সন্দেহ নেই। কিন্তু আজ আমার খেলতে ভয় করছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি আজ আমার ভাগ্য সহায়তা করবে না। খেললে ঠিক হেরে যাব। আমাকে একটু সাহায্য করবেন আপনি?'

'আমি জীবনে এসব খেলিনি। তাছাড়া এসব পছন্দও করি না। চাকরি খোয়াবার ভয় না থাকলে কিছুতেই আপনার সঙ্গে এখানে ঢুকতাম না। এখন বলুন, কি সাহায্য করতে হবে।' একটু বিরক্তি ক্যাথির কণ্ঠে।

'খুব সোজা খেলা। আমার হয়ে আপনাকে একটু খেলতে হবে।'

'বললাম তো, আমি এসব খেলা জানি না।'

'আপনার কোন চিন্তা নেই। শিখিয়ে দেব। আমি যা বলব আপনি শুধু তাই করবেন। এই নিন চার হাজার ডলার। রুলেত খেলতে হবে আপনাকে।'

বিস্মিত ক্যাথি বলল, 'বাব্বা, এত টাকা! যদি হেরে যাই?'

'ব্যাপারটা আগে আপনাকে বুঝিয়ে বলি।' নোটগুলো ক্যাথি ডেভনের হাতে দিয়ে রানা বলল, 'এই টাকা আপনাকে ধার দিচ্ছি, কারণ ধার না দিলে আমার আজ রাতের মন্দ ভাগ্যের আওতা থেকে রেহাই পাবে না টাকাগুলো। আমরা, পাকা জুয়াড়িরা, সৌভাগ্য এবং মন্দ-ভাগ্যের অদৃশ্য হাত উপলব্ধি করতে পারি এক আশ্চর্য শক্তির বলে। এবং মেনে চলি। যেই ধার দিয়ে দিলাম, অমনি এই মুহূর্ত থেকে ওই টাকা আমার না। বুঝেছেন? কিন্তু যাতে হেরে গেলে ওই ধার আপনাকে আবার শোধ করতে না হয় সেজন্যে টাকাটা কোথায় কি ভাবে খেলতে হবে সেটা আমি আপনাকে বলে দেব। হারলে আমার দোষে হারবেন, আপনি দায়মুক্ত। বুঝতে পেরেছেন?'

'কত প্যাঁচ! জুয়াড়িদের নানান কুসংস্কার থাকে জানতাম—কিন্তু আপনার মধ্যেও…' হাসল ক্যাথি। 'বেশ, এখন বলুন কি করতে হবে।'

রুলেত টেবিলের সামনে অল্প লোকের ভিড় ছিল। রানা জিজ্ঞেস করল, 'এখানকার সবচেয়ে উঁচু স্টেক কত?'

'আনলিমিটেড! যত খুশি খেলতে পারেন।' নিরুৎসুক কণ্ঠে কাঠিহাতে লোকটা জবাব দিল।

'মিস ডেভন, টাকাগুলো ক্রুপিয়েই-এর (Croupier) কাছে দিয়ে কালোয় খেলুন।'

'সব একসঙ্গে?' অবাক হয়ে যায় ক্যাথি।

'হ্যাঁ, সব।'

চার হাজার ডলার দেখে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ক্রুপিয়েই-এর। চটপট গুণে

নিয়ে আড়চোখে দেখে নিল একবার রানাকে। নোটগুলো টেবিলের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ফেলে দিয়ে চল্লিশটা লাল 'প্লেক' নিয়ে কালো ঘরে রাখল। আরও কয়েকজন অল্প-স্বল্প স্টেক ধরল। টেবিলের তলায় হাত ঢোকাল একবার ক্রুপিয়েই, রানা বুঝল, কোথাও একটা বেল বেজে উঠল নিশ্চয়ই। যেন হাওয়ায় ভেসে দু'জন ষণ্ডা মত লোক এসে দাঁড়াল টেবিলের পাশে। ঘুরিয়ে দেয়া হলো থালাটা। হাতির দাঁতের ছোট্ট সাদা বলটা ছুটে বেড়াতে লাগল থালাময়।

রানা চেয়ে দেখল ক্যাথি একদৃষ্টে চেয়ে আছে থেমে আসা থালাটার দিকে। কি করে জানি রানা জানত, জয় অনিবার্য। মৃদু হাসল সে।

'থারটিন। ব্ল্যাক। লো অ্যাণ্ড অড্।' উঁচু গলায় বলল কাঠিধারী।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্যাথির চোখ। রানার দিকে চাইল সে। এক বস্তা লাল 'প্লেক' জমল ক্যাথির পাশে। মোট আশিটা হলো।

'আবার চল্লিশটা দিন কালোয়।'

কাঠি দিয়ে 'প্লেক'-গুলো কালোয় রাখা হলো একবার গুণে নিয়ে। আবার থেমে এল থালাটা। আশপাশে লোক জড়ো হতে আরম্ভ করেছে। হাতির দাঁতের বলটা এঘর ওঘর টপকে গিয়ে একটা ঘরে থামল।

'টোয়েনটি। ব্ল্যাক। হাই অ্যাণ্ড ইভেন।'

বাচ্চা মেয়ের মত আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল ক্যাথি ডের্ভন। অদ্ভুত এক অনাস্বাদিতপূর্ব উত্তেজনা অনুভব করছে সে। নেশায় পেয়ে বসেছে যেন ওকে। জিজ্ঞেস করল, 'এবার?'

'এই দানটা আমরা খেলব না,' বলল রানা। অবাক হয়ে ক্যাথি এবং ক্রুপিয়েই চাইল রানার দিকে। মাথা নাড়ল রানা। রানার ভেতর থেকে কে যেন বলে দিল, অপেক্ষা করো।

আশেপাশে সবার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল রানা। এতক্ষণ যারা দশ-বিশ ডলার খেলছিল, রানার জেতা দেখে তারাও স্টেক বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ-ত্রিশ, কেউবা পঞ্চাশ। জমে উঠেছে খেলা। লোকে ভিড় করতে আরম্ভ করল এই টেবিলে। আবার ঘুরল থালা।

থালা থামতেই রানা দেখল ছোট্ট বলটা পড়ল গিয়ে সবুজ দুটো ঘরের একটায়। বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল একবার। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে সে।

স্টিক্-ধারী চিৎকার করে বলল, 'ডাবল জিরো!' তারপর কালো-লাল সব ঘরের প্লেকগুলোই তুলে নিল টেবিল থেকে।

'এবার রেড,' রানা হাসল ক্যাথির দিকে চেয়ে।

'কত?' ডাবল জিরো দেখে ভয় ধরে গিয়েছে ক্যাথির। বুকের ভিতরটা ওর কেঁপে উঠল একবার রানা যখন বলল, চল্লিশ।

বেশ লোক জড়ো হয়ে গিয়েছে এবার। কানাঘুষো হচ্ছে ওদের নিয়ে। ক্যাথির হাত থেকে প্লেকগুলো নিয়ে লালে রাখল কাঠিধারী। আবার ঘুরল থালা। রানা টের পেল কিছু উৎসুক চোখ লক্ষ্য করছে ওর মুখ। নিরাসক্ত ভাবে চেয়ে রয়েছে থালার দিকে। কিন্তু ভিতর ভিতর একটু উত্তেজিত না হয়ে পারল না রানা। প্রতিবারই কি ভাগ্য তার সহায় হবে? এইবার খেলা কি উচিত হলো?

থালাটা যখন থেমে আসছে রানা দেখল কপালের ঘাম মুছছে ক্যাথি। হাত কাঁপছে তার। সেই মুহূর্তে আরেকবার ঘৃণা করল রানা জুয়া খেলাটাকে। এ এক কুৎসিত সংক্রামক ব্যাধি।

'থারটি-ফোর। রেড। হাই অ্যাণ্ড ইভেন।'

মৃদু গুঞ্জন উঠল আশেপাশে। লোভী দৃষ্টিতে সবাই চেয়ে দেখল গুণে গুণে আশিটা লাল 'প্লেক' ক্যাথির পাশে সাজিয়ে দিল ক্রুপিয়েই। মোট হলো একশো ষাটটা।

'ব্যস। চলুন,' রানা ডাকল ক্যাথিকে।

'আর খেলবেন না?'

'না।'

ক্যাথিকে নিয়ে ক্যাশিয়ারের কাউন্টারের দিকে এগোল রানা। ষোলোটা হাজার ডলারের নোট গুণে নিল ক্যাথি দুই তিনবার করে। তারপর সেগুলো কালো ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে আবার এসে বসল রানার সঙ্গে কোণের সেই টেবিলটায়। হাতের ব্যাগটা সযত্নে রাখল সে টেবিলের মাঝখানে।

নিজের জন্যে একটা কোক আর ক্যাথির জন্যে আরেকটা অরেঞ্জ স্কোয়াশ অর্ডার দিয়ে রানা বলল, 'আপনার কপালটা সত্যিই ভাল।'

'আমার কপাল মানে? খেললেন তো আপনি—আমি তো কেবল আপনার কথা মত কাজ করলাম।'

'যাই হোক, আপনার কপালেই তো হলো। এখন আমার চার হাজার ডলার শোধ করে দিন।'

'সবই আছে ব্যাগে। বের করে দেব?' ব্যাগে হাত দিল ক্যাথি।

'না। সব কেন? আমার টাকা আমাকে দিয়ে দিন। আপনি খেলে যা জিতেছেন—ও টাকা আপনার। আমাকে দেবেন কেন?'

অবাক হয়ে রানার চোখের দিকে চাইল ক্যাথি ডেভন। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেছে—চোখ দুটো বিস্ফারিত। কথাগুলো যেন ঠিক বুঝতে পারল না সে। বারো হাজার ডলার!

এ কী সম্ভব? বলল, 'যাহ্, ঠাট্টা করছেন!'

'ঠাট্টা নয়, সত্যি। বারো হাজার ডলার দরকার বলছিলেন না? সেই বারো হাজার আজ নিজেই উপার্জন করে নিলেন আপনি।'

বিস্মিত, বিমূঢ় ক্যাথি ধীরে ধীরে বুঝল কেন ওকে আজ এখানে নিয়ে এসেছে মাসুদ রানা। কেন জোর করে ওকে ধার দিয়েছে চার হাজার ডলার। তারপর যেন এটাকে সে অপরিচিত বিদেশীর অযাচিত দান বলে প্রত্যাখ্যান করতে না পারে সেজন্যে তাকে দিয়ে খেলানো হয়েছে সবটা খেলা। কথাটা ঠাট্টা নয়। তাকে দশ বছরের দুর্বিষহ দায় থেকে মুক্ত করে দিয়েছে ওই নিষ্ঠুর, দুর্ধর্ষ চেহারার পাকিস্তানী স্পাই। হঠাৎ এক অদম্য আবেগে উথলে উঠল ক্যাথির বুকের ভিতরটা।

টেবিলের কিনারা ধরে না ফেললে হয়তো পড়ে যেত ক্যাথি। দুই কনুই টেবিলের ওপর রেখে দুই হাতে দুই গাল ধরে নিজেকে স্থির রাখতে চেষ্টা করল সে। তারপর হঠাৎ দুই চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে

গিয়ে। টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল প্লাস্টিক ঢাকা টেবিলের ওপর হাতের তালু বেয়ে। একজন ওয়েটার তাই দেখে এগিয়ে আসছিল, হাতের ইশারায় তাকে সরে যেতে বলল রানা। এক মিনিটের মধ্যেই সামলে নিল ক্যাথি। চোখ মুছে নিয়ে বলল, 'মাফ করবেন। নিজেকে সামলাতে না পেরে এক বিশ্রী সীন ক্রিয়েট করলাম। কিন্তু কেন আপনি এটা করলেন? কেন আমার মত একটা নিঃস্ব মেয়েকে হঠাৎ এমন প্রাচুর্যে ভরে দিলেন? অদ্ভুত লোক আপনি। আপনি বুঝতে পারবেন না, মি. মাসুদ রানা, আমার কেমন লাগছে। এত টাকা সব আমার। বাবার কেমন লাগবে? উহ্! আর উইলিয়াম! বলতে বলতে আবার দুই বিন্দু জল নেমে এল গাল বেয়ে।

মৃদু হেসে কোকের গ্লাসে চুমুক দিল রানা। চেয়ে চেয়ে দেখল সে একটা বিদেশী মেয়ের উদ্বেগ, বিস্ময়, উত্তেজনা এবং আনন্দাশ্রু। তারপর ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, 'পৌনে আট। ওঠার সময় হলো। ওটুকু শেষ করে চলুন উঠে পড়ি।' বিল চুকিয়ে দিল রানা।

গ্লাসটা শেষ করে এক চিমটি লবণ তুলে মুখে ফেলল ক্যাথি ডেভন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন।'

হোটেলের সামনে রানাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল ক্যাথি দুই ডানা মেলে ভবিষ্যৎ সুখ-কল্পনায় ভাসতে ভাসতে। জীবনের সবক'টা দিন যদি এমনি সুখের হত!

ঘরে ঢুকেই রানা বুঝল, ওর অনুপস্থিতিতে কেউ এসেছিল ঘরের ভিতর। জিনিসপত্র যেমন রেখেছিল ঠিক তেমনটি আর নেই। খোয়া যায়নি কিছুই—কিন্তু সমস্ত জিনিসপত্র ঘেঁটেছে কে যেন। চোর হলে তো চুরি করত। তাহলে? ব্যাপারটা আবছাই থেকে গেল রানার কাছে।

রাতে, বিছানায় শুয়ে, রানা ভাবল মিত্রার কথা। কেন যে ঘুরেফিরে বারবার এই মেয়েটির ছবি ভেসে ওঠে মনের পর্দায় বুঝতে পারে না রানা। কেন অবসর পেলেই নিজের অজান্তে ওর কথা ভাবতে থাকে সে? দেখা হবে আর কোন দিন? কেন যে এমন হয়—হঠাৎ কেন এমন ফাঁকা লাগে? রানার জীবনে কোথায় যেন একটা মস্ত গলদ রয়ে গেছে। বুঝতে পারে না সে অনেক ভেবেও, ত্রুটি ঠিক কোন-খানটায়।

## দশ

৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

'ইওর অ্যাটেনশন, প্লীজ! প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজ অ্যানাউন্সেস দা ডিপারচার অভ ইট্স্ জেট ক্লিপার রাউণ্ড দা ওয়ার্লড সার্ভিস ফ্লাইট পি.এ. জেরো জেরো ওয়ান, টু রেঙ্গুন-ক্যালকাটা-কারাচী-বায়রুত-ইস্তাম্বুল-মিউনিখ-ফ্র্যাঙ্কফুট-লণ্ডন-নিউ ইয়র্ক। প্যাসেঞ্জারস আর রিকোয়েস্টেড টু বোর্ড দা এয়ারক্রাফট। থ্যাঙ্ক ইয়ু।'

চড়া পর্দার তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠ বিশটা লাউড-স্পীকার থেকে ছড়িয়ে পড়ল গোটা

এয়ারপোর্টে।

বহু ছাপ-ছোপ দেয়া পাসপোর্টটা ফেরত পেয়ে প্যাসেঞ্জারস লাউঞ্জের দিকে এগোল রানা। প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন প্যাসেঞ্জার। রানা খেয়াল করল, একজন যাত্রী ওকে লক্ষ করছে সামনে ধরা খবরের কাগজের আড়াল থেকে, আড়চোখে। আনমনে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। লোকটার হাতে ধরা কাগজটার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল সে। তেসরা তারিখের একটা পূর্ব-পাকিস্তানী কাগজ। রানার দুর্ঘটনার খবরটা পড়ছে লোকটা মনোযোগ দিয়ে। মাটিতে রাখা একটা অ্যাটাচি কেসের গায়ে লোকটার নাম পড়ল রানা—টি.আর. পট্টবর্ধন।

নিশ্চয়ই ভারতীয়। টের পেয়ে গেল নাকি ওরা? ফ্লাইট ক্যান্সেল করে দেবে? সপ্তাহে তিনটে মাত্র ফ্লাইট—মঙ্গল, বিষ্যুৎ, শনি। আজ না গেলে ছ'তারিখের আগে পৌঁছতে পারবে না টিটাগড়। কিন্তু টের পাবে কি করে? অসম্ভব। এটা বোধহয় দৈব-সংযোগ। গত রাতে তার ঘরে লোক ঢোকার কথাও মনে পড়ল রানার। গোড়াতেই গলদ হয়ে গেল না তো? এই অবস্থায় কোলকাতায় যাওয়া কি নিরাপদ? ঘুরে দাঁড়াল চিন্তিত রানা। তারপর স্থির করল, এখন আর পিছিয়ে যাওয়া যায় না।

প্লেনে উঠবার সিঁড়িতে পা দিয়েই নিজের নাম, অর্থাৎ মি. থিরা শুনে থমকে দাঁড়াল রানা। দেখল ক্যাথি ডেভন আসছে পেছন থেকে দৌড়ে।

'ওই পট্টবর্ধন থেকে সাবধান। ও কিছু একটা সন্দেহ করেছে। খুব সাবধান! এখন সব কথা বলবার সময় নেই।' কাছে এসে নিচু গলায় কথাটা বলেই লোকটার দিকে ইঙ্গিত করল ক্যাথি। একটা রক্ত গোলাপের কুঁড়ি রানার কোটে লাগিয়ে দিল সে। তারপর বলল, 'আজকের ফ্লাইটটা ক্যান্সেল করতে পারেন না?'

'না, দেরি হয়ে যাবে। নেক্সট ফ্লাইট সাত তারিখে। অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

রানা লক্ষ করল ভিতর ভিতর কেন জানি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছে ক্যাথি।

'আপনি গ্র্যাণ্ড হোটেলেই উঠছেন না?'

'খুব সম্ভব।'

'ওই হোটেলেই আছে আমার বোন স্যালি ডেভন। আমার একটা চিঠি দেবেন তাকে দয়া করে?'

'নিশ্চয়ই। আর মি. শ্রীসানানকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। গুড বাই।'

'গুড বাই। ভায়া খণ্ডিওস।'

চিঠি নিয়েই রানা উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। রুমাল নাড়ল ক্যাথি। রানাও একটু হাত নেড়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। রানার ঠিক পেছনের সীটে এসে বসল টি.আর. পট্টবর্ধন। মাথায় একবোঝা দুশ্চিন্তা নিয়ে সীট বেল্ট বাঁধল মাসুদ রানা।

সুনীল সাগর পেরিয়ে এল রুপোলী নদী-নালার দেশ—শ্যামল বাংলা। নিচে সবুজ কার্পেট বিছানো। তারপর মহানগরী কলকাতা—ছোট ছোট ঘর বাড়ি, খেলনার মত ট্রাম-বাস, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, গড়ের মাঠ, মনুমেন্ট, হাওড়া ব্রিজের একাংশ।

ক্লিপার জেট নামল দমদম এয়ারপোর্টে। রানওয়ের ওপর দিয়ে ট্যাক্সিইং করে এসে একপাক ঘুরে দাঁড়াল প্রকাণ্ড প্লেনটা হ্যাঙ্গার এবং এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের

মাঝামাঝি জায়গায়। এয়ার কণ্ডিশন করা প্লেন থেকে বেরিয়েই অসম্ভব গরম লাগল রানার। রোদের মধ্যে এইটুকু পথ হেঁটে যেতে ঘাম দেখা দিল কপালে। পিছন পিছন এল পট্টবর্ধন।

মস্ত লাউঞ্জে গিয়ে বসল সবাই। মাল নামবে, কাস্টমস চেকিং হবে—বেশ অনেকক্ষণের ব্যাপার। ফাইভ ফিফটি-ফাইভের টিন থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল পট্টবর্ধন। বেশিরভাগ প্যাসেঞ্জারই একবার জেন্টস লেখা ঘর থেকে ঘুরে এল। রানা গেল না। এবং রানাকে চোখের আড়াল করবে না বলে পট্টবর্ধনও বসে রইল পায়ের ওপর পা তুলে। স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল রানা।

বেশ খানিকক্ষণ পর ডাক এল প্যাসেঞ্জারদের কাস্টমস-চেকিং রুমে যাবার জন্যে। সবাই যে যার ছাতা, লাঠি আর ব্যাগ নিয়ে উঠে পড়ল ছত্রভঙ্গ হয়ে। এবার রানা গিয়ে ঢুকল টয়লেটে। পরমুহূর্তেই এসে ঢুকল পট্টবর্ধন। বেচারা অনেকক্ষণ ধরে বোধহয় চেপে রেখেছিল। ভাবল এই সুযোগে দুটো কাজই সেরে নিই। নজর রাখাও হবে, আর···। ঢুকেই দেখল রানা দাঁড়িয়ে গিয়েছে জায়গা মত। আর জায়গা নেই দাঁড়াবার। কিন্তু ল্যাট্রিনের দরজাটা খোলা। প্রস্রাব ও পায়খানার আলাদা বন্দোবস্ত। আর চাপতে না পেরে ঢুকে পড়ল সে ল্যাট্রিনের মধ্যে।

এক মুহূর্ত দেরি না করে বাইরে থেকে বল্টু লাগিয়ে দিল রানা ল্যাট্রিনের। তারপর বেরিয়ে এল বাইরে। দেখল লাউঞ্জ খালি। বাইরের দরজাটাও বল্টু লাগিয়ে দিয়ে ভাবল জমাদার ব্যাটা তাড়াতাড়ি এসে না পড়লেই এ-যাত্রা রক্ষা পাওয়া যায়। দুম দুম করে ল্যাট্রিনের দরজায় বাড়ি মারার শব্দ শুনল রানা কান পেতে। নাহ্, কেউ খেয়াল করবে না। 'কাস্টমস' লেখা দরজা দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঢুকল রানা এবার।

'মি. চরোসা থিরা?' কাস্টমস্ অফিসার চাইল রানার দিকে।

'ইয়েস!'

রানার সুটকেসের ওপর লাগানো একটা লেবেল, ওর নামের নিচে 'ম্যানেজিং ডিরেক্টর' এবং তার নিচে 'আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল' ইত্যাদি শব্দগুলো চোখে পড়ল অফিসারের। ব্যস, আর ঝামেলা হলো না। দুটো স্ট্যাম্প ছিঁড়ে সুটকেস এবং অ্যাটাচি কেসে লাগিয়ে দিল। সাদা চক দিয়ে ক্রস এঁকে দিল দুটো।

'উইশ ইয়ু হ্যাপি স্টে, স্যার।'

'থ্যাঙ্ক ইয়ু।'

একটা পোর্টার তুলে নিল রানার সুটকেস মোটা বখশীশের লোভে। বিদেশী লোক, বেশি দেবে নিশ্চয়ই।

'ট্যাক্সি, স্যার?'

মাথায় পাগড়ি আর হাতে বালা পরা লম্বা চওড়া শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভার এসে দাঁড়াল যমদূতের মত। পোর্টারকে ড্রাইভারের সঙ্গে এগোবার জন্যে ইশারা করে রানা বলল, 'কিপ্ দ্যাট অন দ্য ব্যাক সীট।'

পকেট থেকে দুটো একশো ডলারের নোট বের করে ভাঙিয়ে ইণ্ডিয়ান কারেন্সি নিল রানা এয়ারপোর্টের ব্যাঙ্ক থেকে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়েই ভূত দেখার মত চমকে উঠল।

মিত্রা! ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের বিশেষ ড্রেস পরে একটা কাউন্টারের ওপাশে

বসে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে মিত্রা সেন। মিত্রা কি ছেড়ে দিল সিক্রেট সার্ভিস? হঠাৎ এই বেশ কেন? ওর ওপর নজর রাখবার জন্যে এই ভোল নেয়নি তো!

নিজের অজান্তেই মুখটা অল্প একটু হাঁ হয়ে গেছে মিত্রার। খুব চেনা চেনা লাগছে ওর এই লোকটাকে। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছে না কোথায় দেখেছে এর আগে। এই ফিগার, ঠিক এমনি ব্যাক ব্রাশ করা চুল, প্রশস্ত কপাল, ওই দৃষ্টি যেন তার অনেক চেনা। মাসুদ রানা! নিশ্চয়ই এ মাসুদ রানা!

এক মুহূর্তেই সামলে নিয়েছে রানা। না চেনার ভান করে অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিল সে, কাঁটা ঘুরিয়ে রিস্ট-ওয়াচটা ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের সঙ্গে মিলিয়ে নিল। তারপর এগিয়ে গেল গাড়ি-বারান্দার দিকে। হাঁটার ভঙ্গিটা একটু বদলে নিল সে। পেছনে ফিরে চাইল না আর একটিবারও।

কিন্তু চাইলে দেখতে পেত এক অবর্ণনীয় খুশিতে ঝলমল করে উঠল মিত্রা সেনের মুখ। চিনতে পেরেছে সে। ওই দৃষ্টি ভুলবার নয়। তাহলে বেঁচে আছে! চোখ বন্ধ করে দুই হাত তুলে কপালে ঠেকাল সে তার অদৃষ্ট দেবতার উদ্দেশে। দুই ফোঁটা জল ঝরে পড়ল তেসরা তারিখের একটা পূর্ব-পাকিস্তানী খবরের কাগজের ওপর।

চিড়িয়ামোড়, গানফাউন্ড্রী রোড, কাশীপুর রোড, ব্যারাকপুর ট্র্যাঙ্ক রোড, শ্যামবাজার, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, ধর্মতলা স্ট্রীট ধরে এঁকে বেঁকে এসে শিখ ড্রাইভার থামল চৌরঙ্গীর গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে। পিছনের সীটে বসে এতক্ষণে গোলাপের কুঁড়িটা পকেটে পুরেছে রানা, উল্টে পরেছে কোট, প্লেনের সব রকমের ট্যাগ ছিঁড়ে ফেলেছে সুটকেস এবং অ্যাটাচি কেস থেকে, টান দিয়ে চরোসা থিরার লেবেল উঠিয়ে ফেলেছে বাক্সের ডালা থেকে। অন্য মানুষ হয়ে বেরিয়ে এল সে গাড়ি থেকে।

সুন্দরী রিসিপশনিস্টের প্রচুর প্লীজ এবং থ্যাঙ্কিউ-র পর লিফটে করে উঠে এল রানা তেতলার একটা চমৎকার ডাবল-বেড রুমে। খ্রিস্টান নাম নিয়েছে সে এবার। মরিস রেমণ্ড। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর সেলস ম্যানেজার। এয়ারকুলারটা অন করে পোর্টারকে বখশীশ দিয়ে বিদায় করে দরজা লাগিয়ে একটা চেয়ারে এসে বসল। অতি দ্রুত চিন্তা করছে সে।

পট্টবর্ধন এতক্ষণে ছাড়া পেয়েছে নিশ্চয়ই। ধরা পড়ে গেছে রানা। তার থাই পাসপোর্টের আর কানাকড়ি মূল্যও নেই এখন। সে এখন একটা পাকিস্তানী স্পাই ছাড়া কিছু নয়। এখানে যদি ধরা পড়ে তাহলে কোন সাহায্য পাবে না সে স্বদেশ থেকে। সোজা অস্বীকার করবে পাকিস্তান ওর পরিচয়। জামার একটা বোতামে হাত বুলাল মাসুদ রানা। এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্যে পটাশিয়াম সায়ানাইড লুকোনো আছে বোতামটায়। সে তো অনেক পরের কথা। এখন কি করা যায়?

নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি হোটেলে খোঁজ নেয়া হবে চরোসা থিরা বলে কেউ উঠেছে কিনা। না পেলে সারা কলকাতার প্রত্যেকটি হোটেলে আজ যত লোক উঠেছে তাদের সবাইকে পরীক্ষা করে দেখবে ওরা। রানার চেহারার বর্ণনা দেয়া হবে প্রত্যেকটি হোটেলে, থানায় এবং ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ-এ। রানার ফটোগ্রাফ পাঠানো

হবে সব জায়গায়। শহরটা তছনছ করে খুঁজবে ওরা মাসুদ রানাকে। অবশ্য, সহজ হবে না, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া একটা মানুষকে খুঁজে বের করা কঠিন আছে। কথাটা ভেবে একটু আশ্বস্ত বোধ করল ও।

কিন্তু ধরা পড়ল কি করে? কোন্‌খানে ভুল করল সে? থাই ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশ এখন ওর দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত দাগ মুছে ফেলল রানা কেমিক্যাল্‌স দিয়ে। চরোসা থিরার পাসপোর্ট, ভিজিটিং কার্ড, প্লেনের টিকেট, ইত্যাদি সব চিহ্ন এক সঙ্গে জমা করে বাথরুমে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলল সে। এখন আর কোন আবরণ থাকল না, নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে টিকে থাকতে হবে। ধরা পড়লে হয় বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে প্রাণত্যাগ করবে, না হয় বোতাম তো আছেই। হঠাৎ মনে হলো, মিত্রা? এই অবস্থায় মিত্রা কোন সাহায্য করবে?

'ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্‌স? গুড আফটার নুন, ম্যাডাম। পুট মি টু এনকোয়্যারি কাউন্টার প্লীজ!'

'জাস্ট হোল্ড আ মোমেন্ট, স্যার। এনকোয়্যারী এনগেজড্‌।'

দশ সেকেণ্ড অধীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল রানা রিসিভার কানে ধরে। তারপর খটাং করে ও-ধারের রিসিভার তুলল মিত্রা সেন। গড় গড় করে আউড়ে গেল গৎ।

'ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস, এয়ারপোর্ট এনকোয়্যারী। গুড আফটার নুন।'

'চিনতে পারছ, মিত্রা?'

ধক করে উঠল মিত্রার বুকের ভিতরটা। সেই গলা! সত্যিই সে বেঁচে আছে? ভুল হয়নি তার।

'হ্যাঁ, পারছি।'

'কেমন আছ?'

'ভাল।'

'আমার ঠিকানাটা বলব?'

'না। এটা ওপেন লাইন।'

'কোথায় দেখা হবে?'

'পাঁচটায়। চিড়িয়াখানার সামনে।'

'কেবল তুমি থাকবে, না আশেপাশে তোমার বন্ধু-বান্ধবকেও আশা করব?'

'অবিশ্বাস কোরো না।'

'কারণ?'

'পরে বলব। অনেক কথা আছে, সব বলব। রাখলাম।' ছেড়ে দিল মিত্রা।

নীরব রিসিভারটা কান থেকে সরিয়ে একবার দেখল রানা, তারপর নামিয়ে রেখে সোজা ঘরে ফিরে গিয়ে লাঞ্চ অর্ডার দিল। 'মাটন'টা বাদ রাখল অর্ডার থেকে সযত্নে। 'মাটন' বলতে এরা বোঝে পাঁঠার মাংস—আর ওই গন্ধটা একদম বরদাস্ত করতে পারে না সে।

আবার চিন্তার ঘোড়দৌড় চলল রানার মাথার মধ্যে। কতক্ষণ? আর কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে ও? চব্বিশ ঘণ্টা? এর মধ্যেই হোটেল পরিবর্তন করতে হবে। প্ল্যান করে ফেলল সে কিভাবে এগোবে। কিভাবে ভুল নিশানা দিয়ে ওদের চোখে

ধুলো দেবে। কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো রানা।

স্নান সেরে খেয়ে নিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল সে দরজা বন্ধ করে। বিছানায় শুয়ে শুয়েই পিস্তলটা পরীক্ষা করে নিল একবার। তারপর বালিশের পাশে পিস্তলটা রেখে ওটার বাঁটের ওপর ডান হাত রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

রানা যখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে অনেকগুলো সরকারী ডিপার্টমেন্টে ইমার্জেন্সী অর্ডার এল। টেলিফোনের পর টেলিফোন চলতে থাকল সারা কলকাতা জুড়ে। মৌমাছির চাকে যেন ঢিল পড়েছে। অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠল এক শ্রেণীর কর্মচারী। ওয়্যারলেসে ইনফরমেশন গেল টিটাগড়। মাইক্রোবাস থেকে মোড়ে মোড়ে নামিয়ে দেয়া হলো এক-এক জোড়া সন্ধানী চোখ—হাতে বি-টু সাইজের একটা করে ফটো।

ঠিক সাড়ে চারটায় পাক্কা বিলেতী পরিচ্ছদ পরে বেরিয়ে এল রানা ঘর থেকে। চেহারাটা সামান্য পরিবর্তন করে নিয়েছে সে। হাতে দামী সানগ্লাস।

লিফটের দিকে না গিয়ে করিডর ধরে এগোল রানা সিঁড়ি ঘরের দিকে। বাম পাশে মোড় ঘুরে দেখল একটা মেয়ে ঘরে তালা দিয়ে রওনা হলো সিঁড়ির দিকে। প্রথমেই রানার মনে হলো ক্যাথি এখানে কেন। পর মুহূর্তেই বুঝতে পারল এ ক্যাথি নয়, তার বোন স্যালি ডেভন। ক্যাথির চাইতে দেখতে অবশ্য এ-অনেক ভাল, তবে দু'বোনে মিল আছে চেহারায়। চিঠিটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। পকেট হাতড়ে পেয়ে গেল। ওটা বের করে নিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল সে মেয়েটির দিকে।

'আপনি বোধহয় মিস স্যালি ডেভন! তাই না?'

রানার দিকে চেয়েই অসম্ভব চমকে উঠল মেয়েটি। বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি স্যালি। আর আপনি?'

'আমার নাম মরিস রেমণ্ড। সম্প্রতি ব্যাঙ্কক থেকে এসেছি। আপনার জন্যে চিঠি আছে।' স্যালির চোখের দৃষ্টিটা একটু অদ্ভুত লাগল রানার।

'কে দিয়েছে?'

'আপনার, বোন, ক্যাথি।'

চিঠিটা প্রায় থাবা দিয়ে কেড়ে নিল স্যালি রানার হাত থেকে। খাম ছিঁড়ে ওখানে দাঁড়িয়েই পড়তে আরম্ভ করল। থাই ভাষায় লেখা চিঠিটা। কিছুটা পড়ে রানার মুখের দিকে চাইল একবার। রানা চলে যাচ্ছিল পাশ কাটিয়ে। স্যালি ডাকল, 'শুনুন।'

'কিছু বলছেন?'

'একটু অপেক্ষা করুন দয়া করে।'

আধাআধি পড়েই চিঠিটা ভাঁজ করে বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়, আমার ঘরে চলুন।'

ঘরে এসে বসল ওরা দু'জন। চিঠি শেষ করে গভীর-চিন্তামগ্ন মুখে চুপচাপ বসে থাকল স্যালি ডেভন। কপালে ভ্রূকুটি। হঠাৎ আনমনে বলল, 'আমি একা এখন চেষ্টা করলে কি হবে? ভুল যা হবার হয়ে গেছে।'

'কোনও দুঃসংবাদ?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'না, দুঃসংবাদ আপনার। আপনার সামনে এখন ভয়ানক বিপদ মি. মাসুদ

রানা। হন্যে হয়ে খুঁজছে ওরা আপনাকে।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'এই চিঠি পড়ে। আমার বোন আপনার সর্বনাশ করেছে, মি. রানা। টাকার বিনিময়ে ব্যাঙ্ককের ইণ্ডিয়ান সিক্রেট এজেন্টের কাছে আপনার আসল পরিচয় বিক্রি করেছে। কিন্তু সেই সন্ধ্যাতেই আপনি আমাদের টাকার প্রয়োজন মিটিয়ে দিলেন চিরকালের মত। তার আগেই ও ভুল করে বসে আছে! আমাকে লিখছে আপনাকে সাহায্য করতে। কিন্তু আমি এখন একা কি করব...'

রানার মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল। ক্যাথি! ক্যাথি বিশ্বাসঘাতকতা করল? এই জন্যে ব্যাঙ্কক থেকে লোক লেগে গেছে ওর পিছনে। কেউ যেন রানার বুকে আমূল বসিয়ে দিয়েছে একটা ছুরি। ছাড়া যাবে না ওই পিশাচিনীকে। আরও কত লোকের সর্বনাশ করবে কে জানে। স্যালির শেষের কথাগুলো রানার কানের ভিতর ঢুকল না। উঠে দাড়াল সে। চট্ করে রানার হাত ধরল স্যালি।

'আমার বোনকে ক্ষমা করতে হবে, মি. রানা। আপনার হাত ধরে ক্ষমা চাইছি আমি আমার বোনের হয়ে। চাকরি ছেড়ে দিয়েছে ও...আর কারও ক্ষতি করতে পারবে না কখনও। আত্মগ্লানিতে মরছে এখন। টাকার আমাদের কত প্রয়োজন ছিল আপনি বুঝতে পারবেন না, মি. রানা। কত যে কষ্ট করেছি আমরা...' গলাটা ভেঙে এল। পানি বেরিয়ে এল দুই ফোঁটা। বিকৃত হয়ে গেল মুখটা কান্নায়।

টাকার প্রয়োজন, মনুষ্যত্ব, ন্যায়-নীতি, মূল্যবোধ, আর মানুষের খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার অধিকার, সব মিলেমিশে তালগোল পাকিয়ে গেল রানার মনের মধ্যে। শান্তভাবে হাতটা ছাড়িয়ে নিল স্যালির হাত থেকে। ভাবল কাউকে বিচার করবার অধিকার তার নেই। মানুষের হাজারো সমস্যার কতটুকু সে জানে, বিচার করবে বিচারক। সে কেবল দেখে যাবে। চোখের জলে নিভে গেল ক্রোধের আগুন।

'আপনি আমাকে দেখেই চমকে উঠেছিলেন কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনার ছবি দেখেছিলাম আমি আমার এক বন্ধুর কাছে। সারা কলকাতায় হাজারটা চোখ আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হোটেলে আজ রাতটা আপনি নিরাপদ। ভোর ছ'টা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত যে মেয়েটি কাউন্টারে থাকে সে ছাড়া আর কেউ আপনার খবর দিতে পারবে না ওদের। তার মধ্যেই আমি ভেবে দেখি কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

'ধন্যবাদ। তার দরকার হবে না।'

বেরিয়ে এল রানা ঘর থেকে। স্যালিও বেরোল পিছু পিছু। আঙুল দিয়ে স্যালিকে লিফটের দিকে যাবার নির্দেশ দিয়ে সিঁড়ি ঘরের দিকে চলে গেল রানা।

দেরি হয়ে গিয়েছে। সানগ্লাসটা পরে নিয়ে হাতের ইশারায় একটা ট্যাক্সি ডাকল রানা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে।

'আলীপুর। চিড়িয়াখানা।'

পিছনের সীটে বসে রানা ভাবছে, এইবার বোঝা গেল কি করে ওরা টের পেল তার সত্যিকার পরিচয়! এতক্ষণ কিছুতেই জটিল গ্রন্থিটা খুলতে পারছিল না সে। চারদিক থেকে আঁটঘাট বেঁধে নেমেছিল ও। হঠাৎ সব যেন ওলটপালট হয়ে গেল। খেলা মাত্র শুরু হয়েছে পন কে ফোর, পন কে ফোর, কিংস নাইট বিশপ থ্রী, কুইন্স্

নাইট বিশপ থ্রী, বিশপ নাইট ফাইভ, পন কুইন্স্ থ্রী—ব্যস আড়াই বছরের বাচ্চা মেয়েটা এসে উল্টে দিল যেন দাবার বোর্ড।

ঠিক সোয়া পাঁচটায় পৌঁছল রানা চিড়িয়াখানার গেটের সামনে। মিত্রা এসে দাঁড়াল। দুটো টিকেট কেটে রেখেছে সে। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিল রানা।

'দেরি হয়ে গেল একটু,' রানা লজ্জিত হলো।

'দেরি কোথায়? পাকিস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে পনেরো মিনিট আগেই পৌঁচেছ বরং। আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতাম, লোকে যে যাই ভাবুক না কেন।'

অনেক হাঁটল দু'জন। হরেক রকম রঙ-বেরঙের পাখি, বানর, বাঘ-ভালুক-সিংহ, জিরাফ, জেব্রা, হিপোপটেমাস্, গণ্ডার সব দেখে বসল গিয়ে ওরা নির্জন লেকের পারে পাথরের আসনে। লেকের ভিতর দ্বীপের মত জায়গাটায় লাল আর কালো ঠোঁটের রাজহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে অল্প জলে, আর থেকে থেকে শামুক তুলছে ডুবে ডুবে। এতক্ষণ দরকারী একটা কথাও হয়নি ওদের মধ্যে।

রানার বাঁ হাতটা তুলে নিয়ে কোলের ওপর রাখল মিত্রা।

'অনেক কথা বলবে বলেছিলে, কই একটা কথাও তো বলছ না?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'কথাগুলো গুছিয়ে নিতে পারছি না।'

'তুমি এয়ার লাইন্সে ঢুকলে কবে? আর ঢুকলেই যদি, এয়ার হোস্টেস্ হলে না কেন?'

'এয়ার হোস্টেস্? গ্ল্যামারের লোভে সব খোয়ানো আমার দ্বারা সম্ভব নয়। মামাকে ধরে জয়দ্রথের মুঠি থেকে বেরিয়েছি। নাচের স্কুলে মাস্টারি করতে পারতাম—আগেও ভরতনাট্যম আর কথক শিখিয়েছি আমি—কিন্তু ভাবলাম কিছুদিন এয়ার লাইনসের রিসেপশনে অপেক্ষা করব তোমার জন্য।'

'কেন? কিসের অপেক্ষা?'

'আমি জানতাম, তুমি আসবে, তোমার সাহায্য দরকার হবে।'

'তুমি সাহায্য করবে আমাকে? কেন?'

'এইজন্যে যে আমি তোমার উপকারের প্রতিদান দিতে চাই।'

'কাজটা দেশের বিরুদ্ধে হলেও?'

'হ্যাঁ। অনেক ভেবেছি আমি, রানা। আসলে দেশ বলে কিছু নেই, গোটা পৃথিবীটাই আমাদের দেশ।'

'বলো কি?' বিস্মিত রানা মিত্রার মুখের দিকে চাইল।

'হ্যাঁ। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ রানা। মনুষ্যত্বই বড় কথা। আমাকে রক্ষা করে তুমি সত্যিকার একজন মানুষের পরিচয় দিয়েছ।'

'সত্যি বলছ, মিত্রা?'

মৃদু হাসল মিত্রা। 'আমি এখন জানি, কোনরকম শুভেচ্ছা নিয়ে যাইনি আমরা পূর্ব-বাংলায়, গিয়েছিলাম ভয়ানক কোন ক্ষতি করতে।'

'কি ক্ষতি?'

'তা জানি না। তবে নিশ্চয়ই খুব খারাপ কিছু।'

সন্ধে হয়ে এসেছে। নিজের বিপজ্জনক অবস্থার কথা মিত্রাকে বলল রানা সব খুলে। বলল, আগামীকাল ভোরের ট্রেনে টিটাগড় যাচ্ছে সে। সব শুনল মিত্রা। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'যদি পারতাম, আটকে রাখতাম তোমাকে। কিছুতেই যেতে দিতাম না টিটাগড়ে। ওই দেয়ালের ওপাশে আমি যাইনি কখনও, তবে শুনেছি, যে যায় সে আর ফেরে না কোনদিন।'

'কী আছে ওখানে?'

'জানি না। জয়দ্রথ মৈত্রের সব চাইতে বিশ্বস্ত এক-আধজন ছাড়া বাইরের আর কেউ জানে না। যারা জানে তাদের বাইরে আসতে দেয়া হয় না। আমি জানতাম, পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব জোরদার করবার জন্যে আমাদের ওই সাংস্কৃতিক শুভেচ্ছা মিশন। কিন্তু কই, তাহলে কোনও মতে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে বাঁচলাম কেন আমরা? কি ছিল মৈত্র মশায়ের মনে, কতদূর সফল হলো সেই মিশন, তা তিনিই জানেন। আমি শুধু বলতে শুনেছি ওঁকে একবার—ওদিকের কাজ শেষ, এবার টিটাগড়ের প্রহরা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিতে হবে। অনেকগুলো অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানও ফিট করেছে ওরা এরিয়ার চারধারে।'

'তোমাকে বাড়ি ফিরতে হবে ক'টার মধ্যে?' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইল রানা।

'আজ ফিরব না বলে দিয়েছি মামাকে। বলেছি বান্ধবীর বাসায় যাচ্ছি।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে যদি ধরা পড়ো তবে তো কঠিন শাস্তি হয়ে যাবে তোমার।'

'হবে না। ধরা পড়লে তো। ধরাই পড়ব না।'

'আমার মনে হয়, এখুনি আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়া দরকার। নইলে পরে তোমার অনুতাপ হবে, নিজ দেশের...'

'শোনো, রানা। ব্যাপারটাকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি আমি এখন। আমি তো আসলে আমার দেশের কোন ক্ষতি করছি না—প্রতিবেশী একটা দেশকে এক হীন চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করছি। তোমরা তো আমার দেশকে আক্রমণ করতে যাচ্ছ না। আমার দেশের কয়েকটা খারাপ লোক মিলে যদি শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশীকে অন্যায় ভাবে পর্যুদস্ত করতে চায়, তাহলে পৃথিবীর নাগরিক হিসেবে সেটা বন্ধ করা আমার কর্তব্য নয়? অন্যায় যা, তা অন্যায়ই। নিজের দেশ অন্যায় করলে সেটা ন্যায় হয়ে যায় না।'

ঢং-ঢং করে ঘন্টা পড়ল। আটটা বাজে। আজকের মত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে চিড়িয়াখানা। বেরিয়ে এল ওরা।

ঠিক সোয়া আটটায় চিড়িয়াখানার গেটের পাশে একটা পাবলিক টেলিফোনে একটা বিশেষ নাম্বার ঘোরাল রানা। খটাং করে তুলল কেউ রিসিভার, কিন্তু কথা বলল না। হিশ্‌শ্‌ করে একটা একটানা শব্দ এল রানার কানে। আশেপাশে কেউ নেই, তবু গলাটা যতদূর সম্ভব খাদে নামিয়ে রানা বলল, 'মাসুদ রানা ইন ডেঞ্জার। সীক্‌স্‌ প্রোটেকশন অ্যাণ্ড হেল্‌প।' তাও কোন উত্তর নেই। আবার বলল রানা, 'আই রিপিট। মাসুদ্‌ রানা ইন ডেঞ্জার। সীক্‌স্‌ প্রোটেকশন অ্যাণ্ড হেল্‌প্‌।'

রেকর্ড হয়ে গেল রানার বক্তব্য। নামিয়ে রাখল রানা রিসিভার।

মিত্রাকে নিয়ে সোজা হোটেলে ফিরে এল রানা। দু'জনের কেউ লক্ষ করল না,

ওরা লিফটে উঠতেই একজন লোক দ্রুতপায়ে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল।

ঘরে বসেই ওরা খেয়ে নিল সাত কোর্সের ইংলিশ ডিনার। স্যালির সঙ্গে কয়েকটা দরকারী কথা বলবার প্রয়োজন বোধ করল রানা। কিন্তু সে তো এখন নাচ-ঘরে চলে গেছে। ওইখানেই দেখা করতে হবে ওর সঙ্গে। মিত্রা সেন ওসব নাচ দেখবে না বলে দিল পরিষ্কার। ওকে ঘরেই বসিয়ে ডান্সিং ফ্লোরের দিকে এগোল রানা। নাচের প্রথম সেশন আরম্ভ হচ্ছে তখন। টিকেট করে ঢুকে পড়ল সে ভিতরে। অনেক লোক জড়ো হয়েছে। দরজার কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসল রানা। বয় এসে দাঁড়াল পাশে। কোল্ড ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিয়ে চারধারে একবার চোখ বুলাল সে।

বারোশো বর্গফুট মত হবে চারকোনা ঘরটা। গোটা তিরিশেক টেবিল এলোমেলো ভাবে সাজানো। অনেক স্ত্রী-পুরুষ এসেছে জোড়ায় জোড়ায়। ছেলে-বুড়ো সব রকম মুখই দেখা যাচ্ছে। বিকৃত রুচির সমাবেশ। সবার সামনেই গ্লাস। গরম হয়ে নিচ্ছে সবাই নাচ আরম্ভ হবার আগে। একটা মুখও চিনতে পারল না দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। ভাবল মহানগরী কলকাতায় একজন লোককে খুঁজে বের করা কি এতই সোজা। স্যালির সাথে আরেকবার দেখা না করে টিটাগড়ের পথে রওনা হতে পারছে না রানা। নাচের বিরতিতে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

একজন উঠে দাঁড়াল ডান্সিং ফ্লোরের ওপর। একটা স্পট্ লাইট পড়ল তার মুখের ওপর—বাকি ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল।

'আজকের অনুষ্ঠানই কলকাতায় মিস স্যালির শেষ অনুষ্ঠান। আপনারা যাঁরা আজ শেষ বারের মত তাঁর নাচ দেখতে পাচ্ছেন তাঁদের ভাগ্যবানই বলব। আজ আবহ-সঙ্গীতে আছেন জোসেফ ফার্নাণ্ডিজ।'

আরেকটা স্পট্ লাইট পড়ল ভায়োলিন, চেলো, ট্রাম্পেট, মারাক্কাস ও ড্রাম বাদকের ছোট্ট একটি দলের ওপর। স্টেজের ডান পাশে গোল হয়ে বসেছে তারা বিচিত্র রঙচঙে কাপড় পরে। বৃদ্ধ গোয়ানিজ মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করল। 'ডুম' করে ড্রামের ওপর টোকা পড়ল একটা। মোলায়েম বাজনা এল কানে।

'এবার শুরু হচ্ছে নাচ। মিস স্যালি ডেভন ফ্রম ব্যাঙ্কক।'

ঘোষকের মুখের ওপর যে স্পট্ লাইটটা ছিল সেটা নিভে গেল। স্টেজের মাঝখানে এবার স্পট্লাইট পড়ল। কিছুই নেই সেখানে। আলোটা ধীরে ধীরে বেগুনী হয়ে গেল। যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল স্যালি ডেভন স্টেজের ওপর। ট্র্যাপ ডোরটা বন্ধ হয়ে গেল।

শুরু হলো নাচ।

মিত্রা সেনের ক্লাসিকাল নৃত্য নয়, তবে এ-নাচেরও পৃথক আবেদন আছে। ড্রাম, মারাক্কাস, ক্ল্যারিওনেট, ট্রাম্পেট, গিটার, বেহালায় পাশ্চাত্য সুর ও ছন্দ; আর স্যালির নৃত্যভঙ্গিমায় ফার-ইস্টের দোলা। কয়েক মিনিটেই মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলল সে দর্শকদের।

রানাও উপভোগ করছে, এবং অপেক্ষা করছে, নাচটা শেষ হলেই···

হঠাৎ একটা বজ্রকঠিন হাতের থাবা এসে পড়ল রানার কাঁধের ওপর। চমকে

সন্ধে হয়ে এসেছে। নিজের বিপজ্জনক অবস্থার কথা মিত্রাকে বলল রানা সব খুলে। বলল, আগামীকাল ভোরের ট্রেনে টিটাগড় যাচ্ছে সে। সব শুনল মিত্রা। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'যদি পারতাম, আটকে রাখতাম তোমাকে। কিছুতেই যেতে দিতাম না টিটাগড়ে। ওই দেয়ালের ওপাশে আমি যাইনি কখনও, তবে শুনেছি, যে যায় সে আর ফেরে না কোনদিন।'

'কী আছে ওখানে?'

'জানি না। জয়দ্রথ মৈত্রের সব চাইতে বিশ্বস্ত এক-আধজন ছাড়া বাইরের আর কেউ জানে না। যারা জানে তাদের বাইরে আসতে দেয়া হয় না। আমি জানতাম, পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব জোরদার করবার জন্যে আমাদের ওই সাংস্কৃতিক শুভেচ্ছা মিশন। কিন্তু কই, তাহলে কোনও মতে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে বাঁচলাম কেন আমরা? কি ছিল মৈত্র মশায়ের মনে, কতদূর সফল হলো সেই মিশন, তা তিনিই জানেন। আমি শুধু বলতে শুনেছি ওঁকে একবার—ওদিকের কাজ শেষ, এবার টিটাগড়ের প্রহরা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিতে হবে। অনেকগুলো অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানও ফিট করেছে ওরা এরিয়ার চারধারে।'

'তোমাকে বাড়ি ফিরতে হবে ক'টার মধ্যে?' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইল রানা।

'আজ ফিরব না বলে দিয়েছি মামাকে। বলেছি বান্ধবীর বাসায় যাচ্ছি।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে যদি ধরা পড়ো তবে তো কঠিন শাস্তি হয়ে যাবে তোমার।'

'হবে না। ধরা পড়লে তো। ধরাই পড়ব না।'

'আমার মনে হয়, এখুনি আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়া দরকার। নইলে পরে তোমার অনুতাপ হবে, নিজ দেশের...'

'শোনো, রানা। ব্যাপারটাকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি আমি এখন। আমি তো আসলে আমার দেশের কোন ক্ষতি করছি না—প্রতিবেশী একটা দেশকে এক হীন চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করছি। তোমরা তো আমার দেশকে আক্রমণ করতে যাচ্ছ না। আমার দেশের কয়েকটা খারাপ লোক মিলে যদি শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশীকে অন্যায় ভাবে পর্যুদস্ত করতে চায়, তাহলে পৃথিবীর নাগরিক হিসেবে সেটা বন্ধ করা আমার কর্তব্য নয়? অন্যায় যা, তা অন্যায়ই। নিজের দেশ অন্যায় করলে সেটা ন্যায় হয়ে যায় না।'

ঢং-ঢং করে ঘণ্টা পড়ল। আটটা বাজে। আজকের মত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে চিড়িয়াখানা। বেরিয়ে এল ওরা।

ঠিক সোয়া আটটায় চিড়িয়াখানার গেটের পাশে একটা পাবলিক টেলিফোনে একটা বিশেষ নাম্বার ঘোরাল রানা। খটাং করে তুলল কেউ রিসিভার, কিন্তু কথা বলল না। হিশ্‌শ্‌ করে একটা একটানা শব্দ এল রানার কানে। আশেপাশে কেউ নেই, তবু গলাটা যতদূর সম্ভব খাদে নামিয়ে রানা বলল, 'মাসুদ রানা ইন ডেঞ্জার। সীক্‌স্‌ প্রোটেকশন অ্যাণ্ড হেল্‌প।' তাও কোন উত্তর নেই। আবার বলল রানা, 'আই রিপিট। মাসুদ রানা ইন ডেঞ্জার। সীক্‌স্‌ প্রোটেকশন অ্যাণ্ড হেল্‌প্‌।'

রেকর্ড হয়ে গেল রানার বক্তব্য। নামিয়ে রাখল রানা রিসিভার।

মিত্রাকে নিয়ে সোজা হোটেলে ফিরে এল রানা। দু'জনের কেউ লক্ষ করল না,

ওরা লিফটে উঠতেই একজন লোক দ্রুতপায়ে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল।

ঘরে বসেই ওরা খেয়ে নিল সাত কোর্সের ইংলিশ ডিনার। স্যালির সঙ্গে কয়েকটা দরকারী কথা বলবার প্রয়োজন বোধ করল রানা। কিন্তু সে তো এখন নাচ-ঘরে চলে গেছে। ওইখানেই দেখা করতে হবে ওর সঙ্গে। মিত্রা সেন ওসব নাচ দেখবে না বলে দিল পরিষ্কার। ওকে ঘরেই বসিয়ে ডান্সিং ফ্লোরের দিকে এগোল রানা। নাচের প্রথম সেশন আরম্ভ হচ্ছে তখন। টিকেট করে ঢুকে পড়ল সে ভিতরে। অনেক লোক জড়ো হয়েছে। দরজার কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসল রানা। বয় এসে দাঁড়াল পাশে। কোল্ড ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিয়ে চারধারে একবার চোখ বুলাল সে।

বারোশো বর্গফুট মত হবে চারকোনা ঘরটা। গোটা তিরিশেক টেবিল এলোমেলো ভাবে সাজানো। অনেক স্ত্রী-পুরুষ এসেছে জোড়ায় জোড়ায়। ছেলে-বুড়ো সব রকম মুখই দেখা যাচ্ছে। বিকৃত রুচির সমাবেশ। সবার সামনেই গ্লাস। গরম হয়ে নিচ্ছে সবাই নাচ আরম্ভ হবার আগে। একটা মুখও চিনতে পারল না দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। ভাবল মহানগরী কলকাতায় একজন লোককে খুঁজে বের করা কি এতই সোজা। স্যালির সাথে আরেকবার দেখা না করে টিটাগড়ের পথে রওনা হতে পারছে না রানা। নাচের বিরতিতে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

একজন উঠে দাঁড়াল ডান্সিং ফ্লোরের ওপর। একটা স্পট্ লাইট পড়ল তার মুখের ওপর—বাকি ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল।

'আজকের অনুষ্ঠানই কলকাতায় মিস স্যালির শেষ অনুষ্ঠান। আপনারা যাঁরা আজ শেষ বারের মত তাঁর নাচ দেখতে পাচ্ছেন তাঁদের ভাগ্যবানই বলব। আজ আবহ-সঙ্গীতে আছেন জোসেফ ফার্নাণ্ডিজ।'

আরেকটা স্পট্ লাইট পড়ল ভায়োলিন, চেলো, ট্রাম্পেট, মারাক্কাস ও ড্রাম বাদকের ছোট্ট একটি দলের ওপর। স্টেজের ডান পাশে গোল হয়ে বসেছে তারা বিচিত্র রঙচঙে কাপড় পরে। বৃদ্ধ গোয়ানিজ মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করল। 'ডুম' করে ড্রামের ওপর টোকা পড়ল একটা। মোলায়েম বাজনা এল কানে।

'এবার শুরু হচ্ছে নাচ। মিস স্যালি ডেভন ফ্রম ব্যাঙ্কক।'

ঘোষকের মুখের ওপর যে স্পট্ লাইটটা ছিল সেটা নিভে গেল। স্টেজের মাঝখানে এবার স্পট্লাইট পড়ল। কিছুই নেই সেখানে। আলোটা ধীরে ধীরে বেগুনী হয়ে গেল। যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল স্যালি ডেভন স্টেজের ওপর। ট্র্যাপ ডোরটা বন্ধ হয়ে গেল।

শুরু হলো নাচ।

মিত্রা সেনের ক্লাসিকাল নৃত্য নয়, তবে এ-নাচেরও পৃথক আবেদন আছে। ড্রাম, মারাক্কাস, ক্ল্যারিওনেট, ট্রাম্পেট, গিটার, বেহালায় পাশ্চাত্য সুর ও ছন্দ; আর স্যালির নৃত্যভঙ্গিমায় ফার-ইস্টের দোলা। কয়েক মিনিটেই মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলল সে দর্শকদের।

রানাও উপভোগ করছে, এবং অপেক্ষা করছে, নাচটা শেষ হলেই···

হঠাৎ একটা বজ্রকঠিন হাতের থাবা এসে পড়ল রানার কাঁধের ওপর। চমকে

উঠল রানা। এক মুহূর্ত ফিরে এসেছে বাস্তব জগতে।

কানের কাছে মৃদু স্বরে কেউ বলল, 'দিস ইজ নো এনিমি, ব্রাদার—দিস ইজ এ ফ্রেণ্ড। ডেঞ্জার অ্যাহেড···'

## এগারো

৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

'···লেট্‌স্ গেট আউট।'

উঠে দাঁড়িয়েছিল রানা এক ঝটকায়। দেখল, কথাটা বলেই পেছন ফিরে দরজার দিকে এগোল ছায়ামূর্তিটা। রানাও বেরিয়ে এল লোকটার পিছু পিছু। দরজা দিয়ে বেরিয়ে আলোকোজ্জ্বল লাউঞ্জের দিকে না গিয়ে বারের পাশ দিয়ে অন্ধকার করিডর ধরে এগোল লোকটা। একবারও চাইল না রানার দিকে ফিরে।

'কে আপনি?' এগিয়ে গিয়ে এক থাবা বসাল রানা লোকটার কাঁধে।

'কোন কথা নয়, জলদি বেরিয়ে আসুন আগে।'

অল্প কিছুদূর গিয়েই ছোট একটা দরজা খুলে বেরিয়ে এল ওরা হোটেলের বামধারের সুইপার প্যাসেজে। রানা ভাবছে আর এগোনো ঠিক হবে কিনা। খশ্ করে ম্যাচের কাঠি জ্বালাল লোকটা। সেই আলোর সামনে একটা কাগজ ধরল। রানা পড়ল:

Lew Fu-chung
01633
Chinese Secret Service

লাফিয়ে উঠল রানার হৃৎপিণ্ড। এরাও তাহলে চোখ-কান খোলা রেখেছে! ফু-চুং-এর নাম সে শুনেছে বহুবার। কলকাতার চীফ এজেন্ট। কিন্তু তাকে বের করে আনল কেন?

কাগজটা পুড়িয়ে ফেলল ফু-চুং। জুতো দিয়ে মাড়িয়ে ছাইটা গুঁড়িয়ে দিয়ে ইশারায় এগোতে বলল রানাকে। কিচেনের পাশ দিয়ে মাথা নিচু করে পার হয়ে এল ওরা। বিরিয়ানী, কালিয়া কাবাব, চিকেন কারী, প্রন-কাটলেট, ফ্রায়েড এগ, কাঁচা পেঁয়াজ ইত্যাদি সব কিছুর গন্ধ মিলেমিশে একটা বোঁটকা গন্ধ এল নাকে। আরও কিছুদূর এগিয়ে মুখ খুলল লিউ ফু-চুং।

'আপনার ঘর এখন সার্চ হচ্ছে।'

'মিত্রা!' দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

'উনি এখন নিরাপদে আমাদের গাড়িতে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমি আর এগোচ্ছি না—এখান থেকেই আবার ব্যাক ডোর দিয়ে হোটেলে ফিরে যাব। ওদের কার্যকলাপ লক্ষ করা দরকার। আপনি গলি-দিয়ে বেরিয়ে বাঁ দিকে হাঁটতে থাকবেন। ঠিক পাঁচশো গজ দূরে দেখবেন রাস্তার ওপাশে একটা কালো সুপার ভক্সল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আপনি উঠে বসলেই আমার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাবে ড্রাইভার। আমি বাসায় টেলিফোন করে সব ইন্‌স্ট্রাকশন দিয়ে দিয়েছি। কোন

অসুবিধে হবে না আপনাদের। গুড্ লাক্।'

'সময় মত সাহায্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

উত্তর এল না কোন। ততক্ষণে পিছন ফিরে কয়েক পা এগিয়ে গেছে ফু-চুং। দ্রুত মিলিয়ে গেল সে অন্ধকারে।

গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল সুপার ভক্সল্। হোটেলের দিকে এক নজর চেয়েই চমকে উঠল রানা। ঠিক লাউঞ্জে ঢুকবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে জয়দ্রথ মৈত্র। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল সে এ-যাত্রা। আরও অনেক সাবধান হওয়া উচিত ছিল তার। মনে মনে নিজেকে কষে গোটা কয়েক চাবুক লাগাল রানা। শত্রুব্যূহের মধ্যে বুদ্ধির ঘোড়া আরও দ্রুত ছোটাতে হবে। বার বার আর ভাগ্য তাকে সহায়তা করবে না।

ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখল রানা আগাগোড়া সবটা ব্যাপার। খ্যাপা কুকুর হয়ে খুঁজছে তাকে এই দেশের এক মহা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। কি করবে সে এখন? ফিরে যাবে পাকিস্তানে? সব কথা শুনে রাহাত খান নিশ্চয়ই ওকে দোষারোপ করতে পারবেন না। কিন্তু খুশিও হবেন না। পরাজয়কে রাহাত খান ঘৃণা করেন। যে কাজে এসেছিল সেকাজ শেষ না করে কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াবে সে ওই অসমসাহসী তীক্ষ্ণধী বৃদ্ধের সামনে? আর একটু মাথা খাটালে নিশ্চয়ই কোন পথ বেরোবে কার্যোদ্ধারের। যাই ঘটুক না কেন, পালিয়ে যেতে পারবে না সে—অসম্ভব। কিন্তু এগোবে কোন্ পথে? প্রতি পদেই ধরা পড়বার ভয়। প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে ঢুকবে কি করে পাঁচিলের ভিতর? কোন বুদ্ধিই যে খেলছে না মাথায়। হেই, হ্যাট করে লেজে মোচড় দিয়েও নড়াতে পারছে না সে তার চিন্তার গরুর গাড়ি। ভাবনাটা দূর করে দিল রানা। মাঝে মাঝে এমন হয়—অনেক মাথা খাটিয়েও সমাধান পাওয়া যায় না। কিন্তু আপনিই একটা পথ বেরিয়ে যায় ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে।

মৃদু হেসে বাইরে চেয়ে রইল সে। দ্রুত অপসৃয়মাণ বাড়ি-ঘর দোকান-পাট আর লাল-নীল নিয়ন সাইনবোর্ড দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল ওরা পার্ক স্ট্রীট ধরে। আমীর আলী এভিনিউ ছাড়িয়ে গড়িয়াহাটায় পড়ল সুপার ভক্সল।

'অত ভেব না। আমি তোমাকে সাহায্য করব, রানা।'

চমকে উঠল গভীর চিন্তামগ্ন রানা। মিত্রার উপস্থিতি সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। নিজের অজান্তেই ডুবে গিয়েছিল চিন্তায়।

'না,' মিত্রার কাঁধে হাত রাখল রানা। 'তোমাকে আর এসবে জড়াতে চাই না।'

'তোমাকে বলেছি তো, আর কোন দ্বন্দ্ব নেই আমার। তোমার এই বিপদের সময় আমি কিছুতেই চুপচাপ বসে থাকতে পারব না। আমি বুদ্ধি বের করে ফেলেছি।'

'কি বুদ্ধি, মিত্রা?'

'কাল সকালে তোমার যাওয়া হবে না টিটাগড়। আমি নিয়ে যাব তোমাকে সন্ধ্যায়। কোন কথাই যখন শুনবে না, ঢুকবেই যখন তুমি ওই প্রাচীরের ভেতর, তখন যাতে ঢোকার আগেই ধরা না পড়ো তার ব্যবস্থা আমি করব।'

'তোমার সঙ্গে আমি গেলে তো!'

'কেন? যাবে না কেন?'

'আমার জন্যে কারও কোন বিপদ হোক, এটা আমি চাই না।'

'কিচ্ছু ঝুঁকি নেই। আমার মামার গাড়িতে যাব। গাড়ির সামনে ফ্ল্যাগ দেখলে কেউ ঠেকাতে সাহস পাবে না।'

'তুমি চাইলেই ওঁর গাড়ি পাবে? ওঁর নিজের কোন দরকার থাকতে পারে না?'

'উনি সন্ধের পরই জপে বসেন। অরবিন্দ ঘোষের চেলা। আজীবন ব্রহ্মচারী। স্বদেশী আন্দোলনের একজন পাণ্ডা ছিলেন। আমি ওঁর আদরের একমাত্র বোনঝি। ওসব তুমি ভেব না, গাড়ি পাব।'

মিনিট দশেক পর গাড়িটা থামাল মিত্রা। বলল, 'আমি এখানেই নামি। এই টেলিফোন নাম্বারটা রাখো, যখন ফোন করবে তখনই পাবে আমাকে। তুমি যেখানে বলবে সেখানেই গাড়ি নিয়ে হাজির থাকব।' একটু থেমে বলল, 'আর একটি কথা, দয়া করে অবিশ্বাস কোরো না আমাকে, প্লীজ।'

বালিগঞ্জে ছোট্ট একটা একতলা বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় এসে থামল গাড়ি। রানার ঘড়িতে তখন রাত এগারোটা। একজন চীনা মহিলা দরজা খুলে দিয়ে হেসে অভ্যর্থনা জানাল ওকে। সোনা বাঁধানো একটা দাঁত। মাথা ঝুঁকিয়ে হাতের ইশারায় রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেল ভিতরে। মোজাইক করা সুন্দর ঝক্‌ঝকে তকতকে একটা বেডরুমে ওকে বসিয়ে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। একটু পরেই রানার সুটকেস এবং অ্যাটাচি কেসটা এনে রাখল ড্রাইভার এক কোণে।

রানা ভাবছে, পি.সি.আই.-এর পাত্তা নেই কেন? কি হলো? আর চাইনীজ সিক্রেট সার্ভিসই বা এত খবর জানল কোত্থেকে? এখানে একই সঙ্গে কাজ করছে নাকি দুই দেশ?

মিনিট পনেরো পর ফু-চুং এসে ঢুকল ঘরে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। বলিষ্ঠ দেহ। চেহারা অনেকটা বাঙালীর মত। পরিষ্কার বাংলা বলে।

'ভাগ্যিস সময়মত মেসেজ পাঠিয়েছিলেন, মি. রানা। আর একটু দেরি হলেই কাজ হয়েছিল আর কি! কিন্তু আপনাকে স্পট্ করল কি করে ওরা? তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে দেখলাম? আর আপনিই বা টের পেলেন কি করে যে ধরা পড়ে যাচ্ছেন?'

সমস্ত ঘটনা ভেঙে বলল রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা খবর পেলেন কি করে?'

'ওহ্-হো! আপনি বুঝি জানেন না? গতরাতে আপনাদের পি.সি.আই.-এজেন্ট মোহাম্মদ আলী ধরা পড়ে গেছে দলবল সহ। এখন সে আই.এস.এস.-এর টরচার চেম্বারে। আমরা অপনাদের চীফের সঙ্গে কনট্যাক্ট করেছিলাম আজ। তাঁর কাছেই আপনার আগমন সম্পর্কে জানতে পারি—টেলিফোন নাম্বারটাও। ন'টার দিকে আপনার মেসেজ পেয়েই আমি ছুটেছিলাম গ্র্যাণ্ড হোটেলে। পি.সি. আই.-এর কাজ এখন আমরা টেক-আপ করেছি। যতদিন অন্য লোক না আসবে ততদিন আমাকেই চালাতে হবে।'

'হোটেলের অবস্থা কি রকম দেখলেন?'

'কি আবার? অপনাকে না পেয়ে একটু অবাক হয়ে গেছে ওরা, কিন্তু মোটামুটি

নিশ্চিন্ত আছে, ধরা আপনাকে যাবেই। 'H' সেই ডান্সারের সঙ্গে ঢুকল ওর কামরায়—আমি ফিরে এলাম।'

রানা বুঝল এই বন্ধুটির কাছেই স্যালি ডেভন ওর ছবি দেখেছে। তাই এক নজরেই চিনতে পেরেছিল আজ বিকেলে। জয়দ্রথের সঙ্গে স্যালি! হাসি পেল রানার।

'যাক, এখন আপনার প্ল্যান কি?' জিজ্ঞেস করল ফু-চুং।

'কাল যাচ্ছি টিটাগড়।'

'এত ঘটনার পরেও? নির্ঘাৎ ধরা পড়ে যাবেন। কোন লাভ নেই গিয়ে। আমি নিজে একবার দেখে এসেছি চারপাশ। অ্যাবসলিউট্লি ইন্‌ভাল্‌নারেবল্!' না সূচক মাথা নাড়ল ফু-চুং ঠোঁট উল্টে। 'অবশ্য আপনার কাজ, আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন। কিন্তু আমার মনে হয়...' —কথাটা আর শেষ করল না সে। হঠাৎ লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। 'আপনার বিশ্রাম দরকার। আর বিরক্ত করব না। কাল দেখা হবে। এখান থেকে ইচ্ছে করলেই আপনি আপনার চীফের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আমাকে বললেই ব্যবস্থা করে দেব। আচ্ছা, আসি। শুভরাত্রি।'

# বারো

৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

হিন্দুস্তান অ্যামব্যাসাডার-মার্ক টু। সিক্সটি ওয়ান মডেল। ফোর ডোর। থারটিন হানড্রেড নাইনটি নাইন সি. সি. বা ফোরটিন হর্স পাওয়ার। স্টিয়ারিং গিয়ার। ওয়ান পিস ফ্রন্ট সীট। ওয়াটার কুল্‌ড্ এঞ্জিন।

ভারতের তৈরি এই বেঢপ সাইজের কালো গাড়িটার চারধারে এক চক্কর ঘুরে দেখল রানা। মন্ত্রীত্ব লাভ করে মিত্রার মামাবাবু বোধহয় গাড়িটা পেয়েছেন সরকার থেকে। ছোট ভারতীয় পতাকা উড়ছে সামনে বনেটের ওপর। রানা বুঝল ডায়ালের ওপর '৯০' লেখা থাকলেও '৭৫'-এর এক ইঞ্চি বেশি যাবে না ঘণ্টায়। গ্যালনে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল যেতে পারে বড় জোর, যদি টিউনিং ঠিক থাকে। কার্টসি লাইটের বাল্‌বগুলো খুলে ড্যাশ বোর্ডে রেখে দিল রানা।

তৈরিই আছে রানা। ছোট্ট একটা ব্যাগে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে। দুটো ডেক্সেড্রিন ট্যাবলেট গিলে নিয়েছে আগেই। উঠে বসল সে গাড়ির পিছনের সীটে। ড্রাইভিং সীটে মিত্রা সেন। সাড়ে সাতটা বাজছে রানার রিস্টওয়াচে। উজ্জ্বল বাতি জ্বলে উঠেছে দোকানে দোকানে।

গড়িয়াহাটা—লোয়ার সার্কুলার রোড—শেয়ালদা—আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড—শ্যামবাজার—বেলগাছিয়া—পাইকপাড়া হয়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে পড়ল ওরা। এরপর কামারহাটি—পানিহাটি—সোদপুর—খড়দহ হয়ে টিটাগড়। একটি কথাও হলো না ওদের মধ্যে সারাটা রাস্তায়।

টিটাগড় ছাড়িয়ে আরও আধমাইল গিয়ে স্পীড কমাল মিত্রা। বাঁয়ে মস্ত এরিয়া জুড়ে উঁচু পাঁচিল দেখা গেল আবছা মত। নাগরদোলায় চড়ে নামবার সময়ে, বা প্লেন

এয়ার-পকেটে পড়লে যেমন লাগে তেমনি হঠাৎ শূন্যতা অনুভব করল রানা পাকস্থলীর মধ্যে। এই সেই নিষিদ্ধ এলাকা। বাঁয়ে মোড় নিল গাড়িটা।

প্রাচীরের বাইরে দু'শো গজ জায়গা ছেড়ে কাঁটাতার দিয়ে সমস্ত এলাকাটা ঘেরা। হাই ভোল্টের ইলেকট্রিসিটি দিয়ে সেই বেড়াকে দুর্ভেদ্য করা হয়েছে। এছাড়াও কাঁটাতারের বাইরে প্রতি বিশ গজ অন্তর-অন্তর রাইফেল হাতে প্রহরী। ভেতরে ঢোকার একটাই মাত্র পথ। একটা সাদা-কালো রঙ করা পোস্ট দিয়ে পথটা বন্ধ। দুই পাশে সেন্ট্রির ঘর। দুইজন গেটের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে। স্টেনগান হাতে। একটা বড় সাইনবোর্ডে লেখা:

PROHIBITED AREA
No Entry Without Pass

সাঁ করে এসে গেটের সামনে থামল গাড়ি। ফ্ল্যাগ এবং নাম্বার প্লেট দেখে স্যালিউট ঠুকল দুই প্রহরী। রেল গেটের মত উঠে গেল পোস্টের এক মাথা ওপর দিকে। ঢুকে পড়ল গাড়ি সীমানার মধ্যে। শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গিয়েছিল রানার, আবার হেলান দিয়ে বসল।

খোয়া বিছানো রাস্তার ওপর দিয়ে এগিয়ে গেল হিন্দুস্তান অ্যামব্যাসাডার। প্রায় দু'শো গজ অন্ধকার পথ। তারপর উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আসল এলাকা। মস্ত স্টীলের গেট ভিতর থেকে বন্ধ। কলিং বেল টিপলে বেরিয়ে আসবে প্রহরী। দুই ধারের প্রহরী-কক্ষের ফুটো থেকে চারটে মেশিনগান তৈরি থাকবে ওদের জন্যে। ওই গেটে মন্ত্রী হোক আর যে-ই হোক, ছাড়পত্র দেখাতে হবে। উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে হবে এবং উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে আগে থেকে কোন সংবাদ না দিয়ে এই হঠাৎ আগমনের। টেলিফোনে জয়দ্রথের অনুমতি আসবে। তারপর খুললেও খুলতে পারে সুরক্ষিত প্রকাণ্ড গেট।

'হেড লাইট নিভিয়ে দাও, মিত্রা।' গজ পঞ্চাশেক থাকতে বলল রানা। এবার ডান দিকে মাঠের মধ্যে দিয়ে নিয়ে চলো।

লাইট নিভিয়ে দিতেই চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। পেছন ফিরে দেখল রানা কেউ লক্ষ্য করছে কিনা। না। সেন্ট্রি দু'জন পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে ওদের দিকে পিছন ফিরে। ডান দিকে মাঠের মধ্যে নেমে গেল গাড়ি। ঠিকমত গ্রিজ দেয়া নেই, তাই ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট সাসপেনশন্ থেকে স্বাধীন ভাবে নানান স্কেলে ক্যাঁচকুঁচ শব্দ উঠল অসমান জায়গায় চাকা পড়ায়।

একটা ইউক্যালিপ্টাস গাছের পাশে দেয়াল ঘেঁষে থামল মিত্রা।

ব্যাগটা আগেই ঝুলিয়ে নিয়েছিল কাঁধে, এবার একলাফে নেমে এলো রানা গাড়ি থেকে। মিত্রাও নামল। বিশফুট উঁচু দেয়াল। হুক লাগানো দড়িটা ছুঁড়ে দিল রানা দেয়ালের মাথায়। খটাং শব্দ করে আটকে গেল সেটা।

'কাল ঠিক আটটার সময় আবার আসব আমি এখানে। দড়ি ফেলব ওধারে। পনেরো মিনিট অপেক্ষা করব। যদি বেঁচে থাকো তবে এই জায়গাটায় ফিরে এসো কাজ শেষ হয়ে গেলে।'

'সেটা ঠিক হবে না, মিত্রা। আমি বেরোবার অন্য কোন পথ বের করে নেব। তুমি আর এসো না। তোমার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে...'

'আমি আসব। তুমি বারণ কোরো না, রানা, বন্ধুত্বের অমর্যাদা কোরো না।'

'বেশ, এসো। আর এখন ফেরার পথে ওই গেটটায় কলিং বেল টিপে তোমার মামা এখানে এসেছিলেন কিনা জিজ্ঞেস করে যেয়ো। তাহলে হঠাৎ আজ এখানে আসার ব্যাপারে সন্দেহ করবে না কেউ। কাল আবার আসার পথ পরিষ্কার থাকবে।'

বিদায় নিয়ে তরতর করে রশি বেয়ে উঠে গেল মাসুদ রানা। দেয়ালের ওপর উঠে মুক্ত বাতাস লাগল ওর চোখে-মুখে। একটা আলো এগিয়ে আসছিল ডান ধার থেকে। সর্চ লাইট। দেয়ালের ওপর দেহটা সাঁটিয়ে পড়ে থাকল রানা। পার হয়ে চলে গেল তীব্র আলোটা। সতর্ক দৃষ্টিতে চাইল রানা ভিতরের দিকে। এখানে-ওখানে বাতি দেখা যাচ্ছে, কাঁকর বিছানো রাস্তাটা গেট দিয়ে সোজা ঢুকে কিছুদূর গিয়ে বাঁয়ে ঘুরেছে। এদিকটা অন্ধকার। নিচে কি আছে বোঝা গেল না ঠিক। বেশ অনেকটা দূরে পাকা দালান দেখা যাচ্ছে। রশিটা ভিতর দিকে এনে হুকটা উল্টো করে দিল রানা। তারপর নেমে গেল ভিতরে।

শক্ত মাটিতে পা ঠেকতেই রশিটা ছুঁড়ে ওপারে পাঠিয়ে দিল রানা। আধ মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কান পেতে শুনল সে। দূরে চলে গেল গাড়ির মৃদু গুঞ্জন।

আবার একবার পাকস্থলীর মধ্যে সেই বিচিত্র অনুভূতি হলো। তাহলে সত্যিই ঢুকেছে সে নিষিদ্ধ এলাকায়! সামনে পুরো একটা রাত। এর মধ্যেই সব দেখে-শুনে নিতে হবে। উঁচু টাওয়ার থেকে সার্চ লাইটের আলোটা সমস্ত এলাকা চক্কর দিয়ে আবার আসছে ফিরে। দেয়াল থেকে হাত দশেকের মধ্যেই একটা গাছ। ছুটে সেই গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল রানা। পার হয়ে গেল তীব্র আলো।

ব্যাগ থেকে বিনোকিউলারটা বের করল রানা। আমেরিকার উইভার কোম্পানীর তৈরি। জার্মানীর আবিষ্কৃত স্নাইপারস্কোপের মত ইনফ্রা-রেড লেন্স লাগানো আছে এতে। রাতের অন্ধকারেও পরিষ্কার দেখা যায় এই দূরবীন দিয়ে। চোখে লাগাতেই ধীরে ধীরে কালো অন্ধকার ফিকে হয়ে গেল। ফোকাসিং নবটা ঘুরিয়ে আরও পরিষ্কার করে নিল রানা দূরের গাঢ় অন্ধকারকে। চারদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

বাম দিকে গেটের দুই ধারে সেন্ট্রিরুমে আলো জ্বলছে। কোনরকম অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য দেখা গেল না সেখানে। বোধহয় বিনা বাধায় বেরিয়ে যেতে পেরেছে মিত্রা।

কোথাও লুকোবার জায়গা দেখতে পেল না রানা। ডানদিকে দুই দেয়ালের কোণে একটা সেন্ট্রি ঘর—গজ পঞ্চাশেক দূরেই। গেটের কাছে থরে থরে সাজানো মস্ত আকারের অসংখ্য চারকোনা বাক্সমত কি যেন দেখল রানা। সোজাসুজি তাকালেও সেই রকম কি যেন দেখা যাচ্ছে বহুদূরে। আশেপাশে কোন লোকজন দেখতে পেল না ও।... অনেকগুলো গাছ আছে এলাকার মধ্যে এদিক ওদিক—কিন্তু একটা গাছেও পাতা নেই। ন্যাড়া ডালপালা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে ছোট-বড় হরেক রকমের গাছ। কদাকার লাগছে ওগুলোকে।

হাঁটতে আরম্ভ করল রানা সোজা। পুরো এলাকা সম্পর্কে একটা ধারণা দরকার প্রথমে। সোজা আধমাইল মত পশ্চিমে হেঁটে আবার একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল রানা। বিনোকিউলার চোখে লাগিয়ে দেখল প্রকাণ্ড একটা পাকা একতলা দালান

দেখা যাচ্ছে। প্রায় সিকি মাইল মত লম্বা হবে। চওড়া কত তা বোঝা গেল না যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখান থেকে। ওখানেই আসল ব্যাপার চলছে বুঝতে পেরে সেদিকেই এগোল রানা। আলোকোজ্জ্বল রাস্তাটা এক লাফে পার হয়ে এলো। আশা করল কেউ দেখতে পায়নি। পুকুর ধার দিয়ে এসে দাঁড়াল সেই প্রকাণ্ড ঘরের পাশে। জায়গায় জায়গায় কাঁচ বসানো। শো-রুমের মত। ভিতরটা অন্ধকার। বিনোকিউলার চোখে তুলে দেখল রানা সমস্ত ঘর ফাঁকা। মেঝেটা বালির। যতদূর দেখা যায় কেবল বালি আর বালি। আর কিচ্ছু নেই ঘরের ভিতর। প্রায় দেড়শো গজ চওড়া ঘরটা।

কিছুই বুঝতে না পেরে রানা ভাবল দেখা যাক ওপাশে কি আছে। এমন সময় চোখে পড়ল দু'জন সেন্ট্রি এগোচ্ছে এদিকে। চট্ করে আড়ালে সরে গেল রানা। ব্যাপার কি! দেখে ফেলেছে নাকি ওরা ওকে?

দেড়শো গজ পার হয়ে রানা দেখল হাত চারেক জায়গা ছেড়ে একই আকারের আরেকটা ঘর ওপাশে। এই ঘরটায় উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে। কাঁচ দিয়ে দেখা গেল এ ঘরেও বালির মেঝে। কাঁচটা গরম। ভেতরটা এয়ার-কণ্ডিশন করা নাকি? হঠাৎ রানার চোখে পড়ল অসংখ্য ছোট ছোট পোকা তিড়িং বিড়িঙ লাফাচ্ছে বালির ওপর। প্রকাণ্ড ঘরটায় একটি জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। ভূতুড়ে কারবার নাকি?

এই ঘরটাও পার হয়ে গেল রানা পেছন দিক থেকে। আরেকটা ঘর। এ ঘরটা প্রথম ঘরের মত অন্ধকার। কাঁচে হাত লাগতেই রানা বুঝল ঘরটা অস্বাভাবিক রকমের ঠাণ্ডা। ভিতরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আবার বিনোকিউলার তুলল রানা চোখে। ভিতরে চেয়েই চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল ওর। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পঙ্গপালে সারাটা ঘর ছেয়ে আছে। নড়াচড়া করছে না কেউ—এখন ওদের গভীর রাত। উত্তেজিত হয়ে উঠল রানা। সর্বনাশ! তাহলে তো ডক্টর আলী আকবরের কথাই ঠিক মনে হচ্ছে! আর্টিফিশিয়াল উপায়ে ল্যাবরেটরিতে ব্রীড করছে এরা অসংখ্য পঙ্গপাল! ঘরের ভিতর মরুভূমির আবহাওয়া তৈরি করেছে এয়ার-কণ্ডিশনিং করে।

চতুর্থ ঘরটায় দ্বিতীয় ঘরের মত উজ্জ্বল আলো। কাঁচে চোখ রেখেই শিউরে উঠল রানা। বালি দেখা যাচ্ছে না। মাটি থেকে চার ফুট উঁচু হয়ে সারা ঘরময় বিছিয়ে আছে পঙ্গপাল। একটার ওপর আরেকটা, তার ওপর আরেকটা চড়ে। এগুলো আকারে আর-একটু বড়—পূর্ণ অ্যাডাল্ট। একটার গায়ে লেগে আছে আরেকটা। ডক্টর আকবরের ভাষায় ফেজ গ্রিগেরিয়া, লম্বা বাঁকানো পা দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে একে অন্যকে। মারামারি করছে নিজেদের মধ্যে। সবচাইতে নিচে যেগুলো আছে তাদের কথা ভাবতেই দম বন্ধ হয়ে এল রানার। আপনাআপনি কয়েকবার গা-টা শিউরে উঠল তার এত পোকা দেখে। সিকি মাইল লম্বা, দেড়শো গজ চওড়া, চারফুট উঁচু! শুধু পঙ্গপাল আর পঙ্গপাল!

আবার এগোল। আরও একটা ঘর দেখা গেল একই আকারের। কিন্তু এর মধ্যে হরেক রকম যন্ত্রপাতি এবং মানুষ দেখা গেল। বাতি জ্বলছে এই ঘরটায়। দুই পা পিছিয়ে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়াল রানা। বুঝল এটাই আসল ল্যাবরেটরি।

ঘরের মধ্যে পনেরো ফুট দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা বিশিষ্ট একটা তারের জাল ঘেরা

খাঁচার ভিতর ঠাসাঠাসি করে পঙ্গপাল ভরা। মটিতে শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে একটা ন্যাড়া গাছের আড়ালে দাঁড়াল রানা। পঙ্গপাল ভর্তি খাঁচাটার পঁচিশ গজ দূরে আরেকটা সেই সমান খালি খাঁচার মুখ খোলা। একজন চশমা পরা লোক সেই খাঁচার পিছনে কি একটা জিনিস ডান হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ধুতিটা উড়ছে জোর বাতাসে। রানা বুঝল প্রবল বাতাস বইছে পঙ্গপাল ভরা খাঁচাটার দিকে। ধুতি পরা লোকটা বাম হাতে ইশারা করতেই পঙ্গপালের খাঁচার মুখ খুলে গেল। হুড়মুড় করে বেরুতে থাকল হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পঙ্গপাল। বাতাসের প্রতিকূলে উড়ে তিন মিনিটের মধ্যে সব গিয়ে ঢুকল খালি খাঁচাটার মধ্যে। মুখ বন্ধ হয়ে গেল সে খাঁচার। রানা ভাবল, নিশ্চয়ই মোলাসেস সেন্ট।

বিশেষ ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে পোকাগুলোকে। এই সুরক্ষিত এলাকার মধ্যে দিনরাত নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে শ' পাঁচেক একনিষ্ঠ লোক পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বনাশ করবার জন্যে। এদের দূরদর্শী পরিকল্পনার নিষ্ঠুর ভয়াবহতা চিন্তা করে এদের বুদ্ধি এবং শক্তির তুলনায় রানার নিজেকে বড় ক্ষুদ্র মনে হলো। ঠাণ্ডা মাথায় এরা কতখানি ভয়ঙ্কর এবং মারাত্মক বিদ্বেষপূর্ণ কাজে লিপ্ত হতে পারে ভাবতে গিয়ে এদের প্রতি প্রবল একটা ঘৃণা অনুভব করল সে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে এরা নিজেদের হিংস্রতা চরিতার্থ করবার জন্যে।

বিভিন্ন রকম কাজ চলছে এই ল্যাবরেটরিতে। নানান রকম অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির একাংশ দেখতে পেল রানা। চট্ করে পঞ্চম ঘরটার দেয়ালের সাথে সেঁটে গেল সে হঠাৎ। একটা পায়ের শব্দ শোনা গেল না? এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বুঝল মনের ভুল। আরও কি আছে সব দেখতে হবে। আঁধারের মধ্যে দিয়ে দ্রুত হেঁটে দেড়শো গজ প্রস্থ পার হয়ে এলো রানা। নাঃ। আর ঘর নেই। পঞ্চমটাই শেষ। একটা উঁচু বালির ঢিবি। দূরে কয়েকটা সুদৃশ্য বাংলো। শক্তিশালী জেনারেটর চলছে কাছেই—পাশে পানি ঠাণ্ডা হওয়ার ফোয়ারা। তারপরই চোখ পড়ল রানার খাঁচাগুলোর ওপর। শত শত ১৫ × ১৫ × ১৫ ফুট খাঁচা লম্বালম্বি ভাবে সাজিয়ে রাখা আছে পঞ্চম ঘরটার গা ঘেঁষে। প্রত্যেকটা খাঁচায় ঠাসাঠাসি করে ভর্তি পঙ্গপাল।

রানা ভাবল ডক্টর আলী আকবরের দেয়া ম্যাটারিজিয়াম সলিউশনটা এখনই ছড়াতে আরম্ভ করে দেবে, না আগে সবটা এলাকা দেখে নেবে? গোটা পশ্চিম দিকটা বাকি রয়ে গেছে। আগে সবটা দেখে নেয়াই ভালো! রাত আরেকটু হোক। হাতঘড়ির দিকে চাইলো রানা। সাড়ে দশটা বাজে। দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেছে কখন টের পায়নি সে। একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করল ওর খুব। কিন্তু উপায় নেই এখন।

হঠাৎ মাথার ওপর ঘর-ঘর শব্দ শুনে চমকে উঠল রানা। ওভারহেড ক্রেন। আড়ালে সরে দাঁড়াল সে। লোহার তারের মাথায় লাগানো হুক নেমে এসে একটা খাঁচা শূন্যে তুলে নিল। রানাকে দেখতে পায়নি ক্রেন-চালক। আলো পড়তেই রানা দেখল খাঁচার ওপর একটা টিনের পাতে ইংরেজিতে লেখা যশোর। তাহলে এই খাঁচা চললো যশোর বর্ডারে। ক্রেনটা চলে যেতেই বিনোকিউলার চোখে তুললো রানা। দেখল যতগুলো দেখা যায় সবগুলোর উপরই লেখা আছে যশোর। সবশেষের খাঁচাটা একটু বাঁকা হয়ে রয়েছে—সেটাতেও পড়ল রানা, যশোর।

তাহলে! প্রত্যেকটা জেলার জন্যে এতগুলো করে পঙ্গপাল যাচ্ছে। অন্যান্য জেলার খাঁচা কি গন্তব্যস্থলে রওনা হয়েছে? ওভার-হেড ক্রেনটাকে অনুসরণ করবে ভেবে এক পা এগিয়েছে, অমনি পিছন থেকে আওয়াজ এলো, 'খবরদার! মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও।' হিন্দী।

ঘুরে দাঁড়িয়েই গুলি করল রানা। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল থেকে আওয়াজ হলো, 'দুপ!' ছিটকে লোকটার হাতের সাব-মেশিনগানটা পড়ে গেল মাটিতে। তারই ওপর আছড়ে পড়ল লোকটা। রানা বুঝল, একটু আগে দেখা দু'জন প্রহরীর একজন হবে। নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছিল ওকে। সঙ্গে সঙ্গেই দেয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো দ্বিতীয়জন।

'পাকাড় লিয়া?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হাঁ,' রানা উত্তর দিল।

কিন্তু গলার স্বরেই চিনে ফেলল সে, তাছাড়া পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে রানার হাতে সাব-মেশিনগানটা নেই। মুহূর্ত মাত্র সময় না দিয়ে দ্বিতীয় গুলি করল রানা। এই লোকটাও হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনে, টুঁ শব্দটি না করে। নিজের শার্ট প্যান্টের ওপর প্রথম প্রহরীর কাপড়চোপড় পরে নিল রানা। তারপর দুটো মৃতদেহ আর একটা সাব-মেশিনগান বালি চাপা দিয়ে দিল। ততক্ষণে আরও একটা খাঁচা তুলে নিতে ফিরে এসেছে ওভার-হেড ক্রেন। চুপচাপ মাটিতে পড়ে রইল সে।

ওটা চলে যেতেই দ্রুত কাজ সারার তাগিদ অনুভব করল রানা। এই দু'জন প্রহরীর অনুপস্থিতি টের পেতে বেশি সময় লাগবে না এদের। তার মধ্যেই চেষ্টা করতে হবে এখান থেকে বেরোবার। ব্যাগ থেকে স্প্রে-গান ফিট করা সলিউশনের কৌটো বের করে পকেটে রাখল রানা। তারপর সাব-মেশিনগানটা তুলে নিল হাতে। ইছাপুর গান অ্যাণ্ড শেল ফ্যাক্টরির তৈরি পয়েন্ট থ্রী-এইট ক্যালিবারের গান। বিশ রাউণ্ডের ম্যাগাজিন। চমৎকার হালকা যন্ত্রটা।

খাঁচাগুলোর পাশ দিয়ে খোয়া বিছানো রাস্তায় গিয়ে উঠল রানা। তারপর আলোকিত রাস্তার ওপর দিয়ে বুক ফুলিয়ে এগোল ক্রেনটা যেদিকে গেছে সেদিকে। কিছুদূর পেছনে একটা গাড়ির এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ পেল সে। হেড লাইট জ্বলে উঠল। দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে করল রানার—কিন্তু পালাতে গেলেই সন্দেহ হবে। ঢিপ্ ঢিপ্ করে জোর হার্টবিট আরম্ভ হয়ে গেল রানার। পিছন ফিরে চাইল না সে। পাশ কাটিয়ে চলে গেল জিপ। কোন রকম সন্দেহ করেনি ওকে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন।

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে বাম দিকে চেয়ে দেখল রানা হাজার হাজার খাঁচা ভর্তি পঙ্গপাল থরে থরে সাজানো। সিলেট-কুমিল্লা-চিটাগাং লেখা খাঁচাও দেখল রানা। কী বিরাট পরিকল্পনা নিয়েছে জয়দ্রথ মৈত্র, ভাবতেই বুকের ভিতরটা হিম হয়ে আসে ওর। দেখল, ওভার-হেড ক্রেনটা তখন ফিরছে গেটের কাছ থেকে। ওদিকেও আছে নাকি? ডান দিকে মোড় ঘুরল রানা। গেটের কাছেই রাস্তার দুইপাশে অসংখ্য খাঁচা জমা করা। প্রথমে এখানে ঢুকে রানা ওগুলোকে বাক্স মনে করেছিল।

পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্প্রে-গানটা বের করে প্রত্যেকটা খাঁচায় একটু করে

সলিউশন স্প্রে করল রানা। ওষুধের নামটা জানে সে, কিন্তু কেন পঙ্গপালের কারবার দেখলে এটা ছড়াতে বলেছেন ডক্টর আকবর তা জানে না রানা। ব্যস্ততার মধ্যে সেটা আর জানা হয়নি। রানা ভেবেছিল ছড়ালেই বুঝি মুহূর্তে শেষ হয়ে যাবে এই কোটি কোটি পঙ্গপাল। কিন্তু কিছুই হলো না। অদ্ভুত কিছুই ঘটল না। একটু নিরাশ হলো সে। গুণ নষ্ট হয়ে যায়নি তো ওষুধের?

দৃঢ় পদক্ষেপে ফিরে এল সে রাস্তা দিয়ে পশ্চিম দিকের খাঁচার সামনে। পথে মোড়ের ওপর সেন্ট্রি পোস্টটা খালি দেখে বুঝতে পারল এই চেক পোস্ট থেকেই দু'জন প্রহরী ওকে অনুসরণ করেছিল। আলোকিত রাস্তাটা পার হবার সময় হয়তো রানাকে দেখে ফেলেছিল ওরা।

বেশ অনেকক্ষণ সময় লাগল পশ্চিম দিকের খাঁচাগুলোয় স্প্রে করতে। তারপর এগিয়ে গিয়ে আবার সেই প্রথম ঘরটার সামনে দাঁড়াল রানা। দরজা তালা বন্ধ। এদিক দিয়ে চেষ্টা করে লাভ নেই। পাশাপাশি দুই ঘরের মাঝখান দিয়ে এগোল সে। পনেরো গজ গিয়েই কাঁচের জানালা পেল। মেশিনগানের মাথা দিয়ে এক ঘায়ে খানিকটা কাঁচ ভেঙে ফেলল সে। অল্প খানিকটা সলিউশন স্প্রে করে দ্বিতীয় ঘরটায়ও তাই করল। তারপর বেরিয়ে এল রাস্তায়; আবার ঢুকল তৃতীয় এবং চতুর্থ ঘরের মাঝ রাস্তা দিয়ে, সেখানে কাজ সেরে এল, কিন্তু পঞ্চম ঘরটায় কিছুই করতে পারল না সে। পূর্ণোদ্যমে কাজ চলেছে সেখানে। যশোর লেখা খাঁচার গোটা পনেরোতে দেয়ার পরই শেষ হয়ে গেল সলিউশন। রানার কাজও শেষ। আর কিছুই করার নেই ওর। ফেলে দিল স্প্রে-গানটা ড্রেনের মধ্যে।

করবার নেই কেন? ঊরুতে বাঁধা চামড়ার খাপের ভিতর থেকে ছুরি বের করে এক বর্গফুট আন্দাজ কাটতে আরম্ভ করল সে তারের জাল। রাতের বেলা ওরা কিছুই টের পাবে না। এরাও বেশ চুপচাপ বসে থাকবে খাঁচার মধ্যে। ডক্টর আলী আকবরের কথাটা মনে পড়ল। 'রাত হলো কি কাত হলো।' রাতে নড়াচড়া করবে না ওরা, কিন্তু সকাল হলেই ফুরফুর করে সব বেরোবে খাঁচা থেকে। পশ্চিম বাংলার ওপর দিয়ে এগোবে ওরা সমস্ত সবুজ মুছে দিতে দিতে। একটা অদ্ভুত আনন্দ শিহরণ অনুভব করল রানা। শত্রুর অস্ত্র তাদেরই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার মধ্যে তৃপ্তি আছে।

গোটা পাঁচেক খাঁচা আর কাটতে পারল না রানা। খটাং করে দরজা খুলে গেল ল্যাবরেটরির। এক ঝলক আলো এসে পড়ল খাঁচাগুলোর ওপর। একটা খাঁচার আড়ালে সরে গিয়ে রানা দেখল চারজন লোক বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে। চলে গেল তারা হিন্দীতে কথা বলতে বলতে মাঠের মধ্যে দিয়ে বাংলোগুলোর দিকে। খোলাই থাকল দরজাটা। আলোর মধ্যে আর কাজ করা সম্ভব নয়, ছুরিটা যথাস্থানে গুঁজে রেখে সাব-মেশিনগানটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। পঞ্চম ঘরের বৈজ্ঞানিকরা শিশি-বোতল-টেস্ট-টিউব আর নানান রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্তই থাকল। হাঁটতে হাঁটতে মোড়ের সেই খালি চেক পোস্টের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। ক্রিং-ক্রিং করে ফোন বাজছে। রিসিভার তুলে নিল কানে। একদমে অনেকক্ষণ বকাবকি করল কোন ওপর-ওয়ালা।

'যতসব গেঁয়ো চাষাভূষো নিয়ে পড়েছি আমি। এতক্ষণ ধরে রিং হচ্ছে কানের মধ্যে কি তুলো গুঁজে রেখেছ, না ডিউটি ফেলে ঘুমোচ্ছিলে?' বকুনি থামল একটু।

'কাছেই পেচ্ছাব করতে গিয়েছিলাম,' রানা উত্তর দিল।

'আর তোমার সঙ্গের ভূতটা?'

'ওকে দেব টেলিফোন?'

'না। আমি জিজ্ঞেস করছি দু'জনে কি একসঙ্গে গেছিলে জল তৈরি করতে? তোমাদের নামে আমি রিপোর্ট করব, তা জানো? এক্ষুণি অ্যালার্ম সাইরেন বাজাতে যাচ্ছিলাম।'

'সরি, স্যার,' উত্তর দিল রানা।

'স্যার? স্যার বলছ কেন!'

লোকটার কণ্ঠে সন্দেহ ফুটে উঠল। রানা বুঝল 'স্যার' বলা উচিত হয়নি।

'ভুল হয়ে গেছে।'

'তোমার নম্বর কত?' পরিষ্কার সোজা প্রশ্ন।

'সেভেন্টি-নাইন, সি. পি.।' কাঁধের ওপর পিতলের নম্বর দেখে বলল রানা।

খসখস করে কাগজপত্র ঘাঁটার আওয়াজ এল মৃদু। চেক করল বোধহয় অফিসার ডিউটি-রুটিন। একটু থেমে আবার বলল, তৈরি থেকো, এরিয়ার মধ্যে লোক ঢুকেছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। সজাগ দৃষ্টি রাখবে চারদিকে।' রিসিভার ছেড়ে দিল অফিসার।

রাত বাজে দেড়টা।

ব্যাগ থেকে কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ বের করে খেয়ে নিল রানা। তারপর ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে নিল কফি। তৃপ্তির সঙ্গে কয়েকটা চুমুক দিয়ে ভাবল ব্যাটারা টের পেল কি করে? নাকি এই টেলিফোনের কথোপকথনেই বুঝে ফেলেছে?

এই চেক-পোস্টটা ত্যাগ করা উচিত। এইভাবে বেশিক্ষণ আর আত্মগোপন করে থাকতে পারবে না সে। মিত্রা যদি আসে তো সেই আগামীকাল রাত আটটায়। কিন্তু এখন যত শিগগির সম্ভব এই এলাকা ছেড়ে বেরোনো দরকার। অন্যভাবে চেষ্টা করে দেখতে হবে।

ঠিক এমনি সময়ে কাঠের চেক্-পোস্টের বাইরে মৃদু একটা খস্খস্ আওয়াজ পেল রানা। মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল ওর কান। এত আলো কেন? বুঝল, দেরি হয়ে গেছে। সার্চ লাইটটা স্থির হয়ে আছে এই সেন্ট্রি-পোস্টের ওপর। সাব-মেশিনগানের ওপর হাত পড়ল তার। সঙ্গে সঙ্গেই ফোন বেজে উঠল আবার। রিসিভারটা কানে তুলে শুনল রানা, পরিষ্কার বাংলায় একজন বলছে, 'আমি জয়দ্রথ মৈত্র বলছি। বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই, মি. মাসুদ রানা। বিশটা মেশিনগান ধরা আছে আপনার দিকে। কথা না শুনলে এক সেকেণ্ডে ঝাঁঝরা হয়ে যাবেন।'

কথাটা বিশ্বাস করল রানা। কণ্ঠস্বরটাও চিনতে পারল অক্লেশে।

'মেশিনগান আর পিস্তলটা ডেস্কের ওপর রেখে দয়া করে ভদ্রলোকের মত বেরিয়ে আসুন বাইরে।'

চিন্তা করছে রানা। তাহলে ধরা পড়ল সে! ভাগ্যে কি ঘটতে চলেছে ভাল করেই জানা আছে রানার। এখনই বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে প্রাণত্যাগ করবে, না অপেক্ষা করবে সুযোগের? জামার বোতামটা ছিঁড়ে খেয়ে নেবে?

সার্চ লাইটটা সরে গিয়ে অন্ধকার মাঠের ওপর ঘুরে এল একবার। সেই

আলোয় রানা দেখল বিশজন সৈন্য মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর দিকে চেয়ে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে সাব-মেশিনগান। রানা স্থির করল অপেক্ষা করবে সে।

'অলরাইট, বাস্টার্ড!' বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

'বেরিয়ে এসো, বাপ। সময় নষ্ট করে লাভ আচে কিচু?'

খুব কাছেই পেছন থেকে মোলায়েম কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বেপরোয়া রানা বেরিয়ে এল বাইরে। খপ্ করে দু'পাশ থেকে দু'জন ধরল ওর হাত। তৃতীয়জন এবার পেছন থেকে এসে পিস্তলটা বের করে নিল ওর ওয়েস্ট-ব্যাণ্ড থেকে। অন্ধকার থেকে এগিয়ে এল মেশিনগান-ধারীর দল। রানার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা হয়ে গেছে। দড়াম করে এক লাথি মারল আর্মি লেফটেন্যান্ট রানার পেছন দিকে। দুই পা সামনে এগিয়ে গেল রানা সেই ধাক্কায়।

একটা সুদৃশ্য বাংলোর সামনে নিয়ে যাওয়া হলো রানাকে।

'আসুন, আসুন। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম, মি. মাসুদ রানা। জানতাম আপনি বাঘের বাচ্চা—পালিয়ে যাবার লোক নন। কলকাতায় পেলাম না, কিন্তু জানতাম এখানে আপনার দেখা পাবই।' হলুদ বীভৎস চোখ মেলে রানার দিকে চেয়ে রয়েছে জয়দ্রথ মৈত্র। ওর মুখে এই প্রথম হাসি দেখল রানা। হাসতে গিয়ে টান লাগতেই জিভ দিয়ে মুখের দুই কোণের ঘা ভিজিয়ে নিল জয়দ্রথ মৈত্র। কেশ-বিহীন প্রকাণ্ড মাথাটার তিন ফুট উঁচুতে উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে। আলোটা চক্‌চকে মাথায় প্রতিফলিত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিল রানার।

'কিন্তু আশা করেছিলাম বাইরে ধরা পড়বেন—ভেতরে ঢোকার আগেই।'

পেছন ফিরে হাঁটতে আরম্ভ করল জয়দ্রথ মৈত্র। পাঁচজন ছাড়া বাকি সবাই পেছনে রয়ে গেল। ওয়েটিংরুমের মধ্যে দিয়ে একটা বিরাট কনফারেন্স হলে নিয়ে যাওয়া হলো রানাকে। প্রকাণ্ড একটা পাক-ভারতের ম্যাপ ঝুলছে একধারের পুরো দেয়াল জুড়ে। মোটা লোহার শিক দিয়ে ঘেরা ঘরের একটা অংশ। চাবি দিয়ে গেটটা খুলে দিল জয়দ্রথ মৈত্র। দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে ভাল করে সার্চ করা হলো রানার সারা দেহ। উরুতে বাঁধা খাপ থেকে ছোরাটা বের করে নেয়া হলো।

'পিস্তলটা কোথায়?'

'এই যে,' রানার ওয়ালথার এগিয়ে দিল লেফটেন্যান্ট।

সাইলেন্সার খুলে ফেলল জয়দ্রথ মৈত্র। স্লাইড টেনে ছ'টা গুলি বের করে ফেলল মাটিতে। ব্যারেলের গোড়ায় চেম্বারের কাছে বুড়ো আঙুলের নখ রেখে পরীক্ষা করে দেখল গুলি ছোঁড়া হয়েছে কিনা। নলের ভিতরে পাউডারের দাগ দেখে মাথা নাড়ল সে।

'লাশ দুটো কোথায়?' দপ করে জ্বলে উঠল জয়দ্রথের চোখ।

লেফটেন্যান্ট তখন নিচু হয়ে মাটি থেকে গুলিগুলো তুলছিল। রানা দেখল এ-ই সুযোগ। রেঞ্জের মধ্যে আসতেই হঠাৎ ঝেড়ে এক লাথি লাগাল ওর চিবুকের নিচের নরম মাংস লক্ষ্য করে। এমন ঘটনার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না। স্টীলের সোল বসানো জুতো সোজা গিয়ে লাগল লক্ষ্যস্থলে। একটা বিকট আওয়াজ করে দুই হাত শূন্যে তুলে চিত হয়ে পড়ল লোকটা মেঝেতে। খুঁটে তোলা গুলিগুলো ছিটকে গেল

চারদিকে। নাক মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত। কণ্ঠনালী ছিঁড়ে গেছে। আধ মিনিট ছট্‌ফট্‌ করে জয়দ্রথের চোখের সামনে স্থির হয়ে গেল দেহটা।

লাল হয়ে গেল জয়দ্রথের ফর্সা মুখ। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল সে। এবার এক ঝট্‌কায় হতভম্ব প্রহরীদের কাছ থেকে ছুটে এল রানা। হাত দুটো তেমনি পেছনে বাঁধা। এক লাফে জয়দ্রথের কাছে চলে এল সে। তলপেট লক্ষ্য করে প্রচণ্ড একটা লাথি চালাল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জয়দ্রথ। চট্‌ করে এক পা পিছিয়ে ধরে ফেল্‌ল রানার পা।

রানার কানে গেল, পেছনের কাউকে জয়দ্রথ বলল, 'খবরদার, গুলি কোরো না!' তারপরই ধাঁই করে একটা রাইফেলের বাঁট এসে পড়ল ওর মাথার ওপর। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল মাসুদ রানা।

ঠিক সেই সময় পাশের একটা দরজা দিয়ে স্লীপিং গাউন পরিহিতা স্যালি ডেভন ঢুকল এসে ঘরে। এক মুহূর্ত অবাক হয়ে রানাকে দেখল সে।

'এখন যাও, স্যালি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি আমি।'

বিনা বাক্যব্যয়ে চলে গেল স্যালি পাশের ঘরে। শক্ত করে রানার পা বেঁধে ফেলা হলো। জয়দ্রথের ইঙ্গিতে লেফটেন্যান্টের মৃতদেহ উঠিয়ে নিয়ে গেল দুইজনে। বাকি দু'জন রানার পা ধরে টেনে হেঁচড়ে জ্ঞানহীন দেহটা নিয়ে এল লোহার গরাদ দেয়া হাজত ঘরটার মধ্যে। তালা লাগিয়ে দিল জয়দ্রথ লোহার গেটে। হাতের ইঙ্গিতে ওদের চলে যেতে বলে টেবিলের ওপর কয়েকটা কাগজ ঘাঁটল কিছুক্ষণ। একটা টেলিফোন করল কোথাও। তারপর বাতি নিভিয়ে দিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে।

ঘণ্টা খানেক পরে জ্ঞান ফিরে এল রানার। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। চোখ মেলে দেখল চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কোথায় আছে বুঝতে পারল না সে। পিঠের তলায় হাতটা বেকায়দায় পড়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দেহ কাত করে চাপ মুক্ত করল রানা শক্ত করে বাঁধা হাত দুটো। আবার রক্ত চলাচল আরম্ভ হওয়ায় ঝিঁঝি ধরে গেল ডান হাতটায়। বিকারগ্রস্তের মত অনেক আজেবাজে চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকল ওর মাথার মধ্যে। একই কথা বারবার ফিরে আসে—চেষ্টা করেও তাড়াতে পারে না রানা। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল রানার। চোখ বন্ধ করেই শুনল পাশের ঘরে খবর হচ্ছে রেডিওতে। হঠাৎ ভয়ঙ্কর রকম চমকে উঠল রানা। মুহূর্তে ঘুমের রেশ কেটে গেল তার। যুদ্ধ! নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে ভরসা হলো না।

'এ খবর প্রচারিত হচ্ছে রেডিও পাকিস্তান থেকে। আজ ভোর সাড়ে তিনটায় লাহোরের আটারি-ওয়াগা ও বার্কি সেক্টরে কোন রকম যুদ্ধ ঘোষণা ব্যতিরেকেই সাম্রাজ্যবাদী ভারতের হীন আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। অতর্কিত আক্রমণ করে ভারতীয় সৈন্য লাহোর সেক্টরে পাকিস্তানের মূল ভূ-খণ্ডের তিন মাইল অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। পাকিস্তানী স্থল বাহিনীর বীর জোয়ানরা বিপুল বিক্রমে শত্রু সৈন্যকে প্রতিহত করছেন। এই মাত্র খবর পাওয়া গিয়েছে—ভারতীয় বিমান বাহিনী ওয়াজিরাবাদে দণ্ডায়মান একটি যাত্রীবাহী রেলগাড়ির ওপর বোমা বর্ষণ করেছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিমান

চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত রাখা হয়েছে। জাতির উদ্দেশে আজ প্রেসিডেন্ট যে জরুরী বেতার ভাষণ দান করেছেন তার বাংলা তর্জমা প্রচার করা হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

ব্যাপার কি? যুদ্ধ লেগে গেল? লাহোর আক্রমণ করেছে ভারত!

খবরের বিশেষ বিশেষ অংশগুলো আবার পড়ে শোনানো হলো। মন দিয়ে শুনল রানা। এখন পর্যন্ত পাকিস্তান বিমান বাহিনী আটটি ভারতীয় বিমান ধ্বংস করে দিয়েছে; স্থল বাহিনীর গুলিতে ভূপাতিত হয়েছে আরও তিনটি! খবরের পরই ভেসে এলো রানার প্রিয় কণ্ঠশিল্পীর বলিষ্ঠ কণ্ঠ:

'রক্তে লিখেছি জন্মভূমির নাম'

সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল রানার। স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীর বন্ধু-বান্ধবদের ছবি ফুটে উঠল ওর চোখের সামনে। সমগ্র পাকিস্তানে আজ যুদ্ধ-চাঞ্চল্য, আর সে কিনা পড়ে রয়েছে এখানে নিরুপায় বন্দী অবস্থায়।

এমনি সময় জয়দ্রথ এসে ঢুকল ঘরে। একটা সরু নাইলন কর্ড ধরে টান দিতেই সারা ঘরে উজ্জ্বল বাতি জ্বলে উঠল।

'ঘুম ভেঙেছে তাহলে? খবরটা শুনলেন? অবাক লাগছে না?'

পরম পরিতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল জয়দ্রথের মুখে। টেবিলের ওধারের চেয়ারটায় বসল সে। দু'বার হাতে তালি দিতেই দু'জন সিপাই ঢুকল ঘরে। তালা খুলে রানাকে নিয়ে এসে বসানো হলো একটা বিশেষ ভাবে তৈরি লোহার চেয়ারে। মেঝেতে লেফটেন্যান্টের রক্তের দাগ কালচে হয়ে লেগে আছে এখনও। চেয়ারের সঙ্গেই ফিট করা চামড়ার বেল্ট দিয়ে প্রথমে রানার বুক, পেট এবং আলাদা আলাদা করে দুই উরু বাঁধা হলো শক্ত করে; তারপর পায়ের বাঁধন খুলে পা দুটো চেয়ারের দুই পায়ার সঙ্গে বাঁধা হলো। এবার হাতের বাঁধন খুলে কনুই আর কব্জি বেঁধে ফেলা হলো চেয়ারের হাতলের সঙ্গে। একবিন্দু নড়াচড়ার ক্ষমতা রইল না রানার। জয়দ্রথের ইশারায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সিপাই দু'জন।

'আজ আমার বড় আনন্দের দিন, মি. মাসুদ রানা। আজ আমাদের ডি-ডে। দুই-দুইটা বছর কঠোর পরিশ্রম করবার পর আজ আমরা সাফল্য অর্জন করতে যাচ্ছি। তাই অন্যান্য সবাই পৌঁছবার আগেই আপনার সঙ্গে দুটো রসালাপ করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।'

একটু নড়ে চড়ে আরাম করে বসল জয়দ্রথ।

'ওই যে চেয়ারটায় বসে আছেন, ওটাকে আমরা বলি "প্যানিক চেয়ার"। কারও কাছ থেকে কোন তথ্য বের করতে হলে ওটা ব্যবহার করি আমি। আমার নিজেরই আবিষ্কার। অনেক রকম কাজ হয় ওতে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমাদের দেশের উচ্চ পর্যায়ের কয়েকজন ভদ্রলোক এসে পৌঁছবেন এখানে। স্টেনোগ্রাফারও আসবে দুইজন। তাঁদের সামনে আপনার কাছ থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য বের করে নেয়া হবে নানান কৌশলে। একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন কয়েকটা ইলেকট্রিক তার গিয়ে ঢুকেছে চেয়াটার ভিতর। বারোটা বোতাম আছে আমার হাতের কাছে—একেকটাতে একেক ফল, সময়মত টের পাবেন সব। এখন আমার অতিথিরা এসে পৌঁছবার আগেই আপনাকে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটু

ওয়াকেফহাল করে নিতে চাই।'

এক টিপ নস্যি নিল জয়দ্রথ মৈত্র।

'গত দুই বছর ধরে আমরা একটা মহা প্রস্তুতি নিয়েছি পাকিস্তানীদের পঙ্গু, নির্জীব, মেরুদণ্ডহীন এক জাতিতে পরিণত করবার জন্যে। তার প্রথম অংশ আপনি রেডিওতে শুনেছেন। এগারো ডিভিশন ভারতীয় সৈন্য আজ পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে প্রস্তুত। আখনুর থেকে রাজস্থান পর্যন্ত ভারতীয় পদাতিক, পার্বত্য অশ্বারোহী, সাঁজোয়া ও গোলন্দাজ বাহিনী আজ আক্রমণোদ্যত। কেবল লাহোরেই দুই ডিভিশন সৈন্য আজ ঢুকে পড়েছে পাকিস্তানের ভেতর। ফিফটিনথ্ আর সেভেন্থ্ পদাতিক ডিভিশন। আর টোয়েন্টি থার্ড পার্বত্য ডিভিশন রিজার্ভ রাখা হয়েছে, প্রয়োজন হলে লাগানো হবে। এ ছাড়া কাছেই অমৃতস্বরে আরও এক ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন রাখা হয়েছে। দুই দিক আক্রমণ করা হয়েছে—আটারি-ওয়াগা এবং বার্কিলাহোর। এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ প্রতিহত করবার ক্ষমতা পাকিস্তানের নেই। এ ছাড়া এয়ারফোর্স তো রয়েছেই সাহায্যের জন্যে। আমাদের Mig 21, Gnat, Hunter, Canberra, Vampire ছাতু করে দেবে পাকিস্তানের দুর্বল Sabre F-86, B-57 এবং F-104. গোটা পৃথিবী জানে আজ সন্ধ্যায় আমাদের সেনাপতি লাহোর ফোর্টে বসে চা খাবেন। আগামীকাল লাহোর দখলকারী বাহিনী গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে কাসুর থেকে অগ্রসরমান বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবে। লাহোরের পর শিয়ালকোট। চুরমার হয়ে যাবে পাকিস্তানীদের মনোবল। সর্বত্র দেখা দেবে বিশৃঙ্খলা। মাত্র দশদিন লাগবে আমাদের সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে পদানত করতে। এমনই আঘাত হানব—যেন আগামী দু'শো বছরেও সে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। সে ভার গ্রহণ করেছেন আমাদের সেনাপতি। আর পূর্ব পাকিস্তানের ভার পড়েছিল এই আমার ওপর।'

বুকের ওপর বুড়ো আঙুল ঠেকাল জয়দ্রথ মৈত্র।

'আমি ভেবে দেখলাম এই নদী নালার দেশে সৈন্য-বাহিনী পাঠিয়ে খুব সুবিধে হবে না। ট্যাঙ্ক যাবে নরম মাটিতে বসে। তাছাড়া আমাদের সামরিক শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ হওয়া দরকার পশ্চিম পাকিস্তানে। তাই এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করলাম। পঙ্গপাল দিয়ে ধ্বংস করে দেব পূর্ব-পাকিস্তান। সীমান্ত বরাবর খুলনা-যশোর-কুষ্টিয়া-রাজশাহী-দিনাজপুর-সিলেট-কুমিল্লা-চিটাগাং চারদিক থেকে কোটি কোটি পঙ্গপাল ছাড়া হচ্ছে। মাঝরাত থেকেই স্পেশাল ট্রেনে করে রওনা হয়ে গেছে সব পঙ্গপাল গন্তব্যস্থলে। দশ দিনের মধ্যে ধু-ধু করবে আপনাদের সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা পূর্ব-পাকিস্তান—সবুজের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না কোথাও! ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ লাগবে। না খেতে পেয়ে মারা যাবে লক্ষ-কোটি মানুষ। বাইরে থেকে সাহায্য পাবে না কোন, বাধ্য হয়ে আমাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইবে তখন। হাহাকার পড়ে যাবে সারা দেশ জুড়ে। আমরা তখন দয়া পরবশ হয়ে অনায়াসে দখল করে নেব পূর্ব-পাকিস্তান। বাধা দেয়ার লোক থাকবে না আর।'

নির্বিকার ভাবে শুনছিল মাসুদ রানা। এবার বলল, 'আর চুপচাপ তাই দেখবে পৃথিবী! গাঁজা মারার জায়গা পাওনি, শালা।'

জয়দ্রথ একটা বোতাম স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গেই আর্তনাদ করে উঠল রানা

তীব্র একটা বিদ্যুৎ ঝটকা খেয়ে।

'কেউ অশোভন কথা বললে এই বোতামটা সাধারণত টিপি আমি। বারো রকম কৌশলের এটা একটা। আশা করি ভবিষ্যতে আর অভদ্র ভাষা ব্যবহার করবেন না। যাক, যা বলছিলাম। পৃথিবীতে দুর্বলের স্থান নেই। ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা দেশ যা করে সেটাই ন্যায়। তবে হ্যাঁ, প্রতিবাদ হবে, বড় বড় কনফারেন্স হবে, অনেক যুক্তিতর্কের ঢেউ উঠবে-পড়বে, বৃহৎ শক্তিবর্গ বৈঠকের পর বৈঠক বসাবে, আলোচনা চলবে দিনের পর দিন। শেষকালে ছাড়ব আমরা পাকিস্তান। গড়িমসি করে যাচ্ছি-যাব করতে করতে চার-পাঁচ বছর পার হয়ে যাবে। শুষে ছোবড়া বানিয়ে ছেড়ে দেব আমরা পাকিস্তানকে। প্রাণটা কেবল দুর্বলভাবে ধুক্‌পুক্ করবে—আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। জন্মের পর থেকেই আপনারা যে অবিরাম উদ্বেগের মধ্যে রেখেছেন আমাদেরকে, তাতে সমূলে বিনাশ করা ছাড়া আর কোন পথই ছিল না আমাদের।'

একটু থেমে একটিপ নস্যি নিল জয়দ্রথ মৈত্র। পাশেই রাখা একটা ছোট্ট দামী অলওয়েভ ট্র্যানজিস্টার রেডিও খুলে দিল। প্রেসিডেন্টের ভাষণের অনুবাদ প্রচার করা হচ্ছে।

'ভারতের কামান চিরতরে স্তব্ধ না করা পর্যন্ত দশ কোটি পাকিস্তানী বিশ্রাম গ্রহণ করবে না। ভারত এখনও বুঝতে পারছে না কোন্ জাতির বিরুদ্ধে সে মাথা তুলেছে।'

একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বন্ধ করে দিল জয়দ্রথ রেডিওটা।

'আমার দায়িত্ব ছিল মস্ত বড়, মি. মাসুদ রানা। বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আমার পঙ্গপাল বাহিনী তৈরি করতে হয়েছে। কত শত কঠিন সমস্যা এসে উপস্থিত হয়েছে। ওই যে চারটে ব্রিডিং রুম দেখেছেন—সব এয়ার কণ্ডিশন করা। মরুভূমির আবহাওয়া তৈরি করা হয়েছে সেখানে। লো হিউমিডিটি, হাই টেম্পারেচার। বছরে ছয়বার ডিম পাড়িয়েছি ওদের দিয়ে। প্রতি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চারবার দিনকে রাত করেছি, রাতকে দিন। এক মাসের জায়গায় এক সপ্তায় পূর্ণ বয়স্ক পঙ্গপাল তৈরি করেছি। স্ত্রী পঙ্গপাল বালুর নিচে দু'শো করে ডিম পেড়েছে। ডিম থেকে পিউপা, তার থেকে লারভা এবং সবশেষে অ্যাডাল্ট। বিশেষ প্রক্রিয়ায় দশ দিনের মধ্যেই ডিম পাড়াবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেছে নতুন জেনারেশন। চিন্তা করে দেখুন, নইলে সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তান ছেয়ে ফেলা সম্ভব হত না এত অল্প সময়ের মধ্যে। আমার বম্বে লোকাস্ট, অর্থাৎ Accridium Succinctum আবার চলে হাওয়ার অনুকূলে। যে সময়টাতে ছাড়তে চাই সে সময় হাওয়া বয় দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে। সিলেট-কুমিল্লা-চিটাগাং-এর জন্যে চিন্তা নেই, কিন্তু আপনাদের পশ্চিম সীমান্তে ছাড়লে সব চলে আসবে আমাদের নিজেদেরই দেশে। তাই এদের স্পেশাল ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। Molasses…'

'ওসব আমাদের জানা আছে। আপনাদের কার্যকলাপ সবই আমাদের নখ-দর্পণে। ওই গন্ধ ছড়িয়ে পঙ্গপালগুষ্টি হাওয়ার প্রতিকূলে নেয়ার চেষ্টা করছেন আপনারা।'

'হ্যাঁ। আজ সকালেই আমাদের সব ক'টা বোমা ফেটে সীমান্ত জুড়ে গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে।'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে আবার আরম্ভ করল জয়দ্রথ মৈত্র।

'আপনাদের পি. সি. আই.-চীফ সেগুলো তুলে অকেজো করে ফেলবার জন্যে লোক লাগিয়েছে, এই তো বলতে চাচ্ছেন? সে সব আমার জানা আছে। তাই সকাল বেলা প্লেনে করে নতুন একদফা গন্ধ ছড়ানো হয়েছে। দুপুরে চারটে Mig-21 যাবে আবার একদফা এক্সট্রাক্ট ছড়াতে। কয়দিক সামলাবে রাহাত খান? ও হচ্ছে গরু-খেকো নেড়ে মুসলমান। বুদ্ধির খেলায় আমার কাছে সে একটি তৃতীয় শ্রেণীর গর্দভ মাত্র।'

আবার একবার খুলল জয়দ্রথ রেডিওটা। শেষ হয়ে এসেছে প্রেসিডেন্টের বাণী।

'—কঠোরতম আঘাত হানার জন্য আপনারা তৈরি হন। এগিয়ে যান, শত্রুর মোকাবেলা করুন। আল্লাহ আপনাদের সঙ্গে রয়েছেন। শয়তানের ধ্বংস অনিবার্য। পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।'

পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠল। বন্ধ করে দিল জয়দ্রথ রেডিওটা বিতৃষ্ণার সঙ্গে।

'পঙ্গপালের আপনারা কি দেখেছেন? ১৯৬২ সালে করাচির ওপর দিয়ে যে ছোট্ট দলটা উড়ে গিয়েছিল তার ফলেই সারাদিন সূর্যের মুখ দেখতে পায়নি করাচিবাসী। ওটা ছিল মাত্র ৯৫ মাইল লম্বা, ৮ মাইল চওড়া আর উচ্চতা ছিল আধ মাইল। আর এখানে আমি প্রত্যেক জেলার জন্যে ছাড়ছি এর পাঁচগুণ বড় বড় এক একটা করে দল। দুঃখ শুধু এই, আমার ইচ্ছেমত ছাড়তে পারলাম না। সেনাপতি তৈরি হতে সময় নিয়ে নিলেন একটু বেশি। আর মাস দুই আগে ছাড়তে পারলে অতুলনীয় ক্ষতি করতে পারতাম।'

একবার মুখের দুই কোণ ভিজিয়ে নিল সে। দেখল রানা ঝিমোচ্ছে—ওর কথা শুনছে না। একটা বোতাম টিপল সে। গরম হয়ে উঠছে চেয়ারটা। অবাক হয়ে রানা দেখল জয়দ্রথ হাসছে। লাল হয়ে উঠেছে চেয়ারটা। ধোঁয়া বেরোতে আরম্ভ করল রানার কাপড় থেকে—আগুন ধরে যাচ্ছে। আগুনের তাপ সহ্য করতে না পেরে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল রানা। সুইচটা অফ করে দিল জয়দ্রথ।

'ইচ্ছে করলে অসম্ভব ঠাণ্ডাও করা যায় অন্য বোতাম টিপে। যাক, যা বলছিলাম। অনেক বাধা বিপত্তি। একবার তো একটা ফাঙ্গাস রোগ হয়ে তিন দিনে শেষ হয়ে গেল সব পঙ্গপাল। অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। ম্যাটারিজিয়াম থেকে হয়...'

'কি বললেন?' চমকে তাকাল রানা জয়দ্রথের মুখের দিকে।

'ম্যাটারিজিয়াম। কেন, নামটা শুনেছেন নাকি?'

হঠাৎ খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রানার মুখ। বত্রিশ পাটি দাঁত বের হয়ে গেল ওর। অবাক হয়ে বক্তৃতা বন্ধ করল জয়দ্রথ মৈত্র।

'হাসছেন কেন?'

'আনন্দ চেপে রাখতে পারছি না, তাই।'

'হঠাৎ এত আনন্দের কারণ?'

'আমার দেশকে আমি রক্ষা করেছি—তাই বড্ডো আনন্দ হচ্ছে।'

জয়দ্রথ ভাবল, হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ব্যাটার? অতিরিক্ত নার্ভাস

হলে এমন হয় অনেক সময়। কিন্তু হাসিটা তো বিকারগ্রস্তের হাসি বলে মনে হচ্ছে না!

'ফাংগাস রোগের কথা বললেন না? ম্যাটারিজিয়াম? আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ওই রোগটা বয়ে এনেছিলাম আমি পাকিস্তান থেকে। প্রত্যেকটা খাঁচায় ওই সলিউশন স্প্রে করেছি আমি গত রাতে; কিন্তু জানতাম না কি ক্ষতি হবে আপনাদের। এখন বুঝলাম। কালকের মধ্যে সমস্ত পঙ্গপাল মরে ভূত হয়ে যাবে আপনার। এত পরিশ্রম করেও শেষ কালে হেরে গেলেন, মৈত্র মশাই।'

মুখটা হাঁ হয়ে গিয়েছিল জয়দ্রথের, নিজের অজান্তেই নস্যির কৌটোটা তুলে নিল টেবিল থেকে। ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে একটা ঢোক গিলল সে।

'অসম্ভব!'

'খুবই সম্ভব। আপনার পঞ্চম ল্যাবরেটরির পাশে যেখানে যশোর লেখা খাঁচাগুলো ছিল কাল রাতে···ওইখানে ড্রেনের মধ্যে খোঁজ করলে পাবেন, খালি কৌটোটা পড়ে আছে। তুলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ওইখানে এসেই শেষ হয়ে গিয়েছিল সলিউশন। তাই বাকি খাঁচাগুলোর জাল আমি ছুরি দিয়ে কেটে ফাঁক করে দিয়েছি। জালগুলোও ওখানেই পাবেন। একটু বেলা উঠতেই খাঁচা থেকে বেরিয়ে গেছে ওরা সব—মিথ্যে কথা নয়, খোঁজ নিয়ে দেখুন, এতক্ষণে পশ্চিম-বাংলার খেত খামার চষে বেড়াচ্ছে ওগুলো।'

জয়দ্রথ বুঝল, মিথ্যে কথা বলছে না রানা। সমস্ত মুখ কুঁচকে গেল ওর। ধক-ধক্ জ্বলে উঠল হলুদ লম্বাটে চোখ জোড়া। শেষ কালে এর হাতে পরাজয় হলো তার? একটা সাধারণ পাকিস্তানী স্পাই এসে শেষ করে দিল তার এত দিনের সাধনা, এত পরিশ্রম! একজন লোক পাঠিয়ে দিল জয়দ্রথ কৌটোটা নিয়ে ল্যাবরেটরিতে দেবার জন্যে। ল্যাবরেটরিতেও ফোন করে কয়েকটা নির্দেশ দিল সে।

জয়ের উল্লাসে রানা বলে চলল, 'আর, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের রাহাত খান সম্পর্কে সতর্ক হয়ে মন্তব্য করবেন। আমার হাত খোলা থাকলে চড়িয়ে আপনার দাঁত কয়টা ফেলে দিতাম ওই অশোভন উক্তির জন্যে।'

আবার বোতামে হাত দিতে যাচ্ছিল জয়দ্রথ মৈত্র, কিন্তু টেলিফোনটা বেজে উঠতে সেদিকে হাত বাড়াল। রিসিভার কানে তুলেই চক্ষু চড়কগাছ্ হয়ে গেল জয়দ্রথ মৈত্রের।

'কি বললে? খবর এসেছে খাঁচা খালি? (কিছুক্ষণ চুপচাপ শুনল) না, এখন আর কোন ইনসেকটিসাইড দিয়েই ফেরানো যাবে না। যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে।···কোথায় বললে? বারাসত? (মাথা নাড়ল হতাশ ভাবে) এতগুলো লোক কেউ লক্ষ করল না এত খাঁচা সব কাটা?···না, ওখানে জানিয়ে কি হবে?···কি বললে? প্রধানমন্ত্রী? ওদিক আমি সামলাব। আমি আসছি এক্ষুণি।'

রানার প্রতি তীব্র দৃষ্টি হেনে উঠে দাঁড়াল জয়দ্রথ মৈত্র। তেমনি মুচকে মুচকে হাসছে রানা। বলল, 'হেরে গেলেন, মৈত্র মশাই। এবং পশ্চিম পাকিস্তানেও লেজ গুটিয়ে পালিয়ে আসতে হবে আপনাদের সেনাপতিকে বেত খাওয়া কুকুরের মত। আমাদের সামরিক শক্তি আপনাদের ভুল ভাঙিয়ে দেবে অল্পদিনেই।'

'আমি আসছি! তারপর তোমার উপযুক্ত ব্যবস্থা করছি, শয়তান।'

একটা সুইচ টিপে দিয়ে নিশিতে পাওয়া লোকের মত দিশেহারা পা ফেলে বেরিয়ে গেল জয়দ্রথ মৈত্র।

খুব নিচু ভোল্টে অত্যন্ত হাই অ্যাম্পিয়ারের কারেন্ট চালু হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল রানা। দশ মিনিট পর পর ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন দেখে ভেঙে যাচ্ছে রানার ঘুম। আবার ঘুমিয়ে পড়ছে। এরই মধ্যে ভাঙা ভাঙা ভাবে চিন্তা করছে সে অনেক কথা। মাঝে মাঝে চেষ্টা করছে বাঁধন খুলতে—শেষে হাল ছেড়ে দিল। এ বাঁধন খুলবার নয়। বাজে কয়টা এখন? জয়দ্রথ ফিরবে কখন? কখন আরম্ভ হবে জয়দ্রথের আসল নির্যাতন? তাড়াতাড়ি করছে না কেন? যা ঘটার ঘটে যাক না। এমনি অনিশ্চয়তার মধ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্যে অপেক্ষা করা যায় না।

মাথার ওপর দিয়ে কত যে জেট গেল ঝাঁকে ঝাঁকে তার ইয়ত্তা নেই। রানা ভাবল, এ এক অদ্ভুত নির্যাতন বের করেছে তো জয়দ্রথ। যখন সে ঘুমাতে চাইছে, তখন কে যেন জাগিয়ে দিচ্ছে ওকে···আবার জেগে থাকবার চেষ্টা সত্ত্বেও কে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। আর কিছুক্ষণ থাকলে পাগল হয়ে যাবে সে। ঘুমটা যতবার ভাঙছে দুঃস্বপ্ন দেখে ভাঙছে। টপ টপ করে ঘাম পড়ছে সর্বাঙ্গ থেকে।

একটা ছায়া কেঁপে উঠল ঘরের ভেতর। চমকে ঘাড় ফেরাল রানা। স্যালি ডেভন। প্রথমেই পা টিপে টিপে বোতামগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। আবার ঘুমিয়ে পড়ছিল রানা—সুইচ অফ করে দিতেই ঘুমের রেশটা গেল ছুটে। চটপট রানার বাঁধন খুলতে আরম্ভ করল এবার স্যালি। হাতের বাঁধন আগে খুলল, তারপর পায়ের। বিস্মিত রানা নিজেই তাড়াতাড়ি গলা, বুক এবং পেটের বেল্টগুলো খুলে ফেলল। আধ মিনিটের মধ্যেই বাঁধনমুক্ত রানা উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

'আপনি কোত্থেকে?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'জয়দ্রথের সঙ্গে আছি ব্যাঙ্কক ফিরে যাবার আগের ক'টা দিন। ক্যাথির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি। আপনার ঋণ আমরা কোনদিনই শোধ করতে পারব না। আমার বোন ভুল করেছিল—ওকে ক্ষমা করতে পারবেন না, মি. রানা?'

'ওসব পরে হবে, স্যালি। এখন বাজে কয়টা?'

'সাড়ে সাতটা।'

'ক'জন সশস্ত্র লোক আছে এ বাড়িতে?'

'আট-দশ জন। কিন্তু সম্পূর্ণ এরিয়ার অর্ধেক প্রহরীকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে আজ।'

'আমার পিস্তলটা কোথায় জানেন?'

'না।'

'প্রহরীদের চোখে না পড়ে এ বাড়ি থেকে বেরোবার কোন পথ আছে?'

'তা ঠিক বলতে পারব না। গতকালই প্রথম এসেছি আমি এখানে।'

'জয়দ্রথ কখন আসবে বলে গেছে কিছু?'

স্যালিকে আর জবাব দিতে হলো না। একটা জীপ জোরে ব্রেক কষে স্কিড করে থামল গাড়ি-বারান্দায়। স্যালিকে পাশের ঘরে যাবার জন্যে মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে ইঙ্গিত করল রানা। দ্রুত চোখ বুলাল সে ঘরের চারধারে। অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় এমন একটা জিনিসও চোখে পড়ল না ওর। টেবিলের ওপর থেকে দুটো

কাঁচের পেপার ওয়েট তুলে নিল হাতে। কয়জন লোক আসছে কে জানে। দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়াল রানা দরজা থেকে চার হাত দূরে। পায়ের শব্দ শুনে রানা আন্দাজ করল দু'জন লোক এগিয়ে আসছে এই ঘরের দিকে।

কথা বলতে বলতে ঢুকল জয়দ্রথ মৈত্র। পেছনে পেছনে এল কোমরে রিভলভার ঝোলানো একজন পদস্থ মিলিটারি অফিসার।

'হোয়্যার ইজ দা সোয়াইন?' জিজ্ঞেস করল অফিসার।

প্যানিক চেয়ারটা খালি দেখেই আঁতকে উঠল জয়দ্রথ। ধাঁই করে একটা ভারি পেপার ওয়েট গিয়ে লাগল মিলিটারি অফিসারের নাক বরাবর। নাকে হাত দিয়ে বসে পড়ল প্রকাণ্ড চেহারার লোকটা, তারপর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে জ্ঞান হারিয়ে। দ্বিতীয় ঢিল ছুঁড়ল রানা জয়দ্রথের মাথা লক্ষ্য করে। দ্রুত মাথা সরিয়ে নিয়ে লক্ষভ্রষ্ট করে দিল জয়দ্রথ রানাকে। সোজা ওপাশের দেয়ালে লেগে চৌচির হয়ে গেল কাঁচের পেপার ওয়েট।

বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা জয়দ্রথের ওপর। কিন্তু নাকে-মুখে দমাদম কয়েকটা ঘুসি খেয়ে থমকে দাঁড়াল সে। শক্তিতে কিছু কম হলেও অত্যন্ত দ্রুত হাত-পা চালাতে পারে জয়দ্রথ মৈত্র। সেই সঙ্গে বুদ্ধিও। পেছন ফিরেই দৌড় দিল সে। রানা ছুটল পেছনে, অফিসারের কোমর থেকে রিভলভার নিতে গেলে হারিয়ে ফেলবে জয়দ্রথকে, তাই খালি হাতেই। চিৎকার করে লোক ডাকছে জয়দ্রথ। শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে পেছনের দিকের বারান্দায় পড়ল—তারপর ড্রইং-রুমের পাশ দিয়ে ছুটল সে। যাবার সময় ড্রইং-রুমের দরজায় লাগানো একটা কলিং বেল টিপে দিল একবার। পেছন থেকে ধাওয়া করে প্রায় ধরে ফেলবে রানা এমন সময় হঠাৎ রুখে দাঁড়াল জয়দ্রথ মৈত্র। হাতে উদ্যত ছুরি।

সময় মত সাবধান না হলে ঢুকে যেত ছুরিটা রানার বুকে। ওর হাত ধরে ফেলল রানা, তারপর যুযুৎসুর এক প্যাঁচে দড়াম করে আছড়ে ফেলল মাটিতে। মাথাটা জোরে ঠুকে গেল মেঝেতে। কিন্তু ছুরিটা ছাড়ল না সে হাত থেকে। প্রচণ্ড ওজনের গোটা দুই লাথি লাগাল রানা জয়দ্রথের পাঁজরে। কুঁকড়ে গেল ওর দেহটা যন্ত্রণায়। বিলিয়ার্ড বলের মত চকচকে গোল মাথায় একটা লাথি মারতেই বুদ্বুদের মত ফুলে উঠল জায়গাটা।

এমন সময় বুটের আওয়াজ পাওয়া গেল। দৌড়ে এদিকে আসছে কয়েকজন লোক। চিৎকার করবার চেষ্টা করল জয়দ্রথ, কিন্তু ভাঙা একটা কর্কশ শব্দ বেরোল ওর মুখ থেকে। মৃত্যুর বিভীষিকা ওর চোখে-মুখে। আরেকটা লাথি মারল রানা ওর মাথায়। সাময়িক ভাবে জ্ঞান হারাল জয়দ্রথ। এবার জয়দ্রথের একটা হাত ধরে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল রানা। ডাইনিং রুম।

এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ। বুকের ওপর চেপে বসে গলা টিপে ধরল রানা জয়দ্রথের। হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেল জয়দ্রথ। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে হলুদ চোখ দুটো। তখনও ছুরিটা ধরা আছে ওর হাতে। চেষ্টা করল সে একবার। ডান হাতটা ওঠাল দুর্বলভাবে। রানার পিঠে বসাবার চেষ্টা করল ছুরি। খোঁচা খেয়েই গলা থেকে একটা হাত সরিয়ে কেড়ে নিল রানা ছুরিটা। এবার পা দুটো মাটিতে আছড়ে প্রহরীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করল জয়দ্রথ। রানা দেখল এভাবে এর

পেছনে সময় নষ্ট করা যায় না, ধরা পড়ে যাবে। নিষ্ঠুরভাবে ওর গলায় ছোরা চালাল সে। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। ছিটকে এসে লাগল রানার চোখে মুখে। মাথাটা একদিকে হেলে পড়ল জয়দ্রথের। ফাঁক হয়ে আছে গলা। কলকল করে রক্ত গড়িয়ে যাচ্ছে মেঝেতে।

ছুরি হাতে প্রস্তুত থাকল রানা। কিন্তু না। ডাইনিং রুমটা ছাড়িয়ে দৌড়ে চলে গেল ওরা সামনে। পর্দার নিচ দিয়ে ওদের বুট দেখতে পেল রানা। জনা ছয়েক হবে।

এবার ধীর পায়ে পেছনের দিকে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। অন্ধকার হয়ে গেছে বাইরেটা। যদি এখান থেকে বেরোতে না পারে তবে যতগুলোকে সম্ভব শেষ করে তারপর মৃত্যুবরণ করবে সে। হঠাৎ পঞ্চাশ গজ দূরে বালির ঢিবিটার কথা মনে পড়ল ওর। মৃতদেহ দুটোর সঙ্গে সাব-মেশিনগানটার কথাও মনে এল। এতক্ষণ পর্যন্ত ওগুলো যথাস্থানে আছে কিনা কে জানে। আবার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল করিডরে। দরজা খুলে বাড়িটার পেছন দিকে বেরিয়ে এল রানা। সার্চ লাইটের আলোটা একবার ঘুরে যেতেই দৌড় দিল সে। পাওয়ার জেনারেটারের পাশ দিয়ে সামনের আলোকিত খোলা মাঠে পড়ল এবার। এক ছুটে চলে এল বালির ঢিবিটার কাছে।

আছে। টান দিয়ে সাব-মেশিনগানটা বের করে বালি ঝেড়ে নিল রানা। একজন মৃত প্রহরীর কব্জি পর্যন্ত হাত বেরিয়ে পড়ল বালির নিচ থেকে। রওনা হতে গিয়েও থেমে দাঁড়াল রানা, টেনে বের করল সে মৃতদেহটা। দুটো এক্সট্রা ম্যাগাজিন টান দিয়ে বের করল মৃত ব্যক্তির কোমরের বেল্ট থেকে।

ছয়জন প্রহরী রাইফেল হাতে জয়দ্রথের বাংলোর পেছন দিয়ে বেরিয়ে এল। জয়দ্রথের মৃতদেহ দেখতে পেয়েছে নিশ্চয়ই, তাই বেরিয়ে এসেছে পেছনের খোলা দরজা দিয়ে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ট্রিগার টিপল রানা। বিকট চিৎকার করে মাটিতে আছড়ে পড়ল সব ক'জন। এবার ছুটল রানা ল্যাবরেটরি ঘরগুলোর পেছন দিয়ে সোজা উত্তর দিকে। কিন্তু এক নম্বর ঘরটার পেছনে পৌঁছতেই আকাশ কাঁপিয়ে বেজে উঠল সাইরেন। এলাকার সবাইকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে বিপদ-সঙ্কেত দিয়ে। চারদিকে খবর হয়ে গেছে। গেট থেকে আট দশজন ছুটল সোজা রাস্তা ধরে জয়দ্রথের বাড়ির উদ্দেশে। সেন্ট্রি-ব্যারাক থেকে হুড়মুড় করে বেরোচ্ছে দলে দলে ইউনিফর্মবিহীন সশস্ত্র প্রহরী। পাগল হয়ে খুঁজছে রানাকে সার্চ লাইটের আলো। এক ছুটে পুকুর ধারে চলে এল রানা। তারপর আরেক দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই গর্জে উঠল কয়েকটা মেশিনগান এবং রাইফেল। আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিগুলো। সার্চ লাইটটা রানার ওপর এসে স্থির হয়ে গেছে। প্রথমেই গুলি করে সার্চ লাইট নিভিয়ে দিল রানা, তারপর শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে কোণাকুণি এগোল ইউক্যালিপ্টাস গাছের দিকে। হৈ-হৈ করে এগিয়ে আসছে একদল। আবার গুলি করল রানা। চিৎকার করে কয়েকজন পড়ে গেল মাটিতে, বাকি ক'জন শুয়ে পড়ল মাটিতে। বিশগুলির ম্যাগাজিন শেষ হয়ে গিয়েছে, ওটা ফেলে দিয়ে আরেকটা ম্যাগাজিন ভরল রানা। তারপর অন্ধকার মাঠের ওপর দিয়ে প্রাণপণে বুকে হেঁটে এগিয়ে চলল সামনে। ঘাসবিহীন শুকনো মাটিতে ঘষা লেগে ছড়ে গেল দুই কনুই ও

হাঁটুর চামড়া। আরও লোক আসছে এগিয়ে। রানাকে দেখতে পাচ্ছে না ওরা। ক্রমেই আরও অন্ধকারে সরে যাচ্ছে সে। কিন্তু পেছনে আলোকিত রাস্তা থাকায় রানা দেখতে পাচ্ছে প্রহরীদেরকে পরিষ্কার। আর একটু ডাইনে সরে গেল রানা। আরও বেশ খানিকটা দূরে আছে দেয়ালটা। গুলি এসে বিঁধছে আশেপাশে। খাবলা খাবলা মাটি লাফিয়ে উঠছে আধ হাত।

সাইরেন, গোলমাল ও গুলিগালাচের শব্দে হতচকিত হয়ে উত্তর-পূর্ব কোণের গার্ড পোস্ট থেকে বেরিয়ে এল দু'জন। কয়েক পা এগিয়ে ধরাশায়ী হলো দু'জনেই নিজের পক্ষের সাব-মেশিনগানের গুলিতে। ব্যারাকের লোকগুলোও এতক্ষণে এসে যোগ দিয়েছে! 'ঠা-ঠা-ঠা-ঠা-ঠা' মেশিনগান চলছে—দুই হাত থর থর করে কাঁপছে, সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে 'টাশ্' করে উঠেছে রাইফেলের গুলি। রীতিমত রণাঙ্গন হয়ে গেছে যেন এলাকাটা।

'হত্যা করতে হবে। যতগুলোকে পারা যায় হত্যা করতে হবে। খুন চেপে গেছে রানার মাথায়। আবার গর্জে উঠল রানার মেশিনগান। গরম হয়ে উঠল ব্যারেলটা। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ল কয়েকজন। এগিয়ে চলল রানা বুকে হেঁটে। পিছন পিছন মিলিটারি সেন্ট্রিরাও এগোচ্ছে বুকে হেঁটে। খালি ম্যাগাজিন ফেলে দিয়ে শেষ ম্যাগাজিনটা ভরে নিল রানা দুই সেকেণ্ড থেমে। দেয়ালের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে এবার রানা। মোটা গাছটার আড়ালে উঠে দাঁড়াল সে।

এমনি সময় 'বুম' করে একটা বোমা ফাটল আকাশে। আলোকিত হয়ে গেল চারদিক। জ্বলন্ত ম্যাগনেশিয়ামের তীব্র আলো ছোট্ট একখানা প্যারাস্যুটে ভর করে ধীরে নামছে নিচে। রাতকে দিন বানিয়ে দিল সেই আলো। পরিষ্কার দেখতে পেল রানা বেশ কাছেই দ্রুত বুকে হেঁটে জনা দশেক প্রহরী এগিয়ে আসছে রাইফেল হাতে। একটু হলে ধরে ফেলত রানাকে। নির্বিচারে গুলি চালাল রানা উঁচু থেকে। বড়শি বাধিয়ে ডাঙায় তোলা চিতল মাছের মত লাফাতে থাকল কয়েকজন। নরক হয়ে গেল জায়গাটা। রক্ত, ধোঁয়া, করডাইটের গন্ধ, আর সেই সঙ্গে যন্ত্রণা-কাতর আহত প্রহরীর ভয়াবহ চিৎকার।

অপর পক্ষ থেকেও কয়েকটা মেশিনগান ও রাইফেল গর্জে উঠল। অনেকগুলো এসে লাগল গাছে, বাকিগুলো গিয়ে বিঁধল দেয়ালে। আবার গুলি চালাল রানা। কয়েকটা বেরিয়েই শেষ হয়ে গেল গুলি। ধক্ করে উঠল রানার বুকের ভেতরটা। আর রক্ষে নেই। টের পেলেই এগিয়ে আসবে ওরা নির্ভয়ে। কুকুরের মত গুলি করে মারবে ওকে। দেয়ালের দিকে চাইল রানা। কই, মিত্রা তো এল না! রশি ফেলবে বলেছিল। কোথায়? হয়তো আজ ঢুকতেই পারেনি ও। কিংবা হয়তো এসে পৌঁছোয়নি এখনও। আটটা কি বেজেছে?

আবার, না-ও তো আসতে পারে মিত্রা। রানার বন্দী হবার খবর যদি ওর কানে গিয়ে থাকে তাহলে হয়তো আসার প্রয়োজনই বোধ করেনি সে। শির শির করে একটা ভয়ের ঠাণ্ডা শিহরণ মেরুদণ্ড বেয়ে উঠে এল রানার। আর রক্ষে নেই।

মিত্রার ওপর নির্ভর না করে সোজা গেটের দিকে যাওয়াই বোধহয় উচিত ছিল। এক্ষুণি ওরা টের পেয়ে যাবে রানার হাতে আর গুলি নেই। ধীরে ধীরে এগিয়ে

আসছে ওরা আর অবিরাম গুলিবর্ষণ করছে।

প্যারাস্যুটে চড়ে ম্যাগনেশিয়ামের আলো নেমে এসেছে অনেক নিচে। পুকুরের মধ্যে পড়েই দপ্ করে নিভে গেল আলোটা। অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। গুলি বন্ধ করল সিপাইরা।

ঠিক এমনি সময়ে পেছনে 'সড়াৎ' করে একটা শব্দে চমকে উঠল রানা। মিত্রা না তো? লাফিয়ে উঠল রানার হৃৎপিণ্ড। ছুটে গিয়ে দেয়াল হাতড়াতে আরম্ভ করল ও পাগলের মত। সত্যিই, রশি এসে পড়েছে দেয়াল ডিঙিয়ে। দ্রুত উঠতে আরম্ভ করল রানা রশি বেয়ে।

মাঝ বরাবর উঠতেই 'বুম' করে আরেকটা শব্দ এল কানে। দিনের মত আলোকিত হয়ে গেল আবার চারদিক। দেখে ফেলেছে এবার ওরা রানাকে। হৈ হৈ করে এগিয়ে এল ওরা, কয়েকটা গুলি বিঁধল এসে আশেপাশের দেয়ালে। ছিটকে ইঁটের গুঁড়ো লাগল রানার চোখে মুখে। আবার কয়েক রাউণ্ড গুলি এল ছুটে।

ইউক্যালিপ্টাসের মিষ্টি গন্ধ এল নাকে। লাফিয়ে এদিকে পড়ল রানা দেয়াল থেকে। নামল বটে, কিন্তু নেমে আর উঠতে পারল না। অসম্ভব চোট লেগেছে পায়ে। ছুটে এসে ধরল ওকে মিত্রা। বহুকষ্টে টেনে নিয়ে গেল গাড়ির কাছে। পেছনের দরজা খুলে সাহায্য করল রানাকে ভেতরে ঢুকতে।

কোন মতে আছড়েপাছড়ে উঠল রানা সীটের ওপর।

'খানিকটা ব্র্যাণ্ডি দেব? সঙ্গে আছে।'

'শিগগির গাড়ি ছাড়ো, মিত্রা।' হাঁটুতে হাত বুলাচ্ছে রানা।

গাড়ি ছেড়ে দিল মিত্রা।

প্রহরী দু'জন অবাক হয়ে চেয়ে আছে এদিকে এত গুলি-গোলা, চিৎকার ও সাইরেনের আওয়াজ শুনে। ম্যাগনেশিয়াম ফ্লেয়ার দেখে টের পেয়েছে ওরা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটছে ভেতরে। দূর থেকেই হাত তুলল ওরা। এই অবস্থায় গাড়ি ছেড়ে দিতে পারে না ওরা।

ড্যাশবোর্ড থেকে একটা পিস্তল বের করে রানার হাতে গুঁজে দিল মিত্রা। পয়েন্ট থ্রী-টু ক্যালিবারের 'রণবীর' পিস্তল। ভারতের তৈরি।

লুটিয়ে পড়ল দুই প্রহরী কাঁকর বিছানো রাস্তার ওপর পেট চেপে ধরে। মিত্রা নেমে গিয়ে সাদা-কালো পেইন্ট করা পোস্টটা তুলে দিল। তারপর ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে ছুটল হিন্দুস্তান অ্যামব্যাসাডার ফুল স্পীডে।

# তেরো

৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

রানার সুটকেস নিয়ে এসেছে মিত্রা গাড়িতে করে। কয়েক ঢোক ব্র্যাণ্ডি গিলে নিল রানা। কিছুটা মালিশ করল দুই হাঁটুতে। খিদেতে জ্বলছে পেট। সারাদিন কিচ্ছু খাওয়া হয়নি। কিছুটা চাঙ্গা বোধ করল ব্র্যাণ্ডির কল্যাণে। গাড়ি এখন বারাসতের পথে ছুটছে সত্তর মাইল স্পীডে। স্টিয়ারিং ধরে স্থির হয়ে বসে আছে মিত্রা সেন।

চলল ওরা বর্ডারের পথে। কিন্তু সেখানে পার হওয়া কঠিন হবে। যুদ্ধ বেধে গেছে দুই দেশে, এখন দুই দিকের সীমান্ত প্রহরীই সদা সতর্ক। ভারত থেকে যদি বহু কষ্টে বেরোতে পারে তবে মারা পড়বে গিয়ে ই. পি. আরের গুলি খেয়ে। কি করা যায়? প্ল্যান চলছে রানার মাথায় আশি মাইল স্পীডে।

তাছাড়া নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে সবাইকে ইনফরম করা হয়ে গেছে। টিটাগড় থেকে কলকাতার দিকে গেলে এতক্ষণে ধরা পড়ে যেত। ব্যারাকপুর সামরিক ঘাঁটি পার হয়ে আসতে পেরেছে দেখে একটু নিশ্চিন্ত হলো রানা। বুদ্ধি বের করার সময় পাওয়া যাবে এখন। পথের মধ্যেই যে বাধা দেয়া হবে রানাকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সহজে ছাড়া হবে না তাকে।

বারাসতে পৌছে বনগাঁ-যশোরের রাস্তায় না গিয়ে সোজা পুবে টাকির রাস্তায় চলল ওরা। যশোরের পথে দুই দেশের সীমান্ত প্রহরী অনেক বেশি তৎপর থাকবে। ওদিকে সুবিধে হবে না। তবে টাকি থেকে পাকিস্তানে ঢোকার তেমন কোন ভাল পথ জানা নেই রানার।

পঁচাত্তরের কোঠায় উঠল মাইল মিটারের কাঁটা। কিন্তু নিশ্চয়ই দ্রুততর কোন গাড়িতে অনুসরণ করবে ওরা। এ ছাড়াও বর্ডারের সৈন্যরা প্রস্তুত থাকবে রানার জন্যে। হঠাৎ মৃদু হাসল রানা। প্ল্যান এঁটে ফেলেছে সে।

এতক্ষণে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে চারদিকে ভাল করে চাইল রানা। আকাশে কৃষ্ণা পঞ্চমীর ম্লান চাঁদ, ঘণ্টাখানেক হলো উঠেছে, পাশে সাদা মেঘের ভেলা। চারদিকে কেমন এক রহস্য। খুশি হয়ে উঠল ওর মন।

মিত্রার ঘড়িতে বাজে রাত ন'টা। আর দশ মাইল পরই বশিরহাট। এতক্ষণেও কোথাও বাধা পেল না দেখে একটু অবাকই হলো রানা। দুই হাঁটুতে অনেকক্ষণ মালিশের পর বেশ খানিকটা সুস্থ বোধ করল সে। সীট ডিঙিয়ে মিত্রার পাশে গিয়ে বসল। যাক, শেষ হলো নাটক—ভারতনাট্যম।

জোর বাতাসে উড়ছে মিত্রার খোলা চুল। মুখের এক পাশে পড়েছে চাঁদের আলো। মৃদু হাসল মিত্রা। কেঁপে উঠল যেন সারাটা আকাশ। রানা ভাবল; যে দেখেছে এমন হাসি তার জীবন সার্থক। দু'পাশের মাঠে পাকা আউস ধান দুলছে মৃদু বাতাসে। পৃথিবীটাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে রানার। ঠিক বোঝানো যায় না এই ভাল লাগাটাকে। বিচিত্র মানুষের জীবন। প্রতিপদে যার মৃত্যুর হাতছানি, সেই রানা জানে এই মায়াবী পৃথিবীর কি জাদু। বেঁচে থাকায় কত সুখ। হৃদয়টা উথলে উঠতে চাইল রানার এক অসীম কৃতজ্ঞতায়। কিন্তু কার প্রতি কৃতজ্ঞতা? ঈশ্বর? প্রকৃতি? বুঝতে পারে না রানা। প্রকৃতির মায়া, বন্ধুর বন্ধন, সব মিলিয়ে তীব্র একটা ভাল লাগা—এজন্যে কার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে রানা?

আবোল তাবোল ভাবছে সে।

'জয়দ্রথ আমাদের সহজে ছাড়বে না, রানা,' মিত্রা বলল।

'জয়দ্রথকে শেষ করে এসেছি। কিন্তু ঠিকই বলেছ, টিটাগড়ের ব্যাপারটা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত। সরাসরি ডিফেন্স মিনিস্টারের আণ্ডারে। সহজে ছাড়বে না ওরা।'

'ভেতরে কি দেখলে?'

'পঙ্গপাল।'

রাস্তাটা বাঁয়ে ঘুরেছে। চাঁদটা চলে গেছে পেছনে। হঠাৎ এক সঙ্গে চমকে উঠল মিত্রা ও রানা। সামনের রাস্তায় ছায়া পড়েছে একটা। এক মুহূর্তে বুঝল রানা ব্যাপারটা। চাপা উত্তেজনায় টান হয়ে গেল ওর পেশীগুলো।

'ব্রেক করো! ব্রেক করো, মিত্রা!' চিৎকার করে উঠল রানা।

পনেরো-বিশ গজ স্কিড্ করে থামল গাড়ি। হেড্ লাইট অফ করে দিল মিত্রা।

'শিগগির বেরিয়ে পড়ো গাড়ি থেকে!' পিস্তলটা নিল রানা সঙ্গে। এক ঝটকায় খুলে ফেলল দরজা।

বেরোবার আগেই জ্বলে উঠল সার্চ লাইট। ওদের মাথার পঞ্চাশ গজ ওপরে এসে দাঁড়িয়েছে একখানা হেলিকপ্টার। বিশ্রী আওয়াজ হচ্ছে প্রকাণ্ড রোটর ব্লেড থেকে।

একলাফে বেরিয়ে মিত্রার হাত ধরল রানা। এই সম্ভাবনার কথা একবারও মাথায় আসেনি ওর। ছুটল ওরা মস্ত বটগাছটার দিকে। গজ পনেরো-বিশেক যেতেই প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ হলো পেছনে। সাঁ করে একটা তপ্ত লোহার টুকরো এসে ঢুকল রানার বাম বাহুতে। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। পড়ে যাচ্ছিল, মিত্রার কাঁধ ধরে সামলে নিল। অবশ হয়ে গেছে বাম হাতটা। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে গাড়িটায়। সার্চ লাইটটা আবার খুঁজে বের করল ওদের। এক চোখ মেলে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে যেন অগ্নিবর্ষণ করছে ওদের ওপর। এগিয়ে আসছে এবার ওদের দিকে।

আবার ছুটল ওরা। এক ঝাঁক গুলিবর্ষণ করল কো-পাইলট। কাঁধের কাছ থেকে এক খাবলা মাংস উড়ে গেল রানার। পড়ে গেল সে মাটিতে। আর অল্প বাকি আছে বটগাছ তলায় পৌঁছতে। বাঁচার তাগিদে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল রানা এবার।

ঝিঁঝি ডাকছে চারপাশে। প্রকাণ্ড ডালপালা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে বটগাছটা। ওর তলায় কিছুটা নিরাপদ বোধ করল রানা। গাছের গায়ে বিঁধে যাচ্ছে কো-পাইলটের গুলিগুলো; কোন কোনটা আবার ডালে পিছলে 'বিঙঙ্' শব্দ তুলে চলে যাচ্ছে অন্যদিকে। টেনে তুলে রানাকে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসাল মিত্রা। গুলি খাওয়া হাত থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে। কাঁধের জখম থেকে রক্ত ঝরে ভিজে গেছে রানার শার্ট। হাতটা বেঁধে দিল মিত্রা শাড়ি ছিঁড়ে। কিন্তু তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই কয়েক পরতা কাপড় ভেদ করে টপ্টপ্ করে রক্ত ঝরতে থাকল আবার। বড় অসহায় এবং দুর্বল মনে হলো রানার নিজেকে। সে কি করবে? একটা গোটা দেশের বিরুদ্ধে কি করবে সে একা?

গুলি চালানো বন্ধ হয়েছে। অনেক নিচে নেমে এসেছে পঙ্গপালের মত দেখতে কুৎসিত যন্ত্র দানবটা। হঠাৎ ছোট কি একটা জিনিস টুপ্ করে পড়ল কয়েক হাত দূরে।

'হ্যাণ্ড গ্রেনেড! মিত্রা! আড়ালে চলে যাও। কানে আঙুল দাও, জলদি!'

রানাও সরে এল বটগাছের প্রকাণ্ড গুঁড়ির আড়ালে। প্রচণ্ড শব্দে ফাটল হ্যাণ্ড গ্রেনেড। থেমে গেল ঝিঁঝি পোকার ডাক। পাতার খানিকটা ফাঁকা অংশ দিয়ে দেখা গেল খোলা ককপিটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কো-পাইলট। ধীরে ধীরে নামছে হেলিকপ্টার রাস্তার ওপর। গুলি করল রানা পর পর দু'বার। আবার পাতার আড়ালে চলে গেল হেলিকপ্টার। তিন সেকেণ্ড পরই ধপাস্ করে রাস্তার ওপর পড়ল কো-

পাইলটের লাশটা।

ধীরে ধীরে নেমে এল হেলিকপ্টার পিচ ঢালা রাস্তার ওপর। ওদের দেখতে পেয়ে হুইল এবং রোটর ব্রেক করে কক্‌পিটের সামনে এসে দাঁড়াল পাইলট, হাতে মৃত কো-পাইলটের ব্রেন গান।

দুর্বলতায় হাত কাঁপছে রানার। পরপর চারটে গুলি করল সে পাইলটকে লক্ষ্য করে। কোন্ গুলিটা লাগল বোঝা গেল না। বোধহয় শেষটা, কিংবা তার আগেরটা হবে। ধনুষ্টঙ্কারের রোগীর মত বেঁকে গেল পাইলটের দেহ। ট্রিগারে হাত পড়ে গেল—লক্ষ্যহীন ভাবে আকাশের দিকে পনেরো-বিশবার অগ্নিবর্ষণ করে স্তব্ধ হয়ে গেল ব্রেন গান। লুটিয়ে পড়ল পাইলট হেলিকপ্টারের মেঝেতে। একটা পা বেরিয়ে থাকল কক্‌পিট থেকে।

রক্ত! প্রচুর রক্তক্ষরণে অবশ হয়ে গেছে রানার দেহ। জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে সে ধীরে ধীরে। শত্রু এলাকার মধ্যে জ্ঞান হারালে চলবে না। সমস্ত মনোবল একত্র করবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু বুঝল ক্রমেই ঝিমিয়ে আসছে ওর স্নায়ুগুলো।

আশপাশের গ্রাম থেকে লোকজনের হৈ-হল্লা শোনা যাচ্ছে। এগিয়ে আসছে ওরা মশাল এবং লণ্ঠন হাতে করে। উপায় নেই। ধরা পড়ে যাচ্ছে ওরা। ছুটে গিয়ে গাড়ির ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে থেকে রানার সুটকেসটা টেনে বের করল মিত্রা। ডালাটায় আগুন জ্বলছে এখনও। ব্র্যাণ্ডির বোতলটা বের করে নিয়ে দিশেহারার মত ছুটে এল মিত্রা রানার কাছে। লোকজন তখন বেশ কাছে চলে এসেছে। সময় নেই। যে করেই হোক রানাকে সজ্ঞান রাখতে হবে।

কয়েক ঢোক ব্র্যাণ্ডি খেয়ে উঠে বসল রানা। চারপাশের অবস্থাটা বুঝে নিয়ে বলল, 'আমাকে একটু ধরো, মিত্রা। হেলিকপ্টারের কাছে নিয়ে চলো।'

কক্‌পিটের দরজা খোলা। কিন্তু সিঁড়ি নেই। রানার পক্ষে ওখানে ওঠা সম্ভব নয়। মিত্রা ভাবল, হেলিকপ্টারের ভিতরে যখন উঠতে চাইছে, তখন নিশ্চয়ই কোন গল্প বানিয়ে বলতে চায় রানা ওই গ্রামবাসীদের।

লাফিয়ে দু'হাতে ধরল মিত্রা কক্‌পিটের নিচের অংশ। অনেক কসরত করে আঁচড়ে-খামচে উঠে পড়ল ভেতরে। ওপরে উঠে সিঁড়ি নামিয়ে দিল নিচে। ধীরে ধীরে উঠে এল রানা সিঁড়ি বেয়ে হেলিকপ্টারের ভিতর। মিত্রা সাহায্য করল ওকে হাত ধরে। পাইলটের পা ভাঁজ করে ভিতরে নিয়ে এল রানা।

'সিঁড়ি তুলে ফেলো।'

সিঁড়ি তুলে ফেলল মিত্রা। কক্‌পিটের দরজাও বন্ধ করে দিল রানার হাতের ইশারায়। ড্রাইভিং সীটে বসে পড়ল রানা।

'আমার সীট বেল্টটা বেঁধে দাও তো, মিত্রা। তুমিও বসে পড়ো ওই সীটে।'

কথামত কাজ করল মিত্রা। তারপর অবাক হয়ে দেখল যন্ত্রপাতি নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করেছে রানা।

রাডার পেডালগুলো পা দিয়ে ছুঁয়ে দেখে নিল রানা, তারপর রোটর ব্রেকটা ছেড়ে দিয়ে পিচ কন্ট্রোলের থ্রটল্ একটু ঘোরাল। প্রকাণ্ড পাখাটা ঘুরতে আরম্ভ করল। প্রথম কয়েক পাক ভয়ানক লাগল প্রকাণ্ড রোটরের ছায়াটা দেখতে। ধীরে ধীরে রোটর স্পীড ইণ্ডিকেটারের কাঁটা উঠতে থাকল ওপরে। টেইল রোটরের

দিকে পিছন ফিরে একবার চাইল রানা। ইণ্ডিকেটারে যখন দেখা গেল স্পীড মিনিটে দু'শো পাক, তখন হুইল ব্রেক ছেড়ে দিয়ে আস্তে পিচ লিভারটা ওপরে টেনে থ্রট্‌ল্ ঘোরাল সে আরও খানিকটা। কেঁপে উঠল হেলিকপ্টার। উড়ি উড়ি করেও যেন প্রকাণ্ড পতঙ্গ সাক্‌সিঙ্কটা মায়া কাটাতে পারছে না মাটির।

লণ্ঠন এবং মশাল হাতে নিয়ে বহু লোক জড়ো হয়ে গেছে রাস্তার দুই ধারে। ধুলো উড়ছে বলে নাকে কাপড় দিয়েছে বেশির ভাগ, কিন্তু স্পষ্ট উদ্বেগ দেখল রানা ওদের চোখে। রানা হাত নাড়ল ওদের দিকে। ওরাও ধন্য হয়ে গিয়ে হাত নাড়াতে থাকল।

আরও খানিকটা থ্রট্‌ল্ দিতেই প্রকাণ্ড পঙ্গপাল শূন্যে উঠে গেল। তিনশো গজ ওপরে উঠে নিচে চেয়ে দেখল রানা একবার। তখনও হাত নাড়াচ্ছে সরল গ্রামবাসী। কয়েকজন ঘিরে দাঁড়িয়েছে রাস্তায় পড়ে থাকা মৃত দেহটাকে, আর কিছু লোক চলে গেছে গাড়ির ধ্বংস স্তূপের কাছে।

দুই হাঁটুর মাঝখানে জয়-স্টিক্‌টা ঠেলে দিল রানা সামনে, সেই সঙ্গে দিল লেফট রাডার।

'বর্ডার পেরোবে কি করে? অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট্ গান নিয়ে তৈরি হয়ে আছে দুই দিকের সীমান্ত প্রহরী!' মিত্রার কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

'হিন্দুস্তান গার্ড কিছু বলবে না। এটা ভারতীয় এয়ারফোর্সের মার্কা মারা হেলিকপ্টার। আর পাকিস্তান গুলি ছোঁড়ার আগে নামবার আদেশ দেবে। ভদ্রলোকের মত নেমে পড়ব, ভয় কি?'

আরও কয়েক ঢোক ব্র্যাণ্ডি গিলে নিয়ে হেড ফোনটা কানে লাগিয়ে নিল রানা।

আর রানাকে ঘিরে স্বপ্নের জাল বুনে চলল মিত্রা সেন।

# স্বর্ণমৃগ

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭

## এক

চোখ তুলে তাকাল রানা।

'করাচি?'

স্থির হয়ে বসে আছেন পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কর্ণধার মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। ধনুকের ছিলার মত টান টান, লম্বা, ঋজু দেহ। দৃষ্টিতে ক্ষুরের ধার। পুরু বেলজিয়াম কাঁচ ঢাকা মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওধারে পিঠ-উঁচু রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন তিনি। মৃদু হাসলেন।

'হ্যাঁ। এবার গোল্ড স্মাগলিং।'

'আমরা কেন, স্যার? পুলিসের কাজ না?'

হাডসন হাভানার প্যাকেট থেকে একখানা সেলোফেন মোড়া চুরুট বের করলেন বৃদ্ধ। সযত্নে কাগজ ছাড়িয়ে দাঁতে চেপে ধরে অগ্নিসংযোগ করলেন। পাতলা সাদা একফালি ধোঁয়া চোখে যাওয়ায় চোখ দুটো পেঁচিয়ে উপর দিকে ঘুরিয়ে আঙুলের ফাঁকে নিলেন চুরুটটা। তারপর দৃষ্টি রাখলেন রানার চোখে।

'সোনা আসছে মিড্‌ল্-ঈস্ট থেকে। পুরো চ্যানেল ক্লোজ করতে হবে। কাজেই ব্যাপারটা কয়েক হাত ঘুরে আমাদের হাতে এসেছে। স্ম্যাশ করতে হবে এমন একজন লোককে যে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এ কাজটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে ঢাকা থেকে আমাদের একজনকে পাঠাতে হচ্ছে।'

'লোকটাকে যদি চেনাই যায়, তাহলে...'

'কেউ চেনে না তাকে। অদ্ভুত ধূর্ত এক কৌশলী আর ক্ষমতাশালী লোক আছে এর পেছনে, যাকে কোনমতেই মুখোশ খুলে টেনে আনা যাচ্ছে না অন্ধকার থেকে আলোয়। এই ফাইলটা পড়লেই সব বুঝতে পারবে।'

একটা মোটা ফাইলের মধ্যে লাল ট্যাগ আঁটা। তাতে ইংরেজিতে লেখা 'টপ সিক্রেট'। ফাইলটা ধড়াশ করে ফেললেন রাহাত খান রানার সামনে টেবিলের উপর। প্রচুর ঘাঁটাঘাঁটির ফলে কাভারটা নরম হয়ে এসেছে। কিনারা ছিঁড়ে গেছে দু'এক জায়গায়।

'এটা মন দিয়ে পড়ো গিয়ে। পরে ডাকব আবার আমি। আজ অনেক কাজ। কখন সময় পাব ঠিক বলতে পারছি না। যদি অফিস আওয়ার পার হয়ে যায় সিনক্রাফোনটা সাথে রেখো।'

'আচ্ছা, স্যার।'

'এখন আর কোন কথা নেই। যেতে পারো।'

আস্তে দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে নিজের কামরায় যাচ্ছিল রানা ফাইলটা তুলে

নিয়ে। খোলা দরজা দিয়ে রানাকে দেখতে পেয়ে হৈ-হৈ করে ডাকল চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কর্নেল শেখ।

'আরে এসো, এসো! অত ব্যস্ত হবার কি আছে?' রানার হাতের ফাইলটা দেখে বলল, 'আমি জানতাম, তোমাকেই গছাবে ফাইলটা।'

'বুড়োকে ভারী সিরিয়াস মনে হচ্ছে?' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল রানা।

'ভয়ানক। গত দশ দিন ধরে এ ছাড়া অন্য চিন্তা নেই মাথায়। অন্তত একশো জন লোককে ডেকেছে নানান ডিপার্টমেন্ট থেকে। গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর কি করেছে আল্লামালুম। শেষে আজ আমাকে হুকুম করেছে তোমাকে তলব করবার জন্যে।'

'সাধারণ একটা গোল্ড স্মাগলার···

'সাধারণ নয়!' বাধা দিল কর্নেল শেখ। 'সাধারণ ব্যাপার নিয়ে আমরা ডীল করি না। আমি যদ্দূর জানি, এবার যদি ভালয় ভালয় ফিরে আসতে পারো, জানবে মস্ত ফাঁড়া কাটল।'

'থ্রী কাস্‌ল্‌স'-এর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল কর্নেল শেখ। কারও অর্ডার ছাড়াই যখন দু'কাপ কফি এসে হাজির হলো, তখন রানা বুঝল খামোকা গল্প করবার জন্যে তাকে ডাকেনি কর্নেল, ব্যাপারটা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। মুখে কিছুই বলল না সে। কফিতে চুমুক দিয়ে চেয়ে থাকল শেখের মুখের দিকে।

'সাধারণ হলে আর তোমাকে ঢাকা থেকে করাচি দৌড়াতে হত না। লোকটা এতই ক্ষমতাশালী যে আমাদের করাচি-ব্রাঞ্চকে পর পর তিনজন অপারেটর হারাতে হয়েছে।'

'খুন?'

'তবে আর বলছি কি? দুই-এক কদম অগ্রসর হলেই খতম করে দিচ্ছে বিনা দ্বিধায়। তোমাকে পাঠাবার পেছনে সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে এই যে তোমাকে চেনে না ওরা। বীচ লাগজারি হোটেলে ধনীর দুলাল সেজে উঠতে হবে তোমাকে। তাড়াহুড়ো করে কিছুই করা চলবে না। এমন কি বরাবরের মত একবারও রিপোর্ট করতে হবে না তোমাকে করাচি অফিসে। যেন কোন ভাবেই টের না পায় ওরা যে এই কাজে গিয়েছ তুমি।'

'এত ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় কেন? একটা লোক···

'চিনতে পারলে তো একটা লোক!' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল কর্নেল শেখ, 'এখন সে একটা অদৃশ্য শক্তি। যে-কেউ যে মতলব নিয়েই লাগুক না কেন পিছনে, আশ্চর্য উপায়ে টের পেয়ে যাচ্ছে সে, আর অনায়াসে নিষ্কণ্টক করে ফেলছে রাস্তা। এখানে বসে তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না। ওখানে গেলেই টের পাবে কতখানি শক্তিধর সে। রঙ্গমঞ্চে ওর ছায়াও দেখতে পাবে না—অথচ সে-ই হিরো।'

'ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ কেন খামোকা? তোমারও দেখছি বুড়োর রোগে ধরেছে—কোনও কাজে পাঠানোর আগে চোদ্দবার বলবে, সাবধান! আমাকে কি কচি খোকা পেয়েছ যে জুজুর ভয় দেখাচ্ছ?'

'অন্যান্যদের তুমি চিনবে না, রানা। কিন্তু একজনের নাম বললেই তুমি

ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারবে। তোমার সাথে কয়েকটা মিশনে ছিল। সিন্ধি ছেলে...'

'আলতাফ!'

'হ্যাঁ। কেউ ছুরি দিয়ে ওর সারা শরীর কেচেছে মোরোব্বার মত। তিন দিন পর ফুলে ভেসে উঠেছে লাশ কেমাড়িতে। সাগরের ঢেউ এসে ফেলে গেছে মৃতদেহটা তীরে। বীভৎস সে দৃশ্য। ছবি দেখতে পারো।'

একটা ছবি বের করে দিল কর্নেল শেখ ড্রয়ার থেকে। সত্যিই বীভৎস দৃশ্য। অনায়াসে চিনতে পারল রানা ওর গলার তাবিজ দেখে। মনে পড়ল বিদ্যুৎগতি সেই সিন্ধি যুবকটির কথা। ছ'ফুট লম্বা, পেটা শরীর। একসাথে পাশাপাশি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে ওরা বিপদের মুখোমুখি। রানা বুঝেছিল, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে তার সমকক্ষ যদি কেউ থাকে তবে এই আলতাফ। সেই বুদ্ধিমান করিৎকর্মা ছেলেটির এই দশা যে করতে পারে সে নিশ্চয়ই অবহেলার পাত্র নয়। কঠিন হয়ে উঠল রানার মুখ, দৃঢ় একটা প্রতিজ্ঞার ছাপ ফুটে উঠল সে-মুখে স্পষ্ট। ধীরে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল ছবিটা।

'আমি যাব করাচি।'

মৃদু হাসি কর্নেল শেখের ঠোঁটে। সিগারেটটা ফেলে দিল অ্যাশট্রেতে।

'এবার বুঝতে পারছ গুরুত্বটা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'শুধু এ নয়, আরও দু'জন ছেলেকে হারিয়েছি আমরা। একজনকে খুন করা হয়েছে দিন দুপুরে ম্যাকলিওড রোডের উপর। ছাতের ওপর থেকে কেউ মস্ত একটা পাথর ফেলে থেঁতলে মেরেছে ওকে ফুটপাথের ওপর। আর তৃতীয় জন...'

'আচ্ছা, সেই অদৃশ্য লোকটির সম্পর্কে কোনও তথ্যই জানা যায়নি যাতে তাকে খুঁজে বের করার কাজে কিছুমাত্র সাহায্য হতে পারে?'

'উঁহুঁ। কিচ্ছু না। ভিট্ আয়ল্যাণ্ডের সাধারণ স্মাগলার সে নয়, এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়। অল্পদিন হলো নেমেছে সে এই লাইনে, এরই মধ্যে সবার মাথার ওপর উঠে গেছে। ছোটখাট গোল্ড স্মাগলার ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে এর চেলা হয়ে গেছে। হিউজ স্কেলে কারবার চলছে এখন।'

'আমাকে এগোতে হবে কোন্ সূত্র ধরে? ওদের দলে ঢোকার চেষ্টা করব?'

'ওসব করে কোনও লাভ নেই। আপাতত কিছুদিন তুমি বীচ লাগ্জারী হোটেলে থাকবে নিষ্ক্রীয় ভাবে। আমরা যখন বুঝব যে তার চোখে তুমি পড়োনি, তখন এখান থেকে লাইন-অভ-অ্যাক্শন জানিয়ে প্রসিড করতে বলা হবে তোমাকে। আর যদি দেখা যায় টের পেয়ে গেছে ওরা, তাহলে অ্যাবাউট টার্ন করবে। তখন অন্য পথে এগোব আমরা।'

কফিটা শেষ করে উঠে দাঁড়াল রানা।

'থ্যাঙ্ক ইউ, শেখ।'

'অলওয়েজ মেন্শন্।'

বেরিয়ে গেল রানা ঘর থেকে।

মোটা ফাইলটা বগলে চেপে ছ'তালায় নিজের কামরায় ঢুকেই অবাক হয়ে গেল

রানা। সোহেল। রানার চেয়ারে আরাম করে বসে জুতো সুদ্ধ দুই পা তুলে দিয়েছে সে টেবিলের উপর। ডান পা-টা প্রবল বেগে নাচাচ্ছিল, রানাকে দেখে নাচ বন্ধ করে সেটা দিয়ে একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল। গম্ভীর, চিন্তান্বিত মুখে রাহাত খানের অনুকরণে বলল, 'বোসো। তোমার জন্যে একটা অ্যাসাইনমেন্ট...'

হঠাৎ এতদিন পর সোহেলকে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে ছুটে গিয়ে ওর কান ধরল রানা। মুখে বলল, 'এক লাত্ মেরে স্টেডিয়ামের মাঠে নামিয়ে দেব, শালা। ওপর-আলার সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় জানো না? দাঁড়াও, তোমার চাকরি খেয়ে দিচ্ছি আমি।'

সোহেলও ক্যাঁক্ করে চিমটে ধরেছে রানার পেটের চামড়া। বলল, 'কান ছাড়, শালা উল্লুকে পাট্ঠা। ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।'

'তুই আগে পেট ছাড়!'

'তুই আগে ধরেছিস। তুই আগে ছাড়বি। ছাড়লি?'

'আগে পেট ছাড়।'

'কান ছাড়।'

আরও কতক্ষণ চলত বলা যায় না। হঠাৎ দরজার সামনে রানার স্টেনো নাসরীন রেহানাকে ইউ. এন. ও.-র মত অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দু'জনই লজ্জা পেয়ে গেল। বিনা বাক্যব্যয়ে যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করে বসে পড়ল যেন তাসখেন্দ বৈঠকে। রেহানার উপর হুকুম হলো দু'কাপ কফি সাপ্লাইয়ের।

'তুই হঠাৎ কোত্থেকে, দোস্ত? ডাক-বাংলোর বেয়ারার কাজ ছেড়ে দিয়ে শুনলাম ক'দিন রেল-ইস্টিমারে স্বপ্নে পাওয়া দাঁতের মাজন আর খুজলি-পাঁচড়ার মলম বিক্রি করছিলি। ছেড়ে দিলি নাকি সে বিজনেস?'

নিঃশব্দে হাসল সোহেল।

'স্পেশাল মেসেজ পাঠিয়ে ডেকে আনা হয়েছে আমাকে হেড কোয়ার্টারে, তা জানিস্? তোরা তো শালা এক-একটা অকম্মার ধাড়ি, তাই আমাকে ছাড়া চলল না। এখন থেকে আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে তোদের, বুঝলি?'

'এটা দেখেছিস্?' হাতের মোটা ফাইলটা টেবিলের উপর রাখল রানা। 'সাঙ্ঘাতিক একটা অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছি। তুই তো সে তুলনায় নস্যি। তোকে বড়জোর ডেকে এনে একটা দোকানের সেলস্ম্যান বানিয়ে দিতে পারে। আর আমাকে পাঠাচ্ছে...'

'করাচি।'

'তুই জানলি কি করে?'

'ওই তো মজা! যে ফাইল অত গর্ব করে দেখাচ্ছিস, জেনে রাখিস, শ্যালক প্রবর, ওতে তোর আগে আমার সই পড়েছে। এবং তোর আগে আমাকেই পাঠানো হচ্ছে সেখানে। বললাম না, আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করা ছাড়া তোদের আর গত্যন্তর নেই।'

'কি আছে ফাইলে?'

'ওই ফাইল পড়ে বিশেষ কিছু লাভ হবে না। ওতে যা আছে তা তিন লাইনে মুখেই বলে দিতে পারি আমি। তবু হুকুম যখন হয়েছে, পড়তেই হবে তোকে।

কিন্তু, দোস্ত, ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস। তোর ওই অপারেশন গুড-উইলের চেয়েও। জেনে খুশি হবি, এই 'স্বর্ণমৃগ' অ্যাসাইনমেন্টটাও তোরই। আমাকে পাঠানো হচ্ছে তোর বস্ হিসেবে তোকে সাহায্য করবার জন্যে। আর খোদা চাহে তো যদি পটল তুলিস, সেজন্যে আমি থাকছি স্ট্যাণ্ড বাই।'

'তুই রওনা হচ্ছিস কবে?'

'কাল সকাল সাড়ে দশটার ফ্লাইটে।'

'রাতটা চল্ আমার ওখানে থাকবি আজ।'

'উঁহুঁ। সেটা সম্ভব না। অফিসের বাইরে কারও সঙ্গে দেখা করা নিষেধ।'

'তবে মরগে যা, শালা।'

'তার আগে কফিটা খেয়ে নিলে হয় না?'

ধূমায়িত কফির কাপ নামিয়ে রাখল রেহানা টেবিলের উপর।

রেহানা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সেদিকে ইঙ্গিত করে সোহেল বলল, 'সুখে আছ সখা আপন তালে। অর্ডার দিলেই কফি! তোদের একেকটাকে ধরে না···'

'আরে রাখ, রাখ। এসব চাপা জাহেদের কাছে গিয়ে মার, আমার কাছে না। কেন, অর্ডার দিতেই তুই ছুটে গিয়ে কফি আনিসনি আমার জন্যে?'

হাসল সোহেল। 'সত্যিই, দোস্ত, দারুণ দেখিয়েছিস তুই টিটাগড় অ্যাসাইনমেন্টে। ঝাড়া তিন সপ্তাহ আমার বুকটা ছ'ইঞ্চি উঁচু হয়ে ছিল, গর্বে।'

'আর তুই? তুই ব্যাটা কম দেখিয়েছিস নাকি? টাইম-বোমাটা তো তুই-ই আবিষ্কার করেছিলি।'

কফি খেতে খেতে অনেক গল্প হলো। বেশির ভাগই পুরানো দিনের কথা। দুর্ঘটনায় এক হাত খোয়া যাওয়ায় হেড অফিস থেকে সরিয়ে ব্রাঞ্চ ইন-চার্জ করে দেয়া হয়েছে সোহেলকে। তাই সুযোগ পেলেই সে পুরানো দিনের গল্পে ফিরে গিয়ে স্মৃতি রোমন্থন-সুখ অনুভব করতে চায়। এক কালের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর সাথে সে-সব গল্প করে রানাও আনন্দ পায়। কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট বের করে ধরাল সোহেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুই কাজ কর, আমি জাহেদকে খানিকটা ডিসটার্ব করে আসছি।'

সোহেল বেরিয়ে যেতেই ফাইলের মধ্যে ডুবে গেল রানা।

রাত ঠিক পোনে আটটার সময় বেজে উঠল সিনক্রাফোন রানার পকেটে। রানা তখন গাড়িতে। এলিফ্যান্ট রোডের জামান ড্রাগ হাউজের সামনে থামাল সে তার লরেল গ্রীন মেটালিক কালারের নতুন টয়োটা করোনা সিডান। চেনা ডাক্তার। রিসিভার তুলে নিল রানা।

সিন্‌ক্রাফোন হচ্ছে ম্যাচ বাক্সের মত দেখতে প্লাস্টিকের ছোট একটা রেডিও রিসিভার। এজেন্টদের বিশেষ কাজে দিনে-রাতে যে কোনও সময় ডাকতে হতে পারে। সেজন্যে নতুন এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন রাহাত খান অল্পদিন হলো। হেড অফিসের দশ মাইলের মধ্যে থাকলে এর সাহায্যে যে কোন এজেন্টকে ডাকা যায়। পিপ্ পিপ্ করে শব্দ হয় এতে। এই শব্দ শোনা মাত্র যাকে ডাকা হচ্ছে তার কাজ হলো যেখানে যে অবস্থায় থাকুক নিকটস্থ টেলিফোনে অফিসের সঙ্গে

যোগাযোগ করা।

৮০০৮৩ ঘোরাতেই প্রথমে মিস্ নেলী, তারপর গোলাম সারওয়ার হয়ে রাহাত খানের কাছে পৌঁছল রানার উৎসুক কণ্ঠস্বর।

'আমি বাসায় আছি। আজ রাতে আমার সাথে খাবে তুমি। আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে এসো। সোহেলকেও ডেকেছি।'

কথাটা বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই ফোনটা নামিয়ে রেখে দিলেন রাহাত খান। রানা ভেবেছিল আজ আর ডাক পড়বে না। তাই অফিসের পর দু'একটা কাজ সেরে ক্লাবে স্কোয়াশ খেলতে যাচ্ছিল। এলিফ্যান্ট রোড থেকে সোজা বাড়ি ফিরে এল সে। কাপড়-জামা পাল্টে রওনা হয়ে গেল ধানমণ্ডির দিকে।

ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকায় ঠিক লেকের পারে চমৎকার একখানা একতলা বাড়ি। সাদা উর্দি পরা বেয়ারা রানাকে নিয়ে বসাল ড্রইংরুমে।

'আমি এক্ষুণি সাহেবকে খবর দিচ্ছি। আপনি এক মিনিট বসুন, স্যার।'

প্রকাণ্ড একটা কালো হাউণ্ড ঢুকল ঘরে। রাহাত খানের শখের কুকুর। পিছন পিছন চেইন হাতে ঢুকলেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। চেনা লোক, তাও ওকে উঠে দাঁড়াতে দেখে একবার কট্‌মট্ করে চাইল কুকুরটা রানার দিকে। আপাদমস্তক সবুজ দৃষ্টি বুলাল সে। কোনও আগন্তুককেই পছন্দ করে না হাউণ্ডটা—'কার মনে কি আছে বলা যায় কিছু? মানুষ তো!' কাজেই ওর চোখে স্পষ্ট শাসন—'কোনও রকম চালাকির চেষ্টা কোরো না, বাছা, বিপদে পড়বে।'

'বসো, রানা। সোহেল আসেনি? এখুনি এসে পড়বে। ডিনারও রেডি। খেতে খেতেই কাজের কথা সেরে নেয়া যাবে।'

'আপনার দেহরক্ষীটাকে সামলান, স্যার। যেমন কট্‌মট্ করে চাইছে আমার দিকে, মনে হচ্ছে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।'

একটু হেসে মাথায় দুটো থাবড়া দিয়ে আদর করলেন রাহাত খান ভয়াল কুকুরটাকে। তারপর বললেন, 'যাও, অনেক দৌড়াদৌড়ি হয়েছে, তোমারও ডিনার রেডি। খাও গিয়ে।' শিকলটা বেয়ারার হাতে দিয়ে রানাকে বললেন, 'একটু ব্যায়াম করাচ্ছিলাম ওকে। যুদ্ধের পর থেকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে বেচারার প্রতি অবিচার হয়ে যাচ্ছে। একেবারেই সঙ্গ পায় না আমার।'

হাফপ্যান্ট আর টাওয়েলের গেঞ্জি পরনে, পায়ে কেড্‌স্। এই বেশে আর ড্রইংরুমে বসলেন না রাহাত খান। রানাকে বসিয়ে কাপড় ছাড়তে গেলেন। টেবিলের উপর থেকে ডেভিড ওয়াইজ আর টমাস বি. রসের 'দ্য ইনভিজিব্‌ল্ গভর্নমেন্ট' তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে থাকল রানা। পেপার ব্যাক এডিশন। বইটার প্রতি পৃষ্ঠায় 'সি. আই. এ.' শব্দটা পাওয়া গেল গড়ে দশটা করে। কয়েক পৃষ্ঠা পড়া হতেই দু'দিকের দুই দরজা দিয়ে একসাথে ঘরে প্রবেশ করল সোহেল এবং রাহাত খান।

'এই যে, সোহেলও এসে গেছ। চলো, একেবারে খাবার টেবিলে গিয়েই বসি।'

সুপ শেষ হতেই বাটিগুলো তুলে নিয়ে গেল বেয়ারা। মুখ খুললেন রাহাত খান।

'স্মাগ্‌লিং যে এত সিরিয়াস একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে, ভাবিনি কোনদিন। ব্যাপারটা চিরকাল হয়ে এসেছে, বর্তমানে হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে।

আমাদের আসল সমস্যা এখন স্মাগ্লিং নয়—এর পিছনের প্রতিভাবান ব্যক্তিটিকে ধ্বংস করা। তোমরা দু'জনেই তো ফাইলটা পড়েছ। কারও কোন প্রশ্ন আছে?'

'দেখলাম, শুধু গত বছরেই আনুমানিক দু'শো কোটি টাকার সোনা এসে পৌঁচেছে এখানে। এটা যখন অনুমান করা সম্ভব হয়েছে, কিভাবে কোন পথে এই চোরা-চালান আসছে সেটা আন্দাজ করা যায়নি?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'তাছাড়া সিআইডি এটাকে সিরিয়াসলি টেক-আপ করছে না কেন?' সোহেল বলে উঠল। 'কাউকে খুঁজে বের করবার কাজে ওরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ।'

একটা মুরগির রানে কামড় বসিয়েছিলেন রাহাত খান। ওটাকে বাগে আনবার আগেই রানাকে আরেকটা প্রশ্ন করতে উদ্যত দেখে হাত তুলে থামার ইঙ্গিত করলেন। এক এক করে প্রশ্নের উত্তর দিলেন তিনি।

'না। অভিনব কোনও পদ্ধতিতে সোনা চালান হচ্ছে, এটুকু টের পাওয়া গেলেও পদ্ধতিটা জানা যায়নি। পথ হচ্ছে: জল, স্থল বা আকাশ; অথবা তিনটেই। আর এর মূল উৎস হচ্ছে মিডল্-ঈস্ট। সিআইডি-র জুরিসডিকশনের বাইরে। আমরা যখন এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে রাজি হলাম তখন সবটা দায়িত্ব আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে ওরা হাত গুটিয়ে নিয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। আমাদের মত ওরাও কয়েকজন যোগ্য লোক হারিয়েছে। কাজেই বিপক্ষকে আণ্ডার-এস্টিমেট করবার ধৃষ্টতা আমাদের থাকা উচিত নয়। তুমি ঠিকই ধরেছ, রানা। যদি ওদের সোনা পাচার করবার পদ্ধতি আমাদের জানা থাকত তাহলে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে আজ হোক কাল হোক মূল উৎসে পৌঁছানো অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সোনা একটা অদ্ভুত জিনিস। এর কোনও নির্দিষ্ট আকার নেই। গলিয়ে ফেললেই এর গায়ের সব চিহ্ন মুছে ফেলা যায়, অথচ দাম কমে না এক পয়সাও। তারপর যে কোনও ছাঁচে ফেলে যে কোনও আকার দেয়া যায় সেটাকে। কাজেই ধরা খুব মুশকিল।'

এতক্ষণ কথা বলায় যেটুকু সময় নষ্ট হয়েছিল তা পূরণ করে নিলেন রাহাত খান কিছুক্ষণ চুপচাপ একমনে আহার ক'রে। ওঁর বক্তব্য শেষ হয়নি তাই এই সুযোগে নতুন কোনও প্রশ্ন করল না কেউ।

'এমন কি, ইচ্ছে করলে এক রকম খয়েরি রঙের পাউডারেও পরিণত করা যায় সোনাকে। হাইড্রোক্লোরিক এবং নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণের মধ্যে ফেললেই গলে তরল হয়ে যায় সোনা। তারপর সালফার ডাইয়োক্সাইড বা অক্জালিক অ্যাসিড দিলে খয়েরি পাউডার হয়ে যাবে সেটা। ইচ্ছে করলেই হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপ দিয়ে আবার সেটাকে সোনার টুকরো বানিয়ে নেয়া যায়। ক্লোরিন গ্যাসটা একটু খেয়াল রাখতে হয়, তাছাড়া পন্থাটা খুবই সহজ। কাজেই দেখা যাচ্ছে, কঠিন বা তরল, এমন কি পাউডার হয়েও আসতে পারে এ জিনিসটা জল, স্থল কিংবা আকাশ পথে। আমরা এখানে এই সবগুলোর ওপরই তীক্ষ্ণ নজর রাখছি, কোনও রহস্য উদঘাটন করতে পারলে তোমাদের জানানো হবে।'

'আমাদের দু'জনকে আলাদা ভাবে পাঠাচ্ছেন কেন?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'তোমাদের যে-কোনও একজনকে ওরা চিনে ফেললে অপরজন অতর্কিতে সাহায্য করতে পারবে, এই ভরসায়। দু'জন সম্পূর্ণ আলাদা শ্রেণীর লোক সেজে

যাচ্ছ। দু'জনকে একসাথে সন্দেহ করতে পারবে না ওরা। যদি করে, তাহলে তোমাদের কপাল খারাপ বলতে হবে।'

খাওয়া হয়ে গেলে ড্রইংরুমে গিয়ে বসল তিনজন। বিস্তারিত আলোচনা হলো কেসটা নিয়ে। সোহেল যাচ্ছে হিংলাজ দর্শনপ্রার্থী বাঙালী সাধু হয়ে, আর রানা যাবে করাচিতে এ-অঞ্চলের কিছু মালের হোল্-সেল্ মার্কেট তৈরি করতে। যখন নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হবে তখন কিভাবে কোন্ পথে এগোবে তা নিয়েও বিশদ আলাপ হলো।

সিগারেটের পিপাসা লেগেছিল সোহেলের অসম্ভব রকমের। বুকের ভিতরটা খালি হয়ে এসেছিল ধুঁয়োর অভাবে। ওর অবস্থা অনুমান করে বেশিক্ষণ আর আটকে রাখেননি ওদের রাহাত খান।

চারদিন পর সন্ধ্যার ফ্লাইটে রওনা হলো রানা করাচির উদ্দেশে।

# দুই

লাস্যময়ী মেয়েটা। নাম জিনাত সুলতানা। লম্বা একহারা দেহে আঁটসাঁট করে পেঁচিয়ে পরা নাইলন শাড়িতে চমৎকার মানিয়েছে। কলগার্ল নাকি?

বোধহয় না। রানা ভাবছিল, তাই যদি হবে তাহলে কোনও পুরুষকে কাছে ভিড়তে দিচ্ছে না কেন মেয়েটা? সারা অঙ্গে যেন রূপের আগুন জ্বালিয়ে নিয়েছে সে। স্পর্শ করলেই হাত পুড়ে যাবে। অনেকের মত রানাও আলাপ করার চেষ্টা করে দেখেছে, ফিরে আসতে হয়েছে। এই আগুন যদি কেবল আত্মরক্ষার জন্যে ব্যবহৃত হত তাহলে এত আকর্ষণ বোধ করত না রানা। এত চিন্তাও করত না মেয়েটির জন্যে। কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে, এই আগুনেই জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে মেয়েটি। নিজেকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করছে সে প্রতি পলে। বোধহয় সবটা তার দেখা হয়ে গেছে, লোভীর মত জীবনের সব রস পান করে ফেলেছে সে অল্প সময়ের মধ্যেই।

সাগরের নোনা হাওয়া থেকে সামনের মাজা-ঘষা চকমকে চেহারাটা আড়াল করবার জন্যে রাস্তার দিকে মুখ করে আর সাগরের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড সাততলা বীচ লাগজারি হোটেল। আধুনিক সব রকমের ব্যবস্থাই আছে। হোটেলের সামনে রাস্তার উপর দামী গাড়িগুলো তেরছা ক'রে সার বেঁধে দাঁড়ানো। অল্প দূরেই একটা ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে সব সময় অন্তত চারটে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে। লোহার গেট দিয়ে ঢুকেই সরু রাস্তার দু'পাশে নানান রকম ফুলের চমৎকার বাগান আর সবুজ ঘাস। কয়েক কদম এগোলেই লাউঞ্জে উঠবার সিঁড়ি। বাম পাশে রিসেপশন্ কাউন্টার। লাউঞ্জের এখানে-ওখানে সোফা সেট, সাইড টেবিল। ডান ধারে লিফ্ট্। পাশেই সিঁড়ি। প্রকাণ্ড লাউঞ্জ ছাড়িয়ে ঢুকতে হয় বেগুনি পর্দায় ঢাকা নানান রকম কারুকার্য খচিত বার ও রেস্তোরাঁয়। দুই পাশে দুই টবে লাগানো 'মানিপ্ল্যান্ট' লতিয়ে উঠেছে দেয়ালে। গোটা কতক অর্কিড ছাত থেকে সরু পিতলের চেইন দিয়ে ঝোলানো নক্সা আঁকা মাটির পাত্রে রাখা। নীলচে ফ্লোরেসেন্ট টিউবের

আলো আসছে সিলিং-এর চারটে গোল গর্ত থেকে। দুই পাশে দেয়ালে চুঘতাইয়ের মস্ত দুটো অয়েল পেইন্টিং। মোগলাই দরবারের সুরা পানের দৃশ্য। রেস্তোরাঁয় ঢুকলেই সামনে দেখা যায় সাগরের নীলিমা। প্রকাণ্ড একটা পুরু বেলজিয়ান কাঁচ বসানো আছে ওদিকটায় দেয়ালের বদলে। ইচ্ছে করলেই কালো স্ক্রীন দিয়ে ঢেকে দেয়া যায় রৌদ্রের প্রখরতা।

রেস্তোরাঁর পিছন দিকে সাগরের দিকে মুখ করে চুপচাপ একা বসে আছে রানা। আরেক কাপ কফি এনে রাখল বেয়ারা ওর টেবিলে।

কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা গেল আজও নির্দিষ্ট টেবিলে মুখোমুখি বসে জুয়া খেলছে মেয়েটি সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির সাথে। আরও ঘণ্টাখানেক খেলবে। সন্ধে হয়ে গেলেই উঠে পড়বে ওরা। লোকটি কোনও দিকে না চেয়ে সোজা চলে যাবে হোটেলের দোতলায় ওর কামরায়। মেয়েটি এসে ঢুকবে বারে। গ্লাসের পর গ্লাস মদ খাবে। পরিপূর্ণ মাতাল অবস্থায় টলতে টলতে চলে যাবে পাঁচ তলায় নিজের কামরায়।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঝিল্‌মিল্ করছে আরব সাগর। হোটেলের পিছনে একটা সরু পীচ ঢালা রাস্তা সোজা চলে গেছে সমুদ্র তীরে। সেই রাস্তার ডান পাশে হোটেল থেকে গজ বিশেক দূরে সেইলরস ক্লাব। একতলা। পারটেক্সের ছাদ আর কাঁচের দেয়াল। সাগর থেকে আসা উদ্দাম হাওয়া রোধ করবার জন্যে প্রচুর টাকা ব্যয় করে লোহার ফ্রেমে আঁটা কাঁচের দেয়াল দেয়া হয়েছে চারপাশে। ফলে সাগর দেখা যায় পরিষ্কার, কিন্তু বাতাসের ধাক্কায় কফির কাপ বা টেবিলে বাঁটা তাস উল্টে যাবার ভয় নেই। নানান রকম জুয়োর ব্যবস্থা আছে ক্লাবটায়। সন্ধে হলেই কালো স্ক্রীন টেনে বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করে দেয়া হয় ভিতরের জুয়াড়ীদের। তারপর সেখানে চলে সব চাইতে উঁচু স্টেকে টাকাওয়ালাদের ভাগ্যের উত্থান-পতন। সেইসাথে আরও কত কি! একজন 'সেইলর'ও পাত্তা পায় না সেখানে।

দিনের বেলায় স্ক্রীন সরিয়ে ফেলার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ভিতরের সবুজ ঘাসের গালিচা আর ফুলের কেয়ারিতে সূর্যের আলো এবং উত্তাপ লাগানো। তাছাড়া দিনের বেলা তেমন কোনও লোকজনও হয় না। মেয়েমানুষ তো প্রায় থাকেই না যে তাদের চক্ষু-লজ্জা থেকেই নিষ্কৃতি দিতে হবে। এই নিরিবিলি ক্লাবে কোণের টেবিলে মুখোমুখি বসে ফ্ল্যাশ খেলছে জিনাত সুলতানা সেই প্রৌঢ় ভদলোকের সাথে। গত পাচদিন ধরে রোজ খেলছে।

দ্বিতীয় কাপ কফি সামনে নিয়ে চেয়ে রইল রানা ওদের দিকে। মনে হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড অ্যাকুয়ারিয়ামের মধ্যে বসে আছে ওরা। হরেক রকমের মাছ আছে এতে। লাল্‌চে চুলের ওই প্রৌঢ় জুয়াড়ীকে রানার মনে হচ্ছে যেন গোল্ড ফিশ্। মেয়েটি অ্যাঞ্জেল ফিশ্। আর সে নিজে? একটু হেসে ভাবল, ঝগড়াটে আর হিংসুক সিয়ামিজ ফাইটার।

গত রাতে এতগুলো লোকের মধ্যে হঠাৎ যখন মেয়েটি মাত্রাতিরিক্ত সেবনের ফলে হিক্কা তুলে বমি করতে আরম্ভ করেছিল, ভদ্রলোকেরা ছিট্‌কে সরে গিয়েছিল জামা কাপড় বাঁচাতে, তখন ছুটে গিয়ে ধরেছিল মাসুদ রানা। বেসিনে নিয়ে গিয়ে নিজ হাতে মুখ ধুইয়ে দিয়েছিল, চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে নিজের রুমাল দিয়ে মুছে

দিয়েছিল ওর মুখ। তারপর? একটু সামলে নিয়েই ঠাস করে চড় বসিয়ে দিয়েছিল মেয়েটি রানার গালে। চিৎকার করে বলেছিল, 'নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে, বদমাশ কাহিঁকে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গিয়েছিল সোজা নিজের ঘরে। ঘর ভর্তি মহিলারা আন্তরিক দুঃখিত এবং পুরুষেরা আনন্দিত হয়েছিল এই ঘটনায়। অপমানিত রানাকেও 'রেস্তোরাঁ' ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল মাথা নিচু করে।

কিন্তু আজ রানার দিকে চেয়ে মুচকে হাসল কেন মেয়েটি? কী অপূর্ব সেই হাসি!

কে এই মেয়েটি? রিসেপশনিস্টের কাছ থেকে কেবল নামটা জানা গেছে। আর সব কিছুই রহস্যময় পাঁচ দিন আগে হঠাৎ এসে উঠেছে এই হোটেলে। রানা স্থির করল মেয়েটি সম্পর্কে সব তথ্য বের করতেই হবে। আগামী কালকেই। অদ্ভুত এক অমোঘ আকর্ষণে টানছে মেয়েটি ওকে।

রানা ভাবছে, সোনার চোরাচালান ধরতে পারছে না কাস্টমস্, কিন্তু কেউ যদি এই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের দেশে যায়, তাহলে ঠিক ধরে ফেলবে। এই মেয়েটি খাঁটি সোনা। অনেক কষ্টি পাথরে যাচাই করা। কারও চোখ এড়ানো সম্ভব নয়, ঠিক আটকে ফেলবে কাস্টমস্। কথাটা মনে উদয় হতে একটু হাসল রানা।

এক চুমুকে অবশিষ্ট কফিটুকু গলাধঃকরণ করে রানা ভাবল সাগর তীরে হাঁটবে খানিকক্ষণ। আরও খানিকটা নেমে এসেছে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে। আর কিছুক্ষণ পরেই মেঘেরা পরবে রঙীন সাজ। তারপর বসন্তের রাত্রি নামবে করাচি বন্দরে। মহানগরীর অলিতে গলিতে নেমে আসবে পাপ-পঙ্কিল বিভীষিকা। গলিমুখে রূপজীবিনী, হোটেলে বারে জুয়া-মদ ইত্যাদির ছড়াছড়ি। ভদ্রতার খোলস ছেড়ে মানুষের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবে পশু। বসন্তবাহার মাতাল করে তুলবে বাঈজীর সঙ্গীত কক্ষের মদ্যপ শ্রোতাদেরকে।

উঠে পড়তে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় চোখে পড়ল ঠিক দশ হাত দূরে জিনাত সুলতানা! সারা দেহে হিল্লোল তুলে এগিয়ে আসছে ওর টেবিলের দিকে। বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকল রানা ওর দিকে। গত রাতের দুর্ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চাইবে নাকি মেয়েটা? সন্ধের আগেই আজ খেলা ছেড়ে উঠে এল যে? রানার চোখে চোখ পড়তেই বিচিত্র এক টুকরো হাসি খেলে গেল মেয়েটির ঠোঁটের কোণে।

'বসতে পারি?' ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

'নিশ্চয়ই।'

ঠিক রানার পাশের চেয়ারে বসে পড়ল জিনাত। সেন্টের গন্ধ এল নাকে। মেয়েটিকে দেখলেই প্রখর রোদ আর সোডা ওয়াটারের ঝাঁঝের কথা মনে পড়ে যায়। কড়া সেন্টের গন্ধ বেমানান লাগে না একে মাখলে। আঙুলের ফাঁকে জ্বলছে একটা সিগারেট।

'আমার পেছনে লেগেছ কেন তুমি? গত তিনদিন ধরেই দেখছি। কি চাও তুমি আমার কাছে?' আচমকা প্রশ্ন করল মেয়েটি।

কোন উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসল রানা। হাওয়া তাহলে এই দিকে বইছে। টেবিলের উপর দুই কনুই রেখে হাতের তালুর উপর চিবুক রেখেছে জিনাত। চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে রানার চোখের উপর।

'কি? উত্তর দিচ্ছ না যে? কেন আমার পেছনে লেগেছ তুমি?'

'ভাল লেগেছে, তাই।'

জীবনে কতবার যে কথাটা বলেছে রানা। ভাবল, এবারও বুঝি কাজে লাগবে এ স্তুতি। কিন্তু না, ভুরু জোড়া কুঁচকে গিয়েই আবার সোজা হয়ে গেল জিনাতের। একটুও হাসল না সে। কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ লাগল রানার কাছে।

'ভালবাসো আমাকে?'

হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল জিনাত। অবাক হয়ে গেল রানা। পাগল নাকি? এ কেমন ধারা প্রশ্ন? চেনা নেই, শোনা নেই, কিচ্ছু না; হঠাৎ 'ভালবাসো'?

'সে সুযোগ কি পেয়েছি?' বলল সে স্বাভাবিক কণ্ঠে।

'পছন্দ করো?'

'নিশ্চয়ই। তোমাকে কে না পছন্দ করবে, বলো?'

হঠাৎ অ্যাশট্রের মধ্যে সিগারেটটা ঠেসে মুচড়ে নিভিয়ে দিল জিনাত। মনে হলো কোনও একটা ভয়ঙ্কর আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ হলো এইভাবে। চিবুক থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে আবার সোজা রানার চোখের উপর চোখ রাখল সে।

'ঠিক। সবাই পছন্দ করে। তার কারণও আমার অজানা নেই।' বিদ্রূপের বাঁকা হাসি ফুটে উঠল ওর অধরে। তারপর আবার বলল, 'সবাই পছন্দ করে। খুব সহজেই পাওয়া যায় আমার বন্ধুত্ব। চাও তুমি?'

ধক্ করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। হঠাৎ কি হলো মেয়েটির? এসব কি বলছে সে?

'একটু অসুবিধায় পড়েছি। কিছু টাকা ধার দিতে পারবে আমাকে? আজই রাতে ফেরত দেব, সুদে-আসলে।'

আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। কিন্তু সে-ভাব প্রকাশ করল না। বুঝতে পারছে, কিছু একটা গোলমাল আছে মেয়েটার মধ্যে। কোথায় যেন হিসেব ঠিক মেলে না।

'টাকার তো তোমার অভাব আছে বলে মনে হয় না,' বলল রানা। 'কিন্তু সে কথা থাক, কত টাকা চাই?'

'দশ হাজার। এখুনি আমার দরকার।'

'কি করবে টাকা দিয়ে?'

'সেটা তোমাকে বলতে আমি বাধ্য নই। তবু বলছি। ফ্ল্যাশ খেলব।'

'এই পাঁচ দিন খুব ফ্ল্যাশ খেলছ বোধহয়, ওই লোকটার সাথে?'

'হ্যাঁ।'

'কত টাকা হারলে?'

'দেড় লাখ।'

'দে-ড় লা-খ টাকা! অথচ এখনও নেশা কাটেনি তোমার?'

'এত কথা শুনতে চাই না। টাকা দেবে কিনা বলে দাও পরিষ্কার।'

'ওই জোচ্চোরের সাথে ফ্ল্যাশ খেলে হারবার জন্যে তোমাকে এক পয়সাও দিতে পারব না আমি। কেন তুমি এভাবে...'

'উপদেশ খয়রাত করবার কোনও প্রয়োজন নেই, মি. মাসুদ রানা। ভাল-মন্দ বুঝবার বয়েস আমার হয়েছে। মনে কোরো না তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে

এসেছি আমি। তুমি ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই, ভুলেও এ ধারণা কোরো না। এটা তোমার প্রতি একটা বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। ওয়ালী আহমেদ প্রস্তাব দিয়েছে, শুধু একটু অনুগ্রহ করলেই আমার সব টাকা সে ফিরিয়ে দেবে। আমি রাজি হইনি। ওর কাছ থেকে যদি না-ও নিই, এখানকার যে কোনও লোকের কাছে চাইলে পাব। কাজেই উপদেশ দিতে এসো না। তোমাকেই প্রথম সুযোগ দেব মনে করেছিলাম। যাক, তুমি যখন রাজি নও তখন, সো লঙ।'

উঠে পড়ছিল জিনাত, রানা ধরে ফেলল ওর হাত। বসে পড়ল সে আবার।

'তোমাকে যত দেখছি ততই তোমার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছি আমি, জিনাত। আমিই দিচ্ছি টাকাটা। ফেরত দিতে হবে না। তোমাকে আমি...'

'মহত্ত্ব দেখানো হচ্ছে, না?' খেপে উঠল জিনাত। 'তোমার দয়া চাই না আমি। যদি দাও, ওই টেবিলে পৌঁছে দেবে টাকাটা।' উঠে দাঁড়াল সে। ঘড়িটা দেখল একবার। 'মনে রেখো, পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করব আমি তোমার জন্যে।'

চলে গেল জিনাত সেইলরস ক্লাবের দিকে। রানা চেয়ে দেখল নিবিষ্ট চিত্তে খবরের কাগজ পড়ছে ওয়ালী আহমেদ। গত রাতে ডলফিন ক্লাবে বাকারাত খেলে চল্লিশ হাজার টাকা জিতেছে রানা। তার থেকে দশ হাজার খরচ করা ওর পক্ষে কিছুই না। স্থির করল, টাকাটা দেবে। মেয়েটির নিশ্চয়ই মাথার গোলমাল আছে। তীব্র কোনও বেদনা লুকিয়ে আছে ওর মনের মধ্যে, অহরহ ছিন্নভিন্ন করছে। ওর প্রতি অদ্ভুত একটা মমত্ববোধ জাগল রানার মনে। টাকা না দিলে মেয়েটি যাচ্ছে-তাই করে বসতে পারে, সেজন্যে দেবে।

লিফ্‌টে করে সোজা পাঁচতলায় উঠে ঘর থেকে টাকাগুলো নিল রানা। ঘরের সঙ্গে লাগানো ছোট্ট ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। হু-হু হাওয়া আসছে সাগর থেকে। ঢেউ ভেঙে পড়ছে এসে বালুকা বেলায়। ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা। একটা ফান্টার বোতল হাতে দাঁড়িয়ে আছে জিনাত ক্লাবের দরজার সামনে। রানার উপর চোখ পড়ল জিনাতের। রানা হাত নাড়ল। ক্লাবের ভিতর ঢুকে গেল জিনাত। একতলার লাউঞ্জ দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় রানা লক্ষ করল সেই তিনজন লোক ঠিকই বসে আছে কোণের টেবিলে। রানার দিকে নির্বিকার মুখে তাকাল একজন। পাশের লোকটিকে কিছু বলল। সে-ও চাইল রানার দিকে। মতলব কি ব্যাটাদের? এরা নজর রাখছে কেন তার ওপর? ধরা পড়ে গেল নাকি সে? সাবধান হতে হবে। গত তিন দিন থেকে এখানে আড্ডা গেড়েছে লোকগুলো। বেরিয়ে গেল রানা লাউঞ্জ থেকে চিন্তিত মুখে।

কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা, তবু খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলল না ওয়ালী আহমেদ। পরিচয় করিয়ে দেবে বলে জিনাত ডাকল, 'এই যে, শুনছেন?' তাও কোনও সাড়া নেই। গলা নিচু করে জিনাত রানাকে বলল, 'কানে কম শোনে।' তারপর জোরে আবার ডাক দিল, 'কই, সাহেব, শুনছেন?'

'অ্যাঁ!' বলে চমকে উঠল ওয়ালী আহমেদ। কাগজটা চোখ থেকে নামিয়ে রানাকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

'ইনি মিস্টার ওয়ালী আহমেদ, আর ইনি মিস্টার মাসুদ রানা,' বলল জিনাত।

'গ্ল্যাড্‌ টু মিট ইউ, মিস্টার মাসুক নানা।' উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ড শেক করল ওয়ালী

আহমেদ। নরম তুলতুলে হাতটা। যেন কাদা দিয়ে তৈরি, কিংবা বাতাস ভরা গ্লাভ। গা-টা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠল রানার। লম্বা চওড়া মেদবহুল দেহ লোকটার। চুলগুলো লালচে। বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। ঠোঁটের ওপর পাতলা লালচে গোঁফ। সারাটা মুখে বুটি বুটি বসন্তের দাগ। অস্বাভাবিক সবুজ চোখ। একটু খেয়াল করতেই রানা বুঝল চশমার বদলে কন্ট্যাক্ট লেন্স লাগিয়ে নিয়েছে চোখে। স্থির দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকল ওয়ালী আহমেদ কয়েক মুহূর্ত। তারপর অমায়িক হাসি হেসে বলল, 'বসুন, মিস্টার নানা।'

হাসির সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল দাঁতগুলো। ঠিক যেন তরমুজের বিচি। এতক্ষণে রানার চোখে পড়ল টেবিলের একপাশে রাখা একটা রূপোর কৌটা। পান ভর্তি। পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর একটা করে পান মুখে দিচ্ছে সে। ফলে দাঁতগুলো আর দর্শনযোগ্য নেই।

'আমার নাম মাসুদ রানা। মাশুক নানা নয়,' একটা চেয়ারে বসে বলল রানা।

'ও আচ্ছা, আচ্ছা। মাসুদ নানা। মাসুদ নানা।' মুখস্থ করবার মত করে বলল ওয়ালী আহমেদ। তারপর বুক পকেট থেকে হিয়ারিং এইড়টা বের করে কানে লাগাল। মৃদু হেসে বলল, 'আপনিও খেলবেন নাকি, মিস্টার নানা?'

'জ্বী, না।'

টাকা ভর্তি এনভেলপটা জিনাতের হাতে দিল রানা ওয়ালী আহমেদকে আড়াল করে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না ওয়ালী আহমেদ। জিনাতকে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে? খেলা কি আজকের মত শেষ?'

'শেষ হবে কেন, ডিল করুন না। টাকা জোগাড় হয়ে গেছে।'

রানার দিকে আরেকবার চাইল ওয়ালী আহমেদ চট্ করে। তারপর একটা পান মুখে ফেলে নতুন এক প্যাকেট তাস সর্ট করতে আরম্ভ করল। রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'আছেন কোথায়, মি. নানা?'

'এই হোটেলেই।' আঙুল দিয়ে দেখাল রানা হোটেলের দিকে।

'না, মানে, কি করছেন?'

'ব্যবসা।'

'কিসের ব্যবসা?' কার্ড ডিল করে জিজ্ঞেস করল আবার ওয়ালী আহমেদ।

'ঢাকার কয়েকটা প্রোডাক্টের জন্যে করাচিতে হোলসেল মার্কেট তৈরির চেষ্টায় এসেছি আমি।'

'কেমন রেসপন্স পাচ্ছেন?' একশো টাকার নোট খেলল ওয়ালী আহমেদ।

'মন্দ না।'

দুই এক দান খেলেই শো করতে বলল জিনাত। জ্যাক টপেই দান জিতে নিয়ে গেল ওয়ালী আহমেদ।

'তা ক'দিন থাকবেন?'

'আর সপ্তাহ খানেক।'

রানার ইচ্ছে, আরও কয়েক দান খেলা দেখবে। রহস্যটা ভেদ করতেই হবে। বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে চুরি করছে ওয়ালী আহমেদ। কিন্তু ভাবছে, এতবড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট—যে একটা ব্যাঙ্কের ম্যানিজিং ডিরেক্টর, যে একটা মোটর

অ্যাসেম্বলিং প্ল্যান্ট, তিনটে কটন মিল, একটা জুট মিল এবং গোটাকয়েক নামজাদা হোটেলের মালিক, এবং আরও বহু কোম্পানির ডিরেক্টর, সেই ওয়ালী আহমেদ একটা সাধারণ সোসাইটি গার্লের কাছ থেকে সামান্য কিছু টাকা জোচ্চুরি করে ছিনিয়ে নিতে যাবে কেন? অথচ চুরি যে করছে তাতে কোনও ভুল নেই। নইলে দুই হাতের ফ্ল্যাশ খেলায় পাঁচ দিনে দেড় লক্ষ টাকা জেতা এক কথায় অসম্ভব। যত উঁচু স্টেকই হোক না কেন।

আবার পঞ্চাশ টাকা বোর্ড-ফী রাখল দু'জন। তিনটে-তিনটে ছ'টা কার্ড বেঁটে দিল জিনাত ওয়ালী আহমেদের কাটা হয়ে গেলে পর। এবারও হারল জিনাত। রানা লক্ষ করল কার্ড বাঁটার মধ্যে কোনও রকম চাতুরীর আভাস নেই। আঙুলে আংটি কিংবা সার্জিক্যাল টেপ নেই যে চিহ্ন দিয়ে রাখবে তাসে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খেলা ওয়ালী আহমেদের। অথচ ছ'মিনিটের মধ্যেই দুই হাজার টাকা হেরে গেল জিনাত। জিনাতের হাতে ভাল কার্ড পড়লেই কিভাবে যেন টের পেয়ে যাচ্ছে ওয়ালী আহমেদ। ফেলে দিচ্ছে হাতের তাস। শুধু বোর্ড ফী-টা পাচ্ছে জিনাত। কিন্তু নিজের হাতে যদি বেশি ভাল কার্ড থাকে তাহলে অনেকদূর পর্যন্ত এগোচ্ছে খেলা—জিনাত 'শো' না দিলে খেলেই চলেছে। কোনও রকম ব্লাফেই বিচলিত করতে পারছে না জিনাত ওকে। রানা স্থির নিশ্চিত হলো, চুরি করছে ওয়ালী আহমেদ। কিন্তু কি উপায়ে?

একবার জিনাত পেল ফ্ল্যাশ। ফেলে দিল ওয়ালী আহমেদ ওর হাতের কার্ড 'অফ' বলে। চট করে কার্ডগুলো তুলে রানা দেখল কিং-এর পেয়ার ছিল ওর হাতে। কিন্তু এক দানও না খেলে হাতের কার্ড নামিয়ে রেখেছে ওয়ালী আহমেদ।

'অদ্ভুত আপনার আন্দাজ তো!' টিটকারি মারল রানা।

'জ্বী; হাঁ। আমি মুখ দেখলেই বুঝতে পারি কার হাতে কি আছে। এই চোখে কিছুই এড়ায় না।' বলে একটা পাই পয়সা দিয়ে দুটো টোকা দিল দুই চোখে। ঠুন ঠুন করে শব্দ হলো কন্ট্যাক্ট লেন্সে লেগে।

'মিস জিনাত কি বরাবরই হারছেন আপনার কাছে?'

'বরাবর। ওঁকে নিষেধ করেছি। তবু উনি খেলবেন।'

'আমি দেখেছি জায়গা বদলালে অনেক সময় ভাগ্য ফিরে যায়। আপনারা জায়গা বদলে নিলেই পারেন,' বলল রানা।

'সেটা সম্ভব নয়,' গম্ভীর মুখে বলল ওয়ালী আহমেদ। 'সেটা আমি প্রথম দিনই মিস্ সুলতানাকে বলে নিয়েছি। ওদিকে বসলে সাগর চোখে পড়ে। অ্যাগোরাফোবিয়া রোগ আছে আমার। চোখের সামনে খোলা বিস্তৃতি সহ্য করতে পারি না। তাই হোটেলের দিকে মুখ করে বসি সব সময়। উল্টো দিকে বসলে খেলতে পারব না আমি।'

'ক্লসট্রোফোবিয়ার নাম শুনেছি, কিন্তু অ্যাগোরাফোবিয়া তো শুনিনি কোনদিন।'

'হ্যাঁ। বেশ অসাধারণ রোগ।'

মুখে পান ফেলল ওয়ালী আহমেদ। রানার অনেকখানি বোঝা হয়ে গেছে।

'আপনিও বোধহয় এই হোটেলেই আছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ।'

'ওই যে খোলা দেখা যাচ্ছে, ওটা আপনার সুইট না? দোতলাতেই আছেন বোধহয়?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।' স্থির দৃষ্টিতে রানার দিকে চেয়ে বলল ওয়ালী আহমেদ। 'অনেকগুলো দরজাই খোলা দেখা যাচ্ছে। ওগুলোর মধ্যে একটা আমার। আগামী তিন বছরের জন্য ভাড়া নিয়েছি ওটা আমি।'

উঠে জিনাতের পিছনে দাঁড়াল রানা কিছুক্ষণ। দেখা গেল জিততে আরম্ভ করেছে জিনাত। মৃদু হেসে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল রানা ক্লাব থেকে। হোটেলের দিকে যেতে যেতে পাশ ফিরে একবার দেখল রানা ওদের। ইতিমধ্যে সাত হাজার টাকা হেরে গিয়েছে জিনাত। ওয়ালী আহমেদ হোটেলের দিকে মুখ করে বসতে চায়, নাকি জিনাতকে হোটেলের দিকে পিঠ দিয়ে বসাতে চায়?

ওয়ালী আহমেদের সুইট-এর দিকে চাইল রানা। কিছু নেই। বিকেলের পড়ন্ত রোদ ব্যালকনিতে। খোলা দরজা দিয়ে ঘরটা অন্ধকার দেখাচ্ছে।

ফিরে গেল রানা রেস্তোরাঁয়। আবার চোখ পড়ল তার সেই তিনজন লোকের ওপর। কি চায় এরা? জোর করে দূর করে দিল মন থেকে এদের চিন্তা। আবার কফির অর্ডার দিয়ে আগের সেই চেয়ারটায় গিয়ে বসল সে আবার। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে জুয়াড়ীদের। বুঝতে পেরেছে রানা ওয়ালী আহমেদের অবিচ্ছিন্ন জয়ের রহস্যটা। কিন্তু ওকে ধরিয়ে দেয়ার আগ্রহ বোধ করল না সে মোটেই। কি হবে একজন ক্ষমতাশালী লোককে অকারণে ঘাঁটিয়ে? ওয়ালী আহমেদ চুরি করলে ওর কি? শত্রু বাড়িয়ে লাভ আছে?

কিন্তু অদ্ভুত বুদ্ধিমান তো এই হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বড়লোকটি! আশ্চর্য!

# তিন

রাত অনেক। ইজি চেয়ারে শুয়ে পাতা ওল্টাচ্ছে রানা জন ব্লেকের 'দা গোল্ড স্মাগলিং' বইয়ের। স্বর্ণ-ইতিহাস থেকে আরম্ভ হয়েছে বইটা। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ মাটি খুঁড়ে চলেছে সোনার লোভে। কোথায় ঈজিপ্টের সোনা, মন্টেজুমা আর ইনকাসের খনি। মধ্যপ্রাচ্যের স্বর্ণখনি নিঃশেষ করল মিডাস আর ক্রোয়েসাস। ইউরোপে রাইন, পোর উপত্যকা, মালাগা, গ্রানাডার সমতলভূমি চষে ফেলা হলো। সোনা চাই, সোনা চাই, খেপে উঠল পৃথিবীর মানুষ। নিঃশেষ করল বালকান আর সাইপ্রাসের সোনা। ওদিকে রোমানরা সোনা তুলল ওয়েল্স, ডেভন আর কর্ণওয়াল থেকে। তারপর এল মেক্সিকো, পেরু। তারপর গোল্ড কোস্ট। উনবিংশ শতাব্দীতে লেনা এবং ইউরালে খনি আবিষ্কার করল রাশিয়ানরা। সে-ও শেষ। এখন সোনা উঠছে অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটে।

কেবল ১৫০০ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আঠারো হাজার টন সোনা তোলা হয়েছে পৃথিবীর বুক থেকে। ১৯০০ থেকে আজ পর্যন্ত (১৯৬৩ খ্রি: সংস্করণ) তোলা হয়েছে একচল্লিশ হাজার টন। আগামী পঞ্চাশ বছরেই শেষ হয়ে যাবে গোটা পৃথিবীর স্বর্ণ-সঞ্চয়।

বিরক্ত হয়ে বইটা রেখে দিল রানা। বইখানা গছিয়ে দিয়েছিলেন ঢাকায় রাহাত খান। বলেছিলেন চমৎকার বই, খুব মজার। বুড়ো যে কিসে মজা পায় আর কিসে পায় না বোঝা মুশকিল। বিশ পাতা পড়ে রানা বুঝল, এর মধ্যে দাঁত ফোটানোর ক্ষমতা ওর নেই। এ আখের রস, তালের নয়। মজা পেতে হলে দাঁতের জোর চাই।

ইংরেজদের ওই দোষ। যা করবে একেবারে গোড়া বেঁধে নিয়ে করবে। আরে বাবা, লিখতে বসেছিস গোল্ড স্মাগলিং। থ্রিলার সিরিজের মত লিখে যাবি চমকপ্রদ সব ঘটনা। অত লেকচার মারছিস কেন? এই থিসিস সাবমিট করে দিলেই তো পি.এইচ.ডি.মিলে যেত। তা না করে কেন মিছে আমাদের মত সাধারণ পাঠককে নাকানি-চুবানি খাওয়ানো, বাবা? অত যদি বিদ্যের ভুড়ভুড়ি ওঠে পেটের মধ্যে তো কলেজে ঢুকে পড়ো না, চাঁদ। প্রচুর শ্রোতা পাবে।

মেজাজটাই খারাপ করে দিয়েছে বইটা। টেবিল থেকে তুলে নিয়ে আবার সজোরে রাখল রানা ওটাকে টেবিলের উপর। গায়ের ঝাল একটু কমল। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল সে। সোঁ-সোঁ একটানা সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে। স্লীপিং গাউনটা পত্ পত্ উড়ছে পতাকার মত। নিচে সেইলর্‌স ক্লাবের কাঁচের ওপাশে কালো পর্দা টানা। এক-আধ চিলতে উজ্জ্বল আলো এসে পড়ছে বাইরে। কালো আলখেল্লা গায়ে জাদুকরের মত লাগছে ঘরটাকে। ভিতরে তার অসীম রহস্য। আর দুষ্টবুদ্ধির ঝিলিক।

এই আলখেল্লার জন্যেই ওয়ালী আহমেদ সন্ধ্যার পর খেলতে পারে না। খেলার কথায় রানার মনে পড়ল জিনাত সুলতানার কথা। অদ্ভুত মেয়ে। এত রূপই ওর কাল হয়েছে। বারবার প্রবঞ্চনা পেয়েছে সে স্বার্থপর পুরুষের কাছ থেকে। মমতা হয় রানার।

শীত-শীত করছে। দোসরা মার্চ। বাংলায় ফাল্গুন মাস। কিন্তু শীতের আমেজ যায়নি। একটু বেশি রাতে তো রীতিমত শীত। ঘরের ভেতর চলে এল রানা। ওদিকের দরজাটা বন্ধ করে দিল। দুটো কামরা নিয়ে ওর সুইট। ড্রইংরুমের মধ্যে দিয়ে বেরোতে হয় বাইরে। দরজা বন্ধ আছে কিনা আরেকবার পরীক্ষা করে তিন ওয়াটের সবুজ বাতিটা জ্বেলে দিয়ে বাকি সব বাতি নিভিয়ে দিল রানা। দামী কম্বলের তলায় ঢুকে পাশ ফিরতে যাবে এমন সময় কান খাড়া হয়ে গেল ওর দরজায় মৃদু টোকা শুনে। আবার শব্দটা হতেই বুঝল কানের ভুল নয়।

মৃদু সাবধানী টোকা। কে হতে পারে? সোহেল? না শত্রুপক্ষ? নিঃশব্দ পায়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল। অপর পারে ঠুন করে একটা হাল্কা আওয়াজ হতেই মৃদু হেসে বাতি জ্বালল রানা। চুড়ির আওয়াজ। দরজা খুলতেই ঘরে প্রবেশ করল জিনাত সুলতানা।

'কি ব্যাপার, জিনাত?'

কোনও উত্তর না দিয়ে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল জিনাত। তারপর ঘুরে দাঁড়াল রানার মুখোমুখি। রানার ওপর একবার আপাদমস্তক নজর বুলিয়ে নিয়ে ওকে পাশ কাটিয়ে শোবার ঘরে চলে এল সে। যেন নিজের বাড়ি। রানাও এল পিছন পিছন। ম্লান সবুজ আলো জ্বলছে, সুইচ টিপে উজ্জ্বল বাতি জ্বেলে দিল সে।

'কথা দিয়েও এলে না কেন?' জিনাতের কণ্ঠে তীক্ষ্ণ তিরস্কার। মুখোমুখি

দাঁড়িয়েছে সে রানার।

হাসল রানা। 'সুদে-আসলে টাকা ফেরত নিতে?' মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ। 'কার কাছে যাব বুঝতে পারছিলাম না—টাকাগুলো তো সব এখন ওয়ালী আহমেদের পকেটে। ভাবছিলাম তোমার ঘরে যাব, না ওর ঘরে!'

রানার আমুদে ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল জিনাত। তারপর আবার গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'আমি জানতে এসেছি—গেলে না কেন? মানুষ এমনিতেই সুযোগ নিতে চায়, আর তুমি তো টাকা দিয়েছ।'

'দেখো, জিনাত, মানুষের কথা ছেড়ে দাও। আমি কোনদিন পুরোপুরি মানুষ হতে পারিনি। সব কাজ সবাইকে দিয়ে হয় না—এখন তুমি যদি নিজ গুণে ক্ষমা করে দাও...'

'তাহলে টাকা দিলে কেন?'

'ওটা দিয়েছি অন্য কারণে।'

'দয়া? না পবিত্র প্রেম?' জিনাতের কণ্ঠে বিদ্রূপ।

'না। দয়া নয়, প্রেমও নয়—মমতা। তোমার মত আমিও অনেক আঘাত পেয়েছি, জিনাত। আমি জানি তোমার বেদনার গভীরতা। ভুল বুঝো না আমাকে, প্লীজ। আমি তোমাকে কৃপা বা দয়া করিনি।'

'তোমার মমতার কোনও প্রয়োজন নেই আমার, রানা। কারও মমতা আর আমাকে ফেরাতে পারবে না। একটা কথার সোজা উত্তর দেবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'তুমি অপমান করতে চাও আমাকে?' বিছানার উপর বসল জিনাত।

'না। ঢের অপমান পেয়েছ তুমি মানুষের কাছে। আর না।'

কয়েক মুহূর্ত রানার চোখের দিকে চেয়ে রইল জিনাত। যখন বুঝতে পারল কোনরকম কথার চালাকি নয়, আন্তরিক ভাবেই বলেছে রানা কথাটা, হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকল সে।

থতমত খেয়ে গেল রানা। কাঁদলেও কোনও মানুষকে এত সুন্দর লাগতে পারে, জানা ছিল না ওর। কিভাবে সান্ত্বনা দেবে বুঝতে না পেরে ওর কাঁধে একটা হাত রাখল।

'প্লীজ, জিনাত, কেঁদো না। প্লীজ, শান্ত হও। জিনাত...'

একটু সামলে নিয়ে রানাকে টেনে পাশে বসাল জিনাত।

'আমার হাতটা একটু ধরে থাকবে, রানা? আমি এখুনি চলে যাব। আমি চাই, তোমার স্পর্শের স্মৃতি আমার জীবনের শেষ স্মৃতি হোক।'

'তার মানে?'

কোনও জবাব দিল না জিনাত। রানা ভাবল, এই কথা বলছে কেন, আত্মহত্যা করবে নাকি মেয়েটা? কেন যেন মনে হলো, তাহলে মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে পৃথিবীর।

কয়েক মিনিটেই শান্ত হয়ে গেল জিনাত।

'তোমাকে এক কাপ কফি দিই?' জানতে চাইল রানা।

'নাহ্...আচ্ছা, ঠিক আছে।'

মিনি কিচেন থেকে দু'হাতে দু'কাপ কফি নিয়ে এসে দেখল রানা, তেমনি

অবসন্ন ভঙ্গিতে বসে আছে জিনাত। কফি পেয়ে খুশি হয়ে চুমুক দিল।

অপলক চোখে চেয়ে রইল রানা এই অদ্ভুত মেয়েটির দিকে। কি হয়েছে ওর? কিসের প্রচণ্ড ধাক্কায় চুরমার হয়ে গেছে মেয়েটির হৃদয়? সহ্যের শেষ প্রান্তে চলে গেছে, যেন এক্ষুণি ভেঙে পড়বে। কে এ?

রানাকেও অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল জিনাত। একটি কথাও না বলে কফি শেষ করল, তারপর উঠে দাঁড়াল। কথা বলার আগে ঠোঁট জোড়া একটু কাঁপল।

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, রানা। চলি। তোমার টাকাগুলো ফেরত পেয়ে যাবে কাল-পরশুর মধ্যেই। বিদায়।'

দরজা খুলে চলে গেল জিনাত।

ঘুম আসছে না কিছুতেই। ঘুরে ফিরে কেবল জিনাতের কথা ভাবছে রানা। কে এই মেয়েটি? ভেঙে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে পৌঁছে গেছে বেচারী। ওকে ফেরানো যায় না? রানার কাছ থেকে কোনও রকম সাহায্য গ্রহণ করতে রাজি নয় জিনাত। কিছুই কি করবার নেই ওর? কেন জানি নিজেকে বড় অযোগ্য মনে হলো রানার।

শুয়ে শুয়ে নানান কথা ভাবছে রানা। অনেক সময় পার হয়ে গেছে, টেরই পায়নি সে। ভোর হয়ে এসেছে। সাড়ে চারটে বাজে। মাথা থেকে সব চিন্তা দূর করে এবার ঘুমাবার চেষ্টা করল সে। কম্বলটা গলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শুলো। সমস্ত শরীর ঢিল করে দিয়ে ডাকল ঘুমের সুষুপ্তিকে।

এমনি সময়ে বাইরে করিডরে কারও পায়ের শব্দ শুনতে পেল রানা। কেউ হেঁটে চলে গেল ওর ঘরের পাশ দিয়ে সিঁড়ি ঘরের দিকে। এত ভোরে কে যায়? জিনাত না তো! দরজাটা নিঃশব্দে খুলে একটু ফাঁক করে দেখল রানা। সত্যি, জিনাত। করিডরের মোড় ঘুরে সিঁড়ির দিকে চলে গেল সে। চুলগুলো আলুথালু। হাঁটার ভঙ্গিটা ক্লান্ত, অবসন্ন। যেন স্বপ্নের ঘোরে হাঁটছে শ্লথ পায়ে।

কাক-পক্ষীও ওঠেনি এখন। এই ভোর রাতে কোথায় চলেছে জিনাত? হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর কথা মনে আসতেই চমকে উঠল রানা। ছুটে গিয়ে একটা শার্ট গায়ে দিয়ে স্যাণ্ডেল পায়ে বেরিয়ে এল সে ঘর থেকে।

রানা যখন রাস্তায় নামল জিনাত তখন চলে গেছে অর্ধেক পথ। সেইলরস ক্লাবের পাশ দিয়ে সোজা সাগরের দিকে চলেছে সে। রাস্তা ছেড়ে বালিতে নামল জিনাত। আশেপাশে যদ্দূর দেখা যায় একটা জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। পুব দিকের আকাশটায় একটু ফরসা হয়ে আসার আভাস। আবছা কুয়াশায় বেশি দূর দেখা যায় না। দ্রুত হাঁটছে রানা। ওর চোখ দুটো স্থির ভাবে নিবদ্ধ সামনের মূর্তিটার উপর। মাথার মধ্যে দ্রুত চিন্তা। তাই একবারও ভাবল না সে পিছন ফিরে চাইবার কথা। চাইলে দেখতে পেত ঠিক বিশ গজ পিছন পিছন আসছে তিনজন ষণ্ডা-মার্কা লোক। সেই তিনজন।

নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করতে চলেছে জিনাত। রানা ভাবছে, কি বলা যায়? 'এ কি করছ, জিনাত?' বললে সোজা উত্তর আসবে 'তোমার মাথাব্যথা কিসের? তোমার নোংরা নাকটা না গলালে চলছে না?' যদি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, 'আরে, তুমি

এখানে? তুমিও খুব ভোরে স্নান করো বুঝি!' কিংবা 'হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম। ভালই হলো, দেখা হয়ে গেল। চলো না আজ কোথাও আউটিং-এ যাই!' তাহলে অতিরিক্ত নাটকীয় হয়ে যায়। তাছাড়া সে যে পরিষ্কার মিথ্যে কথা বলছে, বুঝবে জিনাত। গায়ে পড়ে উপকারের চেষ্টা দেখে বিতৃষ্ণায় ভরে যাবে ওর মন।

তার চেয়ে সত্যি কথাটাই বলবে। 'তোমার পায়ের শব্দ শুনে পিছু নিয়েছি আমি, জিনাত। কিছুতেই মরতে দেব না আমি তোমাকে। আমার জন্যে বাঁচতে হবে তোমাকে। চলো আমার সঙ্গে।' যদি না আসে তাহলে কি জোর করে ধরে নিয়ে আসবে? কিন্তু তাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। চিৎকার আর ধস্তাধস্তি করলে লোকজন জমা হয়ে পিটিয়ে লাশ করবে। কেলেঙ্কারি কারবার হয়ে যাবে। দেখা যাক, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে।

সাগরের একেবারে কাছে চলে গেছে জিনাত। দৌড়াতে আরম্ভ করল রানা। ওর পায়ের তালে তালে পিছনের তিনজনও দৌড়াচ্ছে এখন। হাঁটু পানিতে নেমে গেছে জিনাত।

'জিনাত!' রানা ডাকল।

চমকে ফিরে চাইল জিনাত। দুই গাল বেয়ে জল পড়ছে ওর। আবছা কণ্ঠে বলল, 'কে! কি চাও তুমি?'

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা, 'উঠে এসো, জিনাত। এভাবে মরতে পারবে না তুমি। কিছুতেই মরতে দেব না আমি তোমাকে।'

কি যেন বিড় বিড় করে বলল জিনাত, রানা বুঝতে পারল না। রানার কাঁধের ওপর দিয়ে ওর দৃষ্টিটা চলে গিয়েছে পিছনে। কি দেখছে পিছনে ভেবে যেই রানা পিছন ফিরতে যাবে ওমনি কথা বলে উঠল একজন উর্দুতে। আদেশের সুর সে কণ্ঠে।

'খবরদার! মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও। এক ইঞ্চিও নড়বে না!'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। যমদূতের মত দাঁড়িয়ে আছে সেই তিনজন পাঠান। স্থির, নিশ্চল। খালি হাতে থাকলে হয়তো চেষ্টা করে দেখতে পারত রানা। কিন্তু দেখল তিন জনের হাতেই তিনটে চকচকে রিভলভার, ওর দিকে ধরা। ধীরে হাত তুলল সে মাথার উপর।

ব্যাপার কি? কারা এরা? সাধারণ চোর ছ্যাঁচোড় তো নিশ্চয়ই নয়। আজ তিনদিন ধরে লক্ষ রাখছে এরা ওর ওপর। ওর পরিচয় কি প্রকাশ পেয়ে গেল শত্রুপক্ষের কাছে? আজ এই ভোর রাতে যখন ধাওয়া করে এসেছে পেছন পেছন তখন নিশ্চয়ই কোনও মতলব আছে ওদের। কি চায় এরা? ওকে ধরিয়ে দেবার জন্যে মেয়েটিকে ওর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে না তো?

এখানেই ওকে শেষ করে দেবার ইচ্ছে নেই বোঝা গেল। আওয়াজ শুনে হোটেল থেকে লোকজন বেরিয়ে আসবে, সেজন্যেই হয়তো, দু'জন রিভলভার ধরে থাকল, আর তৃতীয়জন তার রিভলভারটা পকেটে পুরে দ্রুত পরীক্ষা করল রানার সাথে কোন অস্ত্র আছে কিনা। কিচ্ছু নেই। রানা বুঝল এই সুযোগ। অন্তত কিছুক্ষণ দেরিও যদি করানো যায় তাহলে ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে কোন না কোন সাহায্য এসে

যেতে পারে। গুলি ওরা নেহাত নিরুপায় না হলে ছুঁড়বে না। খপ্ করে লোকটার ডান হাতটা কব্জির কাছে ধরেই বাম হাতে কনুইটা ঠেলে ওপর দিকে ওঠাল রানা। এটা যুযুৎসুর খুব সহজ একটা প্যাঁচ। বেকায়দা অবস্থায় পিঠের দিকে চলে এল হাত—শরীরের উপর দিক ঝুঁকে পড়ল সামনে। মাঝারি রকমের একটা চাপ দিতেই মুখ দিয়ে আল্লার নাম বেরিয়ে পড়ল লোকটার। আরেকটু জোরে চাপ দিলেই মড়াৎ করে ভেঙে যাবে কাঁধের হাড়। এমন সময় দেখা গেল একটা জিপ এগিয়ে আসছে বালির উপর দিয়ে।

রানা ভাবল, এইবার ব্যাটাদের দেখে নেবে। সোজা শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে বাছাধনেরা। জিপের আরোহী যে-ই হোক না কেন, নিশ্চয়ই ওর এই বিপদে সাহায্য করবে। কিন্তু মেয়েটা সম্পর্কে কি গল্প বানিয়ে বলবে সে? এই ভোর রাতে সাগর পারে কেন আসে একজন ভদ্রমহিলা? তার ওপর আলুথালু বেশ।

ওদের দেখতে পেয়েছে জিপের ড্রাইভার। সোজা এগিয়ে আসছে এদিকে। জয়ের উল্লাসে রানা বলল, 'এখনও সময় আছে, বাপ্। তোমরা দু'জন কেটে পড়তে পারো ইচ্ছে করলে—কিন্তু এই শালাকে ছাড়ছি না।'

কোন রকম ভাবান্তর হলো না রিভলভারধারীদের চেহারায়। একজন শুধু কাছে এসে চট্ করে তৃতীয়জনের রিভলভারটা তুলে নিল ওর পকেট থেকে। তারপর আবার কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল নির্বিকার ভঙ্গিতে। জিপটা কাছে এসে থামতেই লাফিয়ে নামল আরও দু'জন। চুপসে গেল রানার উৎসাহ। চেহারা দেখেই বোঝা গেল একই দলের লোক।

এবার পরিষ্কার ইংরেজিতে একজন বলল, 'বাধা দিলে বেহুদা জখম হবে, মিস্টার। হাতটা ছেড়ে দিয়ে গাড়িতে এসে বসো।'

রিভলভার দিয়ে ইঙ্গিত করতেই জিনাত গিয়ে উঠে পড়ল জিপের পেছনে। রানা বুঝল বাধা দিয়ে এখন লাভ নেই। সে-ও ভালমানুষের মত গিয়ে বসল জিনাতের পাশে। রানার কাবু করে ফেলা তৃতীয়জন ড্রাইভারের পাশে বসল ডান কাঁধটা ডলতে ডলতে। বাকি চারজনও উঠে বসল গাড়ির পেছনে ঠাসাঠাসি করে। জিনাতকে অভয় দেয়ার জন্যে ওর বাহুতে একটু চাপ দিল রানা এক হাতে। আর একটু কাছে ঘেঁষে এল জিনাত প্রত্যুত্তরে।

একটা ব্যাপার রানা লক্ষ করল যে জিনাতের প্রতি এতটুকু অশ্লীল ইঙ্গিত করল না একটি লোকও। এমন কি ওর দিকে চোখ তুলেও চাইছে না কেউ। সাধারণত স্ত্রীলোককে হাতের মুঠোয় পেলে পুরুষ দুর্বৃত্ত যে ব্যবহার করে থাকে তার কিছুমাত্র প্রকাশ পেল না ওদের ব্যবহারে। দ্বিতীয়বার ভাবল রানা, জিনাত কি টোপ হিসেবে কাজ করল। ওরা একজনকে বন্দী করল, না দু'জনকেই? ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছে কেউ? নাকি কোনও প্রেমিক বা স্বামীর প্রতিশোধ? এর শেষ কি? নির্যাতন? খুন?

টাওয়ার ছাড়িয়ে ম্যাকলিওড রোডে পড়ল জিপ। নিউ স্টেট ব্যাঙ্ক বিল্ডিং পার হয়ে ঢুকল উডস্ট্রীটে, তারপর বার্নস্ রোড। নাজিমাবাদের দিকে চলেছে ওরা।

চমৎকার একটা দোতলা বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় এসে থামল জিপ। আরও চারজন পাঠান বেরিয়ে এল। একটিও বাক্য বিনিময় হলো না। চারদিক থেকে ঘিরে রানা এবং জিনাতকে নিয়ে যাওয়া হলো বাড়ির ভেতর। লোকগুলোর চলাফেরা

হাবভাব ঠিক চাবি দেয়া যন্ত্রের মত।

কিছুদূর গিয়েই বাঁয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। রানাও জিনাতের পিছু পিছু উঠতে যাচ্ছিল ওপরে। বাধা দিল একজন।

'তুম ইস্‌তারাফ।'

ডানধারের দরজা দিয়ে ভারি একটা পর্দা তুলে ঢোকানো হলো রানাকে। চমৎকার সুসজ্জিত একটা ওয়েটিং-রুম। অতিথিদের অপেক্ষা করবার জন্যে। ঘরের চারকোণে পা-লম্বা টেবিলের উপর চারটে ফ্লাওয়ার ভাসে তাজা ফুলের তোড়া। ওপাশে আরেকটা ঘর। বোধহয় ড্রইংরুম। সেই দরজাতেও দামী পর্দা ঝোলানো।

রানাকে সম্পূর্ণ আওতার মধ্যে পেয়ে ওদের সতর্কতায় একটু ঢিল পড়েছিল। তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল রানা। পিছনে না চেয়েই ডান কনুইটা রেল এঞ্জিনের পিস্টনের মত সজোরে চালিয়ে দিল সে পিঠের সাথে ঘেঁষে থাকা লোকটার পেটের উপর সোলার প্লেক্সাসে। 'ঘোঁত্' করে একটা শব্দ বেরোল ওর মুখ দিয়ে। মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে টান দিয়ে রিভলভারটা বের করে নিল রানা ওর ওয়েস্টব্যাণ্ড থেকে। কেউ কিছু বুঝবার আগেই একলাফে হাত চারেক পিছিয়ে এল সে।

'হ্যাণ্ড্স্ আপ্! দুই হাত ঘাড়ের পিছনে তুলে দাঁড়াও সবাই।'

বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে হ্যামারটা তুলল রানা রিভলভারের। মাটিতে পড়ে গড়াগাড়ি খাচ্ছে একজন। বাকি তিনজন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়ে হাত তুলে দাঁড়াল। আরও কয়েক পা পিছিয়ে গেল রানা। এমন সময় ঠিক কানের কাছে একটা মোলায়েম পুরুষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'শাবাস, মাসুদ রানা! কিন্তু পেছন দিকটাও একটু খেয়াল রাখতে হয়। কেবল সামনের দিকে নজর রাখলে কি চলে? চারদিক সামাল দিতে পারলেই না বলব সত্যিকারের হুঁশিয়ার জওয়ান।'

গুরু গম্ভীর, কিন্তু ভদ্র মার্জিত কণ্ঠস্বর। রানা বুঝল হেরে গেছে সে। ভাবল, ঘুরে দাঁড়িয়েই গুলি করবে, যা থাকে কপালে! ঠিক যেন ওর চিন্তাটা বুঝতে পেরেই আবার কথা বলে উঠল পিছনের লোকটি। উর্দুর মধ্যে ফ্রন্টিয়ারের টান।

'আমাকে মেরে কোনও লাভ নেই, মিস্টার মাসুদ রানা। আমি আপনার শত্রু নই। তাছাড়া ঘুরে দেখুন, আমি নিরস্ত্র। আপনি আমার মেহমান। কেউ কিছু বলবে না আপনাকে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে রানা দেখল ডান হাতে পর্দাটা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক প্রৌঢ় পাঠান। পরিষ্কার করে গোঁপ-দাড়ি কামানো। মুখে স্মিত হাসি। প্রশস্ত কপালে বুদ্ধির ছটা। কানের কাছে চুলগুলোতে পাক ধরেছে। লম্বায় রানার চেয়ে ইঞ্চি চারেক ছোট হবে। কিন্তু প্রথম দর্শনেই বোঝা গেল অসুরের শক্তি আছে ওই পেশীবহুল দেহে। আর বুকের মধ্যে আছে দুর্জয় সাহস। রানা ঘুরতেই পিছন থেকে এগিয়ে আসছিল দুইজন। হাত উঠিয়ে থামতে ইশারা করল ওদের দলপতি। পশতু ভাষায় কিছু বলল। মাটি থেকে টান দিয়ে তুলল ওরা আহত সঙ্গীকে। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'আসুন। ভেতরে আসুন, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনার সাথে অনেক কথা আছে আমার। কফি খেতে খেতে গল্প করা যাবে। আপনার হাতে রিভলভার

আছে। ইচ্ছে করলেই আমাকে খতম করে দিতে পারেন আপনি। কাজেই নিজেকে বন্দী মনে করবেন না। আমিই বরং আপনার বন্দী।'

হাসল ভদ্রলোক। অদ্ভুত আকর্ষণীয় হাসি। রানার মনে হলো কোথায় যেন দেখেছে আগে এই হাসি। কিন্তু স্মৃতির পাতা হাতড়ে এই মুখটা কিছুতেই মনে পড়ল না ওর। হাসিটার অদ্ভুত একটা সংক্রামক গুণ আছে। রানাও না হেসে পারল না। বহুদিন পর এমন সজীব, প্রাণবন্ত, ক্ষমতাবান একজন মানুষের মুখোমুখি হলো সে। লোকটার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ আছে, মুখের মধ্যে একটা বাল্‌ব ধরলে দপ্ করে জ্বলে উঠবে। নিজের অজান্তেই প্রসন্ন হয়ে উঠল রানার মনটা।

লোকটার পিছনে দরজার গায়ে ক্যালেণ্ডার ঝুলছিল একটা। মার্চ আর এপ্রিল মাস পাশাপাশি। হঠাৎ 'এপ্রিল ফুল' বলেই গুলি ছুঁড়ল রানা। পয়লা এপ্রিলের ছোট্ট চারকোণা ঘরের মধ্যে গিয়ে লাগল গুলিটা দলপতির কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গিয়ে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল পাঠান ক্যালেণ্ডারটা।

'শাবাস্! বাঙ্গাল কা শের হো তুম, মাসুদ রানা।' অব্যর্থ লক্ষ্য দেখে তারিফ করল সে। তারপর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমার নাম খান মোহাম্মদ জান। শুনেছেন কখনও?'

'না।' ইঁটের মত শক্ত হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলল রানা। নামটা চেনা চেনা লাগলেও মনে করতে পারল না সে কোথায় শুনেছে।

'তাই নাকি? আশ্চর্য। কিন্তু আপনার নাম-ধাম পরিচয় সব আমার নখ-দর্পণে। আপনি পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এই ডিপার্টমেন্টে আসার আগে আপনি আর্মিতে মেজর ছিলেন। করাচি এসেছেন স্বর্ণমৃগ শিকার করতে। কি? ঠিক বলিনি?'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল মোহাম্মদ জানের মুখ। মুখে সংক্রামক হাসি।

রানা নিজের বিস্ময় গোপন করে জিজ্ঞেস করল, 'আর আপনি কোথাকার জ্যোতিষ্ক জানতে পারি?'

'আমি মালাকান্দের ট্রাইবাল চীফ।'

# চার

এবার আর বিস্ময় গোপন করতে পারল না রানা। সম্ভ্রমের সঙ্গে দ্বিতীয়বার লক্ষ করল প্রাণবন্ত মুখটা।

এই সেই দুর্দান্ত খান মোহাম্মদ জান! বৃটিশের রাজত্বকালে যে কিনা ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। যার নাম বললেই পশ্চিম পাকিস্তানের ছেলে বুড়ো সবাই চেনে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে যার নাম ভীতির সঙ্গে স্মরণ করা হয়। এই সেই খান মোহাম্মদ জান!

এই লোক তাকে বন্দী করে এনেছে কেন? এর নামে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে আলাদাভাবে একটা ফাইল রাখা আছে। সবাই জানে আফগানিস্তান, ইরান আর সোভিয়েট রিপাবলিকের দুর্বৃত্তদের সাথে এর মস্ত চোরাচালানী কারবার

আছে। কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছে সে এই উপায়ে। বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কে জমা আছে এর অগাধ সম্পদের বেশ-অনেকখানি অংশ। অথচ কেউ কখনও আইনের প্যাঁচে ধরতে পারেনি একে বেকায়দা অবস্থায়। তার এলাকায় সে সম্রাট। পাকিস্তান সরকারও তাকে সব সময়ে ঘাঁটাতে সাহস পায় না।

এই কি তাহলে সোনা চোরাচালানকারীদের অদৃশ্য সর্দার? একেই খুঁজে বের করবার জন্যে পাঠানো হয়েছে তাকে ঢাকা থেকে?

'কই, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, মি. মাসুদ রানা? বসুন।'

একটা সোফায় বসে পড়ল রানা। গুলির শব্দে ছুটে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল কয়েকজন। মোহাম্মদ জান হাতে তালি দিতেই ঘরের ভিতর ঢুকে সালাম করল একজন; পশ্‌তু ভাষায় কিছুক্ষণ অনর্গল কথা বলল মোহাম্মদ জান। লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই রানাকে বলল, 'আপনার জন্যে পাশের বাথরুমে সব কিছু তৈরি আছে, মিস্টার রানা। টুথব্রাশ, সাবান, টাওয়েল, সবই নতুন। আপনাকে বলেছি, আমি আপনার শত্রু নই। আপনি নিশ্চিন্ত মনে মুখ হাত ধুয়ে আসুন। ততক্ষণে নাস্তা এসে যাবে। প্লীজ!'

'জিনাতকে কোথায় রেখেছেন?'

মৃদু হাসল মোহাম্মদ জান। বলল, 'চিন্তা করবেন না। ওকেও যত্নে রাখা হয়েছে।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে রানা দেখল একটা টেবিল লাগানো হয়েছে ঘরের মধ্যে। তার দু'পাশে দুটো চেয়ার। মস্ত একটা থালায় পাঁউরুটি টোস্টের পাহাড়। একটা বাটিতে মাখন ভর্তি। সাদা দুটো প্লেটে পাশাপাশি শুয়ে আছে প্রকাণ্ড সাইজের দুটো করে ধূমায়িত ওমলেট—চারটে ডিম দিয়ে তৈরি প্রতিটা। পাতলা করে কাটা টিনের পনির আছে একটা তস্তরির উপর। একটা দামী ফ্রুট সেটে উঁচু করে আঙুর, নাশপতি, আপেল আর মাল্টা— কিছু কাজুবাদাম আর আখরোট। সব মিলে টেবিলটা প্রায় ভরে যাবার যোগাড়। দশজন একসাথে চেষ্টা করলেও শেষ করতে পারবে না সব। মুখোমুখি বসল দু'জন দুটো চেয়ারে।

'মেজর মাসুদ রানা। আপনার সাথে যা আলোচনা করব তা গোপন রাখবেন বলে কথা দিতে হবে। একেবারে টপ্‌ সিক্রেট। রাজি?'

'তেমন কোনও কথা আমি দেব না। রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন কোন কথা আমাকে বললে সেটা আমার পক্ষে গোপন রাখা সম্ভব হবে না।'

'সেটা আমি ভাল ভাবেই জানি, মিস্টার মাসুদ রানা।' হাসল মোহাম্মদ জান। 'আপনার সম্পর্কে সব রকম রিপোর্ট নিয়েছি আমি। আপনার মত নীতিবান দেশপ্রেমিকের কাছে তেমন কোনও কথা আমি বলতেই বা যাব কোন্‌ সাহসে? আমি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আলাপ করতে চাই। এই ধরুন, আমার একমাত্র কন্যা জিনাত সম্পর্কে।'

এইবার সত্যিই চমকে উঠল রানা। জিনাতের বাবা এই দোর্দণ্ড-প্রতাপ ট্রাইবাল চীফ? এতক্ষণে রানা বুঝল কেন হঠাৎ ফ্রন্টিয়ারের ক্ষমতাশালী এক সর্দার তার সাথে আলাপ করতে চায়। হাসিটাও চিনতে পারল সে এখন—অবিকল জিনাতের হাসি। রীতিমত নাটক জমে উঠেছে মনে হচ্ছে!

'তাহলে রাজি,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'অনেক ধন্যবাদ। আপনার সম্পর্কে সরকারী রিপোর্টে বলে আপনি দায়িত্ববান বিশ্বস্ততমদের একজন। রিপোর্ট না পড়েও আপনার মুখ দেখেই সে কথা অনায়াসে বলে দিতে পারতাম আমি। সত্যিকার মানুষ বলতে আমি যা বুঝি, আপনি তাই। সব কথা খুলেই বলব আমি আপনাকে। তার আগে আসুন নাস্তার পালাটা শেষ করে নেয়া যাক।'

নাস্তার পর কফি এল। একটা চেস্টারফিল্ড প্যাকেট থেকে নিজে একটা নিয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল মোহাম্মদ জান। রানা মাথা নাড়ল। নিজের সিগারেটে আগুন ধরিয়ে নিয়ে আরম্ভ করল মোহাম্মদ জান:

'আজ বারো বছর আমি বিপত্নীক। আর বিয়ে থা করিনি। মর্দানের সেরা সুন্দরীকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে এসে বিয়ে করেছিলাম আমি। এবং ভালবেসেছিলাম।

'মায়ের অভাবে আমার একমাত্র সন্তান এই জিনাত বখে যেতে পারে সেই ভয়ে ওকে লাহোরের সেরা বোর্ডিং স্কুলের হোস্টেলে রেখেছিলাম। ছুটি-ছাটায় বাড়ি আসত। ওদের শিক্ষা-দীক্ষায় আমি সন্তুষ্ট ছিলাম। সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পর্যন্ত ভালই ছিল। কিন্তু কলেজে উঠে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বংশ-মর্যাদাহীন বড়লোকদের আলট্রা-মডার্ন সব ছেলেমেয়েদের সাথে মেলামেশা আরম্ভ করল জিনাত। খারাপ সংসর্গের এমনই গুণ, এক মাসের মধ্যেই লাজুক পাহাড়ী মেয়েটা বদলে গেল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। চক্রবৃদ্ধি হারে খারাপ লোক এসে ভিড় করল ওর আশেপাশে। একেবারেই বখে গেল মেয়েটা। ফিল্ম লাইনে ঘোরাফেরা আরম্ভ করল। অনেক রাতে ফেরে হোস্টেলে। মাঝে মাঝে দু'একদিন ফেরেও না। হোস্টেলের সুপারের চিঠি আসতে আরম্ভ করল আমার কাছে। প্রথমে আমি বিশ্বাস করিনি ওদের নালিশ। নিজ সন্তানের ওপর সব পিতারই অমন অন্ধ বিশ্বাস থাকে।

'কিন্তু ফোর্থ ইয়ারে উঠে কলেজের এক ছোকরা প্রফেসরের সাথে বাথরুমে ধরা পড়ায় রাস্‌টিকেট করা হলো ওকে।

'বিশ্বাস করুন, মি. রানা, এই একটি মাত্র মেয়ের দুঃখ হবে বলে বয়স থাকতেও আর বিয়ে করিনি আমি। ওকে চোখের মণি করে রেখে ওর মায়ের অভাব পূরণ করার চেষ্টা করতাম। যা চাইত, তাই পেত সে। এদিকে আমাকে সেই সময়টা দৌড়াদৌড়ির ওপর থাকতে হত। কয়েকটা কেসে গোলমাল হয়ে যাওয়ায় ধরা পড়বার উপক্রম হয়েছিল। ওর দিকে নজর দেবার সময় তেমন পেতাম না। নিজেকে শেষ করে ফেলল সে। সব ব্যাপার দেখে-শুনে এবার আমি কঠিন হবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু হিতে বিপরীত হলো। আরও অবাধ্য হয়ে উঠল সে। হাত খরচের টাকা কমিয়ে দিলাম। তার ফলে আমার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই বোধহয় সে প্রেমিকদের কাছে টাকা নিতে আরম্ভ করল, যেখানে-সেখানে ধার করতে আরম্ভ করল।'

সিগারেটটা অ্যাশট্রে-তে ফেলে চুপচাপ কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল মোহাম্মদ জান। বোধহয় গুছিয়ে নিল কথাগুলো মনের মধ্যে।

'কিন্তু যত যা-ই করুক, ওর মনের একটা দিক নিরন্তর চাবুক মারত ওকে।

হাজার হোক ভাল বংশের মেয়ে। বিবেক দংশন আরম্ভ হলো ওর মধ্যে। নিজেকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করল। ঠিক সেই সময়েই বোধহয় আত্মহত্যার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল ওর মধ্যে। নিজেকে শুধরাবার চেষ্টা করল জিনাত। জীবনে শান্তি পাওয়ার আশাতেই বোধহয় এক ফিল্মস্টারকে বিয়ে করে বসল হঠাৎ আমাকে না জানিয়ে। ফিল্ম-লাইন পছন্দ না করলেও আমি খুশি হয়েছিলাম ওর এই পরিবর্তন দেখে। এক কোটি টাকার উপঢৌকন পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু বছর দু'য়েক হলো ওর সমস্ত টাকা-পয়সা, গয়না-গাটি চুরি করে পালিয়ে গেছে সেই হিরো বোম্বেতে নাম করবার আশায়। জিনাতের কোলে তখন তিন মাসের একটা শিশু।'

চুপচাপ মন দিয়ে শুনছে রানা রহস্যময়ী মেয়েটার পূর্ব ইতিহাস।

'অনেক টাকা পয়সা খরচ করে এবং ভয় দেখিয়ে আমি তালাক আদায় করি সেই হিরোর কাছ থেকে। মারীতে একটা বাড়ি কিনে দিলাম জিনাতকে। মনে হলো যেন শান্তি পেল মেয়েটা। বেশ ছিল বাচ্চাকে নিয়ে বিভোর হয়ে। কিন্তু অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়। আজ আট মাস হলো হঠাৎ একসাথে ডাবল নিউমোনিয়া আর ব্যাসিলারি ডিসেনট্রি হয়ে মারা গেছে বাচ্চাটা।

'আপনাকে কি বলব, মিস্টার রানা। আমার একমাত্র আদুরে জিদ্দি মেয়েটার কপালে খোদা ভাল যেটুকু লিখেছিল, সে-সময় বোধহয় কলমে তার কালি ছিল না।

'এই চরম আঘাত পেয়ে সমস্ত পৃথিবীর ওপর খেপে গেল মেয়েটা। কিছুতেই আর আপস করবে না। ধ্বংস করে ফেলবে নিজেকে। আবার ফিরে গেল সে তার আগের জীবনে। আজ এখানে কাল ওখানে পাগলের মত সে জীবনটা চেখে নিতে চাইল শেষ বিদায়ের আগে। আমি অনেক চেষ্টা করলাম ওর সাথে দেখা করবার, কথা বলবার। কিন্তু হলো না! বারবার এড়িয়ে চলে গেল ও। কিছুতেই সন্ধি করবে না সে নিষ্ঠুর জীবনের সাথে। আমিও পাগলের মত খুঁজে বেড়াতে থাকলাম ওকে। লোক লাগালাম চারদিকে। কিন্তু আমি পেশোয়ার পৌঁছতে পৌঁছতে ও চলে যায় পিণ্ডি, পিণ্ডি পৌঁছলে খবর পাই চলে গেছে লাহোর। কিছুতেই ধরতে পারি না ওকে। কিছুদিন একেবারে গায়েব হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ খবর এল ও করাচির বীচ্ লাগ্জারি হোটেলে একটা রুম রিজার্ভ করেছে। ছুটে এলাম করাচি। পাহাড়ী দেশের মানুষ আমরা, সাগরকে সব সময় ভয় পাই। যখন শুনলাম ও সাগর পারের হোটেলে উঠেছে তখন থেকে আধমরা হয়ে আছি আমি, মিস্টার রানা। জানলাম, দ্রুত সময় ফুরিয়ে আসছে। যে কোনও মুহূর্তে আমার হাত ফস্কে চলে যাবে ও নাগালের বাইরে, চিরতরে।'

একটানা এতক্ষণ কথা বলায় দুই কষায় ফেনা জমেছে মোহাম্মদ জানের। রুমাল দিয়ে মুছে নিল সেটা। আরেকটা সিগারেট ধরাল। কিছুক্ষণ চুপচাপ টানল সিগারেটটা।

'আপনাকে আজ আমার বুকে চেপে রাখা এতদিনকার গোপন কথা বলতে পেরে মনটা যে কতখানি হালকা হয়ে গেল, মিস্টার রানা, বোঝাতে পারব না! যাক্, যা বলছিলাম, কড়া নজর রাখলাম আমি ওর ওপর।'

হোটেলের সেই তিনজন লোকের কথা মনে পড়ল রানার।

'ওর প্রতিটা পদক্ষেপ আমার লোক লক্ষ করেছে। এবং প্রতি দশ মিনিট অন্তর

অন্তর টেলিফোনে জানিয়েছে আমাকে। আপনাকে ধন্যবাদ জানানো হয়নি এখনও। জিনাতকে টাকা ধার দিয়ে সাহায্য করবার জন্যে আমি আপনার কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ।'

'সাহায্য তো নয়, বরং ক্ষতিই হয়েছে। সব টাকা হেরেছে,' বলল রানা।

'কিছু বলা যায় না, মেজর। কিছুই বলা যায় না। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তা এক ওপরওয়ালাই জানেন। আমরা তার কি বুঝি? যাক্, যা বলছিলাম। এই বাড়িতে বসেই ওর গতিবিধি আমার নখদর্পণে ছিল। সব খবরই জানি আমি। বমি করে ঘর ভাসানো, আপনার সাহায্য করতে এগিয়ে আসা থেকে নিয়ে রাত পোনে একটায় আপনার ঘরে জিনাতের প্রবেশ এবং দেড়টায় প্রস্থান—কিছুই আমার অজানা নেই।'

অস্বস্তি বোধ করল রানা। একটু নড়ে চড়ে উঠল। হাত উঠিয়ে যেন অভয় দিল ওকে সর্দার।

'এতে লজ্জা পাওয়ার কিছুই নেই, মেজর রানা। ব্যাটা-ছেলের এতে লজ্জার কিছুই নেই। আর আমার মেয়েও কচি খুকি নয়। তাছাড়া কে জানে, হয়তো…যাক্, সে কথায় পরে আসছি। এমনও হতে পারে গত রাতের ঘটনাটাই ওর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে। হয়তো এটা একটা চিকিৎসার কাজই করল ওর ওপর।'

এইবার খানিকটা আঁচ করতে পারল রানা কেন ওকে ধরে আনা হয়েছে। এর আসল রহস্যটা কোথায়। কেন জানি একবার শিউরে উঠল ওর সর্বশরীর। যেন কেউ হেঁটে চলে গেল ওর কবরের ওপর দিয়ে।

'গত দুই দিনেই আমি আপনার সম্পর্কে সব তথ্য জোগাড় করে ফেললাম।'

'কিভাবে?' চট্ করে জিজ্ঞেস করল রানা।

হাসল খান মোহাম্মদ জান ওর সেই সংক্রামক হাসি।

'সেটা যদিও আমার বলা উচিত না, তবু বলব আপনাকে। কারণ আমি যদি খবর বের করতে পেরে থাকি, অন্যেও পারবে। এটা আপনার নিরাপত্তার ওপর স্পষ্ট হুমকি। কিন্তু এসব কথা পরে হবে। আগে এই প্রসঙ্গ শেষ করে নিই।'

আবার দু'কাপ কফি এল। লোকটা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চুপ করে থাকল খান মোহাম্মদ জান।

'আপনার সম্পর্কে যা রিপোর্ট পেলাম এবং টেলিফোনে যা খবর পেলাম তাতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠলাম আমি। রাত দুটো পর্যন্ত চিন্তার পর ওদের জানালাম, আপনার সাথে দেখা করতে চাই আমি। আপনার অনেক সময় নষ্ট হলো, সেজন্যে এই জোড় হাত করে মাফ চাইছি আমি। আপনি হয়তো মনে করেছিলেন বিপদে পড়েছেন, সেজন্যেও ক্ষমা চাইছি। কিন্তু এছাড়া আমার কোনও উপায় ছিল না, মিস্টার রানা।'

'আর কোনও উপায়ে কি আমার দেখা পাওয়া সম্ভব ছিল না?' একটু রুষ্ট কণ্ঠে বলল রানা।

উঠে এসে রানার বাহুর ওপর হাত রাখল মোহাম্মদ জান।

'সেজন্যে তো মাফই চাইছি, মেজর। একটা আকুল পিতৃ-হৃদয়ের উদ্বেগের সাথে পরিচয় হতে আপনার দেরি আছে অনেক। আরও পঁচিশটা বছর যাক, তখন বুঝবেন। তাছাড়া একটু পরেই বুঝবেন ব্যাপারটা কত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ডেকে আনতে বললে যে ওরা একেবারে বেঁধে নিয়ে আসবে তা অবশ্য আমার জানা ছিল না। কিন্তু এর প্রয়োজনও ছিল। এই চিঠিটা পড়লে আর আমাকে দোষ দিতে পারবেন না। এই নিন, পড়ে দেখুন।' পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে দিল মোহাম্মদ জান। 'যেই জিনাত রওনা হয়েছে সাগরের দিকে ওমনি আমার লোক ওর সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে এখানে। এই চিঠিটা ছিল ওর টেবিলের ওপর। আপনিও তো কিছু সন্দেহ করেছিলেন, তাই না? এখন দেখুন।'

ছোট্ট চিঠিটা উর্দুতে লেখা। রানা পড়ল:

আব্বাজী,

এছাড়া আমার আর কিছুই করবার ছিল না। শুধু একটু খারাপ লাগছে একজনের জন্যে—ও আমাকে ভাল করতে চেয়েছিল। লোকটা বাঙালী। নাম মাসুদ রানা। ওকে খুঁজে বের করে দশ হাজার টাকা দিয়ে দিয়ো। আমি ধার নিয়েছিলাম। আর তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। বিদায়।

জিনা।

চিঠি থেকে চোখ তুলে চাইল রানা। উদগ্রীব একজোড়া চোখ চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে। ফেরত দিল রানা চিঠিটা। ভাঁজ করে পকেটে রাখল সেটা মোহাম্মদ জান। তারপর হঠাৎ রানার ডান হাতটা তুলে নিল নিজের দুই হাতে।

'মাসুদ রানা। আপনি সমস্ত কাহিনী শুনলেন। প্রমাণও দেখলেন। খোদা জানে, এর মধ্যে একবিন্দু মিথ্যে কথা নেই। একটু দয়া করবেন আমার ওপর? মেয়েটাকে রক্ষা করতে একটু সাহায্য করবেন আমাকে? বলুন?'

করুণ মিনতি সর্দারের চোখে-মুখে। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে টেবিলের উপর রাখল রানা। কপালে ঘাম দেখা দিল ওর। টেবিলের উপর রাখা হাতের দিকে চেয়ে রয়েছে সে—চোখ তুলল না। মনে মনে ভাবছে, এ কি ফ্যাকড়ায় পড়ল সে। সে তো ডাক্তার নয়। সে কী সাহায্য করবে? যেন হাতের সাথে কথা বলছে এমনি ভাবে বলল, 'আমার মনে হয় না আমি তেমন কোনও সাহায্য করতে পারব। আপনার কি মনে হয়?'

উত্তেজনায় খান মোহাম্মদের কপালের দুটো শিরা ফুলে উঠেছে। গলার স্বরে একটা জরুরী ভাব আর সেইসাথে কাতর অনুনয় ফুটে উঠল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আমি চাই তুমি আমার মেয়ের সাথে প্রেম করো, ওকে বিয়ে করো। আমি তোমাকে তিন কোটি টাকা দেব যৌতুক হিসেবে।'

ছ্যাঁৎ করে জ্বলে উঠল রানা।

'বাজে বকছেন আপনি, সর্দার। মেয়েটি ভুগছে মানসিক ব্যাধিতে। ভাল ডাক্তার দেখান। কাউকে বিয়ে করব না আমি—আর কারও টাকারও আমার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট রোজগার করি আমি।'

একটু থেমে শান্ত গলায় আবার বলল, 'জিনাতকে আমি পছন্দ করি। ওকে কোন রকম সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু ও অসুখ থেকে সেরে উঠলেই কেবল ওর সাথে আমার প্রেম বা বিয়ের কথা উঠতে পারে। তার আগে নয়। আমি একজন দুরন্ত প্রকৃতির লোক—শত্রু আর বিপদ নিয়ে আমার কারবার, আপনি জানেন। কারও সেবা-শুশ্রূষা করবার ক্ষমতা বা ধৈর্য আমার নেই। ওর চিকিৎসা

দরকার, সর্দার। আপনি যে ভাবে ওকে সাহায্য করতে চাইছেন তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। বুঝতে পারছেন না আমার কথাটা?'

চুপচাপ শুনল কথাগুলো মোহাম্মদ জান রানার চোখের উপর চোখ রেখে। তারপর নরম গলায় বলল,'বুঝতে পেরেছি। আপনার সাথে আমি তর্ক করব না। আপনি যেমন বললেন, ঠিক তেমনি করব আমি। কিন্তু দয়া করে শুধু একটা অনুগ্রহ করবেন?'

'কি?'

'আজ সারাটা দিন ওর সাথে কাটিয়ে ওকে শুধু এটুকু বুঝিয়ে দেবেন, ওকে পছন্দ করেন আপনি, ওর প্রয়োজন আছে বেঁচে থাকবার, আবার দেখা হবে আপনাদের। যদি আপনি ওকে একটু আশা, একটু ভরসা দিতে পারেন, তাহলে বাকিটা আমি পারব বোঝাতে। আমার জন্যে এটুকু করবেন না আপনি, মেজর রানা?'

ব্যস? এইটুকুতেই খুশি? রানার বুকের উপর থেকে যেন পাথর সরে গেল একটা। তাহলে জোর করে ওর কাছ থেকে কিছুই আদায় করতে চাইছে না এই ক্ষমতাশালী ট্রাইবাল চীফ?

'নিশ্চয়ই!' বলল রানা। 'এটুকু তো নিশ্চয়ই করব আমি। কিন্তু আমি মাত্র তিনদিন আছি করাচিতে। এরপর আপনাকে গ্রহণ করতে হবে ওর ভার।'

মোহাম্মদ জানের মুখে হাসি ফুটল আবার।

'এতক্ষণ পর! উঃ! এতক্ষণ পর একটু আশার আলো দেখালে, বাবা। তিন দিন যথেষ্ট। তারপর নিশ্চয়ই আমি ওর ভার নেব।' রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল মোহাম্মদ জান। 'তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার কোনও ভাষা নেই আমার, মেজর রানা। তুমি বাঁচালে আমাকে। কিন্তু তোমার জন্যে কিছু করবার সুযোগ দেবে না আমাকে? আমার অনেক বুদ্ধি, অনেক টাকা আর অ-নে-ক ক্ষমতা আছে। সবই এখন তোমার। এমন কি কিছুই নেই যা আমি তোমার জন্যে করতে পারি?'

হঠাৎ রানার মনে পড়ল তার কাজের কথা।

'একজন লোককে খুঁজছি আমি। লোকটা—'

'বুঝেছি। স্বর্ণমৃগ। আজই রাত দশটায় হোটেলে থেকো—তোমাকে নিয়ে যাব এক জায়গায়। সেখানে ওর খবর মিলতে পারে। তাছাড়া আমি এক্ষুণি চারদিকে লোক লাগিয়ে দিচ্ছি। এ কাজটা আমার হাতে ছেড়ে দাও।'

উঠে দাঁড়াল মোহাম্মদ জান। রানাও উঠে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ দুই হাতে জড়িয়ে ধরে রানার দুই গালে চুমো খেলো মোহাম্মদ জান। কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘরে এসে ঢুকল জিনাত সুলতানা। জিনাতকে দেখেই লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি রানাকে ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে দাঁড়াল সে।

## পাঁচ

বেলা নয়টার দিকে স্নান সেরে সবচেয়ে দামী ট্রপিক্যালের নীল স্যুটটা পরে নিল

রানা। শেষ বারের মত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে নিল টাইয়ের নট-টা বাঁকা হয়ে আছে কিনা। এমনি সময় কমলা রঙের একটা চমৎকার দামী কাতান শাড়ি পরে ঢুকল জিনাত রানার কামরায়।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল দু'জন রাস্তায়। লাউঞ্জে দেখা হয়ে গেল ওয়ালী আহমেদের সাথে। লিফটের দিকে যাচ্ছিল সে। থেমে দাঁড়িয়ে দেখল দু'জনকে হাত ধরাধরি করে হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে। বিচিত্র এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

'কোন্ দিকে যাবে, জিনাত?'

'তুমি যেদিকে যাবে সেদিকে।'

'গান্ধী গার্ডেন দেখেছ?'

'না। চলো না যাই? অনেক শুনেছি এই গার্ডেনের কথা।'

'বেশ। প্রথমে ওখানেই চলো।'

হাতের ইশারায় ট্যাক্সি ডাকল রানা। চক্‌চকে নতুন ট্রায়াম্প হেরাল্ডের ছাদ হলুদ করা। থামল এসে ওদের সামনে। মিটার ডাউন করে নিল ড্রাইভার। দরজা মেলে ধরল। পিছনের সীটে উঠে বসল ওরা দু'জন।

ঠিকই বলেছিল খান মোহাম্মদ জান। ইতিমধ্যেই মস্ত পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে জিনাতের ভেতর। জীবনের সবকিছুর প্রতি সেই ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিভঙ্গিটা আর দেখতে পেল না রানা। সহজ-স্বচ্ছন্দ একটা ভাব ফিরে এসেছে ওর মধ্যে। প্রথম লক্ষণ, কাটা কাটা বাঁকা কথার বদলে স্বাভাবিক নারীসুলভ কথার খৈ ফুটছে ওর মুখে। অনর্গল কথার ফুলঝুরি। আর অকারণ উচ্ছল হাসি।

সারাটা গান্ধী গার্ডেনে খুশির বন্যা বইয়ে দিল ওরা। জেব্রাগুলোকে বুট খাওয়াল জিনাত, উটের পিঠে চড়ল, বানরগুলোকে দিল কলা—তার থেকে রানা একটা খেয়ে ফেলায় রানার মনুষ্যত্বে ঘোর সন্দেহ প্রকাশ করল।

বেলা সাড়ে-দশটায় লোকজনের ভিড় নেই গার্ডেনে। এই অসময়ের নিরিবিলিতে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে গোটা কয়েক কলেজ পালানো জুটি দেখা গেল। জায়গায় জায়গায় শান বাঁধানো বসবার ব্যবস্থা আছে গাছের তলায়। তারই একটায় বসে রয়েছে পাঞ্জাবী-পাজামা পরা বাবরি-চুলো এক ভাবুক। ফিলসফার না ফিল্মী গানের গীতিকার ঠিক বোঝা গেল না। গাছের ডালে চিল বসে ছিল একটা—নিশ্চিন্ত মনে এক লাদা পায়খানা করল। আর, পড়বি তো পড় সোজা ভাবুকের চাঁদির উপর। চমকে উঠে মাথায় হাত দিয়েই কালো হয়ে গেল ভাবুকের মুখ। হেসে খুন হয়ে গেল জিনাত।

'আজব জানোয়ার' লেখা একটা তাঁবুতে ঢুকল ওরা দুই আনার টিকিট কেটে। মুখটা মানুষের আর দেহটা শেয়ালের। মুখে একগাদা স্নো-পাউডার-রুজ-লিপস্টিক লাগানো। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। রানার গা ঘেঁষে দাঁড়াল জিনাত। এক হাতে খামচে ধরল কোটের হাতা। ভয় পেয়েছে। খেলা যে দেখাচ্ছিল, সেই লোকটা এগিয়ে এসে জন্তুটিকে জিজ্ঞেস করল, 'ক্যায়া নাম হ্যায় তুমহারা?'

'মামতাজ বেগাম,' উত্তর এলো নাকি গলায়।

'ঘ্যর কাঁহাঁ?' আবার জিজ্ঞেস করল লোকটি।

'আফ্রিকা,' উত্তর এল আবার।

'খাতি হো ক্যয়া?'

'কামলা।'

'পিতি হো ক্যয়া?'

'দুদ্।'

রানা লক্ষ করল ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে ওঠা নামা করছে শেয়ালের পেটটা, কিন্তু কথা বলবার সময় থেমে যাচ্ছে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। কৌশল করে বানিয়েছে এই ভোজবাজি।

'পাঁও যারা হিলাও দেখে?'

পা নড়াচ্ছে জন্তুটা।

'হাঁথ যারা হিলাও দেখে?'

আর দেখাতে হলো না। একটানে রানাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল জিনাত তাঁবু থেকে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখ। অন্তত বিশ কদম দূরে না সরে মুখ খুলল না সে।

'ওরেব্বাপরে-বাপ্! এখনও আমার বুকের ভেতর ধুক-ধুক করছে!' উত্তেজিত জিনাতের কণ্ঠস্বর। পিতার মতই সজীব প্রাণবন্ত ওর প্রতিটি কথাবার্তা, কার্যকলাপ।

প্রকাণ্ড চিড়িয়াখানাটা শেষই হতে চায় না। অনেক ঘুরল দু'জন।

রানার হাজার পীড়াপীড়িতেও সিগারেট খেলো না জিনাত। বলল, 'আমি ভাল হতে চাই, রানা। তুমি বলেছ, কিছুতেই মরতে দেবে না আমাকে। সারা সকাল ধরে খালি এই কথাটাই ভাবছি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি আমি তোমার হাত ধরে। তোমার জন্যে বাঁচব আমি।'

একটু থেমে আবার বলল, 'কিন্তু এত কালি, এত কলঙ্ক! তুমি আরও আগে এলে না কেন, রানা? ফুলের মত নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক হয়ে যদি আসতে পারতাম তোমার কাছে!'

'কলঙ্ক তো চাঁদের অলঙ্কার, জিনাত।' বলল রানা, 'চাঁদের দেহটা কলঙ্কিত। কিন্তু আলোটা? এমন স্নিগ্ধ পবিত্র আছে কিছু আর? মানুষের দেহটা তো বাইরের জিনিস—মনের বিচারই আসল বিচার। তাই না?'

'তুমি তাই মনে করো? সত্যিই?'

'হ্যাঁ। মানুষের মনটাই সব।'

'বোম্ ভোলানাথ!'

চমকে উঠল রানা ও জিনাত একসাথে। গুরু-গম্ভীর কণ্ঠস্বর। কাছেই। ঝোপের ওপাশে কম্বলের ওপর পদ্মাসনে বসে আছে সাধু বাবা। আশে-পাশে সাত আটজন চেলা জুটে গেছে। বসে আছে ওরা তীর্থের কাকের মত সাধুজীর মুখের দিকে চেয়ে।

সাধুবাবার চোখ বন্ধ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। একটা নোংরা পুরু কম্বল গায়ে জড়ানো। পাশেই পিতলের চকচকে লোটা আর সিঁদুর চর্চিত ত্রিশূল। সামনে ধুনো জ্বলছে। আশে পাশে প্রচুর উপহার সামগ্রী ফলমূল পড়ে আছে অনাদর অবহেলায়। বোঝা গেল আসল সাধু—এসবের উপর লোভ নেই কোনও।

'বোম্ ভোলানাথ!'

ধীরে ধীরে চোখ মেলল সাধুজী। মৃদু গুঞ্জন উঠল মাড়োয়াড়ী ভক্তদের মধ্যে। কে কার আগে কৃপাদৃষ্টি লাভ করবে তাই নিয়ে ঠেলাঠেলি লেগে গেল নিজেদের মধ্যে। সবাই এগিয়ে বসতে চায়। একটি বাণীও যেন ফসকে না যায়।

ওদের কারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা চাইল সাধুজী রানার চোখের দিকে। প্রচুর গঞ্জিকা সেবনে চোখ দুটো লাল। যেন ভস্ম করে দেবে, এমন চাহনি। মুচকে হাসল রানা। ব্যাটা সোহেল! এই গান্ধী গার্ডেনেই তাহলে আড্ডা গেড়েছে শালা।

চট্ করে সাধুজীর চোখ সরে গেল রানার চোখের উপর থেকে। বোধহয় হাসি সামলাবার জন্যে। জিনাতের প্রতি এবার স্নেহ বর্ষণ করল যেন সাধুবাবার চোখ।

'জনম-দুখিনী তুমি, মা। এসো তো এগিয়ে, দেখি।'

প্রথম দর্শনেই ভক্তি এসে গিয়েছে জিনাতের। পায়ে পায়ে এগোল সে সাধুর দিকে । ভক্তেরা সরে গিয়ে পথ করে দিল।

'চলো, জিনাত,' রানা ডাকল, 'এখান থেকে যাই আমরা।'

'দুই মিনিট। প্লীজ! এসো না, তোমার হাতটাও দেখিয়ে নিই সাধুবাবাকে দিয়ে।'

'না।' গ্যাঁট্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা। সোহেলেরই জয় হলো। এগিয়ে গেল জিনাত রানাকে পেছনে ফেলে। উচ্চ মার্গের একটা অনাবিল হাসি হাসল সোহেল।

'বিশ্বাসে মিলয়ে হরি তর্কে বহুদূর।'

'ঠিক, ঠিক।' সায় দিল ভক্তেরা।

জিনাত এগিয়ে গিয়ে পদধূলি গ্রহণ করল।

'পাহাড়ী দেশের মেয়ে তুমি, মা। সাগর থেকে উঠে এসেছ। সবই ভোলানাথের ইচ্ছে। বোম্, ভোলানাথ! ভাগ্যের জুয়া খেলায় টাকা গেছে, কিন্তু মিলে গেছে মনের মানুষ, সোনার ময়না পাখি। কি? ঠিক বলিনি, মা?'

'সব মিলে গেছে!' ভয়-ভক্তিতে বুজে এল জিনাতের কণ্ঠস্বর। আবার একবার সাধুজীর পদধূলি গ্রহণ করল সে। একেবারে খাঁটি সাধু। ভক্তদের একজন বলল, 'বাঙাল মুলুক থেকে এসেছেন বাবা, হিংলাজ যাবেন। আসলি সাধু। সবাইকে সব কথা ঠিক ঠিক বলে দিয়েছেন।'

স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সাধুর মুখ। বলল, 'কিন্তু পাখি থাকবে না, মা। উড়ে যাবে। ইচ্ছে করলেই কি কাউকে ধরে রাখা যায়? এ সুযোগ পেলেই খাঁচা কেটে উড়ে যাবে।'

সভয়ে চাইল একবার জিনাত রানার দিকে। এখনই উড়ে গেছে কিনা দেখবার জন্যেই বোধহয়। কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে বলল,'একে ধরে রাখার কোনও উপায় নেই, বাবা?'

'আছে,' বিচিত্র এক হাসি ফুটে উঠল সাধুজীর ঠোঁটে। ত্রিশূলটা ধরল সে জিনাতের বুকের উপর। তারপর বলল, 'জুয়াড়ী থেকে সাবধান থাকতে বোলো তাকে। আর এই শিকড়টা সাথে রাখো। যখনই জল খাবে এটা একবার করে ডুবিয়ে নিয়ে তারপর খাবে। বোম্ ভোলানাথ।'

ভক্তিভরে কপালে ঠেকাল জিনাত যষ্টিমধুর শেকড়টা। তারপর ব্যাগে রেখে দিল সযত্নে। একশো টাকার একটা নোট বের করে সাধু বাবাজীর পায়ে একবার ছুঁইয়ে ঢুকিয়ে দিল কম্বলের তলায়।

আড়চোখে একবার নোটটার দিকে চেয়েই হুঙ্কার ছাড়ল বাবাজী, 'বোম্ ভোলানাথ।' তারপর তীব্র দৃষ্টিতে একবার রানার দিকে চেয়েই ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ল চোখ বুজে। মুখে প্রশান্ত হাসি।

দুপুরে হোটেল মেট্রোপোলে লাঞ্চ সেরে নিল ওরা। ওয়েট নিল দশ পয়সা দিয়ে। দু'জনের দুটো কার্ড বেরিয়ে এল। জিনাতের ওজন উঠল ১১৫ পাউণ্ড। ভবিষ্যদ্বাণী লেখা: ধৈর্য্য ধরুন। আপনার সুখের দিন আসিতেছে।

ওজন দেখে মাথা নেড়ে বলল জিনাত, 'অসম্ভব! যন্ত্রে ভুল আছে। একশো দশের বেশি কিছুতেই হতে পারে না।' কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী পড়ে খুশি হয়ে উঠল।

রানার ওজন ১৬০ পাউণ্ড। ভবিষদ্বাণী: সাবধান! আপনার সামনে পিছনে শত্রু রহিয়াছে।

এটা পড়েই মুখটা কালো হয়ে গেল জিনাতের।

গাড়িতে উঠে হঠাৎ একসময়ে জিনাত বলল, 'ওহ্-হো। ভুলেই গিয়েছিলাম। আব্বাজী দশ হাজার টাকা দিয়েছে তোমাকে ফেরত দেবার জন্যে। এক্ষুণি দেব?'

'ওঁর কাছ থেকে কেন নেব? ও-টাকা নেব না আমি। ওটা তোমার জীবনে প্রবেশ করার এন্ট্রি-ফী। ওর বদলে তোমাকে পেয়েছি।'

'টাকা দিয়ে কি কারও মন পাওয়া যায়? যা পেয়েছ, এমনি অকারণেই পেয়েছ। তুমি টাকাটা না নিলে আমি বকা খাব বাড়ি ফিরে।'

'তাহলে আর বাড়ি ফিরো না। থেকে যাও আমার সাথে। চিরকাল।'

রানার হাতটা হাতে তুলে নিল জিনাত।

'তোমাকে এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করতে না হলে বেঁচে যেতাম আমি। কিন্তু আব্বাজী বলে দিয়েছে সন্ধের পর বাড়ি ফিরতে হবে। তোমাদের নাকি কি কাজ আছে? কিন্তু তুমি অন্য কথা বলে ভুলিয়ে দিচ্ছ আমাকে। টাকাটা ...'

'ও-টাকা আমি নেব না, জিনাত।'

'তোমার কসম লাগে, রানা। প্লীজ।'

'আচ্ছা। যদি নেহায়েত ফেরত দিতেই চাও, তাহলে একটা কায়দা শিখিয়ে দিতে পারি আমি।'

'কি রকম?'

'ওয়ালী আহমেদ এই ক'দিন ধরে জোচ্চুরি করছে তোমার সঙ্গে। আমি জানি ওর রহস্য। ওকে প্যাঁচে ফেলে সব টাকা বোধহয় আদায় করা যায়। একটু শাস্তিও হয় ওর। আজ বিকেলে আবার যদি খেলতে বসো ওর সঙ্গে, তাহলে বাকি ব্যবস্থা আমি করতে পারি। তখন আমার টাকা ফেরত দিয়ে দিয়ো।'

'কিন্তু ও চুরি করবে কি করে? আমারও যে সন্দেহ হয়নি তা নয়। কিন্তু সব রকম সম্ভাবনাই ভেবে দেখেছি আমি। কার্ড বাঁটায় কোনও চালাকি নেই, কার্ডে কোন চিহ্ন নেই। যতবার ইচ্ছে কার্ড বদল করেছি আমি, আমার নিজের কেনা নতুন

প্যাকেটে খেলেছি। আশেপাশে কোনও আয়না নেই। টেবিলের ওপর যে চক্চকে সিগারেট কেস রেখে তাস বাঁটবার সময় তার সাহায্যে আমার কার্ডগুলো দেখে নেবে—তাও না। তবু কি করে যেন টের পায় ও আমার হাতে কি আছে। ব্লাফ খেলে দেখেছি, ব্লাইণ্ড খেলে দেখেছি, কিছুতেই কিছু হয় না। লোকটা বোধহয় জাদুকর।'

'লোকটা কচু! চোর একটা। আজকে খেলেই দেখো না কেমন বারোটা বাজিয়ে দিই শালার। একটু শিক্ষা না দিলে কত লোকের যে সর্বনাশ করবে তার ঠিক নেই।'

'যদি আজও হারি?'

'তাহলে তোমার আব্বাজীকে বোলো আমাকে দিয়েছ টাকা।'

'কিন্তু আমি যে আর খেলব না ঠিক করেছি।'

'তাহলে আর আমার টাকাটা শোধ করবার কোন উপায়ই থাকল না, জিনাত। ঠিক আমার টাকাগুলোই ফেরত নিতে পারি আমি—তোমার বাবার টাকা নয়।'

'আচ্ছা, বেশ। আজ না হয় খেলব কিছুক্ষণ। কিন্তু কতক্ষণ খেলতে হবে? আব্বাজীর কাছে শুনলাম তিনদিন পরই চলে যাচ্ছ তুমি করাচি থেকে। তোমাকে এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করতে পারব না আমি এই ক'দিন। তুমি থাকবে তো সাথে?'

'না, জিনাত। আমি থাকব না তোমার সাথে। অবশ্য আধঘণ্টার বেশি খেলতে হবে না তোমাকে। রাজি?'

'নিম-রাজি। বিকেলটা নষ্ট করে দেবে আমার ওই শয়তানটা। এর চাইতে টাকাগুলো যাওয়াও ভাল ছিল। কাছে পেলেই এমন সব কথা আরম্ভ করবে···'

'আরেকটা কথা, জিনাত। আমার মনে হচ্ছে ওয়ালী আহমেদের জোচ্চুরির রহস্য আমি ভেদ করতে পেরেছি। আমার অনুমান মিথ্যেও হতে পারে। কিন্তু খেলতে খেলতে যদি দেখো ওয়ালী আহমেদ একটু অস্বাভাবিক ব্যবহার করছে, আশ্চর্য হয়ো না। চুপচাপ দেখে যেয়ো। বুঝলে?'

'জো হুকুম, হুজুর।'

কাছে সরে এসে রানার গা ঘেঁষে বসল জিনাত। ওর কাঁধে একটা হাত রাখল রানা।

'বিকেলে কোথায় যাওয়া যায় বলো তো, জিনা?'

'ক্লিফটন বীচ্।'

'বেশ। তাই হবে।'

ট্যাক্সি এসে থামল বীচ লাগজারি হোটেলের সামনে।

## ছয়

সাড়ে চারটে বাজে। জিনাত তৈরি হয়ে নিয়েছে। 'টা-টা' করে চলে গেল সে সেইলরস্ ক্লাবের উদ্দেশে।

মিনিট পনেরো পর ব্যালকনিতে এসে দেখল রানা নিচে, নির্দিষ্ট আসনে বসে আছে ওয়ালী আহমেদ আর জিনাত সুলতানা। আজ কেন জানি কিছুতেই মানাচ্ছে না জিনাতকে ওই পরিবেশের সঙ্গে। কী অদ্ভুত পরিবর্তন। তাড়াতাড়ি মুক্তি দিতে হবে ওকে এই অবস্থা থেকে।

শখের নিকন-এফ ক্যামেরায় লেন্স হুডটা লাগিয়ে ঝুলিয়ে নিল রানা গলায়। ব্রাউন হবি ই. এল. ৩০০ ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ গানের ফ্ল্যাশ হেডটা লাগিয়ে নিল ক্যামেরার উপর। গু-মার্কা কন্ট্যাক্ট পয়েন্টে ঢুকিয়ে দিল কেবলটা। এবার অ্যাপার্চার এফ-১১ দিয়ে ডিস্ট্যান্স সেট করল বারো ফুটে, এক্সপোজার ওয়ান হানড্রেড।

তারপর সুটকেসের মধ্যে থেকে মোটা 'সঞ্চয়িতা' বই বের করল। তার ভেতর থেকে বেরোলো একখানা নাইন মিলিমিটার ক্যালিবারের হ্যামারলেস অটোমেটিক ল্যুগার পিস্তল। দ্রুত একবার পরীক্ষা করে নিয়ে কোটের পকেটে ফেলল রানা সেটাকে। একটা এক্সট্রা ম্যাগাজিনও নিল সাথে। তারপর বেরিয়ে এল বাইরে।

ঘরে চাবি লাগাতে গিয়ে কি মনে করে থেমে একটা কাগজের টুকরোকে কয়েক ভাঁজ করল রানা। দরজার কব্জার কাছে টুকরোটা রেখে বন্ধ করল দরজা। বাইরে থেকে আর দেখা যাচ্ছে না কাগজের টুকরো। একবার পরীক্ষা করে দেখল সে, দরজা খুললেই টুপ করে পড়ে যাচ্ছে সেটা মাটিতে। ওর অনুপস্থিতিতে কেউ ঘরে ঢুকলে টের পাবে ও কাগজের টুকরোটা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে।

ঘরে চাবি লাগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল রানা দোতলায়। সোজা এসে দাঁড়াল একত্রিশ নম্বর কামরার সামনে। আগেই চাবি জোগাড় করেছে বেয়ারাকে ঘুষ দিয়ে। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে খুলে ফেলল দরজা।

প্রথম ঘরটা বসবার ঘর। রানা যা ভেবেছিল তাই, খালি। পাশেই শোবার ঘর। তার ওপাশে ব্যালকনি। শোবার ঘরের দরজা বন্ধ দেখে একটু হতাশ হলো রানা। কিন্তু দেখল, ছিটকিনি লাগানো নেই তাতে। আস্তে চাপ দিতেই ফাঁক হয়ে গেল খানিকটা। প্রথমেই চাপা একটা কণ্ঠস্বর কানে এল, 'থ্রী অভ ডায়মণ্ড, টু অভ ক্লাব্স্, ফোর অভ হার্টস।' নারীকণ্ঠ।

মৃদু হাসল রানা। বেচারী জিনাত ব্লাইণ্ড খেলে না থাকলে খালি বোর্ড ফী-টা পাবে এবার। পা টিপে ঢুকে পড়ল রানা ঘরের ভেতর। একটা উঁচু চেয়ারে বসে আছে একটি অ্যাংলো মেয়ে।

টেবিলের উপর মেয়েটির চোখ থেকে ইঞ্চি তিনেক দূরেই„হচডহট্র কোম্পানীর একটা শক্তিশালী দূরবীন। ট্রাইপডের উপর বসানো। দূরবীনের পাশেই রাখা একখানা ছোট মাইক্রোফোন থেকে তার গেছে টেবিলের একপাশে বসানো একটা বাক্সের মধ্যে। বাক্সের ভিতর থেকে আবার তার বেরিয়ে ঘরের ভেতর টাঙানো একটা ইনডোর এরিয়েলে গিয়ে মিশেছে।

আবার একটু সামনের দিকে ঝুঁকে দূরবীনে চোখ রেখে মেয়েটি একঘেয়ে কণ্ঠে গড়গড় করে বলে গেল, 'কুইন অভ ক্লাব্স, জ্যাক অভ স্পেড্স, ফাইভ অভ ডায়মণ্ড।' বলেই মাইক্রোফোনের সুইচ অফ করে দিল।

এইটুকু সময়ের মধ্যে পা-টিপে এগিয়ে এল রানা। ক্যামেরাটা তুলল দু'হাতে মাথার ওপর। আন্দাজে যখন বুঝল দূরবীন, মাইক্রোফোন, এরিয়েল, মেয়েটির

চেহারার একাংশ আর দূরে জিনাত ও ওয়ালী আহমেদের টেবিল, সবই এক সাথে ধরা পড়েছে স্ক্রীনে—টিপে দিল শাটার।

ঝল্‌সে উঠল ঘরটা তীব্র আলোয়। একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল মেয়েটির মুখ থেকে ঘটনার আকস্মিকতায়। চট্‌ করে ঘুরল সে রানার দিকে। নেমে পড়ল উঁচু চেয়ার থেকে।

'কে? কে তুমি?'

'ভয় পেয়ো না, সুন্দরী, আমি ভূত নই। আমার যা প্রয়োজন ছিল পেয়ে গেছি। তোমার কোনই ক্ষতি করব না আমি। আমার নাম মাসুদ রানা।'

মেয়েটিকে রীতিমত সুন্দরী বলতে হবে। লম্বা একহারা চেহারা, চমৎকার স্বাস্থ্য। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। বব ছাঁটা চুল বিছিয়ে পড়েছে কাঁধের ওপর। চোখে একরাশ কৌতূহল।

'কি করবে তুমি ছবি নিয়ে?'

'বলছি তো, তোমার কোন ক্ষতি করব না। অত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? ওয়ালী আহমেদকে গোটা দুই গাঁট্টা মেরেই কেটে পড়ব। এইখানটায় দাঁড়িয়ে থাকো চুপচাপ—কোনও রকম চালাকির চেষ্টা করলে স্রেফ খুন করে ফেলব।'

ক্যামেরাটা নামিয়ে রাখল রানা টেবিলের ওপর। ডান হাতে পিস্তলটা ধরে উঠে বসল মেয়েটির চেয়ারে। চোখ রাখল দূরবীনে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে জিনাতের হাতের কার্ড। দুইয়ের পেয়ার পেয়েছে এবার সে। ওয়ালী আহমেদকে খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবার সময় দিল রানা।

'এত টাকা ওয়ালী আহমেদের, তাও এইসব করে কেন?' জিজ্ঞেস করল সে মেয়েটিকে।

'ওই মেয়েটিকে ও চায়। একটু অনুগ্রহ করলেই টাকা ফিরিয়ে দেবে সব।'

'এই কি ওর প্রথম শিকার?'

'না। এর আগে আরও অনেক এসেছে। সবাই আত্মসমর্পণ করেছে।'

'তোমার মত রূপসী পেয়েও তৃপ্তি হয় না ওর?'

হাসল মেয়েটি।

'আমি বেতনভোগী চাকর মাত্র! নিত্য নতুন মেয়েমানুষ পছন্দ ওর। আমি প্রথম দিনেই পুরানো হয়ে গেছি।'

'তা, তুমি এগুলো করো কেন? ভাগ্যিস আমি আই. বি. কিংবা পুলিসের লোক নই। মেয়েটির একজন শুভাকাঙ্ক্ষী মাত্র। নইলে আজ এই ফটোর জোরে ওয়ালী আহমেদের সাথে সাথে তোমারও হাতে হাতকড়া পড়ত, তা জানো?'

'জানি। আমি এসব করি টাকার জন্যে। পাঁচ হাজার টাকা পাই মাসে। কিন্তু তুমি পুলিস হলে কি আর হত? টাকার কুমীর ও। টাকা দিয়ে কিনে নিত তোমাকে। আমাকেও মোটা টাকা মাইনে দেয় বলেই আছি। নইলে কার ভাল লাগে সকাল বিকেল বসে বসে একঘেয়ে অ্যানাউন্সমেন্ট করতে? এখন ভাবছি, চাকরিটা বুঝি গেল আমার। আর রাখবে না আমাকে।'

আর একবার চোখ রাখল রানা টেলিস্কোপে। আধ ইঞ্চি উঠিয়ে ওয়ালী আহমেদের বসন্তের দাগ ভর্তি মুখের উপর সেট্‌ করে নিল টেলিস্কোপ। দেখল প্রশান্ত

মুখটা এবার সত্যিই একটু উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। একটা পান মুখে ফেলে দরজার চতুষ্কোণ অন্ধকারের দিকে চাইল সে একবার।

'তোমার অ্যানাউন্সমেন্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেশ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ওয়ালী আহমেদ। এখন কি খেলা ছেড়ে উঠে পড়বে নাকি?'

'না। মাঝে মাঝে এরকম হয় কোনও তার-টার ছুটে গেলে। ও ভাবছে, আমি এখন সেই তার জোড়া লাগানোয় ব্যস্ত আছি!'

'তোমার নামটা কি বললে না?'

'অ্যানিটা গিলবার্ট।'

'অনীতা?'

'তা বলতে পারো। চার পুরুষ ধরে খ্রিস্টান। তাই উচ্চারণটা বেঁকে অ্যানিটা হয়ে গেছে। তোমার নাম কি যেন বললে, মাসুদ রানা, না?'

'হ্যাঁ।'

'আমি পাশের ঘর থেকে একটু ঘুরে আসতে পারি? আমাকে...'

'উঁহুঁ!' মাথা নাড়ল রানা। মেয়েটার আর কোনও মতলব আছে কিনা কে জানে। বলল, 'বেশ তো চমৎকার লাগছে তোমাকে দেখতে। আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক পা-ও নড়তে পারবে না তুমি। ইচ্ছে করলে সিগারেট খেতে পারো একটা।'

কাঠগড়ার আসামীর মত দাঁড়িয়ে রইল অনীতা। একটা সিগারেট নিয়ে ধরাল। ভয়ে ভয়ে চাইল পিস্তলটার দিকে। রানা আবার চোখ রাখল দূরবীনে। ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছে ওয়ালী আহমেদের কপালে। হিয়ারিং এইডের অ্যাম্প্লিফায়ারটা অ্যাডজাস্ট করে এয়ার-ফোনটা ভাল করে গুঁজে দিল কানের মধ্যে—তাও কোন সিগনাল নেই। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে ভাবল রানা। ব্যাপারটা আরেকটু জমে উঠুক।

'বেশ সুন্দর ছোট্ট যন্ত্র আবিষ্কার করেছ। কত ওয়েভলেংথে ট্র্যান্সমিট্ করছ?'

'টু হাণ্ডরেড্ টেন মেগাসাইক্‌ল্‌স্।'

মাইক্রোফোনটা হাতে তুলল রানা এবার। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠল অনীতা। ভয়ে পাংশু হয়ে গেছে ওর মুখ।

'ভয়ঙ্কর লোক ওয়ালী আহমেদ। ওকে না ঘাঁটালে কি চলে না?'

'না!' দৃঢ় রানার কণ্ঠস্বর।

হঠাৎ এগিয়ে এসে রানার হাত ধরল মেয়েটা। বিস্ফারিত নয়নে চাইল রানার চোখের দিকে। বলল, 'আমার ওপর একটু কৃপা করো, মিস্টার রানা। ওকে ছেড়ে দাও। দয়া করে ছেড়ে দাও ওকে। নইলে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে আমাকে ওয়ালী আহমেদ। তুমি জানো না। ও পারে না এমন কাজ নেই।' আরেকটু কাছে সরে এল মেয়েটা। চোখে তার করুণ আকুতি। 'প্লীজ! রানা, সব কথা তোমাকে বলা যাবে না। ওকে যদি কিছু করো তাহলে ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে আমার। দোহাই তোমার, ছেড়ে দাও ওকে। বিনিময়ে যা চাইবে তাই দিতে রাজি আছি আমি।'

মৃদু হেসে রানা বলল, 'তা হয় না, অনীতা। তুমি খামোকা অত ভয় পাচ্ছ ওয়ালী আহমেদকে। ওর কিছুটা শিক্ষা হওয়া দরকার। আজ ও বড়লোক একটা

মেয়েকে ঠকাচ্ছে, কাল হয়তো এমন কাউকে ঠকাবে, যার পক্ষে সহ্য করা কঠিন। কাজেই ওর ইসক্রুপে সামান্য টাইট দিতেই হবে।'

মাইকের সুইচ্ টিপে দিল রানা। খুট্ করে একটা শব্দ হয়তো পৌঁছল ওয়ালী আহমেদের কানে। কপালের ভ্রূকুটি সোজা হয়ে গেল। প্রসন্ন হয়ে উঠল ওর মুখ। লালচে গোঁফে একবার তা দিয়ে নিয়ে পান ফেলল মুখে একটা।

রানা বলল, 'এইস্ অভ ডায়মণ্ড, এইস্ অভ হার্টস, এইস্ অভ স্পেড্স্। টপ্ ট্রায়ো!'

ঠিক যেন পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে গেল ওয়ালী আহমেদ। একবিন্দু চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল না ওর চেহারায়। এমন কি সবুজ চোখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত এদিকে।

'ওয়ালী আহমেদ, আমি আপনার মাশুক নানা বলছি। নিশ্চয়ই চিনতে পারছেন? আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি, দূরবীন, মাইক্রোফোন, ইত্যাদি সবকিছুর ছবি তুলে নিয়েছি আমি। আমার কথামত কাজ করলে এ ছবি পুলিসের হাতে যাবে না। বুঝতে পারছেন? পারলে বাঁ হাতটা ওপরে তুলে লাল মাথাটা চুলকান একবার।'

মুখের ভাব পরিবর্তন হলো না। কিন্তু বাম হাতটা তুলে মাথাটা চুলকাল ওয়ালী আহমেদ একবার।

'চমৎকার! এবার হাতের তাস চিত্ করে ফেলে দিন টেবিলের ওপর। ভয় নেই, কেবল টাকার ওপর দিয়েই যাবে এবারের ঝাপ্টা। হাতকড়া পড়বে না হাতে।'

নিতান্ত ভাল মানুষের মত হাতের তাস তিনটে ফেলে দিল ওয়ালী আহমেদ টেবিলের ওপর। ব্যালকনির খোলা দরজার দিকে চাইল সে একবার। মনে হলো সবুজ দৃষ্টিটা যেন দূরবীনের মধ্যে দিয়ে এসে চোখের ভেতর দিয়ে ঢুকে রানার খুলি ভেদ করে বেরিয়ে গেল।

'এবার পকেট থেকে চেক বইটা বের করুন দয়া করে। হ্যাঁ। একলক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকার চেক লিখুন একটা। মেয়েটির কাছ থেকে চুরি করেছেন মোট একলক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার। বাকি দশ হাজার ফাইন করলাম এই চুরির জন্যে। আজকের ডেট দিন—এক্ষুণি ক্যাশ করতে হবে এই হোটেলের ব্যাঙ্কে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের চেক বই-ই তো দেখা যাচ্ছে। বেশ, বেশ।...চেক্টা ধরুন, অঙ্কটা দেখব।...বাঃ, সব ঠিক আছে। এখন সই করুন। সই করবার সময় ফটোগ্রাফটার কথা একবার স্মরণ করুন। এবার উল্টো দিকে আরেকটা কাউন্টার-সাইন, ব্যস।'

চেকটা ছিঁড়ে উল্টো পিঠে কাউন্টার-সাইন করল ওয়ালী আহমেদ। চেক বইয়ের কাউন্টার-ফয়েলে টুকে রাখল অঙ্কটা।

'এবার আরেকবার দেখি তো চেকের এপিঠ-ওপিঠ? এই তো; গুড! এখন একটা বেয়ারা ডেকে চেকটা ক্যাশ করে আনতে বলুন। আর দু'বোতল ফান্টার অর্ডার দিন। বিলটা আমিই দেব।'

অবাক বিস্ময়ে ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধা মিশ্রিত দৃষ্টিতে রানার দিকে চেয়ে রয়েছে অনীতা। রানা ওর দিকে চাইতেই ঢোক গিলল।

বেয়ারা এল, চেক নিয়ে চলে গেল। আরেকজন দু'বোতল স্ট্র লাগানো ফান্টা এনে রাখল টেবিলের উপর। কোল্ড ড্রিঙ্ক শেষ করে একটা পান মুখে ফেলল ওয়ালী আহ[illegible] স্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছে ওর চোখে মুখে—যাক, শুধু টাকার উপর

দিয়েই কেটে গেল ফাঁড়াটা। স্বয়ং ব্যাঙ্কের ম্যানেজারই এল টাকা নিয়ে। সসম্ভ্রমে ওয়ালী আহমেদের হাতে দিয়ে চলে গেল।

'একটা নোটও যেন ভুল করে আবার পকেটে চলে না যায়! সব টাকা ভদ্রমহিলার হাতে দিয়ে জোচ্চুরি করার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। বাঃ, এই তো, লক্ষ্মী ছেলে! এবার আমি নেমে আসছি। কোন রকম চালাকির চেষ্টা করলে বিপদে পড়বেন। ব্যস। আজকের প্রথম অধিবেশনের এইখানেই সমাপ্তি। খোদা হাফেজ। পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।'

## সাত

ওয়ালী আহমেদের মুখের উপর এক দোয়াত কালি ছিটিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল ওরা বাইরে। তখন বিকেল সাড়ে-পাঁচটা। লোকজন জমতে আরম্ভ করেছে ক্লাবে। অনেকেই আড়চোখে চাইল। সকালের সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার ওদের দেখে ডাকার অপেক্ষা না রেখেই সাঁ করে এসে দাঁড়াল। দরজা খুলে দিয়ে সালাম ঠুকল। ভাল বকশিশের এমনি গুণ! তাছাড়া রসিক ড্রাইভার রানা-জিনাতের আনন্দোচ্ছল কথোপকথনে হয়তো প্রচুর রসের সন্ধানও পেয়েছিল।

'ওয়ালী আহমেদকে আমি মস্ত বড় জাদুকর মনে করেছিলাম,' বলল জিনাত। 'এখন দেখছি তুমি তার ওপর দিয়েও এক কাঠি। ব্যাপারটা কি হলো বলো তো? হঠাৎ সব টাকা ফেরত দিয়ে মাফ চাইল কেন ও? কি জাদু করেছিলে তুমি?'

সবটা ব্যাপার ভেঙে বলতেই হেসে গড়িয়ে পড়ল জিনাত। ড্রাইভারও হাসতে আরম্ভ করল। ব্যাটা সব কথা শুনছে এবং তার থেকে রস আহরণ করছে, দেখে ওর দিকে চোখের ইশারা করে আরেক দফা হাসল জিনাত।

'আর পারি না, বাপু। হাসতে হাসতে খিল ধরে গেছে পেটে।'

রানা এ হাসিতে যোগ দিতে পারল না। লক্ষ করল সে, সবুজ রঙের একটা ফোক্সওয়াগেন আসছে ওদের পিছু পিছু ভদ্র দূরত্ব বজায় রেখে। অনেকক্ষণ ধরেই পিছু নিয়েছে।

ক্লিফটন্ বীচে বিকেল বেলা অনেক লোকের ভিড়। বাগানের ভেতর পিঁপড়ের মত পিল পিল করে বেড়াচ্ছে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। সাগরের ধারে বসে কফি খেলো ওরা, সূর্যাস্ত দেখল। ভবিষ্যতের গল্পে এমন মশগুল হয়ে গেল যে খেয়ালই করল না বিকেল গড়িয়ে গেছে, গোধূলির শেষ রঙও কালচে হয়ে আসছে মেঘের গায়ে। আসন্ন রাত্রির কালো ছায়া পড়েছে জনশূন্য সাগরের তীরে গা-টা ছম্ ছম্ করে উঠল জিনাতের।

'চলো, উঠে পড়ি, রানা। সব লোক চলে গেছে। খেয়ালই করিনি এতক্ষণ।'

অনেকগুলো ধাপ ডিঙিয়ে উঠে এল ওরা উপরে। অবাক হয়ে দেখল খাঁ-খাঁ করছে জনশূন্য বাগানগুলো। ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেছে এত লোক সবাই। সবাই চলে গেছে অন্ধকার লাগার আগে আগেই। এতক্ষণে রানার মনে পড়ল ওর এক বন্ধু উপদেশ দিয়েছিল—ক্লিফটন বীচে যদি যাও, আর বিপদ কুড়োবার ইচ্ছে যদি

না থাকে, তবে লক্ষ্মী ছেলের মত ফিরে এসো পাঁচটা বাজতেই।

রাস্তায় পৌঁছে দেখল রানা বেশ কিছুটা দূরে সেই সবুজ ফোক্সওয়াগেন দাঁড়িয়ে আছে। বাম দিকের মাডগার্ডের ওপর লম্বা এরিয়েল।

ট্যাক্সি দাঁড়িয়েই রয়েছে। কিন্তু ড্রাইভারটা পিছনের সীটে পা ভাঁজ করে শুয়ে ঘুমাচ্ছে অকাতরে। অনেক ডাকাডাকি করেও ওঠানো গেল না ওকে। হর্ন বাজতেই ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলল, 'আরে ও মুন্নির মা, বাচ্চা কাঁদছে শুনতে পাও না? উঠে মুতের কাঁথা বদলে দাও।' বলেই আবার গুটি সুটি মেরে শুয়ে নাক ডাকাতে আরম্ভ করল। মৃদু হাসল রানা। এমন ঘুমও হয় মানুষের! চুলের মুঠি ধরে গোটা দুই শক্ত ঝাঁকি দিতেই উঠে বসল ড্রাইভার। একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'ঘুমাইনি, স্যার। এই একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলাম আর কি।'

মাইল চারেক যাওয়ার পরই ঘটল ঘটনাটা।

হঠাৎ অবাক হয়ে দেখল ওরা সামনে রাস্তার ওপর জ্বলে উঠল ছ'টা হেড লাইট। আলোগুলোর দূরত্ব দেখে আন্দাজ করল রানা, ট্রাক হবে। সমস্ত রাস্তা জুড়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল তিনটে ট্রাক হেড লাইট নিভিয়ে দিয়ে। ট্যাক্সিটা কাছে আসতেই হেড লাইট জ্বালিয়ে এগোতে আরম্ভ করল ওদের দিকে।

ব্যাপার কি ! অ্যাক্সিডেন্ট করবে নাকি?

মুহূর্তে রানার দেহের পেশীগুলো সজাগ হয়ে উঠল। বিপদের গন্ধ পেল সে। জায়গা ছাড়বে না এই ট্রাক। ওদের পিষে মারবার জন্যে পাঠানো হয়েছে এগুলোকে। মনে পড়ল রানার, এই একটু আগেই রাস্তার পাশে এদিকে মুখ করা পরপর তিনটে ট্রাককে ছাড়িয়ে এসেছে ওরা। তখন কিছুই সন্দেহ করেনি। এখন বুঝল ওগুলো আসবে এবার পিছন থেকে রাস্তা জুড়ে। পালাবার পথ থাকবে না। রানার অনুমানের সত্যতা প্রমাণ করবার জন্যেই যেন পিছন থেকে একসাথে জ্বলে উঠল ছ'টা হেড লাইট। দুই হাতে তালি দিয়ে যেমন ভাবে মশা মারা হয়, তেমনি ভাবে হত্যা করা হবে ওদের। ফুল-স্পীডে এগিয়ে আসছে ট্রাকগুলো। আলোয় আলোময় হয়ে গেছে রাস্তা। পালাবার কোনও পথ নেই।

এখন উপায়? রাস্তার ডাইনে-বামে বিস্তীর্ণ অসমান অনুর্বর মাঠ। ট্রায়াম্প হেরাল্ডের পক্ষে ওই মাঠের ওপর দিয়ে ট্রাকের সাথে পাল্লা দেয়া সম্ভব নয়। সেখানেও ধাওয়া করে আসবে ওরা। আশেপাশে লোকালয়ের চিহ্নও নেই যে কোনও রকম সাহায্য পাবে।

'ব্রেক করো, ড্রাইভার। গাড়ি থামাও!' চিৎকার করে উঠল রানা।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে ড্রাইভার। এমন ব্যাপার জীবনে দেখেনি সে কখনও। রানার চিৎকারে সংবিৎ ফিরে পেল সে। বিপদ বুঝে প্রাণপণে ব্রেক করল। ছয় সাত গজ স্কিড্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যাক্সি।

এইটুকু সময়ের মধ্যে দ্রুত চিন্তা করে নিল রানা অবস্থাটা। হয় স্বর্ণমৃগ, নয় ওয়ালী আহমেদ। সোহেল জুয়াড়ী থেকে সাবধান হতে বলেছিল ওকে। ওয়ালী আহমেদের প্রতিশোধ হওয়াই বেশি স্বাভাবিক। কারণ হোটেল থেকেই পিছু নিয়েছে ওয়্যারলেস ফিট করা সবুজ ফোক্সওয়াগেন। টাকার জন্য পাঠায়নি সে এদের—কারণ ওয়ালী আহমেদ নিজের চোখেই ওদেরকে টাকাগুলো ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে জমা

দিতে দেখেছে। পাঠিয়েছে প্রতিশোধ নিতে। শিউরে উঠল রানা। কী ভয়ঙ্কর মৃত্যু! আর মাত্র গজ বিশেক আছে। দৈত্যের মত গর্জন করে এগিয়ে আসছে সাক্ষাৎ মৃত্যু। কাছে পিঠে সাক্ষী নেই কেউ। আগামী কাল সড়ক দুর্ঘটনার খবর বেরোবে পত্রিকায় মোটা হেডিং-এ। কে বুঝবে যে এটা খুন? নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিতে চায় ওয়ালী আহমেদ রানার ওপর—মেয়েটির ওপর নিশ্চয়ই নয়। এবং ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে শত্রুতার প্রশ্নই ওঠে না।

'লাফিয়ে পড়ো গাড়ি থেকে। দৌড় দাও ডান দিকে মাঠের মধ্যে দিয়ে।'

'আর তুমি?' রানাকে বেরোতে না দেখে জিজ্ঞেস করল জিনাত।

'যা বলছি তাই করো। জলদি!' ধমকে উঠল রানা।

জিনাত এবং ড্রাইভার গাড়ি থেকে বেরিয়েই ছুটল ডান ধারে।

এক ঝট্‌কায় দরজা খুলে রানাও বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। আর মাত্র দশ গজ আছে। ডান ধারে গেলে চলবে না—তাহলে সবাই মারা পড়বে একসাথে। দুই লাফে রানা সরে গিয়ে দাঁড়াল বাম দিকের মাঠের ধারে।

প্রথমেই সামনে থেকে ধাক্কা মারল মাঝের ট্রাকটা ট্রায়াম্প হেরাল্ডের নাকের ওপর। পরমুহূর্তেই পিছন থেকে হুড়মুড় করে এসে পড়ল আরেকটা ট্রাক। প্রচণ্ড ধাতব শব্দ হলো। চুরমার হয়ে গেল ট্রায়াম্পের নরম দেহ। থেঁতলে চ্যাপ্টা হয়ে গেল লেটেস্ট মডেল ট্রায়াম্প হেরাল্ডের ছিমছাম চেহারা। গাড়ি বলে চিনবার উপায় রইল না। লোহার দামে বিকবে এখন ওটা। অন্যান্য ট্রাকগুলোও থেমে দাঁড়িয়েছে।

'উও দেখো, ময়দান পর খাড়া হুয়া হ্যায় শ্যায়তান।'

কথাটা কানে যেতেই আন্দাজের উপর গুলি ছুঁড়ল রানা দু'বার। একটা আর্তচিৎকার কানে এল। দ্বিতীয়টা বোধহয় লাগল না। কিন্তু গুলির ভয়ে দমে যাবার পাত্র ওরা নয়। একটা ট্রাক থেমে রইল রাস্তার ওপর। বাকিগুলো নেমে আসছে মাঠের মধ্যে।

আরও দুটো গুলি ছুঁড়ল রানা। অন্য গাড়ির হেড লাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল ড্রাইভিং হুইল ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল আরেকজন সীটের ওপর। অ্যাক্সিলারেটরের ওপর থেকে পা-টা বোধহয় সরেনি—মাঠের উপর দিয়ে কোনাকুনি চলে গেল ট্রাকটা ফার্স্ট গিয়ারে। এবারও দ্বিতীয় গুলিটা লাগল না।

দুটো গেল। কিন্তু বাকি চারটে এবার সোজা তেড়ে এল রানার দিকে। দৌড় দিল রানা মাঠের মধ্যে দিয়ে, কিন্তু হেড লাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা রানাকে। কয়েকজন লোক মিলে খোলা মাঠের ওপর একটা ছুঁচোকে তাড়া করলে ছুঁচোর কেমন লাগে বুঝতে পারল রানা। কিচ্‌মিচ্‌ করাই সার, নিস্তার নেই কিছুতেই।

পাগলের মত গুলি করল রানা হেড লাইট অফ করার জন্যে। পাঁচটা গুলির পরই শেষ হয়ে গেল গুলি। দুটো ট্রাকের চোখ কানা করে দিয়েছে রানা। কিন্তু তাতে ফল হলো উল্টো। রানা আর দেখতে পাচ্ছে না ওদের। অথচ ওরা দেখতে পাচ্ছে রানাকে বাকি দুটো গাড়ির হেড লাইটের আলোয়। যে কোনও মুহূর্তে ঘাড়ে এসে পড়তে পারে। এঁকে বেঁকে ছুটতে থাকল রানা মাঠময়। দৌড়াতে দৌড়াতেই রিলিজ বাটন্‌ টিপে ফেলে দিল খালি ম্যাগাজিন। এক্সট্রা ম্যাগাজিনটা ভরে নিল পিস্তলে

আর মাত্র আটটা গুলি। কাজেই বাজে খরচ করা যাবে না। টায়ার পাংচার করবার চেষ্টা বৃথা—তাতে ঠেকানো যাবে না। স্লাইড টেনে চেম্বারে গুলি নিয়ে এল রানা।

আবার একটা ট্রাকের হেড লাইটের আলোয় ধরা পড়ল রানা। আলো না নেভাতে পারলে কোনও আশাই নেই। অদৃশ্য এক ট্রাকের গর্জন শোনা গেল পেছনে। দিশেহারার মত ছুটল সে। ছুটতে ছুটতে ট্রাকের শব্দ খুব কাছে এসে গেলে দিক পরিবর্তন করছে বিদ্যুৎগতিতে। আর গুলি ছুঁড়ছে সুযোগ পেলেই।

ছয়টা গুলির পর নিভে গেল সব হেড লাইট। এবার শুধু দেখা যাচ্ছে চারটে উন্মত্ত দানবের ছায়া মূর্তি। ডান দিক থেকে একটা ট্রাক ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিল প্রায়। লাফিয়ে সরে দাঁড়াতেই বাম দিক থেকে এল আরেকটা। মাডগার্ডের প্রচণ্ড এক ধাক্কায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রানা মাটিতে। প্যান্টের কাপড় ছিঁড়ে দাঁত বসাল শক্ত মাটি হাঁটুর মাংসে। ছড়ে গেল শরীরের অনেক জায়গা—নোন্‌তা ঘাম লেগে জ্বালা করে উঠল কাটা জায়গাগুলো। দরদর করে ঘাম ঝরছে সর্বাঙ্গ থেকে। নিঃশ্বাস পড়ছে হাপরের মত। উঠে বসবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না। সোজা এগিয়ে আসছে একটা বিকট ছায়ামূর্তি। উঠে পড়ো। উঠে পড়ো, গর্দভ! এত সহজেই হেরে যাবে? আপন মনে বলল রানা। তারপর এক ঝট্‌কায় উঠে দাঁড়াল। ট্রাকটাকে পাশ কাটিয়েই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে ফুটবোর্ডের ওপর। ড্রাইভারের কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপল সে, তারপরই চম্‌কে উঠে লাফিয়ে নেমে গেল ফুটবোর্ড থেকে সামনে আরেকটা ট্রাক দেখে। এদিকেই আসছিল ট্রাকটা দ্রুতগতিতে। প্রচণ্ড শব্দে ধাক্কা লাগল দুটোয়। ডিজনির কার্টুনে দুই খরগোস যেমন পিছনের পায়ে ভর করে সামনাসামনি দাঁড়ায়—তেমনি দেখতে লাগল ট্রাক দুটোকে। দুটোরই সামনেটা উঠে গেল আসমানের দিকে—তারপর খেলনার মত পড়ে গেল কাত হয়ে। ছুটে সরে যেতে আর একটু দেরি হলে রানার ওপরই পড়ত।

পিস্তলে আর গুলি আছে একটা। শত্রু আছে দুটো। এদিকে দুই ট্রাকের প্রচণ্ড সংঘর্ষের শব্দ শুনে দুটোই আসছে এদিকে। একটা উল্টানো ট্রাকের আড়ালে সরে দাঁড়াল রানা। কাছে আসতেই গুলি করল। শেষ গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। হঠাৎ একটা ট্রাক বিগড়ে গিয়ে খামোকা ঘুরতে থাকল মাঠের মধ্যে একই জায়গায়। বাকি ট্রাকটা তিন সেকেণ্ড থেমে থেকে বোধহয় হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করল ব্যাপারটা, তারপর হাঁ-হাঁ করে ছুটে গেল রাস্তার দিকে। রাস্তায় উঠেই সোজা পিঠটান দিল শহরের দিকে।

হাঁপাচ্ছে রানা। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে ওর মাটির ওপর। কপালের দুইপাশে দপ্‌ দপ্‌ করছে শিরাগুলো। কান দিয়ে গরম ভাপ ছুটছে। এতক্ষণের প্রাণান্তকর দৌড়ের ফলে মাথার চুল পর্যন্ত ভিজে গেছে ঘামে। উল্টানো ট্রাকের গায়ে হেলান দিয়ে জিরিয়ে নিল সে কিছুক্ষণ। গুলিহীন পিস্তলটা রেখে দিল কোটের পকেটে।

হঠাৎ মনে পড়ল জিনাতের কথা। তাড়াতাড়ি শহরে ফিরে রিপোর্ট করবার তাগিদও অনুভব করল সে। তিন পা এগিয়েই পিছনে একটু খশ্‌ খশ্‌ আওয়াজ পেয়ে ঝট্‌ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। প্রথমেই চোখ পড়ল একটা উদ্যত ছুরির ওপর। ডান হাতে কব্জিটা ধরেই আছড়ে ফেলল সে লোকটাকে মাটির ওপর। বুড়িগঙ্গার শুশুক মাছের মত মাথাটা নিচের দিকে করে ডিগবাজি খেলো লোকটা। ছিটকে পড়ে গেল

ছুরি হাত থেকে। উঠে বসবার চেষ্টা করছিল, শিরদাঁড়ার ওপর রানার বুটের একটা কড়া লাথি খেয়ে বেঁকে গেল ওর শরীর। মুখে গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলেই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে জ্ঞান হারিয়ে। এ সেই মাঠের মাঝখানে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া ট্রাকের অপর ড্রাইভারটা।

রাস্তায় উঠে এল রানা।

'জিনা···!' চিৎকার করে ডাকল সে।

'আয়ি।' উত্তর এল দূর থেকে।

হেড লাইট জ্বালা ও স্টার্ট দেয়া অবস্থায় রাস্তার ওপর দাঁড়ানো ট্রাকের মধ্যে থেকে টেনে নামাল রানা দুর্ধর্ষ চেহারার এক পাঞ্জাবী ড্রাইভারের মৃতদেহ। ঠিক চোখের পাশে লেগেছিল গুলিটা। দরজা এবং সামনের উইণ্ড-স্ক্রীনে রক্তের সাথে লেগে আছে মগজের অংশ।

রাস্তায় উঠে এল জিনাত ও ট্যাক্সি ড্রাইভার। তোবড়ানো গাড়িটার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ নিষ্ফল ক্ষোভ প্রকাশ করল ড্রাইভার, তারপর চূর্ণ বিচূর্ণ গাড়ির ড্যাশ বোর্ড থেকে ব্লু-বুক আর রোড পারমিটের টোকেনটা বের করে নিয়ে বলল, 'হাম্‌কো ক্যয়া হ্যায়, — ফাটেগা ইনশিওর ওয়ালোঁকো।'

উঠে বসল ড্রাইভার ট্রাকের ড্রাইভিং সীটে।

তখনও বন্-বন্ ঘুরছে একটা ট্রাক অন্ধকার মাঠের মধ্যে।

মাইল ছয়েক আসতেই পিছনে কর্কশ হর্ন শোনা গেল, 'বিপ···বি···প্।' অভ্যাসবশে সাইড দিল ড্রাইভার। পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল সবুজ ফোক্সওয়াগেন। এরিয়েলের রডটা দুলছে এদিক ওদিক। রানা বুঝল ওয়্যারলেস ফিট্ করা আছে ওই গাড়িতে। রানার গতিবিধি সম্পর্কে ট্রাক ড্রাইভারদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ওই গাড়ি থেকেই। ফোক্সওয়াগেনের ব্যাক লাইট যখন প্রায় অদৃশ্য হয়ে এল তখন হঠাৎ ট্রাকের মধ্যে কে যেন কথা বলে উঠল।

'মাসুদ রানা, হুঁশিয়ার! মওত বহোত দূর ন্যহিঁ!'

মাথার ওপর চেয়ে দেখল রানা। স্পীকার ঝুলছে একটা।

# আট

খান মোহাম্মদ জানের ওখান থেকে কয়েক জায়গায় ফোন করল মাসুদ রানা। এক বিশেষ মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল একদল লোক এদিক-ওদিক।

না খাইয়ে ছাড়ল না জিনাত। খাওয়ার টেবিলেই পরিচয় হলো একজন সুদর্শন যুবকের সাথে। সাঈদ খান। মোহাম্মদ জানের ভাতিজা। রানার চেয়ে কিছু ছোট হবে বয়সে। মোহাম্মদ জানের পরে সে-ই হবে এই প্রতাপশালী ট্রাইবের সর্দার। সত্যিই, সর্দারের মতই চেহারা। চমৎকার স্বাস্থ্য। লম্বা একহারা পেটা শরীর। রানা নিজে মিশুক প্রকৃতির মানুষ না হলেও প্রথম দর্শনেই পছন্দ করল ছেলেটিকে। গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায় এ-লোকের ওপর।

কিন্তু রানা এটাও বুঝল যে প্রথম দর্শনেই তাকে অপছন্দ করেছে সাঈদ। কারণ কিছুটা আঁচ করল সে জিনাতের দিকে ওর চোরা চাহনি দেখে। বুঝল, মস্ত ক্ষত চেপে রেখেছে বেচারা সাঈদ। ভেতর ভেতর গুমরে মরছে সে কতদিন ধরে কে জানে। বোধহয় কাউকে, এমন কি জিনাতকেও, মুখ ফুটে বলতে পারেনি সে কিছু। চেষ্টা করেও ওর সাথে আলাপ জমাতে পারল না রানা। শেষে হাল ছেড়ে দিল মৃদু হেসে।

ট্রাক-হামলার সমস্ত ঘটনা আগাগোড়া মন দিয়ে শুনল মোহাম্মদ জান। কুঞ্চিত হয়ে উঠল ওর কপাল। বলল, 'বুঝতে পারছি, মস্ত শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে লেগেছ তুমি, রানা। এটা আমার মালাকান্দ নয়। হলে পিষে ফেলতে পারতাম যে-কোনও শত্রুকে। তুমি বরং এখানেই থেকে যাও রাত দশটা পর্যন্ত। এখান থেকেই বেরোনো যাবে তোমার স্বর্ণমৃগের সন্ধানে।'

'তা হয় না। আমার কিছু কাজ আছে হোটেলে। আপনি বরং ওখানেই আসুন।'

'বেশ। সাঈদ, তুমি মেজর রানার সঙ্গে গিয়ে চিনে আসো হোটেলটা।'

বেরোবার আগে রানাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল জিনাত। রানা কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ করেছে, খাওয়া দাওয়ার শেষে পানি খাওয়ার আগে সোহেলের দেয়া যষ্টিমধু চুবিয়ে নিল জিনাত গ্লাসের মধ্যে। অত্যন্ত সিরিয়াস সে এ-সব ব্যাপারে।

'আমার জন্যেই তোমার আজ এই বিপদ, রানা।'

'তোমার জন্যে মানে?'

'আমার জন্যেই তো। সাধুবাবা তোমাকে জুয়াড়ীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে বলেছিল আমাকে। পোড়া মন! ভুলে গেলাম কি করে? আজ রাতে আমার ঘুম হবে না, রানা।'

'দূর। এসব চিন্তা করে মাথা গরম কোরো না, জিনাত। কাল না তোমার জন্মদিন? বাড়িতে বন্ধু-বান্ধব আসবে। খামোকা রাত জাগলে কাল দুপুর হলেই দাঁত কেলিয়ে পড়ে থাকবে—কেক কাটারও শক্তি থাকবে না আর বিকেল বেলা!'

হাসল জিনাত। রানার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'কাল আসছ তো?'

'আসছ তো, মানে? আজ রাতের কাজটা ভালোয় ভালোয় চুকে গেলে কাল তো আমাকে এখান থেকে নড়াতেই পারবে না।'

'কি উপহার দেবে, বলো না?' আব্দার ধরে জিনাত।

'যখন দেব, তখন দেখো! অবাক করে দেব একেবারে।'

সাঈদ জিজ্ঞেস করল, 'ওয়ালী আহমেদের সাথে লাগতে গেলেন কেন? শত্রুতা হলো কিসে?'

রানা ওর জোচ্চুরির কথা বলল সাঈদকে খুলে। কিভাবে শায়েস্তা করেছে আজ বিকেলে, বলল। ওয়ালী আহমেদের আসল মতলব শুনে কঠিন হয়ে গেল সাঈদের মুখ।

'তাহলে জিনাতকে নিয়েই লেগেছে আপনাদের মধ্যে?'

'অনেকটা তাই বলতে পারেন।'

'যদি তাই হয় তাহলে জিনাতের কপালটা নেহায়েতই খারাপ বলতে হবে। ওয়ালী আহমেদ যা চায় তা সে করে ছাড়ে। আপনি জানেন না, কিন্তু আমি চিনি ওকে। আজ পর্যন্ত কেউ ঠেকাতে পারেনি ওকে—আপনিও পারবেন না, আমিও না, চাচাজীও না। করাচি শহরে ওর ক্ষমতার কাছে আমরা কিচ্ছু না।'

'ওকে আপনি চিনলেন কিভাবে?'

'আমাদের একটা গোপন ব্যবসায়ে দুই-দুইবার মার খেয়েছি আমরা ওর হাতে। তাও আবার মালাকান্দে বসে। চাচাজী জানে না। আমার ওপর ছিল সে ব্যবসার ভার। অদ্ভুত ওর ক্ষমতা। আর করাচিতে তো দিন-দুপুরে যদি সে খোলা রাস্তার ওপর আপনাকে গুলি করে মারে, কিচ্ছু হবে না ওর। কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। পাত্তাই পাবে না।'

'আপনি দেখছি ভয় ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন আমার মনে।'

'আমি আপনাকে সত্য উপলব্ধি করাবার চেষ্টা করছি।'

'আমার মনে হয় না সাধারণ একজন লোককে এত ভয় পাওয়ার কিছু আছে।' আলোচনাটা ভাল লাগছে না রানার। গলার স্বরে সেটা টের পেল সাঈদ।

'সাধারণ লোক!' একটু হাসল সাঈদ। তারপর চুপ হয়ে গেল।

ছোট্ট লনটা পার হয়ে লাউঞ্জে উঠবার কয়েক ধাপ সিঁড়ি। হোটেলের বাইরে গাড়ি রেখে এগিয়ে আসছে সাঈদ আর রানা পাশাপাশি। রানার আপত্তি সত্ত্বেও ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দেবে বলে সাথে আসছে সাঈদ। হঠাৎ রানার প্রবল এক ধাক্কায় রাস্তা থেকে ছিটকে লনের ঘাসে চলে গেল সাঈদ। টাল সামলাতে না পেরে গোটা কয়েক ডালিয়া ফুলের গাছসহ ভূমিসাৎ হলো সে। রানাও লাফিয়ে সরে গিয়েছে রাস্তার অপর পাশে ঘাসের ওপর। এমনি সময়ে দড়াম করে পড়ল পাথরটা রাস্তার ওপর। প্রায় তিন মণ ওজনের প্রকাণ্ড একখানা পাথর পীচের রাস্তাটা আধহাত ডাবিয়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে লাগল লোহার গেটে। দুমড়ে বেঁকে গেল গেট। কয়েকটা শিক খুলে বেরিয়ে গেল নিচের খোপ থেকে। সাত তলার ছাদ থেকে পড়েছে পাথর।

চোখের নিমেষে ঘটে গেল ব্যাপারটা। উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে এল সাঈদ রানার দিকে।

'চোট তো ন্যই লাগি, মেজর?'

কোনও উত্তর না দিয়ে ওর হাত ধরে দ্রুত উঠে এল রানা লাউঞ্জে। এটা যে সাধারণ দুর্ঘটনা নয়, কেউ ওদের খুন করবার জন্যে কাজটা করেছে, বুঝতে পেরেই এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটল সাঈদ ছাদের দিকে। এক এক লাফে তিন সিঁড়ি টপকাচ্ছে সে। ঠাণ্ডা মাথায় লিফটে করে পাঁচতলায় উঠে এল রানা। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করতেই দেখল সাঈদ আসছে সিঁড়ি বেয়ে। হাতে রিভলভার। দ্রুত চিন্তা করছে রানা।

'ছাতে গিয়ে কোনও লাভ নেই, মি. সাঈদ। এই দেখুন।'

দেখা গেল বাম পাশের লিফটটা নিচে নেমে আসছে। রানা বোতাম টিপল বার কয়েক। 6…5…4…3 নেমে যাচ্ছে লিফ্ট—থামল না। হলুদ নম্বরগুলো কমে আসছে। 2…1…G, সোজা নেমে গেল লিফ্ট্ গ্রাউণ্ড ফ্লোরে।

'আপনি ওপরে না এসে নিচে থাকলেই ধরা যেত ওদের,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সাঈদ।

'আমার যতদূর বিশ্বাস, ওই লিফ্‌টে অপারেটার ছাড়া আর কেউ-ই নেই।'

'কি করে বুঝলেন?'

'এইটাই স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে।'

'তাহলে ছাতের ওপর নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে দুশমনদের,' আবার রওনা হচ্ছিল সাঈদ, এক থাবা বসাল রানা ওর কাঁধে।

'ছাতেও কিছু পাবেন না, মিস্টার সাঈদ। দুশমন যে-ই হোক না কেন, আমার-আপনার চেয়ে অনেক হুঁশিয়ার। যদি দেখতে চান তাহলে আসুন আমার সঙ্গে।'

সাঈদের উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। দেখল কাগজের টুকরোটা পড়ে আছে মাটিতে। অর্থাৎ, নিশ্চয়ই কেউ ঘরে ঢুকেছিল—কিংবা এখনও আছে।

'রিভলভারটা দিন তো। আমার পিস্তলের গুলি শেষ।'

অবাক হয়ে রানার মুখের দিকে চেয়ে এগিয়ে দিল সাঈদ ওর রিভলভার। নিঃশব্দে তালা খুলে ডান হাতে রিভলভারটা নিল রানা। তারপর বাঁ হাতের এক ধাক্কায় কপাট খুলেই লাফিয়ে ঢুকল ঘরের মধ্যে। না। ঘরের মধ্যে কেউ নেই। শূন্য ঘরটা যেন উপহাস করল রানার অতি-সতর্কতাকে। তবু বাতি জ্বালিয়ে দুটো ঘর আর বাথরুমটা দেখে নিয়ে নিঃসন্দেহ হলো রানা। তারপর বাতি নিভিয়ে দিয়ে সাঈদকে নিয়ে এসে দাঁড়াল ব্যালকনিতে।

'ওই যে!' সাঈদেরই চোখে পড়ল আগে। রানাও চাইল ওইদিকে। দেখল, রশি বেয়ে নেমে যাচ্ছে একজন লোক ছাত থেকে হোটেলের পেছনে। আবছা অন্ধকারে চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। মাটিতে পা ঠেকতেই দৌড় দিল লোকটা সাগরের দিকে। সেইলরস্ ক্লাবের কাছে গিয়ে রাস্তায় উঠতেই ল্যাম্প পোস্টের আলোয় লোকটার চেহারা দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল রানা এবং সাঈদ। মানুষের চেহারা যে এত প্রকাণ্ড আর এত সৃষ্টিছাড়া কুৎসিত হতে পারে, ধারণা ছিল না রানার। মিশমিশে কালো, প্রায় সাড়ে সাত ফুট লম্বা, তেমনি চওড়া। একবার পেছন ফিরে দেখল কেউ আসছে কি না। দেখা গেল ওপরের ঠোঁট নেই। বিকট কালো মুখে ঝক্‌ঝক্ করছে হিংস্র সাদা দাঁত। বুলেটের বেগে চলে গেল বীভৎস মূর্তিটা সমুদ্রের দিকে।

'গুংগা!' কেঁপে উঠল সাঈদের কণ্ঠস্বর।

'চেনেন আপনি ওকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, চিনি। ওয়ালী আহমেদের দেহরক্ষী। লোকটা কালা এবং বোবা। ভয়ঙ্কর শক্তি ওর গায়ে।'

'তা চেহারা দেখেই মনে হলো। ওই তিন-মনি পাথর তাহলে ও-ই ফেলেছিল।'

'ওই পাথর ওর কাছে দশ ইঞ্চি ইঁটের মত হাল্‌কা। আপনি বড় ভয়ঙ্কর পাল্লায় পড়েছেন, মিস্টার মাসুদ রানা। আমি পরামর্শ দিচ্ছি, সম্ভব হলে আজই পালিয়ে যান আপনি করাচি ছেড়ে।'

এসব কথা শুনছে না রানা। ওর মনে পড়ল, ঢাকায় হেড অফিসে চীফ

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কর্নেল শেখের একটা কথা। পি. সি. আই.-এর একজনকে দিন দুপুরে খুন করা হয়েছিল ম্যাকলিওড্ রোডে। ছাতের ওপর থেকে মস্ত একটা পাথর ফেলে কেউ থেঁতলে মেরেছিল ওকে ফুটপাথের ওপর। আজকের ঘটনার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। পি. সি. আই. এজেন্টকে মারা হয়েছিল স্বর্ণমৃগের পেছনে লাগার জন্যে, আর রানাকে খুন করবার চেষ্টা করা হলো ওয়ালী আহমেদের পেছনে লাগার জন্যে। দুই জায়গাতেই একই অস্ত্র—পাথর।

তাহলে? ওয়ালী আহমেদই কি স্বর্ণমৃগ? না এটা একটা দৈব-সংযোগ—কোইন্‌সিডেন্স? এমনও হতে পারে যে ওয়ালী আহমেদের সাথে ঝগড়াও হলো, আর স্বর্ণমৃগের কাছে ধরাও পড়ল একই সঙ্গে। স্বর্ণমৃগই আসলে আক্রমণ চালাচ্ছে, আর রানা খামোকা ওয়ালী আহমেদের সঙ্গে ঘটনাকে জড়িয়ে নিয়ে সব মিলিয়ে জগা-খিচুড়ি পাকাচ্ছে।

কিন্তু তাহলে গুংগা? সাঈদের কথা কতখানি নির্ভরযোগ্য?

'আপনি ঠিক জানেন যে ওই বিকট চেহারার লোকটা গুংগা? ওয়ালী আহমেদের দেহরক্ষী? চোখের ভুলও তো হতে পারে?'

'পাগল নাকি? যে একবার সামনে থেকে দেখেছে ওই চেহারা, জীবনে তার এ ব্যাপারে অন্তত চোখের ভুল হবে না। আপনিই বলুন, আপনি তো এক মুহূর্তের জন্যে দেখেছেন, ভুলতে পারবেন ওই চেহারা?'

কথাটা মনে মনে স্বীকার করতেই হলো রানাকে। ও চেহারা ভুলবার নয়। কয়েক রাতের ঘুম নষ্ট করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। তাহলে? অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠল যে ব্যাপারটা। ওয়ালী আহমেদই যদি স্বর্ণমৃগ হয়ে থাকে তাহলে সে কি জেনে ফেলেছে রানার পরিচয়? নাকি পৌরুষে আঘাত লাগায় কেবল প্রতিশোধ নিতে চাইছে? ওর অনুপস্থিতিতে ঘর অনুসন্ধান করে কোন্ তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে গেল শত্রুপক্ষ? সোহেলই বা ওয়ালী আহমেদ সম্পর্কে সাবধান করল কেন গান্ধী গার্ডেনে? ও কি জানতে পেরেছে কিছু?

এমন সময় একটা স্পীড বোটের এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ এল কানে। চলে গেল গুংগা ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

সাঈদ চলে যেতেই দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজল রানা। ঘরের ভেতর টাইম বম্ব রেখে যেতে পারে হয়তো। সুটকেসের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি হয়েছে। এক আধটা কাগজ খোয়াও গিয়ে থাকতে পারে, ঠিক বোঝা গেল না। সারা ঘরে অস্বাভাবিক কিছুই খুঁজে পাওয়া গেল না। ড্রয়ার, আলমারি, আলমারির ছাদ, ওয়াল ক্লকের ভেতর, বিছানার তলা, এমন কি ভেন্টিলেটার পর্যন্ত দেখল রানা। নাহ্। কোথাও কিছু রেখে যায়নি ওরা। হয়তো রানার সত্যিকার পরিচয় জানবার জন্যে লোক পাঠিয়েছিল ওয়ালী আহমেদ। আর কিছু নয়। অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে কোটটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে জুতো পরেই শুয়ে পড়ল রানা বিছানায়। অন্যমনস্কভাবে ছাতের দিকে চেয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল মাসুদ রানা।

খট্ খট্ খট্। তিনটে টোকা পড়ল দরজায়। রানা ঘড়ি দেখল, সাড়ে নয়টা বাজে। মোহাম্মদ জান কি আগেই এসে গেল? সাঈদের মুখে সব কথা শুনে বোধহয়

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে।

আবার টোকা পড়ল দরজায়। এবার চারটে। অর্থাৎ অসহিষ্ণু। দরজা খুলেই অবাক হয়ে গেল রানা। দাঁড়িয়ে আছে অনীতা গিলবার্ট।

'ভেতরে আসতে পারি?' জিজ্ঞেস করে উত্তরের অপেক্ষা না করেই রানাকে ঠেলে ঢুকে এল অনীতা ঘরের ভেতর। 'দরজাটা বন্ধ করে দিন। জরুরী কথা আছে।' মেঝেতে হাইহিলের খুট খুট আওয়াজ তুলে দরজা থেকে সব চাইতে দূরের সোফাটায় গিয়ে বসল অনীতা। চমৎকার একটা নীল-চকলেট-সাদা ছিটের স্কার্ট পরেছে সে। চিকন কটিতে কালো বেল্ট। মাথায় কালো নেটের স্কার্ফ—গলার কাছে গিঁট দেয়া। মুখে সযত্ন প্রসাধন, ঠোঁটে ঘন করে লিপস্টিক। বিকেলের সেই আলুথালু মেয়েটা বলে চেনাই যায় না আর। এই প্রথম রানা উপলব্ধি করল, মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী।

দরজা বন্ধ করে বসল রানা মেয়েটির মুখোমুখি।

'তারপর, হঠাৎ?' জিজ্ঞেস করল রানা সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে।

'হঠাৎ নয়। তোমার জন্যে সাড়ে ছ'টা থেকে অপেক্ষা করছি আমি। তোমার ওই কাউ-বয় বন্ধুটা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারছিলাম না। আমার অনেক কথা আছে—সব শুনবার সময় হবে তোমার?' পরিষ্কার বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলল অনীতা।

'না। মেয়েমানুষের কথা কোনদিন শেষ হয় না। আর অনেক কথা থাকলে তো রীতিমত বিপজ্জনক!' হাসল রানা। 'তাছাড়া আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেরোতে হবে আমাকে। একজন ভদ্রলোক আসবেন।'

'তাহলে খুব সংক্ষেপে সারতে হবে আমার সব কথা।'

রানা উঠে দু'কাপ কফি তৈরি করে একটা নিজে নিল আর একটা নামিয়ে রাখল অনীতা গিলবার্টের পাশে।

'থ্যাঙ্ক ইউ,' এক চুমুক খেয়ে নামিয়ে রাখল অনীতা কাপটা।

'তোমার প্রভু কোথায় ? যীশুর কথা বলছি না, ওয়ালী আহমেদ। আমার ঘরে এসেছ জানতে পারলে—'

'হ্যাঁ! খুন করে ফেলবে। কিন্তু আমি এখন আর তার চাকর নই। আজ সাড়ে ছয়টায় সে আমার পাওনা চুকিয়ে তার ওপর আরও পাঁচ হাজার টাকা বখ্‌শিশ দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে।'

'তাই নাকি? জোচ্চুরি ছেড়ে দিয়েছে তাহলে তোমার প্রভু ? সুখবর!'

'তোমার জন্যে এটা সুখবর নয়, মি. রানা। সে নিজে ঢুকেছিল তোমার ঘরে বিকেলে তোমরা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তারপরের ঘটনাটুকু আমি জানি বলেই আমার জিনিসপত্র বোনের বাসায় রেখে ফিরে এসেছি আবার।'

আচ্ছা! তাহলে ওয়ালী আহমেদ নিজে এসেছিল তার ঘরে? পরের ঘটনাটুকু শুনবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠল রানার মন। কিন্তু সে-ভাব প্রকাশ করল না, কফির কাপে চুমুক দিল।

'তোমার এই ঘরে কি যে পেল ওয়ালী আহমেদ জানি না। কিন্তু অত্যন্ত উত্তেজিত দেখলাম ওকে। প্রথমেই ওয়্যারলেসে চারদিকে তোমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা

করল, গাড়ি নিয়ে তোমাকে ফলো করবার আদেশ দিল কাউকে। তারপর ওর অ্যাসেম্বলিং প্ল্যান্টের ম্যানেজারকে ডেকে তোমাকে আজকের মধ্যেই সুযোগ মত পিষে মারবার আদেশ দিল। পি.আই.এ. বুকিং-এ ফোন করে আজ সন্ধ্যার ফ্লাইটে রাওয়ালপিণ্ডির একটা ফার্স্ট ক্লাস টিকেট রাখতে বলল—নিজের নামে। তারপর আমার টাকা-পয়সা চুকিয়ে দিয়ে বিদায় করে দিল । জিনিসপত্র গুছাতে গুছাতে শুনতে পেলাম হোটেলের ম্যানেজারকে ফোন করে বলছে, আজ সন্ধ্যায় জরুরী কাজে পিণ্ডি যাচ্ছে সে—কাজেই সব বিল যেন তৈরি রাখে ছ'টার মধ্যে।'

এতগুলো কথা একসাথে বলে চুপ করল অনীতা । একটা সিগারেট ধরাল প্যাকেট থেকে নিয়ে। কাপে একটা ছোট চুমুক দিয়ে হাতেই ধরে রাখল সেটা। সিগারেটের সাদা কাগজের ওপর লাল লিপস্টিকের দাগ পড়েছে।

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। কোনও কথা বলল না । চেয়ে রইল মেয়েটির দিকে।

'তোমার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে এসব কথা আমি তোমাকে বলছি কেন? সে কথায় পরে আসছি। আগে এখন এইসব ঘটনা থেকে আমার ডিডাকশন্টা শোনো। যদিও তুমি বলেছিলে আই.বি. বা পুলিসের লোক তুমি নও, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস তুমি এমন কোন সরকারী বিভাগের লোক যাকে শেষ না করতে পারলে বিপদে পড়বে ওয়ালী আহমেদ। কারণ, তোমার ঘরে ঢুকবার আগে ওকে খুব খুশি দেখেছিলাম। আমাকে তোমার সম্পর্কে বলেছিল,'এতদিনে সত্যিকার একটা উপযুক্ত লোক পাওয়া গেল। মাসে বারো হাজার টাকা দিতে হলেও এই লোককে রাখব আমি সহকারী বানিয়ে।' তোমার ঘর থেকে ঘুরে আসতেই ওর চেহারা দেখে চমকে উঠেছিলাম আমি। তারপরের ঘটনা তো বললামই। ট্রাক দিয়ে পিষে মারার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হইনি। স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ইনটিউইশনের বলে আমি জানতাম অত সহজে তোমাকে ঘায়েল করতে পারবে না ওরা।'

'করে এনেছিল প্রায়,' বলল রানা।

'কিন্তু পারেনি।' কথাটা ওখানেই থামিয়ে দিয়ে নিজের কথায় ফিরে গেল অনীতা। 'আর ওয়ালী আহমেদ যাতে এসব ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়ে, সেজন্যে আমার যতদূর বিশ্বাস ওর নাম নিয়ে ওর মত দেখতে কোনও লোক চলে গেছে রাওয়ালপিণ্ডি আজ সন্ধ্যার ফ্লাইটে। কাগজে-কলমে ওয়ালী আহমেদ আর করাচিতে নেই এখন।'

'কিন্তু আসলে সে সশরীরে করাচিতেই আছে, এই তো বলতে চাও? এর পেছনে তোমার কি যুক্তি ?'

'তিনমাস ছিলাম আমি ওর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে। হাড়ে হাড়ে চিনি আমি ওকে। ও যে কী পরিমাণ ভয়ঙ্কর লোক তা ভাষায় বোঝানো অসম্ভব। জিনাত সুলতানা ওর কুপ্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছে—অবাধ্যতা করে অপমান করেছে ওকে। আজ পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক ওর হাত থেকে নিস্তার পায়নি। জিনাতও পাবে না । ছলে-বলে-কৌশলে সে ধূলিসাৎ করবে জিনাতের অহঙ্কার। আত্মসমর্পণ করতেই হবে তাকে ওয়ালী আহমেদের কাছে। তার আগে সে নড়বে না করাচি থেকে এক পা-ও।'

সিগারেটের ছাই ঝাড়ল অনীতা। হাল্কা করে একটা টান দিল সেটাতে, তারপর ফেলে দিল অ্যাশ-ট্রেতে। সোজা রানার চোখের দিকে চাইল এবার সে।

'আমি তোমাকে সাবধান করে দিতে এসেছি, রানা।'

'কারণ কি, সুন্দরী? আমাকে খুন করা হলে তোমার তো কোনও ক্ষতি দেখি না।'

'ক্ষতি আছে। তোমাকে আমি কিছুতেই মরতে দেব না।' রানাকে অবাক হয়ে চাইতে দেখে আবার বলল, 'তুমিই এখন আমার একমাত্র ভরসা, রানা।'

'প্রথম দর্শনেই প্রেম মনে হচ্ছে!' কৌতুক বোধ রানা।

হেসে ফেলল অনীতা। সোনা বাঁধানো একটা দাঁত চক্ চক্ করে উঠল। এক ঢোক কফি গিলে নিয়ে বলল, 'শুনতে ওই রকমই লাগছে, তাই না? আমি দেখেছি, পুরুষ মানুষকে ঈশ্বর হ্যাণ্ডসাম করে বানালেও মাথায় পাঁঠার বুদ্ধি দিয়ে দেয়। সবক্ষেত্রেই তাই। তোমার বেলায় একটু অন্যরকম ভেবেছিলাম। আজ বিকেলে খানিকটা বুদ্ধির ঝিলিক দেখেছিলাম কিনা, তাই। শোনো হে, আকর্ষণীয় যুবক, তোমার প্রেমে আমি পড়িনি। মেয়েমানুষের প্রেম অত সহজ নয়। তোমাদের মত যেখানে সেখানে ধুপ-ধাপ প্রেমে আমরা পড়ি না।' রানার দিকে তেরছা করে চেয়ে মুচকে হাসল অনীতা। 'তোমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি আমি, রানা।'

'সাহায্য?'

'হ্যাঁ, সাহায্য। আমি জানি, কেউ যদি আমাকে সাহায্য করবার শক্তি, সাহস, আর বুদ্ধি রাখে; সে হচ্ছ তুমি। আমি যখন অপমানের জ্বালায় তিলে তিলে দগ্ধে মরছি, কালনাগিনীর মত বিষাক্ত ছোবল তুলে প্রতিশোধ নেবার জন্যে সুযোগের প্রতীক্ষা করছি, ঠিক সেই সময় তুমি এসেছ আমার জীবনে প্রেরিত-পুরুষের মত। সাহায্য করবে আমাকে, রানা?'

কথাগুলো বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে গেল অনীতা গিলবার্ট। করুণ মিনতি ফুটে উঠল ওর চোখে। সমস্ত সত্তা একাগ্র হয়ে উঠেছে ওর রানার উত্তর শুনবার জন্যে।

'কিসের প্রতিশোধ, অনীতা?'

রানা বুঝল এই মেয়েটির জীবনের কোনও দুর্বিষহ সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে সে। নিতান্ত ঘটনাচক্রে। হৃদয়ের মস্ত একটা ব্যথা উন্মোচন করে দেখাবে মেয়েটি আজ তাকে। খামোকা এক কাজে এসে অন্য কাজে জড়িয়ে পড়বার আশঙ্কায় একটু উদ্বিগ্ন হলো রানা মনে মনে। কিন্তু বড় আশা করে এসেছে, ওকে ফেরাবেই বা কি বলে?

'অপমানের। স্ত্রীলোক প্রকৃতির মতই সর্বংসহা। পুরুষের অনেক অত্যাচার, অনাচার আর কঠিন আঘাত সহ্য করতে পারে সে হাসিমুখে। পুরুষের বুনো স্বভাবের জন্যে আরও বেশি করে ভালবাসে সে তাকে। এটা নারীর ধর্ম। পুরুষরা যখন নাটক নভেলে সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোকের ওপর হৃদয়হীন পুরুষের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে হা-হুতাশ করে তখন আমরা মনে মনে হাসি। আমরা যাকে মন দিই, তার কোনও অত্যাচারই আর অত্যাচার মনে হয় না আমাদের কাছে। কিন্তু একটা জিনিস নারী কোনদিন সহ্য করতে পারে না, কোনদিন ক্ষমা করে না—সে হচ্ছে অপমান।' এসব কথা শুনতে রানার অস্বস্তি লাগছে বুঝতে পেরে আবার বলল, 'ঘটনাটা খুলে বলছি।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল অনীতা। তারপর বলল, 'তিন মাস আগে আমি

এয়ার হোস্টেস ছিলাম। কায়রো থেকে করাচি ফিরছিলাম। সেই প্লেনেই পরিচয় ওয়ালী আহমেদের সাথে। ও প্রস্তাব দিল ওর সাথে ডিনার খাওয়ার। ডিনারে আপত্তি আমার কোনদিনই ছিল না, এখনও নেই। তাছাড়া খ্রিস্টান সমাজে খোলামেলা পরিবেশে মানুষ হয়েছি আমি। কাজেই নির্ভয়ে রাজি হয়ে গেলাম। ক্যাপ্টেনের কাছে অনুমতি চাইতেই মৃদু হেসে অনুমতি দিয়ে দিল সে।'

'সেই রাতেই প্রথম এলাম আমি এই হোটেলে ওয়ালী আহমেদের কামরায়। ডিনার শেষ হতেই বাড়াবাড়ি রকম ঘনিষ্ঠ আচরণ শুরু করল ওয়ালী আহমেদ। আমি আপত্তি করলাম। কিন্তু এইমাত্র ওর পয়সায় তৃপ্তির সঙ্গে জীবনের শ্রেষ্ঠ ডিনার খেয়ে উঠে তেমন জোর করে কিছু বলতেও পারলাম না। তাছাড়া, একজন পুরুষের সাথে মেয়েমানুষ গায়ের জোরে পারবে কেন?' লাল হয়ে উঠল অনীতার মুখ। নিচের ঠোঁটটা কাঁপছে। কামড়ে ধরে সেটাকে সংযত করবার চেষ্টা করল সে। অপলক চোখে চেয়ে শুনছে রানা একটি নারীর চরম লজ্জার কথা।

'পারলাম না। পাশের ঘর থেকে হিংস্র গর্জন ছেড়ে এ-ঘরে ঢুকল মিশমিশে কালো বিশাল এক দৈত্য। জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। ওপরের ঠোঁট কাটা। দাঁত আর মাড়ি বেরিয়ে আছে।'

'গুংগা!'

'হ্যাঁ। আঁৎকে উঠে ওয়ালী আহমেদের হাত থেকে ছুটে দরজার কাছে চলে গিয়েছিলাম, বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে এল পিশাচটা। এক হাতে চুলের মুঠি ধরে শূন্যে তুলে ফেলল আমাকে। তারপর মারল···এবং অপমান করল!'

দুই হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল অনীতা। ফুলে ফুলে উঠছে ওর পিঠ। একটু সামলে নিয়ে বলল। 'ওই পিশাচটা আমার সম্ভ্রম···'

'থাক, অনীতা। আর বলতে হবে না।' উঠে গিয়ে ওর পিঠে হাত রাখল রানা। ওর মনের সমস্ত দ্বিধা আর সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। বলল, 'আমি তোমাকে সাহায্য করব। খোদার কসম। তোমার এই অপমানের কথা আমি ভুলব না। যেমন করে হোক প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব।'

কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল অনীতার চোখ মুখ। যেন এই একটি কথায় হালকা হয়ে গেল ওর মনের বোঝা। বলল,'সেই থেকে অপেক্ষা করছি আমি সুযোগের। সাগ্রহে রাজি হয়ে গিয়েছিলাম ওর প্রাইভেট সেক্রেটারি হবার প্রস্তাবে। প্রতিশোধ আমি নিতাম। কিন্তু আজ আমাকে বিদায় করে দিয়ে পালিয়ে গেছে ও আমার নাগালের বাইরে। তাই এসেছি তোমার কাছে। ধন্যবাদ, রানা। কৃতজ্ঞ বোধ করছি আমি তোমার কাছে।'

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ছোট্ট একটা আয়না বের করে আবার মেক্ আপ নিল অনীতা। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে সন্ত্রস্ত পায়ে।

# নয়

এতে কিছুই প্রমাণ হয় না। ভাবছে রানা।

পুল্‌থ্রু দিয়ে পিস্তলটা পরিষ্কার করছে সে। শুধু পাথর ফেলা ছাড়া ওয়ালী আহমেদের সাথে স্বর্ণমৃগের কোনও যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে না। দুইজন একই ব্যক্তি কিনা তা এই সামান্য সূত্র ধরে হল্‌ফ করে বলা যায় না। দেখা যাক্‌, আজ মোহাম্মদ জানের সঙ্গে গিয়ে যদি নতুন কোনও তথ্য আবিষ্কার করা যায় তখন বোঝা যাবে। গুণে গুণে আটটা গুলি ভরে নিল রানা ম্যাগাজিনে। স্লাইড টেনে চেম্বারে একটা গুলি ভরল। ম্যাগাজিনটা ঢুকিয়ে দিল যথাস্থানে। ক্লিক্‌ করে ক্যাচের সাথে আটকে গেল সেটা। সেফটি ক্যাচ 'অফ' অবস্থায় যন্ত্রটা শোল্ডার হোলস্টারে ঢুকিয়ে দিল। দ্রুত কয়েকবার পিস্তল বের করা প্র্যাকটিস করল। ঠিক জায়গা মতই বারবার হাত পড়ছে দেখে নিশ্চিন্ত মনে বাইরের ঘরে গিয়ে বসল।

মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতেই এল মোহাম্মদ জান। একা। ম্যানেজারের সাথে দুই-একটা জরুরী কথা বলেই বেরিয়ে এল রানা হোটেলের বাইরে। মোহাম্মদ জানের ওপেল রেকর্ড দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিল।

'সাঈদের কাছে শুনলাম পাথর পড়ার কথা। পাথরটাও দেখলাম। দেখছি রীতিমত জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'এখন আমরা চলেছি কোথায়?'

'সাদারে। কয়েকটা আড্ডায় যাব আমরা। আগেই খবর দিয়েছি, লোক থাকবে আমার। আমার মালাকান্দের লোক—করাচিতে এখন স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে। কিছু না কিছু খবর বেরোবেই, দেখো তুমি।'

রানা চুপ করে ভাবছে অনীতা গিলবার্টের কথা।

'ওহ্‌-হো! আসল কথাই তো ভুলে গেছি।' আবার বলল মোহাম্মদ জান। 'তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, রানা। পরিবর্তনটা লক্ষ করছ জিনার? দেখেছ, একদিনেই কেমন অন্য মানুষ হয়ে গেছে? জীবনে যে-কাজ করেনি, দেখে এলাম সেই কাজ করছে। গুনগুন গান গাইছে আর ঘর-দোর গোছাচ্ছে। কাল যে জন্মদিন! তোমাকে কি বলব, মেজর, আমার খুশি আমি চেপে রাখতে পারছি না কিছুতেই। বাঁচালে তুমি আমাকে, বাবা। মনে হচ্ছে আমার বুকের ওপর থেকে মস্ত ওজনের একটা পাথর কেউ সরিয়ে দিয়েছে। আজ সাত বছর এমন স্বস্তির নিঃশ্বাস আর ফেলিনি। মারি পাঠাবার বোধহয় আর দরকারই হবে না।' রানাকে নড়ে চড়ে উঠতে দেখে চট করে কথা পাল্টাল, 'অবশ্য তাও পাঠাতে হবে। ভাল ডাক্তার দিয়ে থরো চেকাপ করাতেই হবে। কিন্তু সত্যি বলতে কি আমার আর ভয় নেই একফোঁটাও। খোদার কাছে হাজার শোকর, কোথা থেকে তোমাকে এনে হাজির করেছেন তিনি ঠিক সময় মত।'

উচ্ছ্বসিত আনন্দে বক বক করতে থাকল স্নেহান্ধ পিতা। বড় বড় রাস্তা পেরিয়ে গাড়ি চলেছে এখন অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা ধরে। একটা সাইনবোর্ডে পড়ল রানা এল্‌ফিন্‌স্টন স্ট্রীট, তারপর পড়ল ওরা ভিক্টোরিয়া রোডে।

মোড় ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়েই দাঁড়াল গাড়ি। রাস্তার ডানধারে 'কাফে জর্জ'। বেরিয়ে এল রানা ও মোহাম্মদ জান গাড়ি থেকে। মাটির তলা দিয়ে রাস্তা পার হওয়ার ব্যবস্থা। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার ভিড় কমে গেছে অনেক—তবু আণ্ডারগ্রাউণ্ড

ক্রসিং দিয়ে ডান ধারে এসে দাঁড়াল ওরা কাফে জর্জের সামনে। বাইরে থেকে দেখতে নোংরা, অথচ ভিতরটা গমগমে, লোক ভর্তি। বাইরেই একটা প্রকাণ্ড উনুনে সারি সারি শিক ঝলসানো হচ্ছে। সুগন্ধ এল নাকে। ঢুকে পড়ল ওরা কাঁচের দরজা ঠেলে। রানা লক্ষ করল এদিক-ওদিক থেকে কয়েকজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে সালাম করল মোহাম্মদ জানকে। সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল মোহাম্মদ জান ঢোলা পাঞ্জাবী আর বিশ গজী পাজামায় খশখশ আওয়াজ তুলে।

কোণের টেবিলে একজন গুণ্ডা কিসিমের লোক বসে ছিল। ডান চোখের নিচ থেকে উপরের ঠোঁট পর্যন্ত একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। ঝাঁকড়া মাথার চুল। গলায় তাবিজ। মোহাম্মদ জানের সাথে চোখের ইঙ্গিতে কিছু ভাব বিনিময় হলো—রানা সেটা খেয়াল না করার ভান করে সোজা ঢুকে গেল একটা কেবিনে মোহাম্মদ জানের পিছু পিছু। তিন শিক আর তিন চায়ের অর্ডার দিল সর্দার।

মিনিট কয়েক পরেই কেবিনের পেছনে একটা দরজা খুলে গেল। ঘরে প্রবেশ করল সেই গুণ্ডা। পরিষ্কার ডাকাতের চেহারা। মোহাম্মদ জানের পায়ে ধরে সালাম করল সে, তারপর বসল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে। মুখে ভয়ঙ্কর একটা নিঃশব্দ হাসি। কেবিনের পর্দাটা আগেই টেনে দিয়েছে মোহাম্মদ জান।

নিচু গলায় অনর্গল কথা বলল কিছুক্ষণ দু'জনে পশতু ভাষায়। বার কয়েক মাথা ঝাঁকাল গুণ্ডাটা। রানার দিকে অবাক চোখে চাইল কয়েকবার। হঠাৎ রানার দিকে লক্ষ পড়তেই লজ্জিত হয়ে মোহাম্মদ জান বলল, 'আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমার এই বন্ধু একবিন্দুও বুঝতে পারছেন না আমাদের আলাপ। উর্দুতেই কথা বলা উচিত ছিল আমাদের।'

কথার ভঙ্গিতে রানা বুঝল জেনে শুনেই পশতুতে কথা বলেছে মোহাম্মদ জান। তিন প্লেটে শিক কাবাব, সাথে তিনটে গরম নান-রুটি আর তিন পেয়ালা চা ঠক ঠক করে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে চলে গেল বেয়ারা। বাকি কথাবার্তা উর্দুতেই হলো।

'তা তোমরা সোনা দাও কার কাছে?' পোয়াটেক কাবাব মুখে ফেলে অবশিষ্ট ফাঁকটুকু দিয়ে জিজ্ঞেস করল মোহাম্মদ জান।

'আমরা কারো কাছে দিই না, সর্দারজী। তারাই আমাদের খুঁজে বের করে নিয়ে যায় মাল। দেড় বছর আগে আমরা যাদের কাছে যেতাম তারা আর মার্কেটে নেই। তারাও এখন আমাদের মত সাপ্লায়ার হয়ে গেছে। এখন হঠাৎ কোথা থেকে এক একদিন একেক জন আসে, নগদ টাকা দিয়ে মাল নিয়ে যায়। যাবার সময় একটা সঙ্কেত বলে যায়—সেই সঙ্কেত দিলেই আমরা নতুন লোককে চিনতে পারি, নির্ভয়ে মাল দিই। আমাদের কাজ হলো শুধু মাল জমা করে রেডি রাখা। ব্যস্। এর বেশি জানতে গেলেই সাফ করে দেয়। পর পর চার পাঁচজন খুন হয়ে যাবার পর আমরা আর সে চেষ্টা করি না।'

'কিন্তু বছর দেড়েক ধরে যে নতুন লোকটা কারবার করছে, একটা লোকও তাকে চাক্ষুষ দেখেনি, এ কেমন কথা? তোমাদের কেউ কখনও দেখোনি ওদের লোক যায় কোথায়? পিছু নাওনি কখনও?'

'বললাম তো। আপনি সর্দার। আপনার সাথে ঝুট বললে খোদার কাছে ঠেকা

থাকব। চার পাঁচজন চেষ্টা করেছিল। ওদের লাশ পাওয়া গেছে।'

'ওরা চেষ্টা করতে গিয়েছিল কেন?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'কৌতূহল।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে , আসল লোকটা খুবই সাবধানে নিজেকে গোপন রাখতে চায়?'

'খুব।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ আহার করল তিনজন। প্লেট খতম করে তশতরির ওপর আধ কাপ চা ঢেলে নিয়ে ফড়ফড় করে টানছে ডাকাতটা। নীরবতা ভঙ্গ করল মোহাম্মদ জান।

'আল্লারাখার কাছে কোন খবর পাওয়া যাবে ? করাচিতে আছে না এখন?'

'জ্বী, সর্দার। তবে ওর কাছ থেকেও কোন খবর পাবেন বলে মনে হয় না। এ এক সাঙ্ঘাতিক দল।'

'তুমি পর্যন্ত এ ধরনের কথা বলছ, দিল্লির? তুমি না মালাকান্দের ছেলে ? এদেশে এসে বিড়ালের বাচ্চা বনে গেলে?'

চুপ করে বকা হজম করে নিল দিল্লির খান।

'তাহলে দেখছি অন্যের কাছে যাওয়া বেকার। আমাকেই নামতে হবে ময়দানে। খবরটা আমার চাই-ই।'

'আমরা থাকতে আপনি কেন ময়দানে নামবেন, সর্দারজী? আমরা খতম হয়ে গেলে তারপর নামবেন আপনি। তার আগে নয়। আপনি শুধু হুকুম করুন, সর্দার।'

'দিন কয়েক অপেক্ষা করলে আসবে না ওদের লোক?'

'আসবার সময় হয়ে গেছে, সর্দার। আজও আসতে পারে, কালও। কিন্তু আমি জানি, ওদের সাথে বেঈমানী করলে আর রক্ষা নেই। কবর থেকে খুঁড়ে তুলে মারবে। আপনি হুকুম করলে মৃত্যুকে পরোয়া করব না, সর্দার।'

'আমি হুকুম করছি। তোমার যাতে কোনও বিপদ না হয় সেদিকে লক্ষ রাখব আমরা ।'

হাসল দিল্লির ওর ভয়ঙ্কর নিঃশব্দ হাসি।

'আপনার হুকুম আমার শিরোধার্য, সর্দার। আমি মালাকান্দের কু-সন্তান। কিন্তু যত দূরেরই হোক, আপনার রক্ত আমার শরীরেও আছে।' পা ছুঁয়ে কপালে ঠেকাল দিল্লির। 'আর আমার বিপদের দিকে লক্ষ রাখার কোনও দরকার নেই--কোনও লাভ হবে না তাতে। আপনি আমার পরিবারের ভার গ্রহণ করলে নিশ্চিন্তে জান দিতে পারব আমি। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, সর্দার, সে-লোক আপনাকেও ছাড়বে না।'

রানা ভাবল, কী আশ্চর্য ক্ষমতা এই ট্রাইবাল চীফদের। সাধারণ লোকের কাছে ঈশ্বরের নিচেই এদের স্থান। লোকটা স্থির নিশ্চিত যে কেউ ওর মৃত্যু ঠেকাতে পারবে না— বেঈমানী করলে খুন হতেই হবে। তবু সে এক কথায় রাজি!

'আচ্ছা, এই গ্যাঙের শেষ মাথায় কি ধরনের লোক আছে বলে তোমার ধারণা?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'ভদ্রলোক।' ডান ভুরুটা উপর উঠিয়ে রানার দিকে চাইল দিল্লির খান।

'কানাঘুষোয় শুনেছি আশ্চর্য এক বুদ্ধিমান লোক এসেছে এখন এই ব্যবসায়ে। পুলিসের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সে নাকি সারা পশ্চিম পাকিস্তানের ক্রিমিনালদের নিয়ে মস্ত শক্তিশালী একটা দল তৈরি করতে চায়। তাই লোক বাছাই করছে। পাঁচ হাজার থেকে বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত তনখা দেবে মাসে মাসে, গুণ অনুসারে। সবই শোনা কথা। টুকরো টুকরো এর-ওর কাছ থেকে শোনা। আমাদের মধ্যে প্রবল একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে এই নতুন লোককে ঘিরে।'

'আচ্ছা, দিল্লির খান, দু'মিনিট ভেবে উত্তর দাও। তোমাদের মধ্যে কেউ কি ওদের আড্ডার কোনও উড়ো খবরও রাখে না? খালি একটা ঠিকানা পেলেই তোমাকে আর বিপদের মধ্যে টানব না আমরা। তোমার বালবাচ্চাকে এতিম করবার ইচ্ছে আমাদের নেই। শুধু একটা ঠিকানা।'

চট্ করে রানার মুখের দিকে চাইল একবার দিল্লির খান। কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে ভাবল। তারপর ধীরে ধীরে চিন্তান্বিত ভাবটা দূর হয়ে গেল মুখের ওপর থেকে। মনের গভীরে হাতড়ে পেয়েছে সে এক টুকরো বাঁচবার অবলম্বন। উদগ্রীব হয়ে চেয়ে রইল রানা।

'সেখানে গেলে কোনও লাভ হবে কিনা বলতে পারি না। হয়তো সেখানে গিয়েছিল লোকটা অন্য কাজে। কিন্তু আমি একটা দোকানে ঢুকতে দেখেছি একজনকে। চোখের ভুলও হতে পারে। তবে আমার যতদূর বিশ্বাস এই লোকটাই দশ মাস আগে আমার কাছ থেকে সোনা নিয়েছিল পাঁচশো ভরি।'

'কিসের দোকান?' টেবিলের উপর দুই বাহু রেখে সামনে ঝুঁকে এল রানা।

'মাছের!' ফিস্ ফিস্ করে বলল দিল্লির খান।

মাছের বাজার মনে করে হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠল রানার মুখে। তাই আবার বলল দিল্লির খান, 'ওই মাছ না। ছোট ছোট রঙিন সব মাছ। কাঁচের বাক্সে রাখা। জ্যান্ত। যেদিন দেখলাম লোকটাকে ওই দোকানে ঢুকতে সেদিন থেকে ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটি না আমি।'

কাগজ বের করে ঠিকানাটা লিখে নিল রানা। কাছেই, ভিক্টোরিয়া রোডের ওপরই দোকানটা।

'যদি এ ঠিকানায় কিছু পাওয়া না যায় তাহলে হয়তো তোমার সাহায্য নিতেই হবে, দিল্লির খান,' বলল রানা।

'বেশক্। কিন্তু সাবধান, জনাব! দুশমন বড় হুঁশিয়ার।'

চোখ পাকিয়ে কথাটা বলে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল দিল্লির খান। গেলাস ঠুকে বেয়ারাকে ডাকা হলো। বিল চুকিয়ে বেয়ারাকে মোটা বখশিশ দিয়ে আবার গাড়িতে চাপল ওরা। ড্রাইভারকে ঠিকানাটা বুঝিয়ে দিল মোহাম্মদ জান। মাথা নেড়ে 'জ্বী, সর্দার' বলেই গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটল ড্রাইভার নির্জন হয়ে আসা রাস্তা ধরে।

অনেক দোকান সারি সারি। বেশির ভাগই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কোনও কোনটা সামান্য একটু খোলা—ভেতরে হিসাব-কিতাব হচ্ছে সারাদিনের বিকিকিনির। গাড়ি এসে থামল ফুটপাথের ধারে। নীল নিয়নে সুন্দর করে ইংরেজিতে লেখা: ফিশ এমপোরিয়াম। নামটা চেনা চেনা লাগল। কোথায় দেখেছে?···মনে পড়ল রানার,

এই নামটা দেখেছে চিটাগাং-এর 'বিপণী বিতানে'। এদেরই ব্রাঞ্চ নাকি? নাকি এটাই ওদের ব্রাঞ্চ?

বাইরে থেকে দেখা গেল কাঁচের শো-রুমে সুন্দর করে সাজানো আছে কয়েকটা অ্যাকুয়ারিয়াম। কয়েকটা শেল্ফে সাজানো বিচিত্র বর্ণ ও আকারের ঝিনুক আর শঙ্খ। পেছনে কালো পর্দা টাঙানো আছে বলে দোকানের ভেতরের চেহারাটা বাইরে থেকে বোঝা গেল না। একদিকের শাটার টেনে নামানো হয়েছে। আরেকটাও নামানোর উদযোগ হচ্ছে। বন্ধ করছে দোকান।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রানা একবার ভাবল আজ ফিরে যাবে কিনা। কাল এলেই বোধহয় ভাল হয়। কিন্তু খরিদ্দার দেখেই উৎসাহিত কণ্ঠে ভেতর থেকে ডাক দিল একজন। ঢুকে পড়ল ওরা দোকানের ভেতর।

চারপাশে কেবল মাছ আর মাছ। মাঝের সরু একটা প্যাসেজ দিয়ে কিছুদূর গেলে অফিস ঘর। দোকানে পা দিতেই সজাগ হয়ে উঠল রানার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, 'সাবধান! সামনে বিপদ!' আশ্চর্য এক ক্ষমতার বলে কি করে জানি আগে থেকেই বিপদ টের পায় রানা, এবার বড্ডো দেরি হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে পড়েছিল রানা, কিন্তু মোহাম্মদ জান সোজা ঢুকে গেছে ভেতরে, তাই সে-ও চলল পেছন পেছন। বাম বাহু দিয়ে চেপে একবার অনুভব করল স্প্রিং লোডেড্ শোল্ডার হোলস্টারটা। দ্রুত পা ফেলল সে মোহাম্মদ জানের কাছাকাছি থাকার জন্যে।

হরেক সাইজের অ্যাকুয়ারিয়াম। ছোট, বড়, মাঝারি। তার মধ্যে সুন্দর সুন্দর রঙিন সব মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। ট্রপিকাল ফিশ একদিকে, সল্টওয়াটার ফিশ অন্যদিকে। প্রত্যেকটি জারের ওপর আলোর ব্যবস্থা আছে। নানান রকম গাছ, শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ লাগানো আছে কাঁকর ও বালিতে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ উঠছে সুন্দর সব স্টোন থেকে। সুন্দর সুন্দর ঝিনুক, শঙ্খ রুচিসম্মতভাবে ছড়ানো বালির ওপর।

'আসুন, স্যার, আসুন। এক্ষুণি সেল ক্লোজ করতে যাচ্ছিলাম। কি মাছ লাগবে আপনার? বার্থডে প্রেজেন্টেশান?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল রানা। ভাবল, হঠাৎ জন্মদিনের কথা মনে হলো কেন ব্যাটার? বড়লোকেরা বোধহয় বার্থ ডে-তে মাছ উপহার দেয়। নইলে চলবে কি করে এসব দোকান? লোকটার মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রাখল রানা। গোলগাল মুখটা, হাসি-খুশি। যেন দুঃখ কাকে বলে জানে না। অমায়িক হাসি লেগে আছে সব সময় ঠোঁটের কোণে।

'তাহলে, স্যার, অ্যাঞ্জেল ফিশ নিন। চমৎকার একজোড়া ব্ল্যাক অ্যাঞ্জেল আছে। ম্যাডাগাস্কার থেকে আনা। মাত্র পাঁচশো টাকা। দেখবেন? আসুন আমার সঙ্গে।'

পিছন ফিরে লোকটা হাঁটতে আরম্ভ করবে এমন সময় রানা বলে বসল, 'আমরা চাইছি গোল্ড ফিশ। ভাল কোন ভ্যারাইটি আছে?' ভেতরের দিকে যেতে চাইছে না রানা।

'কি যে বলেন, স্যার! নেই? কত রকম ভ্যারাইটি চান? চোখ ধাঁধিয়ে যাবে

আপনার। আসুন আমার সঙ্গে।' এবার আর কোনও কথাতেই কান না দিয়ে পিছন ফিরে হাঁটতে থাকল লোকটা।

কয়েক পা এগিয়েই মোহাম্মদ জানেরও বোধহয় রানার সেই অনুভূতিটা হলো। থেমে পড়েই পেছন ফিরল সে। রানার পেছনে তিনজন ষণ্ডা মার্কা লোক দেখতে পেল সে। ঘড় ঘড় করে নেমে গেল শাটারটা। ফ্যাকাসে হয়ে গেল মোহাম্মদ জানের মুখ। বুঝল, বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়েছে। বেরোবার উপায় নেই। রানা চোখ টিপল একবার। মৃদু হাসির চেষ্টা করল মোহাম্মদ জান, কিন্তু সেটা মুখ বিকৃতির মত লাগল দেখতে। বোঝা গেল দমে গেছে সে। দিল্লির খানের কথা মনে পড়ল। 'বেশি জানতে চাইলেই সাফ করে দেয়···কয়েকজন চেষ্টা করেছিল। ওদের লাশ পাওয়া গেছে।'

একটা বড় অ্যাকুয়ারিয়ামের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। পানির মধ্যে বালি আর পাথরের কুচির উপর একটা পাত্রের মধ্যে সহস্র বাহু ওপরে তুলে কিলবিল করছে একদলা টিউবিফেক্স ওঅর্ম। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে ওগুলোকে গোটা কতক গোল্ড ফিশ। রানার সাথে মোহাম্মদ জানের চোখে চোখে কিছু ইঙ্গিত বিনিময় হয়ে গেল। মাছগুলো সম্পর্কে বক্তৃতা আরম্ভ করতে যাচ্ছিল ম্যানেজার, হঠাৎ ধাঁই করে এক লাথি লাগাল মোহাম্মদ জান ম্যানেজারের কাঁকালে। ছিটকে গিয়ে পড়ল লোকটা অ্যাকুয়ারিয়ামের ওপর। কনুয়ের ধাক্কা লেগে ভেঙে গেল কাঁচ। হাতটাও কেটে গেল খানিকটা। ঝর ঝর করে পানি পড়ে ভেসে গেল মেঝে। ছোট ছোট রঙিন মাছগুলো তড়াক তড়াক করে লাফাতে থাকল মোজাইক করা মেঝের ওপর। এবার একটা প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল ম্যানেজার। মাটিতে পড়ে মাছগুলোর মতই লাফাতে থাকল লাথি থেকে বাঁচবার জন্যে।

রানাও একই সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে লোকগুলোর ওপর। দড়াম করে নাকের ওপর রানার একটা অতর্কিত ঘুসি খেয়ে ছিটকে সাত হাত দূরে গিয়ে পড়ল প্রথম জন। দ্বিতীয় জনের উদ্দেশ্যে চালাল লাথি। তৃতীয়জন একটু দূরে ছিল—হঠাৎ সে পুকুরে ডাইভ দেয়ার মত সোজা ঝাঁপ দিল রানার পেট লক্ষ্য করে। মুষ্টিবদ্ধ দুই হাতে প্রচণ্ড জোরে এসে পড়ল রানার পেটের ওপর। ধাক্কা সামলাতে না পেরে কয়েক পা পিছিয়ে গেল রানা। ব্যথায় নীল হয়ে গেল ওর মুখ। পিস্তলটা বের করল সে তারই মধ্যে। কিন্তু ঠিক সেই সময় পায়ের তলায় পড়ল একটা গোল্ড ফিশ। সড়াৎ করে পা পিছলে গেল রানার। সাথে সাথেই প্রচণ্ড একটা ঘুসি লাগল ওর বাঁ কানের ওপর। পড়ে গেল রানা। হাঁটুতে লাগল খুব, এবং চোখটা অন্ধকার হয়ে গেল শক্ত মেঝেতে নাক ঠুকে যেতেই। পিস্তলটা হাত থেকে খসে চলে গেল একটা অ্যাকুয়ারিয়াম বসানো টেবিলের নিচে। নাক থেকে রক্ত বেরিয়ে ভেজা মেঝে লাল হয়ে গেল বেশ খানিকটা জায়গা। চোখ দুটো আঁধার হয়ে গেছে। বোঁ বোঁ করে ঘুরছে মাথাটা। তবুও উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সে।

ততক্ষণে আরও কয়েকজন লোক এসে উপস্থিত হয়েছে। মোহাম্মদ জানকে কাবু করে ফেলে হাত দুটো বাঁধা হয়ে গেছে পেছনে। বাঘের বাচ্চার মত গজরাচ্ছে আর ছটফট করছে মোহাম্মদ জান বাঁধন খুলবার ব্যর্থ চেষ্টায়। রানাকেও বেঁধে ফেলা হলো।

কয়েকবার মিট মিট করে চোখের পাতা থেকে পানি সরিয়ে চারদিকে চাইল রানা। বুকের কাছে শার্টের ওপর রক্ত পড়ছে এখনও নাক থেকে টপ্ টপ্। তিন দিক থেকে তিনটে রিভলভার ধরা ওর দিকে। ম্যানেজার উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে একটু বাঁকা হয়ে। এক হাতে ঘষছে লাথি খাওয়া জায়গাটা।

'আগে বাঢ়ো।'

হুকুম করল একজন পেছন থেকে। এগোল ওরা পিছনের ধাক্কায়। কিছুদূর গিয়েই ছোট একটা কামরায় ঢুকল ওদের নিয়ে সব ক'জন। ঘরটা আট ফুট বাই আট ফুট হবে। সাতও হতে পারে। স্টোর রুম মনে হলো। দেয়ালের গায়ে বসানো কয়েকটা বড় সাইজের কাঁচের আলমারি—ভেতরে নানান আকারের বিচিত্র কারুকার্য খচিত সামুদ্রিক ঝিনুক আর শঙ্খ। চার কোণে চারটে অ্যাকুয়ারিয়াম—গায়ে ইংরেজিতে লেখা 'সাবধান! বিষাক্ত মাছ।' একটা জারে বিষাক্ত স্করপিয়ন আর লায়ন ফিশ দেখে চিনতে পারল রানা। ফ্লোরেসেন্ট টিউব জ্বলছে ঘরের মধ্যে।

একটা বিষাক্ত মাছের অ্যাকুয়ারিয়ামের আড়ালে গোপন করা সুইচ টিপল একজন। নামতে আরম্ভ করল ওরা নিচে। রানা বুঝল, ওটা একটা লিফট। মাটির তলায় নিশ্চয়ই আরও ব্যাপার স্যাপার আছে। স্টোর রুম দেখে কেউ ভাবতেও পারবে না যে এটাই মাটির তলায় গোপন আড্ডায় যাওয়ার পথ।

নিচে এসে থামল লিফট। বেরিয়ে এল ওরা বাইরে। চারফুট চওড়া রাস্তা। ডান দিকে অল্পদূর গিয়ে আটফুটি রাস্তায় পড়ল ওরা। কিছুদূর পরপর শেড-বিহীন বাল্ব ঝুলছে সিলিং থেকে। মাটির নিচে গোলক ধাঁধার পাতাল পুরী তৈরি করেছে স্বর্ণমৃগ। গলির দু'পাশে সারি সারি ঘর। এ-গলি, ও-গলি পার হয়ে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর থামল ওরা একটা মোড়ের ওপর। এতক্ষণে মুখ খুলল একজন।

'এবার দু'জন দু'দিকে। শেষ বিদায় নিয়ে নিতে পারো।'

মোহাম্মদ জানের দিকে চেয়ে হাসল রানা। দাঁতে রক্ত। বলল, 'ভাগ্যিস পুলিসে খবর দিয়ে ঢুকেছিলাম এখানে!'

'হ্যাঁ, দশ মিনিটেই হাত কড়া পড়বে ব্যাটাদের হাতে। এতক্ষণে চারদিক ঘিরে ফেলেছে নিশ্চয়ই। আচ্ছা, দেখা হবে।' কথাটা শেষ করেই একটা ধাক্কা খেয়ে বাঁয়ে এগোল মোহাম্মদ জান। চারজন গেল সঙ্গে।

এই মিথ্যে কথায় কোনও রকম চাঞ্চল্য দেখা গেল না ওদের কারও মধ্যে।

একজন হুকুম করল, 'নাথু, তুমি জনা দুই লোক নিয়ে পেছনের পথ দিয়ে বেরোও। রাস্তায় দাঁড়ানো ড্রাইভারকে ধরে প্রথমে আচ্ছামত দুরমুজ করবে, তারপর নিয়ে আসবে ভেতরে। গাড়িটা একজন নিয়ে গিয়ে নুমায়েশ বা গুরুমান্দারের কাছে রেখে আসবে। কিংবা হোটেল মেট্রোপোলের সামনে পার্ক করে রেখে আসতে পারো।'

'আর তুমি এদিকে,' ধাক্কা দিল পেছনের লোকটা রানাকে।

আবার কয়েকটা গলি পেরিয়ে একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেল টিপল একজন। ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজা। দরজার ফাঁক জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে গুংগা।

চমকে উঠল রানা। বীভৎস চেহারা। শুধু ল্যাংগোঠ ছাড়া কিছুই নেই সারা

দেহে। রানাকে দেখেই ছোট ছোট চোখগুলো জ্বলজ্বল করে উঠল গুংগার। ঘড়-ঘড় করে একটা শব্দ বেরোল ওর মুখ দিয়ে। থাবা দিয়ে এক হাতে ধরল সে রানার চুল। রানার ঊরুর সমান মোটা পেশীবহুল সে হাত। অন্য হাতের ইশারায় লোকগুলোকে বিদায় দিয়ে চুলের মুঠি ধরে প্রায় ঝোলাতে ঝোলাতে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল পাশের ঘরে।

সাজানো গোছানো একটা প্রশস্ত ড্রইংরুম। সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিল একজন লোক, পায়ের শব্দে কাগজটা নামাল মুখের সামনে থেকে।

ওয়ালী আহমেদ।

'আসুন। আসুন, মিস্টার মাসুদ রানা। বসুন ওই সোফায়।'

রানাকে বসতে হলো না। বসিয়ে দিল গুংগা চুলের মুঠি ধরে। তার আগেই পেছন দিকে জোরে একটা লাথি চালাল রানা। হাঁটুর নিচে হাড়ের ওপর গিয়ে লাগল স্টীলের পাত বসানো জুতোর গোড়ালি। আর কেউ হলে বাবা-গো, মা-গো বলে বসে পড়ত মাটিতে। কিন্তু আশ্চর্য, একবিন্দু বিচলিত হলো না গুংগা।

'বৃথা চেষ্টা, মিস্টার মাসুদ রানা। ওর শরীর হচ্ছে পেটা লোহা। ও-সবে ওর কিছুই হবে না,' বলল ওয়ালী আহমেদ। 'প্রতিদিন সকালে দু'জন জোয়ান প্যাহেলওয়ান ওর সর্বাঙ্গ মুগুর-পেটা করে মাটিতে শুইয়ে নিয়ে। সে দৃশ্য দেখলে এই সামান্য প্রয়াসে লজ্জা হত আপনার। গত বিশ বছর ধরে এই রুটিন চলে আসছে। এখন এসব সামান্য আঘাত তো কিছুই নয়, তীক্ষ্ণ ছুরির ফলা বা পিস্তলের গুলিও ওর শরীরে প্রবেশ করানো শক্ত।'

কথাটা শেষ করেই মুখ দিয়ে একটুও শব্দ বের না করে কেবল ঠোঁট নাড়াল ওয়ালী আহমেদ গুংগার উদ্দেশে। রানার সারা দেহ সার্চ করে দেখল গুংগা। রুমাল আর টাকা পয়সা বের করে রাখল নিচু টেবিলের ওপর। কোনও অস্ত্র নেই। হাঁটুর নিচে পায়ের সঙ্গে বাঁধা যে ছোরার খাপ থাকতে পারে সে কথা একবারও চিন্তা করল না সে। সন্তুষ্টচিত্তে রানার হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পিছনে যমদূতের মত।

'আরাম করে বসুন, মিস্টার রানা। আপনার পেছনে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, অসম্ভব দ্রুতগতিতে নড়াচড়া করতে পারে সে। কাজেই কোনও রকম কুমতলব থাকলে বিনা দ্বিধায় পরিত্যাগ করাই আপনার জন্যে মঙ্গলজনক হবে। ওর হাত এড়িয়ে আমার কাছে পৌঁছতে পারবেন না আপনি কোনদিন। তাছাড়া আমার হাতের দিকে লক্ষ করলে ছোট্ট একটা যন্ত্র দেখতে পাবেন। যন্ত্রটা ছোট হলেও যথেষ্ট শক্তিশালী। এটাও প্রস্তুত থাকবে। বুঝতে পেরেছেন? এখন আরাম করে বসে দু'একটা খোশ-গল্প করা যাক, কি বলেন?'

রানা চেয়ে দেখল একটা পয়েন্ট টু-ফাইভ ক্যালিবারের স্কেলিটন-গ্রিপ বেরেটা অটোমেটিক ধরা ওয়ালী আহমেদের হাতে। টেবিলের ওপর থেকে রুমালটা তুলে নাক মুখের শুকিয়ে আসা রক্ত মুছে ফেলল রানা। তারপর হেলান দিয়ে বসল ফোম্ রাবারের নরম সোফায়।

'আপনাকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না, মিস্টার মাসুদ রানা। দুই-দুইবার আপনি আমার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। বুদ্ধিমান এবং সাহসী লোক আপনি। কিন্তু

শেষ পর্যন্ত আমার খাঁচায় ঢুকতেই হলো আপনাকে।'

রানা ভাবছে, তাহলে ওয়ালী আহমেদই স্বর্ণমৃগ? নাকি এটা কোইনসিডেন্স? রানার করাচি আগমনের হেতুটা কি জানতে পেরেছে ওয়ালী আহমেদ?

'আপনার আক্রমণ আমি আরও আগেই আশা করেছিলাম। এত দেরি হলো কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দেরি কোথায়? যেই মাত্র জানলাম আপনার পরিচয়, তক্ষুণি হুকুম দিয়ে দিলাম। আজ ভাগ্যক্রমে দু'বার বেঁচে গেছেন, আমার কিছু বিশ্বস্ত লোকও খুন করে ওভার-ট্রাম্প করেছেন। কিন্তু আরও অনেক ট্রিক্‌স ছিল হাতে। আজ রাত পোহাবার আগেই গেম এবং রাবার করে বসে থাকতাম আমি। যাক্, ভাল হলো, নিজেই ঠিকানা জোগাড় করে এসে উপস্থিত হয়েছেন।'

'এবং আরও অনেকে শিগগিরই উপস্থিত হবেন।'

'এসে লাভ নেই। যদি তাই হয়, গোপন পথে বেরিয়ে যাব আমরা। তেমন প্রয়োজন হলে এই দোকান বন্ধ করে দেব। আমার আসল কাজে কোন অসুবিধে হবে না। যাক, যা বলছিলাম। আজ বিকেলেই স্থির করলাম আমি, আপনাকে ছাড়া আমার চলবে না। আপনার মত বুদ্ধিমান এবং কৌশলী লোককে হয় নিয়ে নিতে হবে আমার সাথে, নয় সরিয়ে ফেলতে হবে চিরতরে। কাজেই খোঁজ নিলাম। আপনি বিকেলে হোটেল থেকে বেরিয়ে যাবার ঠিক দশ মিনিটের মধ্যেই আপনার মৃত্যু পরোয়ানা প্রচার করলাম আমি।' পান মুখে ফেলল সে একটা।

'আমার অপরাধ?'

'আমার পেছনে লাগতে যাওয়াটা অপরাধ বৈকি।' দুই আঙ্গুলে খানিকটা জর্দা টিপে তুলে ফেলে দিল মুখ-বিবরে।

'আপনার জোচ্চুরি ধরে ফেলায় মৃত্যুদণ্ড? সুবিচারই বটে!'

'সেজন্যে নয়। ন্যাকামি করছেন আপনি। আপনি ভাল করেই জানেন, কেন আপনার মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। আজ বিকেলে আমার জুয়া খেলার কৌশল আবিষ্কার করে ফেলায় আপনার ওপর যার-পর-নাই খুশি হয়েছিলাম আমি। সেই মুহূর্তে মনে মনে আপনার বেতন ধার্য করে ফেলেছিলাম। আপনি এখন পাচ্ছেন মাসে দু'হাজার করে—আমি অবশ্য তখন জানতাম না সে-কথা, পরে জেনেছি। আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম আপনাকে মাসে বারো হাজার টাকা বেতন দেব, সেই সাথে হাফ পারসেন্ট কমিশন। অর্থাৎ কোম্পানীর হাজার টাকা লাভ হলে পাঁচ টাকা আপনার। বছর শেষে এই কমিশনই গিয়ে দাঁড়াত দুই লাখে।'

'বাহ্, এ তো চমৎকার অফার! কোন্ বোকা এই সুযোগ ছাড়বে?' টিটকারি মারল রানা।

'কিন্তু দুঃখের বিষয়,' রানার টিটকারিতে কান না দিয়ে বলে চলল ওয়ালী আহমেদ, 'নিরাশ করেছেন আপনি আমাকে। আপনার সম্পর্কে যা তথ্য পাওয়া গেল তাতে দেখা গেল আমার মৃত্যু গহ্বরে প্রবেশ করবার জন্যেই জন্ম হয়েছিল আপনার। আমার জন্যে পাঠানো হয়েছে আপনাকে। আরও খবর নিয়ে জানলাম আজ পর্যন্ত কোনও রকম প্রলোভন দেখিয়েই আপনাকে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করা যায়নি। কাজেই অন্য পথ থাকল না আমার।'

রানা বুঝল সে খোদ স্বর্ণমৃগের সামনে বসে আছে। আর কিছুক্ষণ আগেই যদি বুঝতে পারত! মিনিট খানেক চুপ থেকে নীরবতা ভঙ্গ করল ওয়ালী আহমেদ।

'আপনি বোধহয় ভাবছেন, আর একটু আগে যদি টের পেতেন যে যার জন্যে এতদূর ধাওয়া করে এসেছেন সে হচ্ছে বিখ্যাত শিল্পপতি ওয়ালী আহমেদ, তাহলে...।'

হাসল ওয়ালী আহমেদ।

'এখনও যদি ছেড়ে দিই আপনাকে, সবকিছু জানার পরেও, তাহলেও আপনি আমার গায়ে একটি আঁচড় পর্যন্ত কাটতে পারবেন না। শত চেষ্টা করেও আমার বিরুদ্ধে একটি প্রমাণ জোগাড় করতে পারবেন না।'

'ছেড়ে দিয়েই দেখুন না!' রানা বলল।

উত্তর দিল না ওয়ালী আহমেদ। ইশারা করতেই দেয়াল আলমারির ভেতর থেকে গ্লাস আর বোতল বের করে আনল গুংগা। ততক্ষণ একটি কথাও না বলে পিস্তলটা রানার পেটের দিকে ধরে থাকল ওয়ালী আহমেদ। গ্লাসটা ভরে দিয়ে আবার রানার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল গুংগা। আবার মুখ খুলল ওয়ালী আহমেদ। গুংগার দিকে চোখ ইশারা করে বলল, 'এ আমার এক অদ্ভুত আবিষ্কার, মিস্টার রানা। এবং গর্বের বস্তু। দেখতে নিগ্রোর মত হলেও ও আসলে পাকিস্তানী নাগরিক। মাকরান থেকে সংগ্রহ করেছি ওকে। আফ্রিকার আদিম অধিবাসীর রক্ত আছে ওর দেহে, তাই ও-রকম চেহারা। লোকটা বোবা এবং কালা। সেই কারণেই বোধহয় আশ্চর্য তীক্ষ্ণ ওর ঘ্রাণ এবং দৃষ্টিশক্তি। তাছাড়াও পাথর ছোঁড়ায় অদ্ভুত রকমের দক্ষতা অর্জন করেছে ও। হোটেলের সামনে তিনমনি পাথরটা আজ সন্ধ্যায় ও-ই ফেলেছিল ছাদ থেকে। ও হচ্ছে কিং-কং গরিলার মনুষ্য সংস্করণ। এমন হিংস্র আর ভয়ঙ্কর প্রাণী জীবনে আর চোখে পড়েনি। মাঝে মাঝে একে কন্ট্রোল করা আমার পক্ষেও শক্ত হয়ে পড়ে।'

লালচে চুলের মধ্যে কয়েকবার হাত চালিয়ে নিয়ে আবার বলল, 'আপনাকে এত খাতির যত্ন করে বসিয়ে এসব বাজে গল্প করে আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করছি কেন, তার কারণ বুঝতে পারবেন কিছুক্ষণ পরেই। ততক্ষণ গল্পটা চালু রাখা যাক। আপনার ওপরওয়ালা শুনেছি খুব বুদ্ধিমান লোক, কিন্তু একাজে আপনাকে পাঠিয়ে উনি মস্ত একটা ভুল করেছেন। আপনার সম্পর্কে যা জানা গেল তাতে বুঝলাম দুঃসাহসিক কাজে পারদর্শিতা, সেই সাথে অল্পবিস্তর কৌশল ছাড়া আর কিছুই পুঁজি নেই আপনার। কিন্তু আমাকে সত্যি সত্যি কাবু করতে হলে অন্য রকম লোকের প্রয়োজন ছিল। আপনাকে শেষ করা ছাগল ধরে জবাই করার মতই সহজ কাজ।'

গ্লাসটা তুলে নিল ওয়ালী আহমেদ। শ্যাম্পেন। দুই ঢোক খেয়ে নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর।

'আচ্ছা, মিস্টার ওয়ালী আহমেদ, আমাকে যখন শেষ করে দেয়াই স্থির করেছেন, তখন নিশ্চয়ই আমার দু'একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে কৌতূহল মেটাতে কুণ্ঠিত হবেন না?'

'কি ধরনের প্রশ্ন করবেন তার ওপর নির্ভর করবে আমার উত্তর।'

'মৃত্যুর আগে আমি জানতে চাই, কেন আপনি এত টাকার মালিক হয়েও

আবার এই অসৎ কাজে নামলেন।'

'অসৎ কাজ আমি প্রচুর করি। আপনি কোন্‌টার কথা বলছেন?'

'সোনা চোরাচালান।'

'দেখুন, ওটা অসৎ কাজ নয়—অসৎ কাজের একটা উপায় মাত্র। আমি যত টাকা করেছি সবই অসৎ পথে। এতদিন যেভাবে উপার্জন করেছি তা বাইরে থেকে দেখতে ভদ্র-ব্যবসা মনে হলেও তার মধ্যে এতখানি অসততা আছে যে ধরা পড়লে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এমনকি ফাঁসী পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। এটাই আমার লাইন। চিরকাল এ-ই করেছি, ভবিষ্যতেও করব। যত টাকাই হোক না কেন, কেউ আমাকে বিপথ থেকে ফেরাতে পারবে না। আমি বর্ণ-ক্রিমিনাল। চোর পিতার ঔরসে সিফিলিস রোগাক্রান্ত ফকিরণীর গর্ভে আমার জন্ম। শারীরিক কয়েকটা দুর্বলতা থাকলেও প্রতিভা নিয়ে জন্মেছি আমি। যাই হোক আত্মজীবনী শুনতে চাননি আপনি। বলছিলাম, বিপথ আমার ধর্ম। সোনাতে অল্প পরিশ্রমে বেশি লাভ, তাই এদিকে একটা সাইড্ বিজনেস খুলেছি। কিন্তু আমার আসল উদ্দেশ্য এটা নয়। আমি এক মহা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাই। বাছাই করা সব খারাপ লোক নিয়ে গড়ব আমি আমার এই আণ্ডারগ্রাউণ্ড সোসাইটি। টাকা আমার যথেষ্ট আছে, এবার আমি চাই ক্ষমতা অর্জন করতে । অপরাধ জগতে আমি সম্রাট হয়ে মরতে চাই। আমি সোনা চালান দিচ্ছি…।'

'কি ভাবে?'

হঠাৎ হেসে উঠল ওয়ালী আহমেদ। বেরিয়ে পড়ল এক সারি তরমুজের বিচি। শ্যাম্পেন শেষ হয়ে গিয়েছে—পান মুখে ফেলল সে আরেকটা । সেই সাথে জর্দা।

'আপনি দেখছি বাঁচার আশা ত্যাগ করেননি এখনও! ভাবছেন, আপনাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে আমার গোপনতম কথা বলতে দ্বিধা করব না আমি ; আর চিরকাল যেমন হয়েছে, তেমনি দৈবক্রমে ছাড়া পেয়ে যাবেন আপনি। আর ছাড়া পেয়েই সমূলে ধ্বংস করে ফেলবেন আমাকে। তাই না? থ্রিল সিরিজের আইডিয়াল নায়ক। আমি আপনাকে এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি, মিস্টার রানা, আমার হাত থেকে মুক্তি লাভ করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু তবু আমি একটি কথাও বলব না আপনাকে। আপনার লাশের কানে কানে হয়তো বলতে পারি, কিন্তু জ্যান্ত থাকতে এই গোপন কথা জানবার অধিকার নেই কারও।'

'তার মানে আপনার মনেও ভয় আছে যে চিরকাল যেমন হয়েছে, তেমনি এবারও আপনার হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে পারি আমি?'

'তা ঠিক নয়। সাবধানের মার নেই।'

এমন সময় টিপয়ের ওপর রাখা টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার কানে তুলে হুঁ-হাঁ করল ওয়ালী আহমেদ কিছুক্ষণ। কথা বলল না একটিও, শুনে গেল কেবল। খুশি খুশি হয়ে উঠল ওর চোখ-মুখ। বসন্তের বুটি-বুটি দাগ ভরা গাল দুটো কুঁচকে গেল মুচকি হাসিতে। নামিয়ে রেখে দিল সে রিসিভার।

'আমাকে না হয় হত্যা করবেন। মোহাম্মদ জান কি দোষটা করেছে? ওকে আটকে রেখেছেন কেন?' রানা বলল।

'ও-ই আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে।'

'মিথ্যে কথা। আমিই এনেছিলাম ওকে সাথে করে।'

'যাই হোক, যদি বুঝি তেমন কোনও ক্ষতি করতে পারবে না ও, তাহলে জানে মারব না। হালকা কোনও শাস্তি দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেব। আপাতত ক'দিন বন্দী থাকতে হবে ওকে।'

মেলা কথায় বিরক্ত হয়ে উঠছে রানা। সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল, 'এখন আমাকে নিয়ে কি করতে চান, মি. ওয়ালী আহমেদ?'

'আপনাকে দিয়ে আমার দুটো উদ্দেশ্য আমি পূরণ করব। এক এক করে বলছি। প্রথমটা হচ্ছে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা। আপনি বোধহয় শুনেছেন জিনাতের কাছে, আমি কামনা করেছিলাম ওকে। আমাকে অবহেলা করে ও গিয়েছে আপনার কাছে। এর ফলে আমার আহত আত্মাভিমান অপমানে জর্জরিত হয়েছে। আমাকে বেকায়দায় ফেলে টাকা আদায় করে আপনারা যে প্রাণখোলা হাসি হেসেছিলেন, সে হাসি সূচের মত বিঁধেছে আমার মনে। প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলেছি আমি।' ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল ওয়ালী আহমেদের চেহারা। 'তাই আপনার চোখের সামনে টরচার করবে জিনাতকে আমার দেহরক্ষী গুংগা প্যাহেলওয়ান। মেয়েদেরকে নির্যাতন করার ব্যাপারে বরাবর আমার খুবই উৎসাহ আছে। পারভারটেড্ বলতে পারেন—কিন্তু গুংগাকে আসরে নামিয়ে দিয়ে দর্শকের গ্যালারিতে বসে আমি যার-পর-নাই আনন্দ লাভ করি। আপনিও থাকবেন আমার সাথে আজ।'

'আজ?' চমকে উঠল রানা।

'হ্যাঁ। আজ। জিনাতকে আনতে পাঠিয়েছি। এসে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

'অসম্ভব!'

'খুবই সম্ভব। নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।'

'জিনাত এখন তার বাপের বাড়িতে নিরাপদে আছে। ওকে রক্ষা করবার জন্যে যথেষ্ট সশস্ত্র লোক আছে ও বাড়িতে।'

'জানি। আমার ক্ষমতা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই আপনার—তাই আপনার এই সন্দেহ প্রকাশ করবার ধৃষ্টতা ক্ষমা করে দিচ্ছি। জিনাতকে ওই-বাড়ি থেকে বের করে আনা অত্যন্ত সহজ কাজ। মাত্র তিনজন লোক পাঠিয়েছি। সাথে নিয়ে গেছে একখানা বড় সাইজের রেডিওগ্রাম। কলিং বেল টিপলে বেরিয়ে আসবে বাইরে মোহাম্মদ জানের লোক। তাকে বলা হবে আগামী কাল জিনাত সুলতানার জন্মদিন উপলক্ষে ওটা মাসুদ রানার উপহার। কেউ কিছুমাত্র সন্দেহ করবে না। কাঠের ডালা তুলে দেখানো হবে অত্যন্ত দামী রেডিওগ্রামের কিছুটা অংশ। সাদরে ডেকে নিয়ে যাবে জিনাত ওদেরকে ওর ঘরে। রেডিওগ্রামটা পছন্দসই জায়গায় ফিট করে দেবে আমার লোক। তারপর ফেরার সময় সেই কাঠের বাক্সের মধ্যে করে নিয়ে আসবে জিনাতের জ্ঞানহীন দেহটা সবার সামনে দিয়ে। এবার বুঝেছেন?'

বিস্মিত দুই চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে রানা ওয়ালী আহমেদের মুখের দিকে। কয়েকটা খারাপ গালাগালি বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। গালি শুনে তরমুজের বিচি বের করে হাসল ওয়ালী আহমেদ, গায়ে মাখল না। পায়ে বাঁধা ছুরিটার কথা মনে হলো রানার। কিন্তু না। এখন স্থির থাকতে হবে। এখনও সময় আছে।

'আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন থেকে জোগাড় করা

আমার হাজার কয়েক প্রিয় মাছ বহুদিন মুখরোচক খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে, ওদের একটু আনন্দ দান করা। নির্যাতনের পর জিনাতের দেহটা আপনার দেহের সঙ্গে একসাথে পেঁচিয়ে বেঁধে নামিয়ে দেয়া হবে পানিতে। আমি স্টপ-ওয়াচ নিয়ে থাকব কাছেই। ব্যাপারটা অনেকটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার মত আর কি। এ ব্যাপারেও আমার উৎসাহের অভাব নেই। উজ্জ্বল বাতি থাকবে ট্যাঙ্কের ওপর। পরিষ্কার দেখা যাবে আপনাদের দেহ। আমার নিজের বিশ্বাস স্ত্রীলোকের চাইতে পুরুষের মাংসই ওরা বেশি পছন্দ করে। সেই পরীক্ষাও হয়ে যাবে এই ফাঁকে। তবে আমার স্থির বিশ্বাস কোনও অবস্থাতেই তিন মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। সেটাও আজই বোঝা যাবে।'

'হাঙ্গর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনি একটা গর্দভ। হাজার হাজার হাঙ্গর পুষব কি করে আমি? এত খাবারই বা দেব কোত্থেকে? আর এজন্যে দক্ষিণ আমেরিকাতেই বা যাব কেন? এটা খুব ছোট মাছ। ছয় থেকে আট ইঞ্চি। শতখানেক এনেছিলাম শখ করে। এখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্রীড করিয়েছি। এখন আমার স্টকে আছে পনেরো হাজার।'

'পিরান্হা!' গলাটা শুকিয়ে এল রানার।

'ঠিক বলেছেন। পিরান্হা। ক্ষুরের মত ধারাল দাঁত দিয়ে পাঁচ মিনিটেই একটা আস্ত ঘোড়া খতম করে দেয় ঝাঁকের মধ্যে বাগে পেলে।'

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। অসম্ভব। নিশ্চয়ই খামোকা ভয় দেখাবার জন্যে বোম্বাস্টিক গুল মারছে ওয়ালী আহমেদ। এক ধরনের ম্যানিয়াতে ভুগছে লোকটা। কিছুতেই এসব সত্যি হতে পারে না। এ হচ্ছে ওর বিকৃত মস্তিকের বিকারগ্রস্ত প্রলাপ। কিন্তু যদি সত্যি হয়…

'এবার আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে ক্ষমা করতে হবে, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনাকে এক্ষুণি 'টরচার চেম্বারে' নিয়ে যাবে গুংগা। অল্পক্ষণের মধ্যেই জিনাতও এসে পড়বে। আমি কিছু হাতের কাজ সেরেই আসছি।'

নিঃশব্দে আবার কিছু বলল ওয়ালী আহমেদ গুংগাকে। মাথা নাড়ল গুংগা। তারপর ইঙ্গিত করল রানাকে উঠে দাঁড়াবার জন্যে। বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। টেবিলের ওপর থেকে টাকা ও রুমাল তুলে আবার পকেটে চালান দিল রানা। তারপর উঠে দাঁড়াল বিনা বাক্যব্যয়ে। দেখল এখনও ওর দিকে ধরা আছে ওয়ালী আহমেদের হাতের পিস্তলটা। শেষ চেষ্টা একবার করতেই হবে—কিন্তু এখন নয়।

পিছন থেকে গুংগার হাতের মৃদু ঠেলা খেয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল রানা। আবার সেই চারফুটি এবং আটফুটি করিডর ধরে এগিয়ে গেল ওরা। শেডহীন বালবগুলোকে উলঙ্গ লাগল রানার কাছে। প্রতিধ্বনি উঠল ওর জুতোর শব্দের। এই গোলক ধাঁধার মত রাস্তায় উত্তর-দক্ষিণ পুব-পশ্চিম ঠিক রাখতে পারল না সে। এদিকটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার। আবছা অন্ধকারে একটা ঘরে চাবি লাগাল গুংগা। আর সেই সুযোগে আলগোছে পায়ে বাঁধা খাপ থেকে ছুরিটা বের করে পকেটে ফেলল রানা। ঝাঁপিয়ে পড়বে কিনা ভাবছিল, কিন্তু গুংগা ততক্ষণে আবার থাবা চালিয়েছে চুলের ওপর। রানা মনে মনে ভাবল, যত খারাপই দেখাক, এ-যাত্রা যদি রক্ষা পায় তাহলে ক্রু-কাট করে রাখবে মাথার চুল।

একটা সুন্দর ডাবলসাইজের খাট পাতা রয়েছে আলোকোজ্জ্বল ঘরটার এককোণে। দামী কাভারে ঢাকা। ওদিকে পাঁচ ছ'টা চেয়ার খাটের দিকে মুখ করা। একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল গুংগা রানাকে। হাতলের ওপর হাত রেখেই বুঝল সে, আলগা ওটা। জোরে হেঁচ্‌কা টান দিলে খুলে আসার সম্ভাবনা আছে। যদিও এই সামান্য অস্ত্র দিয়ে এই পাহাড়-প্রমাণ দৈত্যকে ঘায়েল করার চেষ্টা করা ছেলেমানুষী, কিন্তু এছাড়া উপায়ই বা কি? এরপর আর কোনও সুযোগ না-ও আসতে পারে।

এটাই তাহলে টরচার চেম্বার! কি পৈশাচিক বিকৃতি। এই দানব জিনাত সুলতানাকে নির্যাতন করবে, ছট্‌ফট্ করতে থাকবে নিরুপায় জিনাত রানার চোখের সামনে, চিন্তা করতেই রানার মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল। প্রাণ থাকতে এ দৃশ্য দেখতে পারবে না সে। তার আগে এর হাতে শেষ হয়ে যাওয়াও ভাল।

পিছন ফিরে বিছানার দিকে এগোচ্ছিল গুংগা। এক টানে মড়াৎ করে ভেঙে ফেলল রানা চেয়ারের হাতলটা। গুংগার কানে সে-শব্দ পৌঁছল না। কিন্তু পকেট থেকে ছুরি বের করে উঠে দাঁড়াতেই ঘরের মধ্যে যে সামান্য একটু আলো-ছায়ার পরিবর্তন হলো তাতেই বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়াল সে।

মাঝপথে একবার ঝিক্ করে উঠল তীক্ষ্ণধার ছুরিটা।

## দশ

ভয় কাকে বলে বুঝল মাসুদ রানা আজ। শুনেছে সে, প্রাণভয়ে কেউ দৌড় দিলে হানড্রেড মিটার স্প্রিন্টের রেকর্ড হোল্ডার ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ানও তার কাছে নস্যি। গল্পের বইয়ে পড়েছে প্রাণভয়ে ভীত মানুষ অদ্ভুত সব কাজ করে বসেছে : বারো ফুট উঁচু দেয়াল টপকে চলে গেছে ওপারে, বাঁকিয়ে ফেলেছে মোটা লোহার শিক। আজ বুঝল সে-কথার মধ্যে কিছুটা হলেও সত্যতা আছে, একেবারে গাঁজাখুরি নয়।

সোজা গিয়ে বিঁধল ছুরিটা গুংগার বুকে।

আশ্চর্য! আধ ইঞ্চিও ঢুকল না ছুরি ওর গায়ে। সামান্য একটু বিঁধে বাঁটটা ঝুলতে থাকল নাভির কাছে। এক মুহূর্ত সময় লাগল গুংগার বিস্ময় সামলাতে। কিন্তু তারই মধ্যে লাফ দিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে রানা। দড়াম করে লাগল চেয়ারের ভাঙা হাতলটা গুংগার নাক বরাবর। যত মুগুর পেটা শরীরই হোক না কেন, এই প্রচণ্ড আঘাতে নাকের জল আর চোখের জল এক হয়ে গেল গুংগার। হাত দিয়ে নাক ঢেকে ফেলায় মনে হলো দ্বিতীয় বাড়িটা পড়ল গিয়ে কাঠের ওপর। তৃতীয় বার আঘাতের চেষ্টা না করে খোলা দরজা দিয়ে ছুটল রানা। দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই পেছনে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল। ছুটতে ছুটতে একবার পিছন ফিরে চাইল রানা আস্ত একটা পাহাড় ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে ওর দিকে।

নিস্তার নেই, বুঝল রানা। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুঁড়ে মারল হাতলটা। একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি যেন লাগল গিয়ে গুংগার গায়ে। ঠক্ করে ঊরুতে লেগে ছিট্‌কে চলে গেল হাতলটা একদিকে। গতি কমল না একটুও।

আবার ছুটল রানা। এঁকেবেঁকে এ-গলি ও-গলি, এ-বাঁক ও-বাঁক ঘুরে ছুটল

গুংগার কাছ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে। এই গোলক ধাঁধার কি শেষ নেই? পেছনে গুংগার ক্রুদ্ধ গর্জন। ব্লাড হাউণ্ডের মত গন্ধ শুঁকে এগিয়ে আসছে সে। হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে কুঁকড়ে বসে পড়তে ইচ্ছে করল রানার।

একটা বাঁক ঘুরেই পর পর দুটো ঘরের দরজা খোলা, ভারি পর্দা ঝুলছে। চট্ করে দ্বিতীয় ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল রানা। খালিঘর। পর্দাটা দুলছে, হাত দিয়ে ধরে স্থির করে দিল। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকল ঘরের ভেতর।

সামনে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল গুংগা। একটা দমকা হাওয়া পর্দা দুলিয়ে দিয়ে ঘরের ভেতর প্রবেশ করল। থপ্ থপ্ পায়ের শব্দ দূরে চলে গেল। রানা ভাবল, দৌড়ের ঝোঁকে কিছুদূর এইভাবে চলে যাবে গুংগা, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে ওর বেশি দেরি হবে না। এক্ষুণি আবার ফিরে আসবে ও সামনে তাকে দেখতে না পেয়ে।

ঘরের চারদিকে চাইল রানা। কিছুই নেই যা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অনেকগুলো শামুক স্তূপ করা আছে এককোণে, আর কয়েকটা ছোট ছোট জাল। আর কিছুই নেই ঘরটায়। হঠাৎ দরজার কোণে চৌকাঠের সঙ্গে ঝোলানো একটা লোহার রডের দিকে দৃষ্টি পড়ল রানার। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করবার হুড়কো, একদিক চৌকাঠের সাথে আটকানো। অসুরের শক্তি এসে গেল রানার দেহে দূর থেকে গুংগার থপ্ থপ্ পায়ের শব্দ ফিরে আসতে শুনে। দুই হ্যাঁচকা টানে খুলে এল রডটা কব্জা থেকে। অনেকটা কাছে এসে গেছে গুংগার পায়ের শব্দ। বেরিয়েই ছুট দিল রানা।

রানাকে দেখতে পেয়ে হুঙ্কার ছাড়ল গুংগা। তুফানের মত এগিয়ে আসছে এবার। বিশাল বুকটা শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে দ্রুত ওঠা-নামা করছে। বাঁক ঘুরতেই দেখল রানা একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল দু'জন লোক। বেরিয়েই রানা যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকেই রওনা হচ্ছিল ওরা, পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়াল। মরিয়া হয়ে এগোল রানা। প্রস্তুত হবার আগেই বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল সে লোক দুটোর ওপর। মাথার ওপর রডের বাড়ি খেয়েই 'ইয়াল্লা' বলে বসে পড়ল একজন। দ্বিতীয়জন ধরে ফেলল রডটা। প্রচণ্ড এক লাথি চালাল রানা ওর তলপেটে। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল শরীরটা। তারপর একটা নক্আউট পাঞ্চে ছিট্কে পড়ল দেয়ালের ওপর।

আর পনেরো হাত দূরে এখন গুংগা। আবার ছুটল রানা। অল্পদূর গিয়েই একটা বাঁক। বাঁকটা ঘুরেই আর না এগিয়ে বসে পড়ল সে মাটিতে। তারপর লোহার রডটা ওপাশের দেয়ালে নৌকার বৈঠার মত ঠেকিয়ে শক্ত করে ধরে বসে থাকল। উত্তেজনায় দাঁত বেরিয়ে গেছে রানার, ঠোঁটের দুই কোণ পিছিয়ে এসেছে কিছুটা।

তিন সেকেণ্ড পরেই তুফানের বেগে বাঁক ঘুরল গুংগা। রানাকে দেখতে পেল না। পা দিল সে রানার ফাঁদে সম্পূর্ণ অসতর্ক অবস্থায়। গুংগার পায়ের বাড়ি লেগে রানার হাত থেকে ছিটকে বহুদূরে চলে গেল রডটা। সেই সাথে দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল গুংগা। তুমুল গতিবেগ সামলাতে না পেরে উল্টে পাল্টে দেয়ালে ঠোকর খেয়ে বেশ খানিক দূরে গিয়ে থামল ওর দেহটা ঘাড় গুঁজে।

বুকের ভেতর একটা অদম্য আবেগ অনুভব করল রানা। জয়ের উল্লাসে চিৎকার

করে উঠতে ইচ্ছে করল ওর। পর-মুহূর্তেই শিউরে উঠল সে। প্রাণ উড়ে গেল ভয়ে। আশ্চর্য! আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে দানবটা!এই পতনের ফলে কিছুই হয়নি যেন ওর।

এইবার? আর রক্ষা নেই। খোদা! ধরা পড়তেই হলো!

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে আরম্ভ করল রানা। পৌঁছল যে-ঘরটা থেকে লোক দু'জন বেরিয়েছিল, সেই ঘরের সামনে। ঘরে ঢুকেই বুঝল ওর আন্দাজটা ঠিক। চিনতে পারল ঘরটা। টিপে দিল বোতাম।

গুংগার ক্রুদ্ধ গর্জন কানে এল। দ্রুত ওপরে উঠে এল লিফট। এই পথ দিয়েই নামানো হয়েছিল ওদের। লাফিয়ে বেরিয়ে এল রানা লিফট থেকে।

দোকানটা খালি। থরে থরে সাজানো রয়েছে অ্যাকুয়ারিয়াম। নিশ্চিন্ত মনে তার মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে মাছগুলো। নিঃশব্দে। কোনও ভয় নেই, ভাবনা নেই। এত ঘটনার কোন খবরই রাখে না ওরা।

টেবিলের তলায় রানার ল্যাগারটা নেই। এখন? রানা লক্ষ করেছে, ও লিফট থেকে বেরোতেই আবার নিচে নেমে গিয়েছে লিফট। এখনই উঠে আসবে গুংগা। কোন্ দিকে যাবে সে এখন? দোকানের কোলাপসিবল গেট বাইরে থেকে নিশ্চয়ই তালা মারা। ওদিকে গিয়ে লাভ নেই। ছুটল রানা শো-রুমের দিকে। অ্যাকুয়ারিয়ামের ফাঁক দিয়ে এক ঝলক দেখা গেল গুংগার ভয়ঙ্কর মুখটা। ধক্ ধক্ করে জ্বলছে ওর ছোট ছোট চোখ দুটো। মুখটা কুঁচকে গেছে এক পৈশাচিক আক্রোশে। কালো পর্দা ছিঁড়ে ঢুকে পড়ল রানা শো-রুমের ভিতর।

কাঁচের ভিতর থেকে পরিষ্কার ফুটপাথ দেখতে পেল রানা। রাত কত হয়েছে? বারোটার বেশি নিশ্চয়ই নয়। এখনও হয়তো ট্যাক্সি পাওয়া যেতে পারে। ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে পড়ল শো-রুমের কাঁচ রানার এক লাথিতে। লোহার ফ্রেম থেকে খানিকটা প্লাস্টার খসে পড়ল নিচে। একলাফে বাইরে বেরিয়ে এল রানা। ভাঙা কাঁচের টুকরো লেগে কেটে গেছে কপাল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে,হাঁপাচ্ছে সে হাপরের মত। বাইরে ঠাণ্ডা বাতাসে বেরিয়ে এসে নতুন প্রাণশক্তি ফিরে পেল সে। ফুটপাথ ধরে ছুটল বাম দিকে।

গাড়ি আসছে না একটা? খুশি হয়ে উঠল রানার মন। যাক্ এ-যাত্রা বেঁচে গেল তাহলে। আধঘন্টার মধ্যেই ফিরে আসবে সে ফোর্স নিয়ে—বারোটা বাজাবে এদের হাতেনাতে ধরে।

একটা গাড়ি আসছে সামনে থেকে এই দিকে। কাছে এসে পড়েছে। রাস্তায় নেমে হাত দেখাল রানা।

ডাকাতের মত চেহারার একটা লোককে মাঝ রাত্তিরে এভাবে হাত তুলতে দেখে ভড়কে গেল ড্রাইভার। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ভোঁ করে বেরিয়ে গেল সে রানার পাশ দিয়ে বাউলি কেটে। অ্যাক্সিলারেটর পুরো টিপে ধরেছে সে। লাল রঙের একটা আমেরিকান গাড়ি।

অতি দুঃখেও হাসি পেল রানার। কিন্তু পরমুহূর্তেই মিলিয়ে গেল সে হাসি। পেছন ফিরে দেখল সে শো-রুমের ভাঙা কাঁচের মধ্যে দিয়ে ফুটপাথের ওপর বেরিয়ে এসেছে গুংগা।

আঁৎকে উঠে আবার ছুটল রানা। পেছনে গুংগা। আধ মিনিট ছুটবার পর পেছন

দিক থেকে জ্বলে উঠল আরেকটা গাড়ির হেড লাইট। গুংগার ছায়াটা বিকট দেখাচ্ছে সে আলোতে।

এই অবস্থায় গাড়িকে থামতে বললেও যে থামবে না, ভাল করেই জানা আছে রানার। তাই মিছে সময় নষ্ট না করে প্রাণপণে দৌড়ে চলল ও। টপ টপ ঘাম পড়ছে কালো পিচের রাস্তার ওপর। বিশ হাত পেছনে গুংগা। আর আধ মিনিটেই ধরা পড়ে যাবে রানা। কিন্তু যতক্ষণ দেহে শক্তি আছে, এগোতে হবে। আশ্চর্য! একটা পুলিস বা নাইট গার্ড নেই কেন! এতবড় একটা শহরের উন্মুক্ত রাজপথের ওপর খুন করা হচ্ছে ওকে, কারও কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাবে না সে?

রানার পাশ কাটিয়ে কয়েক হাত সামনে এগিয়েই হঠাৎ ব্রেক কষল গাড়িটা। ঝটাং করে খুলে গেল এদিকের দরজা।

'জলদি উঠে পড়ো, রানা! কুইক্!'

পরিষ্কার ইংরাজিতে বলল কেউ গাড়ির ভেতর থেকে। নারী কণ্ঠ। রানা দেখল সেই আমেরিকান গাড়িটা। বিস্মিত হবার সময় নেই। একলাফে উঠে পড়ল সে ড্রাইভারের পাশের সীটে। অনীতা গিল্‌বার্ট। নিজেই ড্রাইভ করছে। আর কেউ নেই গাড়িতে।

ফার্স্ট গিয়ার দিল অনীতা। কিন্তু এক ইঞ্চিও এগোল না গাড়ি। চট করে রানা দেখে নিল হ্যাণ্ড ব্রেকটা তোলা আছে কিনা। না তো। লাফিয়ে সীট ডিঙিয়ে পেছনের সীটে চলে গেল সে। পেছনের কাঁচ দিয়ে দেখল, যা ভেবেছে তাই। পেছনের বাম্পার টেনে ধরে আছে গুংগা। দূরে রাস্তার ওপর চোখে পড়ল, চারজন লোক দৌড়ে আসছে এদিকে। ওদের লোক, সন্দেহ নেই।

'ব্যাক গিয়ার দাও, অনীতা। পেছন থেকে টেনে ধরেছে গুংগা। খানিকটা পিছিয়ে হ্যাঁচকা টান দিয়ে সামনে চালাতে হবে। পারবে না?'

'তোমার জন্যে সব পারব।'

অবাক চোখে চাইল রানা মেয়েটির দিকে। এই বিপদেও মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে! অবলীলায় রসিকতা করছে। আশ্চর্য মেয়ে তো!

ততক্ষণে ব্যাক গিয়ার দিয়ে জোরে চালিয়ে দিয়েছে অনীতা পিছনে। খানিকটা পিছিয়েই এক ঝটকায় গুংগার হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল ওরা। পাঁচ সেকেণ্ডে স্পীড মিটারের কাঁটা উঠে গেল পঁচিশে, দশ সেকেণ্ডে পঁয়তাল্লিশ। মিলিয়ে গেল পিছনে গুংগার চেহারাটা দুঃস্বপ্নের মত।

হু-হু করে ছুটে চলেছে লাল গাড়িটা নির্জন রাস্তা দিয়ে। সামনে চলে এল রানা। ঠাণ্ডা হাওয়ায় অনেকখানি সুস্থ বোধ করল এবার। হেলান দিয়ে বসে সামনে যতদূর সম্ভব পা ছড়িয়ে দিল।

'তুমি হঠাৎ কোত্থেকে, অনীতা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার এক বোনকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে ফিরছিলাম। সিনেমা স্টার। লাহোর যাচ্ছে। ওরই গাড়ি। তুমি তো প্রথমে আমাকে ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলে একেবারে! পাশ কাটিয়ে ভেগেছিলাম ডাকাত মনে করে। চেনা চেনা লাগছিল, কিন্তু একটু দূরেই যখন গুংগাকে দেখলাম, তখনই বুঝলাম লোকটা তুমি ছাড়া কেউ না। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে আবার এলাম ছুটে।'

'তোমার সাহস আছে বলতে হবে।'

'সাহস দেখাবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি আমি। প্রশংসা করে লজ্জা দেবার চেষ্টা কোরো না। এখানে কি করছিলে শুনি? অবস্থা তো রীতিমত সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল দেখলাম। রেল এঞ্জিনের মত ফোঁস ফোঁস করছিলে গাড়িতে উঠে। ব্যাপার কি? রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছিলে মনে হলো? না, না, এক্ষুণি উত্তর দেয়ার দরকার নেই। আগে বিশ্রাম নিয়ে নাও।'

দপ্ দপ্ করছে রানার কপালের দু'পাশে শিরাগুলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকল সে। আর কান খালি পেয়ে অনর্গল বক বক করতে থাকল অনীতা গিলবার্ট।

'আজই ছুটেছিলে বুঝি প্রতিশোধ নিতে? তুমি দেখছি একেবারে সিনেমার হিরোর মত শিভাল্‌রাস্ হয়ে উঠেছ। ভাবছি তোমার প্রেমেই পড়ে যাব কিনা। একে হ্যাণ্ডসাম্, তার ওপর নারীত্রাতা! রক্ষে আছে আর? কিন্তু দেখো তো, কি বিপদে ফেললাম তোমাকে গায়ে পড়ে সাহায্য চেয়ে! তোমার জন্যেই তো। আমার চাকরিটা ঘুচিয়ে না দিলে আমিই প্রতিশোধ নিতাম সুযোগ মত—তোমার কাছে নাকি-কান্না কানতে যেতাম না। আহা, হিরো বেচারা হাঁপাচ্ছে দেখো!'

হেসে উঠল অনীতা খিল খিল করে। লাইট পোস্টের আলোয় ঝিক করে উঠল সোনা বাঁধানো একটা দাঁত। একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সিগারেট খাও না?'

'খেতাম, ছেড়ে দিয়েছি,' জবাব দিল রানা।

'তাহলে যাও, আমিও ছেড়ে দিলাম,' বলেই ফেলে দিল হাতের সিগারেট।

'এখন যাচ্ছ কোন্‌দিকে, অনীতা? কাছাকাছি কোনও ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ড পাওয়া যাবে না?'

'তুমি যাবে কোথায়? হোটেলে?'

'না। আমার এখন অনেক কাজ পড়ে আছে। এক্ষুণি কয়েক জায়গায় ফোন করা দরকার। তারপর যেতে হবে নাজিমাবাদ। তুমি আমাকে যে কোনও ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে যাও।'

'গাড়িটা হপ্তাখানেক আমার অধীনে থাকছে। এটাকে ট্যাক্সি হিসেবে ব্যবহার করো না এই ক'দিন? আর আমিও গায়ে-পড়া বেহায়া মেয়েলোক—হিরোর সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হই।'

হাসল রানা। মেয়েটির বলিষ্ঠ মানসিকতা মুগ্ধ করতে আরম্ভ করেছে ওকে। অদ্ভুত সহজ, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ অনীতার কথাবার্তা, চালচলন, দৃষ্টিভঙ্গি। কোথাও কোনও আড়ষ্টতা নেই, জটিলতা নেই।

'বেশ। সাতদিন বেঁচে থাকব কিনা কে জানে। আর সাতদিনের মধ্যে আমাকে কোথায় যে ড্রাইভ করে নিয়ে যাবে তুমি তারও ঠিক নেই। তবু অ্যাপয়েন্ট করলাম তোমাকে। আজ আমাকে নাজিমাবাদে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে যাও। কাল বিকেলে এসো হোটেলে। রোজকার মজুরি রোজ। আজকের মজুরি হিসেবে গত দু'দিনের সব ঘটনা সংক্ষেপে বলছি তোমাকে। রাজি?'

'রাজি।'

গল্প শেষ হতেই পৌঁছে গেল ওরা নাজিমাবাদ। বাড়িটা অন্ধকার। কোথাও

কোন আলো নেই দেখে মনটা দমে গেল রানার। অনীতাকে বিদায় দিয়ে কলিং বেল টিপল সে। মিনিট দু'য়েক পর চোখ ডলতে ডলতে বেরিয়ে এল সাঈদ খান।

'চাচাজী কোথায়?' রানাকে একা দেখে জিজ্ঞেস করল সাঈদ। 'গাড়িটাও দেখছি না যে?'

'জিনাত কোথায়?' পাল্টা জিজ্ঞেস করল রানা।

'কেন, ঘুমাচ্ছে ওর ঘরে!' রানার কপালে কাটা দাগ দেখে ঘুমের রেশ কেটে গেল ওর।

'কেউ এসেছিল রেডিওগ্রাম নিয়ে?'

'হ্যাঁ। আপনি পাঠিয়েছিলেন তো? সে তো প্রায় ঘণ্টাখানেক আগেই দিয়ে গেছে। কিন্তু চাচাজী কোথায়?'

'সর্বনাশ হয়ে গেছে, সাঈদ। জিনাতের ঘরটা কোন্‌দিকে?'

সাঈদকে ঠেলে ঢুকে পড়ল রানা ঘরে মধ্যে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সাঈদও এল পিছু পিছু। বলল, 'দোতলায় উঠেই প্রথম ঘরটা। কেন, কি ব্যাপার?'

তিন লাফে দোতলায় উঠে এল রানা। ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা। বাতি জ্বালতেই চোখ পড়ল চমৎকার একখানা রেডিওগ্রামের ওপর। স্টিরিওফোনিক। দাম সাত-আট হাজার টাকার কম হবে না।

কেউ নেই ঘরে। ঘর খালি। বিছানার চাদরে ভাঁজ পড়েনি একটুও। অর্থাৎ কেউ শোয়নি আজ ওই বিছানায়। বাথরুমে খোঁজ করা নিরর্থক, যা বোঝার বুঝে নিয়েছে রানা; তবু একবার দেখে এল সে। সাঈদও এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। একদম বোকা বনে গেছে সে। কিছুই বুঝতে পারছে না। জিনাত গেল কোথায়? তার সাথে রেডিওগ্রামের কি সম্পর্ক? রানাই বা এত রাতে একা এসে হাজির হলো কোত্থেকে? চাচাজী কোথায়? সব প্রশ্ন একসাথে ভিড় করে আসে ওর মনের মধ্যে।

'ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন, মিস্টার রানা।'

'বলছি। তার আগে একটা ফোন করা দরকার। আপনি ছুটে গিয়ে গ্যারেজ থেকে জিপটা বের করুন।'

সাঈদ বুঝল জরুরী ব্যাপার। ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল সে।

একতলার বৈঠকখানায় গিয়ে বসল রানা ফোনের সামনে। একটা সিক্স ডিজিট্ নাম্বারে ডায়াল করল।

'আমি মাসুদ রানা বলছি।...এক্ষুণি পঞ্চাশ জনের আর্মড্ মিলিটারি ফোর্স পাঠাবার ব্যবস্থা করুন এই ঠিকানায়। পেন্সিল নিয়েছেন? লিখুন Fish Emporium, 234 Victoria Road. স্টেনগান আর টর্চ নিলেই চলবে। আমিও আসছি ওখানে। পুরো বিল্ডিংটা ঘিরে ফেলতে বলবেন। আমি এসে বাকি ব্যবস্থা করব। একটি প্রাণীও যেন বেরুতে না পারে। আমার কোড নাম্বার হচ্ছে এম আর নাইন। ঠিক আছে?'

সাঈদ এসে ঢুকল ঘরে। ফোনটা নামিয়ে রেখে রানা বলল, 'চলুন। গাড়িতেই সব কথা বলব।'

'এক সেকেণ্ডে কাপড় পরে আসছি আমি।'

'আমার জন্যে একটা এক্সট্রা রিভলভার আনবেন সাথে করে। আমারটা খোয়া গেছে।'

'আরও লোক নেব?'

'না। দরকার হবে না।'

পথে সমস্ত ঘটনা শুনে পাথরের মত স্থির হয়ে গেল সাঈদ খান। তারই চোখের সামনে দিয়ে জিনাতকে ধরে নিয়ে গেল দুর্বৃত্তেরা, সে কিছুই করতে পারল না! চাচাজীকে কি উত্তর দেবে সে? জিনার কাছেই বা মুখ দেখাবে কি করে? ক্ষোভে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে ওর।

# এগারো

ছট্‌ফট করছে রানা খাঁচায় বন্দী বাঘের মত।

নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে ওকে। একটি প্রাণীরও চিহ্ন পাওয়া যায়নি ফিশ এম্পোরিয়ামে। সব পালিয়েছে। অ্যাকুয়ারিয়াম আছে, মাছও আছে যেমন ছিল ঠিক তেমনি। শুধু মানুষগুলো সব ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছু পাওয়া যায়নি। পাহারা বসিয়ে দিয়ে রাত দুটোর সময় হোটেলে ফিরে এসেছে সে।

এখন কিছুই করবার নেই ওর, সব রকম খবরাখবর নেয়া হয়েছে ওয়ালী আহমেদের সম্পর্কে—সমস্ত সম্ভাব্য জায়গায় খোঁজা হচ্ছে তাকে। রাওয়ালপিণ্ডিতে বেতারে খবর চলে গেছে। ওয়ালী আহমেদের ছদ্মবেশী অনুচরকে (যে পি. আই. এ. করে সন্ধ্যার ফ্লাইটে রওনা হয়েছিল) সম্ভব হলে গ্রেপ্তার করার জন্যে।

কিন্তু বুঝতে পারছে রানা, আজই এক্ষুণি যদি ওয়ালী আহমেদের ওপর চরম আঘাত হানতে পারা না যায় তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে জিনাতের। কিন্তু কোথায় আঘাত করবে? শত্রুর চিহ্নই নেই যে মোকাবিলা করবে। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন সবাই ভোজবাজির মত। জিনাত এবং মোহাম্মদ জানেরও কোনও খবর নেই সেই সাথে।

ঘরের মধ্যে বহুক্ষণ পায়চারি করল রানা। এই নিরুপায় অবস্থায় নিষ্ফল আক্রোশে গজরাতে থাকল সে। সব রাগ কেন জানি গিয়ে পড়ল নিজেরই ওপর। সে-ই এদেরকে টেনে এনেছে এই বিপদের মধ্যে। কেন সে পারছে না? কেন সে পারছে না জিনাতকে রক্ষা করতে, মোহাম্মদ জানকে মুক্ত করে আনতে? তারই জন্যে তো আজ ওদের এই অবস্থা।

ঘণ্টাখানেক এভাবে পায়চারি করার পর স্থির হলো রানা অনেকখানি। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। হু-হু করে বাতাস আসছে সাগর থেকে। সমুদ্রের গর্জনে জিনাতের কান্না।

রানা বুঝল, যা হবার হয়ে গেছে। এখন আপাতত ওর নিজের পরিশ্রান্ত দেহটাকে বিশ্রাম দেয়া ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। কাল নব উদ্যমে এগোতে হবে নতুন পথে। বিশ্রামটা প্রয়োজন। এরকম অস্থির ভাবে সারারাত পায়চারি করে

বেড়ালে নিজেকে আরও দুর্বল করে ফেলা ছাড়া আর কোনও লাভ হচ্ছে না।

ঘরে এসে দুটো স্লীপিং পিল খেয়ে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল রানা বাতি নিভিয়ে। অনেকক্ষণ ছটফট করল বিছানায় শুয়ে, এপাশ ওপাশ ফিরল কমপক্ষে পঞ্চাশবার। ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়ল সে। পাতলা একটা তন্দ্রার ঘোর নামল দু'চোখে।

ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল রানার। রিস্টওয়াচে দেখল পাঁচটা বাজে। সারা শরীর ঘেমে নেয়ে উঠেছে। টিপয়ের ওপর রাখা কাঁচের জার থেকে ঢেলে একগ্লাস ঠাণ্ডা পানি খেলো সে। স্বপ্নের ঘোরটা কাটেনি।

ভাবল, ওয়ালী আহমেদের কথাগুলো অতিরিক্ত রেখাপাত করেছিল মনের ওপর, তাই বোধহয় এ দুঃস্বপ্নটা দেখল সে। স্বপ্নের ঘটনাস্থল হচ্ছে 'টরচার-চেম্বার'। কিন্তু ফিশ্ এম্পোরিয়ামের সমস্ত চেম্বারই এখন মিলিটারির দখলে। কাজেই ঘটনাটা তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল সে মন থেকে। আবার ভাবল, ওই ঘরটা ও দেখেছে বলে ওটারই স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু করাচি শহরের অন্য কোনও একটা ঘরে ঘটনাটা ঘটা কি একেবারেই অসম্ভব?

উঠে বসল রানা বিছানার ওপর। ভোর রাতের স্বপ্ন নাকি ফলে। এতদিন কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলেও আজ কেন জানি মনটা এই কুসংস্কারের প্রতি বিদ্রূপ করতে পারল না।

দর্শকের গ্যালারিতে বসে আছে ওয়ালী আহমেদ। তার পাশে যেখানে রানার বসবার কথা ছিল সেখানে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসানো হয়েছে মোহাম্মদ জানকে।

জিনার তীক্ষ্ণ দীর্ঘস্থায়ী চিৎকারে ঘুম ভেঙে গিয়েছে রানার। জেগে উঠেও কিছুক্ষণ শুনতে পেয়েছে সে চিৎকার। একটু পরেই ভুল ভাঙল। দূর থেকে ভেসে আসছে জাহাজের বাঁশী।

কিন্তু জিনাতের বেদনা-কাতর মুখটা কিছুতেই ভুলতে পারল না রানা। উঠে গিয়ে বাথরুম থেকে চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে এসে আবার বিছানায় উঠতে যাবে, এমন সময় খুট্ করে দরজায় শব্দ হলো একটা।

মনের ভুল ভেবে শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু আবার খুট করে শব্দ হতেই লাফিয়ে উঠে বসল রানা। না, মনের ভুল নয়। রিভলভারটা বের করল সে বালিশের তলা থেকে। করিডরে কয়েকটা দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। পা টিপে এসে দাঁড়াল সে দরজার পাশে। দশ সেকেণ্ড কান পেতে থেকেও আর কোনও শব্দ শুনতে পেল না সে।

নিঃশব্দে বল্টু খুলে এক ঝট্কায় দরজা খুলে বাইরে চাইল সে। হাতে উদ্যত রিভলভার। করিডরটায় কম পাওয়ারের বালব জ্বলছে। হলদে ম্লান আলো। কই, কেউ তো নেই। মানুষ দেখতে পাবে বলে উঁচুতে চেয়েছিল রানা, চোখ নামাতেই দেখতে পেল জিনিসটা। দরজার সামনে রাখা আছে একটা লম্বা কাঠের বাক্স। দুই বাই দেড় বাই ছয় ফুট সাইজ। ওপরে বড় বড় করে লেখা: GRUNDIG.

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল রানার। তবে কি…!

দুটো পেরেক মেরে ডালা আটকানো। ঘরে বাতি জ্বেলে ঠেলে নিয়ে এল রানা

বাক্সটা ঘরের ভেতর। ভারি। রক্তের একটা ধারা এল দরজা দিয়ে ঘরের মাঝখান পর্যন্ত। রক্ত কেন? ডালা ধরে টান দিতেই খুলে এল সেটা। ভেতরে চেয়েই চক্ষুস্থির হয়ে গেল রানার। যা ভেবেছিল তাই। ভেতরে শোয়ানো আছে একটা মানুষের দেহ। সারা দেহে ব্যাণ্ডেজ জড়ানো। রক্তে ভেজা লাল। মৃতদেহ কারও? কার? জিনাত—না মোহাম্মদ জান?

খাবলা খাবলা করে সারা মুখের মাংস খাওয়া—চোখের কোটর দেখা যাচ্ছে, চোখ নেই। নাকের সামনের অংশটুকু নেই। একটু নড়ল মনে হলো না?

দেহটা তুলে নিয়ে বিছানায় শোয়াল রানা। খান মোহাম্মদ জান! বুকের ওপর কান রেখে দুর্বল হার্ট বিট শুনতে পেল রানা। কয়েক পরতা ব্যাণ্ডেজ খুলে দেখল সারা দেহই মুখের মত খাবলে খাওয়া। বাঁচানো যাবে না। জ্ঞান আছে কিনা দেখার জন্যে ডাকল রানা একবার নাম ধরে।

হঠাৎ নড়ে উঠল খান মোহাম্মদ জানের মুমূর্ষু দেহটা।

'কে, মেজর?' দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মোহাম্মদ জান। গলার ভেতর তার আসন্ন মৃত্যুর ঘড়ঘড় শব্দ। এ শব্দ রানা চেনে। এটা মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ।

'হ্যাঁ! মাসুদ রানা, সর্দার!' ব্যগ্র কণ্ঠে বলল রানা।

'তোমার জন্যেই এখনও বেঁচে আছি আমি, রানা। জ্ঞান হারাইনি।'

'এ অবস্থা কি করে হলো আপনার?'

এই কথার উত্তর দিল না মোহাম্মদ জান। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষ কথা বলার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করল। তারপর ফিশ ফিশ করে বলল। 'প্রতিশোধ! প্রতিশোধ নিয়ো, রানা!'

'ঠিকানা বলতে পারবেন?'

'জিনাতকে···জিনাতকে ওরা—'

'আমি জানি সে কথা। ঠিকানা। ঠিকানাটা বলুন!' মুখের কাছে কান নিয়ে গেল রানা। কিন্তু কথা আটকে গেল মোহাম্মদ জানের। উত্তর দিতে পারল না। মুখ দিয়ে ভুড়ভুড়ির মত গ্যাঁজলা বেরোল খানিকটা। কেঁপে উঠল শরীরটা দু'বার। তারপর স্থির হয়ে গেল। রানা বুঝল, সব শেষ।

টেলিফোন রিসিভারটা তুলে নিল সে। কয়েকবার রিং হতেই ওপাশে রিসিভার তুলল সাঈদ খান।

'সাঈদ?'

'জ্বী, হাঁ।'

'শিগ্‌গির চলে আসুন হোটেলে। আমি রানা বলছি।'

'এক্ষুণি আসতে হবে?'

'হ্যাঁ। এক্ষুণি।'

'কোনও খবর পেলেন? নতুন কিছু?'

'দুঃসংবাদ আছে। আসুন তারপর বলব।'

আর কোনও কথা না বলে ফোন নামিয়ে রাখল সাঈদ। এবারে আবার সেই ছয় ডিজিটের বিশেষ নাম্বারে ডায়াল করল রানা। মোহাম্মদ জানের খবর দিল এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবার নির্দেশ দিল। তারপর বিছানার কাছে এসে বসল

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে।

হঠাৎ কাগজটা চোখে পড়ল রানার। বুকের কাছে ব্যাণ্ডেজের মধ্যে গোঁজা। বের করে নিয়ে চোখের সামনে ধরল সে কাগজটা। অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ওটার দিকে কিছুক্ষণ। বুঝতে পারল না কিছুই। তীব্র উত্তেজনায় এক মুহূর্তের জন্যে ব্ল্যাক আউট হলো যেন রানার দৃষ্টি। পর মুহূর্তেই ফুটে উঠল লেখাগুলো স্পষ্ট। ইংরাজিতে টাইপ করা। বাংলা করলে দাঁড়ায়:

মাসুদ রানা,

তোমার জন্যও এই একই দণ্ডাদেশ।

অপেক্ষা করো।

ধক্-ধক্ করে জ্বলল রানার চোখ কয়েক সেকেণ্ড। কঠোর হয়ে গেল মুখটা। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে স্থির করবার চেষ্টা করল সে। তারপর খান মোহাম্মদ জানের মৃতদেহের মাথায় রাখল ডান হাত। বলল, 'প্রতিজ্ঞা করলাম, সর্দার। প্রতিশোধ নেব।'

কথাটা বলেই রানা লক্ষ করল মোহাম্মদ জানের চুল ভেজা। পিরান্হার ট্যাঙ্কে ফেলে হত্যা করা হয়েছে তাকে। কি মনে করে কয়েকটা চুল ছিঁড়ে নিল রানা লাশটার মাথা থেকে। চেটে দেখল, নোন্তা। চট্ করে একটা কথা মনে পড়ল ওর। তাহলে কি···

ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ফর্সা হয়ে আসছে আকাশটা। সাগর থেকে আসা ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া বয়ে আনছে সমুদ্রের কল্লোলধ্বনি। দূর থেকে আবার ভেসে এল জাহাজের বাঁশীর করুণ সুর।

সাঈদ পৌঁছল প্রথম। ছুটে গেল বিছানার পাশে। দুই হাতে মুখ ঢেকে হু-হু করে কেঁদে উঠল। একটু পরেই সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। শার্টের আস্তিনে চোখ মুছে নিয়ে ফিরল রানার দিকে।

'চাচার খুনের বদলা নেব আমি।'

'আমিও।'

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানা ওর চোখের দিকে। ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সাঈদ। রানাও চেপে ধরল ওর হাত। দুইজন শক্তিশালী পুরুষের মৈত্রী-স্থাপন হলো।

'আজ সন্ধ্যায় এসো। একা।'

'আচ্ছা।'

চোখে চোখে কথা হয়ে গেল দু'জনের।

এরপর বাকি সব রুটিন মাফিক হয়ে গেল। ডাক্তার পরীক্ষা করে রায় দিল। অ্যাম্বুলেন্সে করে লাশ চলে গেল মর্গে। পোস্টমর্টেম হবে। সাঈদ চলে গেল সেই সঙ্গে। ঘর খালি হতেই আবার কাগজের টুকরোটা বের করল রানা। মোহাম্মদ জানের রক্ত লেগে আছে এক কোণে। উল্টোপিঠে আঠা লাগানো—মাছের অ্যাকুয়ারিয়ামে লাগাবার লেবেল। বুক পকেটে রেখে দিল সে চিঠিটা। ফরাস এসে চাদর বদলে দিয়ে গেল বিছানার।

বাইরের ঘরে সোফার ওপর হেলান দিয়ে বসে চোখ বন্ধ করল রানা। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে সে। ছোট্ট দু'একটা সূত্র ধরে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার চেষ্টা করছে

সে। সমস্ত মনোযোগ একত্রীভূত হওয়ায় দুই ভুরুর মাঝখানে কপাল খানিকটা ফুলে উঠেছে। স্থির হয়ে পড়ে থাকল সে বিশ মিনিট, তারপর চোখ মেলল। সমাধান হয়ে গেছে সমস্যার।

কয়েকটা জায়গায় টেলিফোন করে কিছু নির্দেশ দিল সে। কিছু খবরও সংগ্রহ করল। সারাদিন ঘর থেকে বেরোল না।

চারটের সময় দুটো থারটি-ও-সিক্স রাইফেল এবং আরও কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস পৌঁছে দেয়া হলো রানার কামরায় পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট মারফত, গোপনে। প্রতিটা রাইফেলের জন্যে একটা করে পাঁচ-গুলির এক্সট্রা ম্যাগাজিন। মেশিন রেস্টে জিরোয়িং করা আছে রাইফেলগুলো এক্সপার্টের হাতে। একটা টারগেটে পাঁচটা গুলির গ্রুপিং দেখানো আছে—স্লিং-এর সঙ্গে টুইন সুতো দিয়ে বাঁধা। গ্রুপিং দেখে খুশি হলো রানা। টু হানড্রেড ইয়ার্ডসে তিনটে বুলস্ আই। সোয়া ইঞ্চি গ্রুপিং।

রানার নির্দেশে সাগর পারের একটা গোডাউন খুঁজে বের করেছে সাধু বাবাজী। বিভিন্ন রকমের ব্যবসা আছে এই কোম্পানীর। একটা ইয়ট আছে, করাচি-চিটাগাং যাতায়াত করে মাসে একবার করে। হরেক রকম মাল নিয়ে যায় এখান থেকে চিটাগাং-এ। সাথে ঝিনুক, শঙ্খ এবং নানান জাতের সৌখিন রঙিন মাছও যায়। আর যায় কলেজ-ইউনিভারসিটিতে রিসার্চের জন্যে এবং যারা মাছ পোষে তাদের কাছে বিক্রির জন্যে নানান রকম বিষাক্ত সামুদ্রিক সাপ ও মাছ। ফেরার সময় আদা আর বেতের কাজ করা কুটির শিল্পের বিভিন্ন শখের জিনিস নিয়ে ফেরে করাচিতে। এ ছাড়া এক্সপোর্টও করে এই কোম্পানী বিরাট স্কেলে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী। পুলিসের কোনও খারাপ রিপোর্ট নেই। কাস্টমসেও অল ক্লিয়ার। পরিষ্কার ঝরঝরে ব্যবসা। বছর দু'য়েক হলো শুরু করেছে—বেশ জমিয়ে নিয়েছে এরই মধ্যে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর নাজির বেগ।

রাইফেল দুটো ভালমত পরীক্ষা করে দেখল রানা বোল্ট টেনে। সব ঠিক আছে। এখন রাতের অপেক্ষা। একাই যেত সে, কিন্তু সাঈদকে সাথে না নিলে অন্যায় করা হবে ওর প্রতি। ওরও আছে প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার।

গোপনে যেতে হবে। রানা মনে মনে জানে, দল নিয়ে গেলেও চলত; কিন্তু তাহলে প্রতিশোধটা নেয়া হয় না। ওদের বুঝিয়েছে মিলিটারি বা পুলিস মুভমেন্ট টের পেলেই পালিয়ে যাবে সে নাগালের বাইরে। তাছাড়া মাছের ব্যবসার সঙ্গে সোনা চোরাচালানের সম্পর্ক বের করা যায়নি এখনও। ছোট ছোট মাছ, বড় নয় যে পেটের মধ্যে করে সোনা চালান দেয়া যেতে পারে।

বিকেলে করাচি ব্রাঞ্চ থেকে এল দু'জন। রানার বর্তমান কার্যকলাপ আবছা ঠেকছে করাচি অফিসের কাছে। অথচ রানার নিরাপত্তার দায়িত্ব ওদেরই ওপর। রানার ভবিষ্যৎ প্ল্যান জানতে চাইল ওরা। এড়িয়ে গেল রানা। কারণ, ঠিক কোন্ লোকটা বোঝা না গেলেও করাচি অফিসে অন্তত একজন দু'মুখো সাপ আছে। তা না হলে এত সহজে রানাকে চিনে বের করা সম্ভব হত না মোহাম্মদ জান বা ওয়ালী আহমেদের পক্ষে।

'সবকিছু এমন রহস্যাবৃত রাখার কারণ জানতে পারি?' একজন প্রশ্ন করল।

'হেড অফিস থেকে সেটা জানতে পারবেন।'
'এটা কি আমাদের ওপর আপনার কন্‌ফিডেন্সের অভাব বলে ধরে নেব?'
'সেটাও হেড অফিস থেকেই জানতে পারবেন।'
'আমাদের চীফ আপনার কার্যকলাপে অত্যন্ত—'
'দেখুন,' উঠে দাঁড়াল রানা সোফা ছেড়ে। 'আপনার চীফের বিরক্তি বা ঘৃণা যা-ই থাকুক, হেড অফিসে জানাতে বলবেন। এ কাজের ভার ডিরেক্ট হেড অফিস থেকে পেয়েছি আমি। আপনার হেডের কাছে যে ইন্‌স্ট্রাক্‌শন্‌ এসেছে সেটা যদি তিনি ভুলে গিয়ে থাকেন তাহলে আবার তাঁকে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলবেন। এই কেসে আমি যেটুকু সাহায্য চাইব সেটুকু সাহায্য করতে তিনি বাধ্য—তার বেশি একটি কথাও জানবার তাঁর অধিকার নেই। আপনারা এবারে আসতে পারেন।'
'একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনার রিপোর্ট করাচি চীফের কাছে দেয়ার কথা। এখান থেকে ঢাকায় রীলে করা হবে সেটা। কিন্তু…'
'আমার রিপোর্ট আমি সরাসরি হেড অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি।'
বেরিয়ে যাচ্ছিল ওরা। রানা আবার বলল, 'আমারই রিসিভ করার কথা ছিল, কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আপনার চীফকে বলবেন আজ রাতের ফ্লাইটে আসছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান কাউকে কিছু না জানিয়ে। ইচ্ছে করলে এয়ারপোর্টে গিয়ে রিসিভ করতে পারেন।'
বেরিয়ে গেল ওরা। সেই সাথে রানার মেজাজটাও বিগড়ে দিয়ে গেল। সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। ঠিকই করেছে সে আচ্ছামত ডাঁটিয়ে দিয়ে। রানার ভদ্রতার সুযোগ গ্রহণ করতে চাইছিল ব্যাটারা। সীমা লঙ্ঘনকারীকে প্রয়োজন হলে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় তার সীমাবদ্ধতা।

মিনিট পনেরো পরেই ঘরে ঢুকল অনীতা গিলবার্ট।
'হ্যাল্লো, হিরো! এখনও বেঁচে আছ তাহলে?'
'ভয়ে ঘর থেকে বেরোইনি সারাদিন,' মৃদু হেসে বলল রানা।
'উঁহুঁ। বিশ্বাস করলাম না। ভয়ে পেছপা হবার লোক আলাদা। তোমার চেহারায় সংকল্প দেখতে পাচ্ছি, বন্ধু। ব্যাপার কি? আরও ঘটেছে কিছু?'
মাথা নাড়ল রানা। কফির অর্ডার দিয়ে মোহাম্মদ জানের পরিণতির কথা বলল অনীতাকে। সাঈদের কাছে জিনাতের পরিণতির কথা গোপন করেছিল। কিন্তু অনীতাকে বলল সব। ভুরু কুঁচকে গেল অনীতার।
'এখনও চুপচাপ বসে আছ?'
'এখনও আছি। কিন্তু সন্ধের পর আর থাকব না।'
'আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'
'অসম্ভব। মেয়েমানুষের কাজ এটা নয়।'
'আমারও প্রতিশোধ নেবার আছে।'
'সেদিক থেকে অবশ্য সাঈদের মত তোমারও দাবি আছে। কিন্তু তোমাকে সাথে নিলে কাজে অসুবিধে হবে। অবশ্য অন্য কাজ দিতে পারি তোমাকে।'

'কি কাজ?'

'ঠিক রাত এগারোটার সময় সাগর পারের একটা স্টোর রুমের সামনের রাস্তায় ওই লাল গাড়িটা নিয়ে উপস্থিত হবে। গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করবে না। বারোটার মধ্যে যদি আমার দেখা না পাও তাহলে একটা বিশেষ নম্বরে ফোন করে খবরটা শুধু জানিয়ে দেবে। পারবে না?'

'খুব পারব। ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখে দাও। ঠিক সময় মত পাবে আমাকে।'

এক টুকরো কাগজে লিখে দিল রানা ফোন নাম্বার ও ঠিকানাটা। ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে দিল সেটা অনীতা। একটা লজেন্স মুখে পুরল কফির কাপ শেষ করে। সত্যিই ছেড়ে দিয়েছে সিগারেট। রাইফেল দুটো দেখে চোখমুখের একটা ভঙ্গি করল।

'যুদ্ধ হবে মনে হচ্ছে!'

মুচকে হাসল রানা। মেয়েটির কথা বলার ভঙ্গিতে কৌতুক আর বুদ্ধির ছটা। এমন অঙ্গভঙ্গি করে কথা বলে যে না হেসে পারা যায় না। সাধারণ কথা, তবু হাসি আসে। চলে গেল সে টাটা করে।

সন্ধের পর এল সাঈদ খান।

'হোটেল থেকে বেরোবেন কি করে? ঢুকবার সময়ই পরিষ্কার বুঝতে পারলাম চারপাশে ছড়িয়ে আছে ওদের লোক। লাউঞ্জের মধ্যেও।'

'ওদের সঙ্গে আমাদের লোকও মিশে আছে। আর বেরোবার ব্যাপারটা ভেবে রেখেছি আমি। ওদের দেখানো পথই অনুসরণ করব। কিন্তু তোমাকে যা বলেছিলাম করেছ? বিকেলে লোক পাঠিয়েছিলে ওখানে?'

'আলবত। আপনি ঠিকই বলেছিলেন। দোতলার ওপর চিলেকোঠার ছাতে ফিট করা একটা লম্বা পোস্টের মাথায় ঘুরছিল রাডার স্ক্যানার। পাঁচশো গজ দূরের একটা অফিসের ছাত থেকে স্কোপ্ লাগানো রাইফেলের গুলি ছুঁড়ে নষ্ট করে দেয়া হয়েছে ওটাকে। এখন বেহুদা ঘুরছে ওটা লাঠির মাথায়। এলাকাটা তিন দিক থেকে কাঁটাতারের জাল দিয়ে ঘেরা। গেটে সারাক্ষণ পাহারা।'

আটটার সময় কামরায় বসেই সাপার খেয়ে নিল ওরা। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। তারপর ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে বসল গিয়ে ব্যালকনিতে, নিচু গলায় সমস্ত প্ল্যানটা বুঝিয়ে দিল রানা সাঈদকে। মাথা ঝাঁকাল সাঈদ।

উঠে পড়ল ওরা। রাইফেল দুটো কাঁধে ঝুলিয়ে নিল দু'জন। ওয়েস্ট ব্যাণ্ডে গুঁজে নিল রিভলভার। সবশেষে, মনে পড়ে যাওয়ায়, সুটকেস থেকে একটা বিশেষভাবে তৈরি অ্যাসিড পেন নিয়ে পকেটে গুঁজল রানা। কন্‌সেন্‌ট্রেটেড নাইট্রিক এসিড ভরা তাতে—বোতাম টিপলেই পিচকারীর মত বেরোবে। তারপর একগোছা ডিসেণ্ডিং রোপ নিয়ে কামরায় তালা লাগিয়ে দিয়ে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে ছাতে।

আধখানা চাঁদ আকাশে। সেই আলোয় খাঁ-খাঁ করছে শূন্য ছাতটা। একটা লোহার হুকে বাঁধল রানা দড়ির এক প্রান্ত। দুই জোড়া ধাতুর তৈরি হাতলের মধ্যে

দিয়ে গেছে শক্ত সরু রশিটা।

'দুই হাতে মুঠো করে ধরবে হাতল দুটো। নিয়ম হচ্ছে, স্পীড বেশি চাইলে ওগুলো বেশি জোরে টিপে ধরবে। আর কমাতে চাইলে একটা হাত একেবারে ঢিল করে দেবে। বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকাল সাঈদ। এক মিনিটে নেমে এল ওরা হোটেলের পিছনের অন্ধকারে। সেইলরস্ ক্লাবের ওপাশ দিয়ে সোজা সাগরের দিকে চলে গেল ওরা। অপেক্ষমাণ স্পীড বোটে রানার নির্দেশে বৈঠা রাখা ছিল দুটো। সাঈদ উঠে বসতেই ঠেলে পানিতে নামাল রানা স্পীড বোট। তারপর উঠে বসে বৈঠা দিয়ে কিছুক্ষণ লগির মত ঠেলা দিয়ে বেশি পানিতে নিয়ে এল। এবার বিনাবাক্যব্যয়ে বৈঠা চালাল দু'জন। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল স্পীড বোট পুব দিকে। মাথায় একরাশ ফেনা নিয়ে ঢেউ ভেঙে পড়ছে বোটের গায়ে। ছিটকে জলকণা এসে লাগছে চোখে মুখে। দুলে দুলে উঠছে ছোট্ট বোট।

'ডুবে যাবে না তো আবার?' সাঈদ জিজ্ঞেস করল।

'না, ডুববে না। কিন্তু সাঁতারটা শিখে নাও না কেন? কত সুইমিং পুল আছে শহরে। শিখে নিলে অনেক কাজে আসবে।'

'ঠিক বলেছেন। কাল যদি সূর্যের মুখ দেখি তাহলে মেম্বার হয়ে যাব কোনও সুইমিং-ক্লাবের।'

বেশ অনেকদূর সরে এসেছে ওরা তীর থেকে। হোটেল ঢাকা পড়েছে একটা টিবির আড়ালে। এখন আর শব্দ পৌঁছবে না ওখানে। বৈঠা তুলে রেখে এভিনরুড এঞ্জিনটা স্টার্ট দিল রানা। ফরওয়ার্ড গিয়ার দিতেই ছুটল স্পীড বোট তরতর করে পানি কেটে। বৈঠা তুলে একপাশে রেখে দিয়ে কাছে এসে বসল সাঈদ। জোর বাতাসে শীত শীত করছে। পৌনে এক ঘণ্টার পথ।

'তোমার চেয়ে ছোট নাকি জিনাত?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। দু'বছরের ছোট। পনেরো বছর একসাথে খেলাধুলা করে বড় হয়েছি আমরা। তারপর ও চলে গেল লাহোর।'

'যেদিন পরিষ্কার বুঝতে পারলে যে ওকে ভালবাসো, তখন নিশ্চয়ই ও অনেক দূরে সরে গেছে?'

চুপ করে থাকল সাঈদ। রানা যে হঠাৎ তার মনের কথাটা এভাবে বলে বসবে ভাবতেও পারেনি সে।

'আপনাকে বলেছে ও কিছু?'

'না। তোমার চোরা চাহনি দেখে বুঝেছি।'

আবার চুপ হয়ে গেল সাঈদ। ওর কাঁধের ওপর হাত রাখল রানা।

'এমনই হয়, সাঈদ। জীবনটাই এরকম। সবকিছুর মধ্যেই গরমিল। মানুষ একান্ত করে যে জিনিসটা চায়, কেন জানি গোলমাল হয়ে যায়, পেতে পেতেও পায় না।'

'কিন্তু এরকমটা হওয়ার কথা ছিল না, মি. রানা।' সাঈদের কণ্ঠে অদ্ভুত একটা অভিমানের সুর ধ্বনিত হলো। হৃদয়ের আগল খুলে গেল ওর। 'ছোটকাল থেকেই আমি জানতাম ও আমার স্ত্রী। চার বছর বয়সে আমার আব্বাজী মারা যান। চাচাজীই

আমাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন। চাচী-আম্মা আমাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসতেন। আমার সব আবদার অত্যাচার সহ্য করতেন হাসিমুখে। আট বছর বয়স থেকে শুনে আসছি আমাদের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। বড় হলে বিয়ে হবে। তখন থেকেই নিজের বৌ মনে করে কত যে অধিকার ফলিয়েছি আমি ওর ওপর!' হাসল সাঈদ। 'কিন্তু পনেরো বছর বয়স হতেই ও যেন আমার চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেল। বুদ্ধি বিবেচনায় অনেক পেকে গেল ও। দেহেও এমন বাড়ন্ত হয়ে উঠল যে ওর দিকে চাইতে লজ্জা লাগত আমার। নিজেকে ওর পাশে খুবই অপরিণত, কাঁচা মনে হত। চাচী-আম্মা মারা গেলেন। চাচাজী মনে করলেন এখন ওকে লাহোরে কোনও বোর্ডিং স্কুলে রাখাই ভাল। নইলে চরিত্র খারাপ হয়ে যেতে পারে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল সাঈদ। মোলায়েম চাঁদের আলো বিছিয়ে পড়েছে সমুদ্রের ওপর। কেবল জল আর জল। ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা। করাচি শহরের হাজার হাজার বাতি দেখা যাচ্ছে তারার মত বহুদূরে।

'মাঝে মাঝে ছুটিতে যখন আসত বাড়িতে, উদগ্রীব আমি, কতবার বলতে চেয়েছি। কোথা থেকে একরাশ লজ্জা এসে কণ্ঠরোধ করেছে আমার। এখন বুঝতে পারি, যদি সেদিন সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে উঠে দাবি করতাম, তাহলে আজ এভাবে ও নষ্ট হয়ে যেত না। তারপর একসময় আমি এগিয়ে এলাম। ও হেসে উড়িয়ে দিল আমাকে। অন্য জগতের মানুষ হয়ে গেছে ও তখন। হঠাৎ বিয়ে করে বসল। এসব ঘটনা তো আপনি জানেন। তখন আমি বড় হয়ে গেছি। স্বামীর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে ও যখন মারীতে, আমি গিয়ে হাজির হলাম, বললাম আমার মনের কথা। ক'দিন ও আমাকে খুব আদর যত্ন করে রাখল, তারপর বলল, 'সাঈদ ভাইয়া, আমি তোমার যোগ্য নই। তোমার মত একজন ভালমানুষের জীবনটা আমি নষ্ট করে দিতে পারব না।' কাঙালের মত বললাম, 'দয়া করো আমাকে, জিনা। তোমার সমস্ত দোষ-ত্রুটি, পাপ-পূণ্য নিয়ে তুমি এসো আমার জীবনে। ধন্য করো আমাকে। তোমাকে ছাড়া আর যে কিছুই ভাবতে পারি না আমি।' দু'চোখ ভরে গিয়েছিল ওর অশ্রুতে। বলেছিল, 'আগে বলোনি কেন? সময় থাকতে তুমি আমাকে জোর করে ছিনিয়ে আনলে না কেন ওই বিষাক্ত জীবনের মায়াবী আকর্ষণ থেকে? এখন আর হয় না, সাঈদ ভাইয়া। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল রানা। ঢাকা বেতার কেন্দ্রের নাটকের মত কিছুটা শোনালেও রেডিওর ওপর বমি করে দিতে ইচ্ছে করল না রানার। কারণ এ নাটক রূপ লাভ করছে অতি সাধারণ হলেও একজন সত্যিকার প্রেমিকের হৃদয় মন্থন করা উপলব্ধি থেকে। শীত করছে রানার। ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা কফি ঢেলে সাঈদের দিকে বাড়িয়ে দিল, নিজেও খেলো কয়েক ঢোক। দুই ঢোকে শেষ করল সাঈদ কফিটুকু। তারপর গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার আরম্ভ করল।

'ফিরে এলাম আমি শূন্য পাত্র নিয়ে। অনেক অনুরোধ-উপরোধেও, এমন কি চাচাজীর আদেশেও বিয়ে করিনি আমি। অপেক্ষা করে ছিলাম। কিন্তু বাচ্চাটা মারা যাওয়ার পর আবার নষ্ট হয়ে গেল ও। তিক্ত হয়ে গিয়েছে ও তখন জীবনের ওপর। অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু ও কিছুতেই দেখা করল না আমার সাথে। ওর পেছন

পেছন লাহোর, পিণ্ডি, পেশোয়ার, করাচি ছুটে বেড়িয়েছি চাচাজীর সাথে পাগলের মত। তারপর আপনি এলেন ওর জীবনে। একটা কথা ভুলেও ভাববেন না, মি. মাসুদ রানা—আপনার প্রতি আমার কোন বিতৃষ্ণা আছে মনে করলে ভুল হবে। আমি চাই ও সুখী হোক—ওর শান্তি হোক। আমার কপালে যা লেখা আছে, তাই হবে। এ লিখন তো কেউ খণ্ডাতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য কি জানেন? এত ঘটনার পরেও আমার স্নেহ ভালবাসা এতটুকু কমল না। অদ্ভুত মেয়ে ও। কিছু দোষ নেই ওর। কারও ওপর কখনও অন্যায় করেনি জিনা। কিন্তু আমারই মত ওর ভাগ্যও বিরূপ। সুখ হলো না কিছুতেই। সবাই ঠকাল ওকে।'

এই ভাবপ্রবণ যুবক জানে না জিনাতের বর্তমান অবস্থা। স্টিয়ারিং ধরে স্থির হয়ে বসে রইল রানা। আর বেশি দূর নেই। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল সে কৌশলে। নানান কথার পর মালাকান্দ স্মাগলিং সম্পর্কে কথা তুলতেই চুপ হয়ে গেল সাঈদ। মনে মনে হাসল রানা। ব্যাটা J M T T—জাতে মাতাল তালে ঠিক। এখন ও-ই মালাকান্দের সরদার। চাচাজীর সমস্ত অপকীর্তি চালু রাখার মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে ওকে। এবং বোঝা যাচ্ছে যোগ্যতার সাথেই সে-কাজ চালাবে ও। এই একটা মানুষের মধ্যে কি অদ্ভুত ভাবে নিষ্পাপ প্রেম আর ব্যবসায়িক কুটিলতা, কোমল আর কঠিনের মিশ্রণ হয়েছে ভাবতে অবাক লাগল রানার।

ছোট ছোট আধডোবা পাহাড় দেখা যাচ্ছে দূরে। আর বেশি দেরি নেই, এসে পড়েছে ওরা।

হঠাৎ তীরের ওপর একটা সবুজ আলো জ্বলেই নিভে গেল। একটু বাঁয়ে কাটল রানা। পাঁচ মিনিট পর আরও কিছুদূর সামনে দু'বার জ্বলল আর একটা সবুজ বাতি। অনেকখানি সরে এল এবার রানা তীরের কাছে। তারপর বন্ধ করে দিল এঞ্জিন। বেশ কিছুদূর আপনাআপনি চলল বোট। তারপর আবার বৈঠা চালাতে আরম্ভ করল ওরা। তীরের ওপর তিনবার জ্বলল সবুজ বাতি। আবছা মূর্তিটা চিনতে পারল রানা। দিল্লির খান।

'বৈঠার শব্দ হচ্ছে, সাঈদ,' ফিসফিস করে সাবধান করল রানা।

ধীরে ধীরে এগোল ওরা। নিঃশব্দে ইনফ্রা-রেড লেন্স লাগানো নাইট গ্লাসটা চোখে পরে নিল রানা। অনেক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এবার আঁধারের মধ্যে। দূরে একটা ইয়ট দেখা যাচ্ছে না? অর্ধেকটা আড়াল হয়ে আছে পাহাড়ের ওপাশে। তীরের দিকে দেখা গেল এরিয়ার মধ্যে বাঁধানো ঘাটে একটা লঞ্চ দাঁড়ানো। লোকজন দেখা গেল না। না ঘাটে, না লঞ্চে।

একশো গজ জায়গা খোলা আছে সমুদ্রের দিকে। ওখান দিয়েই ঢুকতে হবে। তীরে উঠে ঠেলে দিল রানা স্পীড বোটটা বেশি পানিতে। হাওয়ার ধাক্কায় ধীরে ধীরে চলে গেল ওটা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে। পাড়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা ও সাঈদ।

একটা ছোট মেঘের আড়ালে চলে গেল চাঁদটা। ছুটে লম্বা স্টোররুমের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। এই লম্বা ঘরটার ওপাশে খানিকটা জায়গা ছেড়ে রাস্তার পাশের দোতলা বিল্ডিং। ওদিকে আপাতত কোনও ঔৎসুক্য নেই রানার। প্রথমে ঢুকতে হবে এই ঘরটার মধ্যেই।

বড়-সড় একটা দরজা দেখা গেল পেছন দিকে। এই দরজা দিয়েই বোধহয় লোডিং-আনলোডিং হয়। তালা মারা। কব্জায় তারের অস্তিত্ব দেখে বুঝল রানা বার্গলার অ্যালার্মের ব্যবস্থা আছে সেখানে। তাতে রানার কিছুই এসে যায় না। এদিক দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে না সে। মাছের কারবার যখন, তখন সামনে এগোলে নিশ্চয়ই কাঁচের দেয়াল থাকবে আলো আসবার জন্যে। দরজাটা ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেল ওরা।

ঠিক। কিছুদূর এগিয়েই দেখা গেল লোহার ফ্রেমে কাঁচ বসানো আছে। কিন্তু বেশ অনেকখানি উঁচুতে। ভেতর থেকে ম্লান আলো আসছে। সাঈদের কাঁধে চড়ে কমার্শিয়াল ডায়মণ্ড বসানো কাঁচ কাটার স্টিক দিয়ে এক বর্গ গজ আন্দাজ জায়গার কাঁচ তিন দিক থেকে কেটে ফেলল রানা। তারপর স্কচ্ টেপ দিয়ে অনেকগুলো স্টিচ্ লাগাল যাতে চতুর্থ দিকে কাটলেই ঝন্ ঝন্ করে পড়ে না যায়। বাঁ দিক, ডান দিক আর উপর দিকে ভাল মত স্টিচ্ লাগিয়ে এবার একটানে নিচের দিকটা কেটে ফেলল রানা। সামান্য ঠেলতেই প্রায় নিঃশব্দে বেরিয়ে এল কাঁচ। দুই হাতে সাবধানে সেটাকে ধরে পায়ে ইশারা করতেই ধীরে ধীরে বসে পড়ল সাঈদ।

দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে কাঁচটা রাখল রানা। সাঈদকে ওখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার নির্দেশ দিয়ে রাইফেলটা মাটিতে শুইয়ে রেখে লাফিয়ে ধরল সে লোহার ফ্রেম। তারপর পাকা জিম্‌নাস্টের মত পা দুটো টেনে তুলে নিয়ে গেল ভেতরের দিকে।

কি যেন ঠেকল পায়ে। পা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দেখল অ্যাকুয়ারিয়াম একটা। হঠাৎ একটা শক্ খেয়ে চম্‌কে উঠল রানা। আপনাআপনি ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু। কোনও বিষাক্ত মাছ কাঁটা মারল না তো? ফ্রেম থেকে বাঁ হাতটা সরিয়ে একটা পেন্সিল টর্চ বের করল রানা। মুখ খোলা অ্যাকুয়ারিয়ামের মধ্যে অস্বাভাবিক ভাবে পানি নড়তে দেখে সত্যিই ঘাবড়ে গেল রানা। সাবধানে এক পা রাখল টেবিলের ওপর। বেশি ভর দিতে সাহস হলো না, ভেঙে পড়তে পারে। হালকা করে টেবিলের ওপর এক পায়ের ভর দিয়ে ছেড়ে দিল ডান হাত। আরেক পা পড়ল মাটিতে। সামান্য শব্দ হলো। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে প্রথমেই লেবেলটা পড়ল রানা। ইংরাজিতে লেখা আছে:'ঈল।' যাক্, বাঁচা গেল। বিষাক্ত কিছু নয়। সাউথ আমেরিকান এই মাছ শুধু ইলেকট্রিক শক্ দেয়। হর্স কিলার বলে একে। জুত মত পেলে অনায়াসে একটা মানুষ খুন করে ফেলতে পারে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে টর্চ নিভিয়ে দিল রানা। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কোনও সাড়াশব্দ নেই কোথাও।

পাশাপাশি কয়েক সারিতে অসংখ্য কাঁচের ট্যাঙ্ক চার পায়া টেবিলের ওপর রাখা। কয়েকটা ট্যাঙ্কে আলোর ব্যবস্থা আছে। কাঁচের দেয়াল ভেদ করে ম্লান চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরের ভেতর। অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা বিরাজ করছে চারদিকে।

বাম পাশের সারিতে কয়েকটা লেবেল পড়ল রানা: ফ্লাইং ফক্স, ডিস্কাস্, লোচ, প্লেটি, সোর্ড টেইল, জার্মান ফাইটার, গাপ্পি, গোরামি, ব্ল্যাক মলি, নিয়ন, সিক্লিড্, প্যারাডাইস, অ্যাঞ্জেল, ল্যাবিরিন্থ, গোল্ড ফিশ্, সিয়ামিজ ফাইটার আরও

কত কি। আর ডান দিকের সমস্ত অ্যাকুয়ারিয়ামের গায়ে সাঁটানো কাগজে লাল কালিতে ছাপা:

DANGER
Poisonous Fish

ছোট বড় নানান সাইজের ট্যাঙ্ক—মাছের আকৃতি অনুসারে।

কয়েকটা লেবেলে নাম পড়ল: গীটার ফিশ্, মাড ফিশ্, লায়ন ফিশ্, ঈল, টর্পেডো স্কেটস্, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান স্করপিয়ন। এ ছাড়াও কিছু সামুদ্রিক বিষধর সাপের নামও পাওয়া গেল: হিমোফিস হিমোডার্মা, হিমোসরাস, ইত্যাদি। রানা লক্ষ করল এদিকের সারির প্রত্যেকটা ট্যাঙ্কে একটা করে মাছ বা সাপ। দু'শো আড়াইশো ট্যাঙ্ক আছে ডানধারের এই দুই সারিতে। চারদিকে কেমন একটা বোটকা মত গন্ধ।

বহুরকম মাছের খাবার রাখা আছে মেঝেতে টিনের ট্রের মধ্যে। কিছু পাউডার করে রাখা, কিছু জ্যান্ত। কয়েকটা চিনতে পারল রানা। ব্লাড-ওয়ার্ম, টিউবিফেক্স, মাইক্রো-ওয়ার্ম, হোয়াইট-ওয়ার্ম, ড্যাফনিয়া, ব্রাইন শ্রিম্প্। কয়েকটা কাঁচের বোয়েমেও কয়েক পদের পাউডার ও ফ্লোটিং বল রাখা।

জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন আকারের অসংখ্য সুদৃশ্য ঝিনুক আর শঙ্খ স্তূপ করা। এতেও আসে প্রচুর ফরেন্ কারেন্সি।

ঘরের ভেতর গরম। বদ্ধ আবহাওয়া। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে আরম্ভ করল রানার কপালে। বাইরের মুক্ত বাতাসের জন্যে প্রাণটা চঞ্চল হয়ে উঠল ওর। ওদিকে সাঈদ নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে উঠেছে ভেতরে আসবার জন্যে।

বিষাক্ত মাছের কথা শুনেই একটা কথা মনে এসেছিল রানার। সেটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তাই সাঈদকে বাইরে রেখে এসেছে।

হাঁটুর নিচে পায়ের সাথে বাঁধা খাপের মধ্যে থেকে বের করল রানা অফিস থেকে পাওয়া নতুন ছুরিটা। ইঞ্চি পাঁচেক লম্বা একটা লায়ন ফিশের জারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। টর্চের আলো মাছটার দিকে ধরতেই নড়েচড়ে উঠল সেটা। রানার জানা আছে এ মাছ আক্রমণ করে না, আত্মরক্ষার জন্যে ব্যবহার করে বিষ। না ছুঁলে ভয়ের কিছু নেই।

ছুরিটা পানি স্পর্শ করতেই খাড়া হয়ে গেল ওর মেরুদণ্ডের ওপরের কাঁটাগুলো প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর ছবির মত। চোখ দুটো বেরিয়ে এসেছে বাইরে। বিপদ টের পেয়ে গেছে সে। ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে পেছনে। ঘ্যাচ করে দুই চোখের মাঝখানে মাথার মধ্যে গাঁথল রানা ছুরিটা। তারপর কাঁচের সাথে ঠেসে ধরে ধীরে ধীরে উঠিয়ে আনল ওপরে। মাছটা ছট্ফট্ করছে আর লেজের বাড়ি মারছে ছুরিতে। একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ওটাকে ফেলল রানা মেঝের ওপর। তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে থাকল মাছটা মাটিতে পড়ে। জুতো দিয়ে মাড়িয়ে ওটার ভব যন্ত্রণা ঘুচিয়ে দিল ও। তারপর আস্তিন গুটিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল অ্যাকুয়ারিয়ামের তলায় বালু আর কাদার মধ্যে।

আছে। শক্তমত কিছু ঠেকল রানার হাতে।

বিষাক্ত মাছ আর সাপের কারবার দেখে ওর মনে যা সন্দেহ হয়েছিল, তাই ঠিক। বালি আর কাদার মধ্যে থেকে বের করে আনল রানা অন্তত একশো ভরি

ওজনের একটা সোনার বার।

ওপরের অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে বাম হাতে সেটাকে নিল রানা। তারপর আবার হাত ঢুকিয়ে বাইরে না এনেই গুণে দেখল, আরও তিনটে আছে। এই ছোট ট্যাঙ্কেই যদি চারটে থাকে তাহলে বড়গুলোতে নিশ্চয়ই কমপক্ষে আটটা করে আছে। আন্দাজ করল রানা। আড়াইশো অ্যাকুয়ারিয়ামে কমপক্ষে দুই লক্ষ ভরি সোনা। একশো তিরিশ টাকা হিসাবে দাম হচ্ছে কত কোটি টাকা? প্রতি ট্রিপে যদি এই পরিমাণ চালান যায় তাহলে বছরে? ওরেব্বাপ! বিরাট ব্যাপার!

খুব দ্রুত চিন্তা করছে রানা। আজকের এই অভিযানের ফলাফল অনিশ্চিত। হয়তো আজই ওর জীবনের শেষ দিন। কিন্তু এই সোনার ব্যাপারটা জানানো দরকার কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সকে। ভেবে দেখল, রাত বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে অনীতা ফোন করবে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই এসে হাজির হবে আর্মড্ ফোর্স। একটা জারে মাছ না দেখতে পেলেও ওরা আসল ব্যাপারটা ধরতে না-ও পারে। কাজেই সোনার বারটা এমন জায়গায় রাখা দরকার যেখানে রাখলে সোয়া বারোটার আগে এদের চোখে পড়বে না, অথচ পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর চোখে পড়বে এবং সবটা ব্যাপার বুঝতে পারবে ওরা।

ছুরির আগা দিয়ে সোনার বারটার ওপর M. R.-9 লিখল রানা। তারপর মরা মাছটাকে ছুরিতে গেঁথে নিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার টেবিলের ওপর ট্যাঙ্কের আড়ালে রেখে দিল সোনা আর মাছ পাশাপাশি।

এবার ফিরে এল ও যেখান দিয়ে ঢুকেছিল সেইখানে। সঙ্কেত পেয়েই একটা রাইফেল ভেতরে চালান দিল সাঈদ। দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল সেটা রানা। কিন্তু দ্বিতীয় রা-ফেল চালান দেয়ার আগেই একসাথে জ্বলে উঠল ঘরের মধ্যে পঁচিশ-তিরিশটা একশো পাওয়ারের বাল্ব। সেই সঙ্গে কানে এল ভয়ঙ্কর একটা হিংস্র গর্জন।

## বারো

গুংগা!

চমকে উঠল রানা। একটানে বের করল রিভলভার।

পঁচিশ গজ দূরে মেইন গেটটা খুলে গেছে। সেই গেট দিয়ে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে দানব-দেহী গুংগা। রানা বুঝতে পারল রিভলভার দিয়ে ঠেকানো যাবে না ওকে। রাইফেলটা তুলে নিতে যাবে, এমন সময় বোঁ করে দশ ইঞ্চি ইটের সমান একটা পাথর এসে লাগল দেয়ালে খাড়া করে রাখা রাইফেলের বাঁটের ওপর। ছিটকে চলে গেল রাইফেল বারো চোদ্দ হাত দূরে।

আরেকটা পাথর আসছিল ছুটে। চট করে মাথা নিচু করল রানা। ঝন্ঝন্ করে ভেঙে পড়ল পিছনের অ্যাকুয়ারিয়াম। বিষাক্ত মাছের। লাফিয়ে সরে গেল রানা বামদিকে। আবার গর্জন শোনা গেল। অনেকখানি এগিয়ে এসেছে গুংগা তত্ক্ষণে। কোমরের সাথে ঝোলানো একটা পাথরভর্তি বড় থলে। তার একমাত্র অমোঘ অস্ত্র।

আজ সে বাগে পেয়েছে রানাকে।

গুলি করল রানা। অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সাথে একপাশে সরে গেল গুংগা। দূরের একটা ট্যাঙ্কের মধ্যে ঠুস্ করে ঢুকল রানার গুলি। মেঝের ওপর পানি পড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

দমে গেল। সম্পূর্ণ দমে গেল রানার মনটা। আশ্চর্য! মানুষ, না পিশাচ? এতখানি ক্ষিপ্রতা এক পিশাচেই সম্ভব! কোন্ এক ইংরাজি বইয়ে পড়েছিল, আফ্রিকার জঙ্গলে অন্ধকার রাতে একটা ষাঁড় মেরে খেতে খেতে রাইফেলের শব্দ শুনেই লাফিয়ে সরে গিয়েছিল এক সিংহ। মনে করেছিল, হয় গাঁজা মারছে, নয় হাত কেঁপে গিয়েছিল শিকারীর। কিন্তু আজ নিজের চোখে সেই রকম ক্ষিপ্রতা দেখে ভয়ে এবং বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। আবার গুলি করল রানা। এবারও সরে গেল গুংগা। শব্দ তো শুনতে পাচ্ছে না, রানার আঙুলের নড়া দেখেই টের পাচ্ছে সে। ছুটে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে আবার একটা পাথর ছুঁড়ল সে রানার দিকে।

চট করে বসে পড়ল রানা টেবিলের তলায়। পাথর লাগল এসে অ্যাঞ্জেল ফিশের ট্যাঙ্কে। ঝুপ ঝুপ করে সব পানি পড়ল রানার মাথায়। কলারের মধ্যে দিয়ে শার্টের ভেতর ঢুকল একটা মাছ। ফড় ফড় করে লেজ ও পাখার অস্বস্তিকর বাড়ি মারছে সে রানার ঘাড়ে।

চোখটা মুছে নিয়ে টেবিলের তলা দিয়ে গুংগার পা লক্ষ্য করে গুলি করল রানা। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। কয়েক পা এগিয়ে এসেছে গুংগা।

এমন সময় গর্জে উঠল আরেকটা রিভলভার। রানা চেয়ে দেখল কাটা কাঁচের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাঈদকে। একহাতে রিভলভার। অর্ধেকটা ঢুকে পড়েছে সে ঘরের মধ্যে।

উঠে দাঁড়িয়ে দেখল রানা গুংগার বাম বাহুতে একটা সরু রক্তের ধারা দেখা যাচ্ছে। ট্যাঙ্কের আড়ালে আড়ালে বেশ খানিকটা সরে গেল রানা। হাতে ব্যথা পেয়ে হুঙ্কার ছেড়ে একটা পাথর তুলল গুংগা।

এমন সময় 'উহ্!' করে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনেই ফিরে চাইল রানা। দেখল ঈল মাছের ট্যাঙ্কসহ হুড়মুড় করে পড়ল সাঈদ মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে। নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর ইলেক্‌ট্রিক শক খেয়েছে। হয়তো ট্যাঙ্কের মধ্যেই নেমে পড়েছিল।

এই এক মুহূর্তের অন্যমনস্কতাটুকু কাজে লাগাল গুংগা। দড়াম করে একটা পাথর এসে পড়ল রানার ডান কব্জির ওপর। ছিট্‌কে কয়েক হাত দূরের একটা মুখ খোলা অ্যাকুয়ারিয়ামের মধ্যে গিয়ে পড়ল রিভলভার। জয়ের উল্লাসে আরেকটা হুঙ্কার ছাড়ল গুংগা।

অসহ্য যন্ত্রণায় একটা গোঙানি বেরিয়ে এল রানার মুখ দিয়ে। কব্জিটা ভেঙেই গেছে বোধহয়। বাম হাতে চেপে ধরল সে ডান হাতের কব্জি।

নিরস্ত্র সে। ছুটে এগিয়ে আসছে পিশাচটা। সাঈদের কাছাকাছি যেতে পারলেও হত। ওর রিভলভারটা কাজে লাগানো যেত। কিন্তু সে উপায় নেই। তাড়া খাওয়া মুরগীর বাচ্চার মত মাছের জারের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে বেড়াতে থাকল সে। বোঁ করে কানের পাশ দিয়ে গিয়ে দেয়ালে লাগল একটা পাথর।

নিজের নিরুপায় অবস্থা ভালমত উপলব্ধি করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। কারণ গুংগা যদি ওকে ওয়ালী আহমেদের কাছে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে এসে থাকে তাহলে আত্মসমর্পণ করলে এক্ষুণি হত্যা করবে না। কিন্তু এখন ওকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে ঠিক মেরে ফেলবে। খুনের নেশা দেখতে পেয়েছে সে গুংগার চোখে।

বেরিয়ে এল রানা মাঝের প্রশস্ত পথটায়। এগিয়ে আসছিল গুংগা তুফানের মত। দুই হাত মাথার ওপর তুলে দাঁড়াল রানা।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল গুংগাও। বিস্মিত ওর চোখমুখ। বহুদিন পর একজন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়ে আন্তরিক খুশি হয়েছিল সে। কিন্তু এত সহজে হাল ছেড়ে দিল? আক্রমণের আনন্দটা আর থাকল কোথায়? কিন্তু···সতর্ক হলো গুংগা। এই লোকটি তো সহজে কাবু হবার বান্দা নয়! নিশ্চয়ই কোন কুমতলব আছে। সাবধানে এগোল সে সামনে। রানা মাথার ওপর হাত তুলে পিছিয়ে যাচ্ছে এক-পা এক-পা করে। পাঁচ হাত দূরেই গুংগা। গুংগার চোখ পড়ল পিছনে মাটিতে পড়ে থাকা সাঈদের ওপর। এতক্ষণ দেখতে পায়নি সে ওকে। রানাকে পিছিয়ে ওদিকে যেতে দেখে একটা হুঙ্কার ছেড়ে হাতের ইশারায় থামতে বলল সে। কোঁচড় থেকে পাথর বের করল একটা।

হঠাৎ রানার মনে পড়ল বুক পকেটের বল-পয়েন্ট পেনসিলটার কথা। একটানে বের করেই টিপে দিল গুংগার মুখ লক্ষ্য করে। এ অস্ত্র আর কোনদিন প্রয়োগ করেনি সে। দেখল কন্‌সেন্‌ট্রেটেড্ নাইট্রিক অ্যাসিড ছুটে গিয়ে চোখে-মুখে পড়তেই টগবগ করে ফুটতে লাগল গুংগার মুখের মাংস। বড় বড় ফোস্কা আর ঘায়ে বীভৎস আকার ধারণ করল চেহারাটা তিন সেকেণ্ডে।

যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল গুংগা। হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল পাথরটা। ভয়ঙ্কর মুখটা দুইহাতে ঢাকল সে। একটা চোখ সম্পূর্ণ গলে গিয়েছে। আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে আরেকটা ভীত চোখ চেয়ে আছে রানার দিকে।

ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুটল রানা রাইফেলটার দিকে। কিন্তু দুই পা এগিয়েই হঠাৎ একটা লোহার হুকে পা বেধে সে মাটিতে পড়ে গেল। হুকটা সরে গেল একপাশে। প্রাণভয়ে আবার লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা।

কিন্তু কোথায় গুংগা? গুলি খাওয়া চিতাবাঘের মত লাফিয়ে উঠেছিল গুংগা ব্যাপার বুঝতে পেরে। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গিয়েছে। একটা আতঙ্কিত তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। অবাক হয়ে দেখল রানা চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেছে গুংগা ভোজবাজির মত।

কাছে গিয়ে দেখল একটা আট ফুট বাই আট ফুট চারকোনা গর্ত সৃষ্টি হয়েছে মেঝেতে। নিচে অন্ধকার। পর মুহূর্তেই চোখে পড়ল গর্তের একটা কিনারায় গুংগার আঙুল দেখা যাচ্ছে। পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে কিনারাটা ধরে ফেলেছে সে। কিন্তু উঠতে পারছে না উপরে। কেউ সাহায্য না করলে পারবেও না।

এতক্ষণ পর দুই কোমরে হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস গ্রহণ করল রানা। কপালের ঘাম মুছে নিল রুমালে। অর্ধেকটুকু অ্যাসিড আছে—পেনটা পকেটে পুরল আবার। তারপর পকেট থেকে টর্চ বের করে ধরল গুংগার মুখের

ওপর। স্থির নিষ্পলক বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানার মুখের দিকে একটা চোখ।

কি আছে নিচে? গুংগার হাতের পাথরটা ফসকে পড়ে গিয়েছিল একধারে। পা দিয়ে ঠেলে এনে ফেলল রানা সেটাকে গর্তের মধ্যে। 'টুম' করে শব্দ হলো। তারপরই ছলাত্ করে ওপরে ছিটকে এল পানি।

নিশ্চয়ই পিরান্হা! এর মধ্যে ফেলে হত্যা করা হয়েছে মোহাম্মদ জানকে। আঙুলের মাথায় খানিকটা পানি নিয়ে জিভে ঠেকাতেই সন্দেহ রইল না আর। নোন্তা! মাটির তলা দিয়ে সাগরের সাথে যোগ আছে এই ট্যাঙ্কের।

গুংগার আঙুলগুলো সাদা দেখাচ্ছে—নখগুলো রক্তশূন্য। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে ঝুলছে সে মৃত্যু-গহ্বরের মুখে। আবার টর্চ ধরল রানা ওর মুখের ওপর। করুণ মিনতি ওর এক চোখে। একটা গোঙানি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। থর থর করে কাঁপছে ওর হাতের পেশীগুলো।

রানার চোখের সামনে ভেসে উঠল মৃত মোহাম্মদ জানের মুখ। স্বপ্নের সেই দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখতে পেল সে আবার। অনীতার মুখও ভেসে উঠল মনের পর্দায়। অনীতা, জিনাতের আর্তনাদ—গুংগার পৈশাচিক উল্লাস···

আগুন ধরে গেল মাথার মধ্যে।

ছোট্ট দুটো লাথি দিয়ে সরিয়ে দিল সে আটটা আঙুল।

একটা আতঙ্কিত চিৎকার হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল মাথাটা পানির তলায় চলে যেতেই। রানা মনে মনে ভাবল, এক নম্বর গেল। এবার ওয়ালী আহমেদ। ডান হাতটা টন টন করে উঠতেই চেয়ে দেখল ডবল-সাইজ গুংগার কব্জির মত দেখাচ্ছে সেটা। উত্তেজনার মাথায় ভুলেই গিয়েছিল সে ব্যথার কথা।

ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে উঠে দাঁড়িয়েছে সাঈদ। রানা গিয়ে দাঁড়াল পাশে। দূরে কয়েকটা বুটের শব্দ শোনা গেল। রাইফেলটা তুলে নিল রানা মাটি থেকে। তারপর এগিয়ে গেল ওরা খোলা গেটের দিকে।

'গুংগা কোথায়?'

কালো গর্তটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে লোহার বল্টুটা উল্টো দিকে ফেরাল রানা জুতো দিয়ে। খটাং করে বন্ধ হয়ে গেল গর্তমুখ। বুটের শব্দ কাছে এসে পড়েছে। দৌড় দিল রানা ও সাঈদ। দরজা দিয়ে মুখ বের করেই দেখতে পেল ওরা জনা আষ্টেক লোক পাশের দোতলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে এদিকে। প্রত্যেকের হাতেই রিভলভার। গুলি গালাচের শব্দ শুনতে পেয়েছে ওরা।

দরজার আড়াল থেকে একসাথে গর্জে উঠল রানার রাইফেল আর সাঈদের রিভলভার। দু'জন আছড়ে পড়ল মাটিতে। থমকে দাঁড়াল বাকি সবাই। সামনে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভড়কে গেল। রানার রাইফেলের বোল্ট টানার অবসরে আর একটা গুলি করল সাঈদ। একজনের পায়ে গিয়ে লাগল সাঈদের দ্বিতীয় গুলি। বসে পড়ল সে-ও। বাকি পাঁচজন ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল ছত্রভঙ্গ হয়ে।

এমন সময় তীক্ষ্ণ একটা নারী কণ্ঠের চিৎকারে একসাথে চমকে উঠল রানা ও সাঈদ। বাঁ দিক থেকে আসছে। এই স্টোর রুমের পাশের কোনও একটা ঘর থেকে।

জিনাত!

ছুটে গেল রানা ও সাঈদ সেদিকে। কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা গেল একটা স্ত্রীলোকের চেহারা। কি একটা জিনিস ঘুরাচ্ছে সে দেয়ালের গায়ে। রাইফেলের বাঁটের প্রচণ্ড আঘাতে কড়া ভেঙে ছুটে এল দরজার তালা। ঘরে ঢুকতেই হা-হা-হা-হা করে হেসে উঠল স্ত্রীলোকটি। এ কে? প্রথমে চিনতেই পারেনি রানা। এই চেহারা হয়েছে জিনাতের? উদভ্রান্ত দুই চোখ টকটকে লাল, চোখের কোণে কালি। চাপ চাপ রক্ত লেগে আছে জামা কাপড়ে। হাতে, মুখে, গলায় ধারাল নখের চিহ্ন। মাথার চুল উষ্কখুষ্ক।

ওদের দেখেই হা-হা করে হেসে উঠল জিনাত আবার। মট্ মট্ করে একগোছা চুল ছিঁড়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিল। তারপর খোলা দেয়ালে-আলমারির মধ্যে বসানো একটা চাকার হাতল ধরে ঘোরাতে থাকল। মাথা খারাপ হয়ে গেছে জিনাতের।

'জিনাত!' ডাকল রানা।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। একবার চোখ পাকিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে নিজের কাজে মন দিল জিনাত। চিনতেই পারল না রানাকে।

ছুটে গিয়ে সাঈদ ধরল জিনাতের হাত।

'জিনা! জিনা ব্যাহেন!'

অবাক হয়ে সাঈদের দিকে চাইল জিনাত। চিনতে পারল ধীরে ধীরে।

'সাঈদ ভাইয়া, উও কওন হ্যায়?' রানার দিকে ভীত-চকিত দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞেস করল জিনাত। তারপর চিৎকার করে উঠল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে 'ভাগো, সাঈদ ভাইয়া!'

জিনাতকে সাঈদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ছুটল রানা ওয়ালী আহমেদের উদ্দেশে। ওই বাড়িতে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে ওকে।

ফিশ্‌স্টোরের দরজার সামনে এসে পৌঁচেছে রানা, এমন সময় একটা সরু দড়ির ফাঁস এসে পড়ল ওর গলায়। দু'জন চেপে ধরল দুই হাত। ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল ওকে স্টোরের ভেতর।

## তেরো

হাত পা ছুঁড়ে ছুটবার চেষ্টা করল রানা। ফল হলো না। রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে দড়াম করে এক বাড়ি মারল একজন রানার পশ্চাতদেশে। কয়েক পা এগিয়ে গেল রানা সে ধাক্কায়। বুঝল, বাধা দেয়ার চেষ্টা বৃথা। একজন বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরেছে ওর ফুলে ওঠা কব্জি। বাম হাতে এতগুলো লোকের সাথে পারবে না সে।

তাছাড়া ওয়ালী আহমেদের কাছে পৌঁছবার আগেই শেষ হয়ে যেতে চায় না সে। খোদা! কিছু শক্তি অবশিষ্ট রেখো। ওয়ালী আহমেদের কণ্ঠনালীটা ছিঁড়ে ফেলতে পারলে আর কিছুই চায় না সে। তারপর ওর কপালে যা হয় হোক।

সমুদ্রের দিকে স্টোর-হাউসের একটা দরজা খুলে হাঁ করা। ওই পথেই এসেছে ওরা। ওই পথেই বাইরে বের করে আনল রানাকে। কোথায় নিয়ে চলেছে ওকে ওরা? তাহলে কি প্রতিশোধ নেয়া হলো না? লঞ্চ ঘাটের দিকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে

চলল ওরা রানাকে।

বাইরে খোলামেলা জোলো হাওয়া। সমুদ্রের একটানা সোঁ সোঁ গর্জন। আর আকাশে আধখানা চাঁদ। সারা আকাশ জুড়ে টিপ্ টিপ্ করছে অসংখ্য ম্লান তারা। রানার হাত ঘড়িতে ঠিক বারোটা বাজে। রানা ভাবল, কার বারোটা বাজল? ওর, না ওয়ালী আহমেদের।

সরু দুটো তক্তা জোড়া দিয়ে লঞ্চে ওঠার গ্যাংওয়ে বানানো হয়েছে। কয়েকটা ঝটকা দিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বার বৃথা চেষ্টা করল রানা। সতর্ক ছিল লোকগুলো। দড়াম করে পিঠের ওপর পড়ল রাইফেলের কুঁদো। সামনের টানে এবং পিছনের কয়েকটা প্রবল ধাক্কায় লঞ্চের ওপর উঠে এল সে চোখের সামনে প্রচুর শর্ষে ফুল দেখতে দেখতে। কিন্তু এই ধস্তাধস্তিতে কাজ হলো। বুকের কাছে শার্টের একটা বোতাম ছিঁড়ে গেল।

একটা কেবিনের দরজায় তিনটে টোকা দিল একজন।

'ভেতরে এসো,' গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

ওয়ালী আহমেদ! চিনতে পারল রানা গলার স্বর। লাফিয়ে উঠল ওর হৃৎপিণ্ড। আল্লা! এখনও সুযোগ আছে! শেষ চেষ্টা করে দেখবে সে। নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করল রানা। মাথা ঠিক রাখতে হবে এখন।

প্রশস্ত একটা কেবিন। ইজি চেয়ারে শুয়ে আছে ওয়ালী আহমেদ। হাতের কাগজটা কোলের ওপর নামিয়ে রাখা।

'শেষ পর্যন্ত আসতেই হলো আপনাকে, মিস্টার মাসুদ রানা। কিন্তু দুঃখ, আমার ইচ্ছেমত এক্সপেরিমেন্টাল মৃত্যু দিতে পারলাম না আপনাকে। অবশ্য মোহাম্মদ জানের ওপর দিয়ে সে কাজটা সেরে নেয়া গেছে অনেকটা। বোঝা গেল আড়াই মিনিটের বেশি লাগবার কথা নয়। ভীতু বেড়াল-ছানার মত সারা দিন হোটেলের মধ্যে বসে থাকলেন সারা হোটেলময় একঝাড় টিকটিকি ছড়িয়ে। ভাবছিলাম ফস্কে গেলেন বুঝি। কিন্তু বিদায়ের আগে ঠিক দেখা হয়ে গেল। কপালের লিখন খণ্ডাবে কে!'

রানা কোন উত্তর দিল না। ডান হাতের কব্জির ব্যথায় মুখ দিয়ে গোঙানি বেরিয়ে এল একটা। হাতটার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল ওয়ালী আহমেদ। একটা পান ফেলল মুখে।

'আজ আর গত কালকের মত লেকচার দিয়ে আপনার বিরক্তি উৎপাদন করব না। আর তিন মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু ঘটবে আপনার। পাথর বেঁধে সাগরে ফেলে দেয়া হবে লাশটা। আমি জানি কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টোর হাউসটা ঘিরে ফেলবে আর্মড্ ফোর্স। আমার বিরুদ্ধে কিছুই পাবে না তারা সেখানে। তবু ওরা এসে পড়বার আগেই আমি ইয়টে পৌঁছে যেতে চাই। সন্দেহজনক কিচ্ছু নেই ওই ইয়টে। বিনা বাধায় দু'হাজার নয়শো মাইল, অর্থাৎ চিটাগাং পর্যন্ত চলে যাবে ওই ইয়ট। এখান থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণে একটা হেলিকপ্টার এসে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে রাওয়ালপিণ্ডি।'

ঘড়ির দিকে চাইল ওয়ালী আহমেদ।

'আর দু'মিনিট আছে। আপনার শেষ ইচ্ছা বলতে পারেন, মিস্টার মাসুদ

রানা।'

'দুই মিনিটের আগে মারবেন না আমাকে?'

'না।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আপনার দু'মিনিট পূর্ণ হবার আগেই আমি ঢলে পড়ব মৃত্যুর কোলে,' বলল রানা। চোখের ইঙ্গিতে বোতাম-ছেঁড়া শার্টের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওয়ালী আহমেদের। 'বিষ ছিল এ বোতামে। খেয়ে নিয়েছি আমি।'

বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চাইল ওয়ালী আহমেদ রানার দিকে। ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে আসছে রানার দেহটা। ঢুলছে সে অল্প অল্প। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না আর। টেনে টেনে বলল, 'আমার শেষ ইচ্ছা পূরণ করবেন?'

মাথা নাড়ল ওয়ালী আহমেদ। 'হ্যাঁ।'

'তাহলে চিঠি দেব একটা। আমার···আমার বাগদত্তা স্ত্রীর কাছে। উহ্! আপনার বিরুদ্ধে কিছুই···কিছুই থাকবে না সে চিঠিতে। উহ্, পানি!'

হাঁপাতে থাকল রানা। লাল হয়ে উঠল ওর চোখ মুখ। মুচকে হাসল ওয়ালী আহমেদ। সামনের টেবিলে রাখা একটা সাদা প্যাডের দিকে ইঙ্গিত করতেই একজন তুলে ধরল সেটা রানার সামনে। পা দুটো কাঁপছে রানার থরথর করে। ডান হাতটা ছেড়ে দেয়া হলো। কাঁপা কাঁপা হাতে পকেট থেকে বল পয়েন্ট পেন বের করল রানা।

কিন্তু বোতাম টেপার আগেই টের পেয়ে গেল ওয়ালী আহমেদ। চট্ করে পেপার তুলে ধরায় মুখ পর্যন্ত গেল না অ্যাসিড—কাগজে বাধা পেয়ে টপ্ টপ্ করে পড়ল কয়েক ফোঁটা ভুঁড়ির ওপর। ফড়ফড় করে পুড়তে থাকল ভুঁড়ির চামড়া। জ্বলুনির চোটে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার দিয়ে তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেল ওয়ালী আহমেদ।

এক ঝট্কায় বাঁ হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা। বাকি অ্যাসিডটুকু শেষ করল স্যাঙাতদের ওপর। পাগলের মত নাচানাচি আরম্ভ করল লোকগুলো। অন্ধের মত ছুটাছুটি শুরু করল ঘরের মধ্যে।

ওয়ালী আহমেদ দৌড়ে গিয়ে একটা দেরাজ টান দিল। সাথে সাথেই সিংহের মত লাফিয়ে পড়ল রানা ওর ওপর। পিস্তলটা আর বের করা হলো না। শিরদাঁড়ার ওপর রানার কনুয়ের এক প্রচণ্ড গুঁতো খেয়ে বাঁকা হয়ে গেল ওর দেহটা। তারপর পাঁজরের ওপর এক লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ল ওয়ালী আহমেদের মেদ বহুল দেহটা মেঝেতে। কব্জির ব্যথার কথা ভুলে গেল রানা। বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টিপে ধরল ওর টুঁটি। ঠিকরে বেরিয়ে এল ওয়ালী আহমেদের চোখ দুটো বাইরে।

এমন সময় স্যাঙাতদের একজন এসে চেপে ধরল রানার চুলের মুঠি। ওদের কথা ভুলেই গিয়েছিল রানা। পায়ে বাঁধা ছুরিটা বের করে চালিয়ে দিল সে লোকটার পেট আন্দাজ করে। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। চুল ছেড়ে দিয়ে আর্তনাদ করে চিৎ হয়ে পড়ল লোকটা। আর রিস্ক নেয়া যায় না। লাফিয়ে উঠে দেরাজ থেকে বেরেটা অটোমেটিক পিস্তলটা বের করল রানা। স্লাইড টানতেই ইজেক্টারের টানে

ছিটকে বেরিয়ে একটা গুলি পড়ল মেঝেতে। লোডেড।

উঠে বসেছিল ওয়ালী আহমেদ। নাক-মুখের ওপর রানার বুটের এক লাথি খেয়ে শুয়ে পড়ল আবার। থুক্ করে দুটো রক্ত মাখা ভাঙা দাঁত বের করে ফেলল মুখ থেকে। তারপর জ্ঞান হারাল। লঞ্চটা চলতে আরম্ভ করেছে। ঘরের মধ্যে দু'জন এবং দরজার কাছে একজন স্যাঙাত পড়ে আছে জ্ঞান হারিয়ে। বাকি দু'জন কেবিন থেকে বেরিয়ে বোধহয় সংবাদ দিয়েছে অন্যান্যদের। দ্রুত সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে ওরা লঞ্চটাকে ঘাট থেকে। একবার ইয়টে পৌঁছতে পারলে আর রক্ষা নেই রানার।

ওয়ালী আহমেদের একটা পা ধরে হিড় হিড় করে টেনে কেবিন থেকে বের করে ডেকের ওপর আনল রানা। রাইফেলটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে ঝুলিয়ে নিল কাঁধে। গলার ফাঁসটা খুলে ওয়ালী আহমেদের গলায় পরাল। তারপর বেঁধে ফেলল ওকে রেলিং-এর সঙ্গে ছাগলের মত।

কয়েক পা এগোতেই সারেংকে দেখা গেল।

'লঞ্চ ঘুরাও।'

চমকে উঠেই পালাতে যাচ্ছিল সারেং—পিস্তলটা দেখে থেমে গেল। ঘুরিয়ে দিল লঞ্চ। ঘাট থেকে অল্পদূরেই গিয়েছিল, ফিরে চলল আবার সেটা ঘাটের দিকে।

চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখল রানা। আর লোকগুলো কোথায় গেল? কোন্ দিক থেকে আক্রমণ আসবে এবার?

নড়েচড়ে উঠল ওয়ালী আহমেদের দেহটা। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সে।

'খবরদার! এক ইঞ্চি নড়েছ কি খতম করে দেব।' বলল রানা সারেং এবং ওয়ালী আহমেদকে লক্ষ্য করে। চোখ মেলে চাইল ওয়ালী আহমেদ। চারদিকে চেয়ে সবটা পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করল সে।

আর গজ পঁচিশেক আছে। হঠাৎ ডান ধারে পায়ের শব্দ শুনে সেদিকে চাইল রানা। পিস্তল হাতে রানাকে দেখে থমকে দাঁড়াল ওরা। সেই দু'জন স্যাঙাত। ভয়ে বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। বিনাবাক্যব্যয়ে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ।

এমনি সময় ঘটল ঘটনাটা। রানা অন্যদিকে চাইতেই বাঁধন খুলে ফেলেছিল ওয়ালী আহমেদ। এবারে তড়াক করে রেলিং টপকে পানিতে গিয়ে পড়ল।

'সার্চ লাইট পানিতে ফেল, সারেং। জলদি।'

হুকুম করল রানা। জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে না পারলে মেরে রেখে যাবে।

জ্বলে উঠল তীব্র আলো। সে আলোয় বিস্মিত হয়ে দেখল রানা খলখল করে হাসছে যেন সাগরের জল। জীবন্ত হয়ে উঠেছে লঞ্চের চারিটাপাশ প্রাণচাঞ্চল্যে।

ব্যাপার কি? প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না রানা। বুঝতে পারল ওয়ালী আহমেদ ভেসে উঠতেই। ভুস্ করে মাথাটা ভেসে উঠল ওর পানির ওপরে।

'বাঁচাও! বাঁচাও!' চিৎকার করে উঠল ওয়ালী আহমেদ ভাঙা গলায়। অবাক হয়ে দেখল রানা ওর সারা মুখ কামড়ে ধরে ঝুলছে আট দশটা ছয় সাত ইঞ্চি লম্বা মাছ। আলো পড়ে চক্‌চক্ করছে ওগুলোর রূপোলী পেট।

পিরান্‌হা! সাগরে বেরিয়ে এল কি করে? ওয়ালী আহমেদ আকাশ ফাটিয়ে

চিৎকার করছে। দুই হাত দিয়ে সরাবার চেষ্টা করছে মাছগুলোকে সর্বাঙ্গ থেকে। কিন্তু একটা সরলে দশটা ঝাঁপিয়ে আসছে সেই জায়গায়। সর্বশরীর ছেঁকে ধরেছে ওরা। তিন মিনিটেই শেষ করে ফেলবে।

কিন্তু এল কোত্থেকে ওরা? হঠাৎ রানার মনে পড়ল জিনাতের সেই চাকা ঘুরানোর কথা। মাটির তলা দিয়ে যখন সাগরের সাথে স্টোর-রুমের নিচের ট্যাঙ্কের যোগ আছে, তখন নিশ্চয়ই কোনও এক জায়গায় তারের জাল দিয়ে বেড়া দেয়ার ব্যবস্থাও আছে। জিনাতের ওই চাকা ঘুরানোর ফলে হয়তো সেই জালের বেড়া সরে গিয়ে থাকতে পারে। হয়তো ওই চাকা দিয়েই বেড়া উঠানো-নামানোর ব্যবস্থা করেছিল ওয়ালী আহমেদ। ছাড়া পেয়ে সব বেরিয়ে এসেছে বাইরে।

এবার পাগলের মত সাঁতার কাটতে আরম্ভ করল ওয়ালী আহমেদ তীরে আসার জন্যে। কন্ট্যাক্ট লেন্স থাকায় চোখ দুটো বেঁচে গেছে পিরান্হার ভয়ঙ্কর আক্রমণ থেকে। কিন্তু সারা দেহের জ্বলুনি আর কতক্ষণ সহ্য করা যায়। সমুদ্রের লবণাক্ত পানি লাগলে খাবলে খাওয়া দেহে কেমন জ্বালা করে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সে। এ-ও এক এক্সপেরিমেন্ট।

মৃত্যু-যন্ত্রণায় শেষ বারের মত কেঁদে উঠল ওয়ালী আহমেদ। আর এগোতে পারছে না। রক্তে লাল হয়ে গেছে পানি। কয়েক মুহূর্তের জন্যে জ্ঞান হারিয়ে ডুবে গিয়েছিল—আবার যখন ভেসে উঠল, রানা দেখল নাক-কানের চিহ্নমাত্র নেই সে মুখে। কয়েক সেকেণ্ড রানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ডুবে গেল ওয়ালী আহমেদের মুমূর্ষু দেহটা। সেই সাথে পিরান্হার রূপোলী ঝিলিক নেমে গেল সাগরের গভীরে।

কপালের লিখন খণ্ডাবে কে? ঠিকই বলেছিল ওয়ালী আহমেদ।

ঘাটে ভিড়ল লঞ্চ। ইশারা করতেই সারেংসহ তিনজন নেমে গেল আগে আগে। কসম খেয়ে বলল আর লোক নেই লঞ্চে। আবার স্টোর হাউসে ঢুকল ওরা খোলা দরজা দিয়ে। যে ঘরে জিনাত ছিল সেখানে কাউকেই দেখতে পেল না রানা।

এখনও আর্মড্ ফোর্সের পাত্তা নেই কেন? অনীতা কি তাহলে আসেনি?

দোতলা বাড়ির পাশ দিয়ে বাইরে বেরোবার গেটের দিকে এগোচ্ছে রানা বন্দী তিনজনকে নিয়ে। হঠাৎ কানে এল: 'হুকুমদার (Who comes there)! হল্ট্! হ্যাণ্ডস্ আপ্!'

রানাকে 'ফ্রেণ্ড' বলবারও সুযোগ দিল না—ব্যাপার কি? ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল পিল্ পিল্ করে চারপাশ থেকে এরিয়ার মধ্যে ঢুকছে লোহার শিরস্ত্রাণ পরা সশস্ত্র বাহিনীর জোয়ানরা।

সামনের তিনজনের মত রানাও দাঁড়িয়ে গেল হাত তুলে। এমন সময় গেট দিয়ে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর করাচি চীফের সঙ্গে ঢুকলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। তাদের পিছন পিছন ঢুকল সাধু বাবাজী সোহেল। সামনের তিনজনের ভার গ্রহণ করল মিলিটারি।

রানার বিধ্বস্ত চেহারা আর ফোলা হাতের দিকে চেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন রাহাত খান। অল্প কথায় সব বুঝিয়ে দিল রানা রাহাত খানকে। ফার্স্ট এইডের কথা তোলায় বলল বাইরে লোক আছে তার সঙ্গে যাবে। তারপর সোহেলকে একবার

চোখ টিপে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। রাহাত খান করাচি-চীফের সঙ্গে চললেন স্টোরের দিকে।

এমন সময় ছুটে এসে রানার হাত ধরল অনীতা গিল্‌বার্ট।

'এ কী চেহারা হয়েছে তোমার, রানা! যাক, বেঁচে যে আছ এ-ই বেশি। ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল একেবারে।'

'শিগগির আমাকে কোনও হাসপাতালে নিয়ে চলো, অনীতা। ফার্স্ট এইড দরকার।'

'নিশ্চয়ই।'

এগোল ওরা গেটের দিকে। হঠাৎ ওপর দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল অনীতা।

'আরে! ছাতের ওপর কে!' আঙুল তুলে দেখাল সে ছাতের দিকে।

অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে দেখল রানা বিশাল এক দৈত্যের ছায়ামূর্তি। গুংগা! ভূত দেখার মত চমকে উঠল রানা গুংগাকে দেখে। চট্‌ করে রাইফেলটা নামাল কাঁধ থেকে। বুঝল সব পিরান্‌হা সাগরে বেরিয়ে যাওয়ার পরে ফেলেছিল সে ওকে গর্ত দিয়ে পিরান্‌হার ট্যাঙ্কে।

প্রকাণ্ড একটা পাথর তুলেছে গুংগা দুই হাতে মাথার ওপর। বোধহয় এতক্ষণ ছাতে উঠে বসে ছিল সে রানার অপেক্ষায়।

পর পর দুটো গুলি করল রানা আধ সেকেণ্ডের মধ্যে।

ধনুষ্টঙ্কার রোগীর মত বাঁকা হয়ে গেল গুংগার দেহটা পিছন দিকে। তারপর প্রফেশনাল ডাইভারের মত সোজা নেমে এল সে ছাত থেকে মাথা নিচের দিকে করে। মড়াত করে ভেঙে গেল বিশ বছরের দুরমুজ করা গর্দান।

এগিয়ে যাচ্ছিল সেদিকে রানা, হঠাৎ অনীতার এক হেঁচকা টানে থেমে গেল।

গুংগার হাতের তিনমনি পাথরটা হাত থেকে খসে প্রথমে পড়েছিল কার্নিসের ওপর। ওখান থেকে গড়িয়ে সোজা নেমে এল নিচে। ঠিক গুংগার মাথার ওপর এসে পড়ল প্রকাণ্ড পাথর। 'ঠুস্‌' করে একটা শব্দ করে ফেটে গেল খুলি। মগজ আর তাজা রক্ত ছিটকে এসে লাগল রানা আর অনীতার চোখেমুখে, কাপড়ে।

'সেই পিশাচ, তাই না, রানা! ইট'স আ জায়ান্ট!'

কানের পাশে রাহাত খানের কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল রানা। দেখল পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। অনীতার হাতটা ছেড়ে দিল সে চট্‌ করে।

'জ্বী, স্যার।'

'তা তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও, কুইক। কোনও হসপিটালে ফার্স্ট-এইড নিয়ে নাও।'

'সাতদিনের ছুটি দিতে হবে, স্যার,' বলল রানা একটু ইতস্তত করে।

ভুরু কুঁচকে রানা এবং অনীতার মুখের দিকে চাইলেন রাহাত খান। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অলরাইট।'

ঘৃণাভরে চাইল একবার অনীতা গুংগার মৃতদেহের পানে। তারপর এগিয়ে গেল ওরা স্টার্ট দিয়ে রাখা লাল গাড়িটার দিকে।

'তোমার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকলাম, রানা,' ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে ক্লাচটা ছাড়তে ছাড়তে বলল অনীতা গিলবার্ট।

মৃদু হেসে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, থেমে গেল। অনীতা গম্ভীর। দু'চোখে টলটল করছে দুফোঁটা অশ্রু। রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে আবার বলল, 'চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকলাম। সত্যি, তোমাকে ধন্যবাদ।'

***